Boighar.com

বইঘর নিবেদন

মাসুদ রানা

হ্যাকার

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
বইঘর



বইঘর নিবেদন

মাসুদ রানা

দুইখণ্ড একত্রে

হ্যাকার

কাজী আনোয়ার হোসেন

একটা খবর একই সঙ্গে কীভাবে ভাল আর মন্দ হয়,
বলতে পারেন? ঠিক আছে, উদাহরণ দেয়া যাক।
নাসার ডিপ স্পেস প্রোব ভয়েজার-টু'তে রিসিভ করা হয়েছে
অত্যাশ্চর্য এক সিগনাল—ভিনগ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার
অকাট্য প্রমাণ। সুসংবাদ, তাই না?
কিন্তু খারাপ খবরটা হচ্ছে, ওটার ভিতর লুকিয়ে আছে
এক ভয়ঙ্কর কোড, যা আগামী চারদিন পর সারা পৃথিবীর
কম্পিউটার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।
আর এর পিছনে যারা জড়িত, তারা কোনও
ভিনগ্রহবাসী নয়, এই গ্রহেরই দু-পেয়ে জানোয়ার।
এই মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে সভ্যতাকে বাঁচাতে হ্যাকিং,
সাইবার-ক্রাইম আর সাইবার-টেররিজমের সম্পূর্ণ
অজানা-অচেনা অন্ধকার জগতে ঢুঁ মারতে চলেছে
মাসুদ রানা। কিন্তু কাজটা সহজ নয় মোটেই।
উদয় হয়েছে ওর পুরনো শত্রু ডগলাস বুলক ওরফে বুলডগ।
যে-কোনও মূল্যে রানাকে ঠেকাতে মরিয়া সে।
রয়েছে অচেনা শত্রুর লেলিয়ে দেয়া ভয়ঙ্কর খুনীরাও।
আগামী ৯০ ঘণ্টা নরক দর্শন করে ফিরবে রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী বইঘর

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

হ্যাকার

(দুইখণ্ড একত্রে)

www.boighar.com

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7675-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
www.boighar.com
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
HACKER
Part I & II
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী

ছিয়াশি টাকা


BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৫১/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হংকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৮২/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	১০৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৭৩/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৪-১৬৯	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-

www.boighar.com

মাসুদ রানা-৩৮৫,৩৮৬

হ্যাকার-১,২

কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতা

ASHIQ

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ জ্বলন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো [illegible] ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন কলম্বিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+[illegible]	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৮১ মৃত্যু ফাঁদ+[illegible]	৪৫/-
২৭৯-২৮২ [illegible] ট্রেজার+[illegible]	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+ভূকম্পের জাল	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া [illegible]	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99	৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুইন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ [illegible]+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+[illegible]	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ [illegible]	১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+[illegible]	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+[illegible]	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে)	৮৭/-

হ্যাকার-১

প্রথম প্রকাশঃ-২০০৮

এক

www.boighar.com

জুন, ১৯৯০। গ্লস্টারশায়ার, ইংল্যান্ড।

অফিস ছুটি হওয়ায় কিংসউড ইলেকট্রনিক্সের পার্কিং লটে বাড়িমুখী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভিড়। প্রচুর মানুষ জায়গাটায়, তারপরও একটু খেয়াল করলেই একজোড়া যুবক-যুবতীর উপর চোখ আটকে যাবে আপনার। স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, এমন চমৎকার জুটি সচরাচর চোখে পড়ে না। সেইসঙ্গে চমকেও যাবেন, যদি শোনেন—ওরা বিবাহিত এবং সাত বছর বয়েসী এক কন্যাসন্তানের জনক-জননী। হঠাৎ দেখায় ওদের কলেজ-পড়ুয়া উচ্ছল তরুণ-তরুণীর মত মনে হলেও বাস্তবে দুজনেরই বয়েস উনত্রিশ, বেশ কিছুদিন হলো ইউনিভার্সিটির পাট শেষ করে চাকরিজীবনে প্রবেশ করেছে।

মাইকেল ওয়ালডেন টগবগে যুবক—ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা, মাথাভর্তি কোঁকড়া কালো চুল, দু'চোখে রাজ্যের উজ্জ্বলতা। অসম্ভব সুপুরুষ, মুখে সারাক্ষণই একটা হাসিখুশি ভাব ফুটে আছে, যেন পৃথিবীর কোনওকিছুই তাকে বিচলিত করতে পারবে না। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে, যা মেয়েরা সাধারণত এড়িয়ে যেতে পারে না। মাইকেলের সুগঠিত-সুঠাম দেহও এর একটা কারণ হতে পারে, হঠাৎ দেখায় তাকে অ্যাথলিট বলে ভ্রম হয় প্রায় সবারই। অবশ্য দেহের চেয়ে তার মগজটা অনেক বেশি প্রখর—পরিচিতজনরা একবাক্যে স্বীকার করবে ব্যাপারটা।

মগজের কথাই যদি বলতে হয়, তা হলে ডেবিকেও এড়ানোর উপায় নেই। স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মত মেধা রয়েছে তার, লেখাপড়ায় তার কৃতিত্বও উল্লেখ করার মত। অবশ্য ডেবির রূপ-যৌবন হারিয়ে দেবে বাকি সব গুণকে। সিল্কের মত মসৃণ কোমর-ছাড়ানো সোনালি চুল তার, পটলচেরা চোখের নীল মণিতে সাগরের গভীরতা। তীক্ষ্ণ নাক, ছোট্ট কপাল, পাতলা ঠোঁট আর ডিম্বাকৃতির মুখটা যেন শিল্পীর হাতে গড়া হয়েছে—চেহারাটা হয়ে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর আর মায়াময়। সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার দেহটাও ছিপছিপে, তাতে অকৃপণ হাতে যৌবনের সম্পদ ঢেলেছেন সৃষ্টিকর্তা, নশ্বর এক নারীকে পরিণত করেছেন সব পুরুষের আরাধ্য দেবীতে।

অবশ্য বিপরীত লিঙ্গকে নাচানোর মত যত রসদই থাকুক, তা কখনও ব্যবহার করে না মাইকেল বা ডেবি। একে অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ওরা, ভুলেও চোখ তুলে অন্য কোনও নারী বা পুরুষের দিকে তাকায় না। তাকাবার প্রয়োজনও অবশ্য পড়ে না, দম্পতি হিসেবে অত্যন্ত সুখী দুজনে। সেই স্কুলজীবনে সম্পর্কের শুরুটা করেছে ওরা, অল্প বয়েসের প্রেম পরিণত বয়স পর্যন্ত টেকে না বলে যে মতবাদটা আছে, সেটাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করেছে, আজও সেই শুরুর মতই অটুট ওদের বন্ধন। অবশ্য এর পিছনে প্রধান কারণ দুজনের মধ্যকার

চমৎকার বোঝাপড়া। ব্যক্তিত্ব আর পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই ওদের, ছোটখাট যেসব বিভেদ আছে, সেগুলোও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে জানে দুজনে—সম্পর্কটা এত বছর টিকে থাকার রহস্য সেটাই। এই চমৎকার বোঝাপড়াটার জন্যই আজ পর্যন্ত ওদের জীবনে অন্য কোনও নারী বা পুরুষ আসেনি।

বিধাতা নাকি পৃথিবীতে সবার জন্যই উপযুক্ত একটা জুটি তৈরি করে রাখেন, প্রত্যেক মানুষ অবচেতনভাবে সারাটা জীবন তার অপর অর্ধাংশকে খুঁজে বেড়ায়, সত্যি সত্যি পায় অল্প ক'জন। মাইকেল আর ডেবি সেই সৌভাগ্যবানদের দুজন। ব্যাপারটা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি ওদের, তাই দ্রুত বিয়ে করে একে অপরকে চিরতরে বেঁধে ফেলতে উৎসুক হয়ে রয়েছিল শুরু থেকেই। মাইকেলের বয়স একুশ পেরোতেই আইনগত বাধাটা আর রইল না, শুভ কাজে আর দেরি করেনি ওরা—মাইকেলের একুশতম জন্মদিনটাই ওদের বিয়ের দিন। এক বছরের মাথায় কোল জুড়ে এসেছে ফুটফুটে এক রাজকন্যা, তাকে নিয়ে সুখের সংসার গড়েছে দুজনে।

অবশ্য ওদের গল্পটা শুধু প্রেম আর ভালবাসার বললে ভুল হবে। দুজনে যে অত্যন্ত মেধাবী, তা তো আগেই বলা হয়েছে। স্কলারশিপ নিয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছিল ওরা, পড়াশোনা করেছে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে। শুধু তাক লাগানো ফলাফলই নয়, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তরতর করে এগোতে থাকা এই ফিল্ডে চমৎকার কিছু আবিষ্কারও ইতোমধ্যে করে ফেলেছে ওরা, ফলে উদীয়মান কম্পিউটার বিজ্ঞানী হিসেবে নামডাক ছড়াতে শুরু করেছে। ঘরে ছোট্ট একটা সন্তান রেখে ওরা কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর। পড়াশোনা শেষ করার আগেই একের পর এক আকর্ষণীয় চাকরির প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু লোভের ফাঁদে পা দেয়নি ওদের কেউই। লেখাপড়া শেষ করেছে, ডক্টরেট নিয়েছে, তারপর যোগ দিয়েছে চাকরিতে।

কিংসউড ইলেকট্রনিক্স যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে নামজাদা ও বড় কোম্পানিগুলোর একটা, ওয়ালডেন দম্পতিকে পেতে তাদের শুধু টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ হয়নি, মেনে নিতে হয়েছে স্বামী-স্ত্রী'র হাজারটা শর্ত, সেইসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে কাজ করার স্বাধীনতা দেবার। আজ দেড় বছর হলো যোগ দিয়েছে মাইকেল আর ডেবি, ইতোমধ্যে কিংসউডকে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেক্টরে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে ওরা।

গ্রীষ্মের এই সুন্দর বিকেলে অফিস শেষ করে বেরিয়ে এসেছে মাইকেল আর ডেবি, বাড়ি ফিরবে। ভিড় এড়িয়ে এগিয়ে পার্কিং লটের এক প্রান্তে রাখা নিজেদের টয়োটা কারে উঠে বসল ওরা। কোম্পানি দামি গাড়ি আর শোফার দিতে চাইলেও তাতে রাজি হয়নি ওদের কেউ, পাঁচ বছর আগে কষ্ট করে কেনা এই গাড়িটা ওদের কাছে অনেক বেশি আপন আর নানা রকম স্মৃতিতে ভরা। এই অনুভূতি আর কোনও গাড়ি দিতে পারবে না ওদের।

ড্রাইভিং সিটে বসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসল মাইকেল, ইগনিশন ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল। ডেবিও প্রত্যুত্তরে হাসছে দেখে তাকে হালকা করে চুমো খেল

boighar.com

ও, তারপর হ্যান্ডব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল। ধীরগতিতে অন্যান্য গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল টয়োটা পার্কিং লট থেকে। দুজনের কেউই জানল না, মাত্র দশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা কালো শেভি ভ্যানটা থেকে নজর রাখা হচ্ছে ওদের উপর।

ভ্যানের ভিতর রুক্ষ চেহারার দুজন লোক বসা—ড্রাইভার বিশালদেহী, তার সঙ্গী বেঁটেখাটো, নাকের তলায় ঝাঁটার মত গোঁফ। টয়োটাকে বেরিয়ে যেতে দেখে কোলের উপর থেকে একটা ওয়াকিটকি তুলে নিল ঝাঁটাগুঁফো, বোতাম টিপে বলল, 'টার্গেট রওনা দিয়েছে, সবাই রেডি থাকো। টিম ওয়ান, রোডব্লক করে ফেলো। টিম টু, তৈরি হও, টার্গেট আর আমরা তোমাদের ক্রস করব দশ মিনিটের মধ্যে। তারপরই রাস্তা আটকে দেবে, কোনও ট্রাফিক যেন না থাকে।'

'দিস ইজ টিম টু,' ওপাশ থেকে জানানো হলো, 'আমরা অলরেডি ট্রাফিক ডাইভার্ট করে দিতে শুরু করেছি। রাস্তায় কোনও গাড়ি নেই।'

'আগেই শুরু করলে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ঝাঁটাগুঁফো। 'কেউ যদি সন্দেহ করে বসে?'

'তেমন কোনও ভয় নেই, রাস্তাটা এমনিতেই নির্জন। সব মিলিয়ে মাত্র চারটে গাড়ি এসেছিল। আমাদের পোশাক দেখে কিচ্ছু সন্দেহ করেনি।'

'তা হলে তো ভালই। স্ট্যান্ড বাই, আমরা আসছি এখুনি।' ড্রাইভারের দিকে তাকাল ঝাঁটাগুঁফো। 'লেটস্ গো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্টার্ট দিল বিশালদেহী, পার্কিং লট থেকে ভ্যান নিয়ে বেরুল ধীরে, মেইন রোডে এসে হু হু করে গতি বাড়িয়ে দিল। মাইকেল পাগলের মত গাড়ি চালায়, টয়োটা এগিয়ে গেছে অনেকটা, সেটাকে ধরতে হবে।

'সাবধানে চালাও,' ঝাঁটাগুঁফো বলল। 'টার্গেট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরত্ব রাখবে সারাক্ষণ, বেশি কাছে যেয়ো না।'

খানিক পরেই নজরে পড়ল মাইকেল আর ডেবির নীল টয়োটা, শহরের রাস্তা ছেড়ে হাইওয়ে একজিটের পাশে ইন্ডিকেটর জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে ট্রাফিক বাতি সবুজ হবার জন্য। একটু দূরত্ব রেখে কালো ভ্যানটাও থামল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সবুজ সঙ্কেত পাওয়া গেল, স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে হাইওয়েতে গাড়িটাকে তুলে আনল মাইকেল, রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে শুধু একটা কালো ভ্যান দেখতে পেল, সামনে বা পিছনে আর কোনও গাড়ি নেই। রাস্তা ফাঁকা দেখে গতি বাড়িয়ে দিল ও, দ্রুত ছুটছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। হাইওয়ের এই পথ ধরে কয়েক মাইল এগোলেই কটস্ওল্ড হিলের পার্বত্য এলাকা, সেখানে উইনস্টোনের পাহাড়ি উপত্যকায় নির্মল প্রকৃতির মাঝে ওদের বাড়ি। যদিও প্রায় সভ্যতা-বিবর্জিত এমন জায়গা বসবাসের জন্য সাধারণ লোকজন পছন্দ করে না, তবে মাইকেল আর ডেবি অন্যরকম ধ্যানধারণার মানুষ। শহরের যান্ত্রিকতা পছন্দ নয় ওদের কারও, সারাদিন জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার পর দিনের শেষে ওরা চায় নির্মল একটা পরিবেশ, সেজন্যই ওখানে আবাস গড়েছে দুজনে। সমস্যা একটাই, যাওয়া-আসা করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সময়টা কমিয়ে আনার চেষ্টায় থাকে মাইকেল।

অবশ্য ঝুঁকি তেমন নেই এতে—রাস্তাটায় খুব একটা ট্রাফিক থাকে না। জোরে চালালেই যে অ্যাকসিডেন্ট হবে, তা নয়।

স্পিডোমিটারের কাঁটা আশি পেরুচ্ছে দেখে বাঁকা চোখে স্বামীর দিকে তাকাল ডেবি। বলল, 'আস্তে চালাও। এত তাড়া কীসের?'

মুচকি হাসল মাইকেল। 'কত কাজ পড়ে আছে, জানো না? বাসায় গিয়ে মেয়েটাকে আদর করতে হবে, ঘরদোর গোছাতে হবে, ডিনার তৈরি করতে হবে, তারপর তোমাকে নিয়ে বিছানায়...'

'মারব এক কিল!' চোখ রাঙাল ডেবি। 'ইস্‌সি রে, ভাবখানা দেখো! এমনভাবে বলছে যেন নিজে করবে! কাজ তো সব করতে হবে আমাকেই!'

'তুমিই তো করবে,' হাসল মাইকেল। 'তাড়াতাড়ি না গেলে কাজ সেরে বিছানায় আসবে কীভাবে...উহুহ্!'

স্বামীর হাতে জোরে চিমটি কেটেছে ডেবি। ভুরু নাচিয়ে বলল, 'কী...কেমন মজা?'

ব্যথা পাওয়া জায়গাটা অন্য হাতে ডলল মাইকেল। শাসাল, 'আজ রাতে তোমার খবর আছে!'

আবারও চিমটি কাটল ডেবি।

'অ্যাই, অ্যাই! করছ কী?' বলল মাইকেল। 'ড্রাইভিঙের সময় ডিস্টার্ব করতে হয় না—এটা জানো না? অ্যাকসিডেন্ট হলে কিন্তু আমাকে দুষতে পারবে না।'

'করো তোমার ড্রাইভিং,' কপট রাগের সুরে বলল ডেবি। 'বাড়ি ফিরে প্রতিশোধ নেব। আজ রাতে একা শোবে তুমি, আমি থাকব আমার মেয়ের সঙ্গে।'

'কী সর্বনাশ! এত নিষ্ঠুর হতে পারবে তুমি?'

'উঁহুঁ, ওসব মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজবে না...'

কথা বলতে বলতে কটস্‌ওল্ডের পার্বত্য এলাকায় পৌঁছে গেল গাড়ি। দিগন্তজোড়া উঁচু-নিচু পাহাড় ঢেকে রেখেছে সামনেটা, আর এরই মাঝ দিয়ে পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে চলে গেছে রাস্তা। প্রথম ঢালটায় চড়ার সময় পথের পাশে আরেকটা ভ্যান পেরিয়ে এল ওরা, তবে ওটার উপস্থিতিটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না।

ভ্যানটার গায়ে লেখা: *লিওয়ে কনস্ট্রাকশনস্।* টয়োটা পেরিয়ে যেতেই লাফ দিয়ে সেটা থেকে নামল চারজন লোক, সবার পরনে কভারঅল আর হেলমেট। কয়েক সেকেন্ডের ভিতর অনুসরণকারী কালো ভ্যানটাও পেরিয়ে যেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা, কাঠের তৈরি রোডব্লক আড়াআড়িভাবে বসিয়ে বন্ধ করে দিল রাস্তা, মাঝখানে বসাল একটা সাইনবোর্ড। তাতে বড় বড় করে লেখা:

সাবধান!
রাস্তা মেরামতের কাজ চলিতেছে।
বিকল্প পথ ব্যবহার করুন।

রিয়ারভিউ মিররে দৃশ্যটা দেখে সন্তুষ্টি ফুটল ঝাঁটাগুঁফোর চেহারায়। মুখের কাছে ওয়াকিটকি তুলে বলল, 'টিম থ্রী, আর দু'মাইল!'

দু'মিনিটও লাগল না দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে, মাইকেল বরাবরের মত

boighar.com

প্রবল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। লোকেশনটা একটা তীক্ষ্ণ বাঁক, পুরো পথের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ, রীতিমত ব্লাইন্ড টার্ন যাকে বলে—দুপাশ থেকে আসা গাড়িগুলো কেউ কাউকে দেখতে পায় না। দীর্ঘদিন থেকে যাওয়া-আসা করতে করতে অভিজ্ঞ হয়ে গেছে মাইকেল, মোড়ে এসে লম্বা করে হর্ন দিল, অপরপ্রান্তে কোনও শব্দ না পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো, গতি খুব একটা না কমিয়ে বাঁক নিতে শুরু করল।

ঠিক তক্ষুণি দেখা দিল বিপদ, বাঁকের ওপাশ থেকে মূর্তিমান দানবের মত উদয় হলো আঠারো-চাকার বিশাল এক ট্রাক, পুরো রাস্তা দখল করে ছুটে আসছে ছোট্ট টয়োটাকে লক্ষ্য করে। চিৎকার করে উঠল ডেবি।

মাথা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মাইকেলের, বিপদটাকে চাক্ষুষ করে হতবুদ্ধি হলো না সে, বনবন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষটা এড়াল। রাস্তার কিনার ধরে কোনাকুনিভাবে ছুটে গেল ওদের গাড়ি, ঢালের প্রান্তে লাগানো নিচু রেলিঙে সজোরে আঘাত করল টয়োটার ফ্রন্ট-এন্ড, ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল অনেকটা, অর্ধেক পৌঁছে থমকে গেল।

সিটবেল্ট বাঁধা থাকায় বেঁচে গেছে ওয়ালডেন দম্পতি, তারপরও ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠোকর খেয়ে কপাল কেটে গেছে। এক হাত তুলে গড়াতে থাকা রক্ত মুছল মাইকেল, তাকাল চারপাশে। বিস্মিত হয়ে দেখল, চলে যাচ্ছে ট্রাকটা, দাঁড়াচ্ছে না। ভাবখানা এমন—যেন কিছুই ঘটেনি। ব্যাপারটা কী, ওদের সাহায্য না করে চলে যাচ্ছে কেন? মুহূর্তেই ধরতে পারল কারণটা, তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে উঁকি দিল মাইকেল, চোখে পড়ল পাহাড়ের খাড়া ঢাল—কয়েকশো ফুট দীর্ঘ। রেলিং ভেঙে অর্ধেক দৈর্ঘ্য বেরিয়ে গেছে টয়োটার, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে টালমাটাল করছে, পড়ে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে।

এবার স্ত্রীর দিকে নজর দিল ও, অচেতনের মত এলিয়ে পড়ে আছে ডেবি। ডাকল, 'ডেবি! ডেবি!! তুমি ঠিক আছ?'

গুঙিয়ে উঠল ডেবি। চোখ খুলে বলল, 'ক...কী...কী ঘটল?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইকেল। 'অ্যাকসিডেন্ট, তবে ইচ্ছাকৃত। ট্রাকটা মোড় ঘোরার আগে হর্ন দেয়নি, তারওপর কীভাবে পুরো রাস্তা আটকে আমাদের দিকে ছুটে এল, দেখোনি? ইচ্ছে করে করেছে, আমাদের পিষে ফেলতে চাইছিল চাকার তলায়।'

'মাই গড! কিন্তু কেন? কে আমাদের মারতে চাইবে?'

শব্দ করল না, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শুধু ঠোঁট নাড়ল মাইকেল।

'না-আ!' আঁতকে উঠল ডেবি। 'ও পাগল হতে পারে, তাই বলে এতটা নয়!'

পিছনে ইঞ্জিনের শব্দ পেয়ে আলোচনাটা আর বাড়াল না মাইকেল। বলল, 'থ্যাংক গড, কেউ সাহায্য করতে এসেছে।' ঘাড় ফেরাতেই কালো ভ্যানটাকে থেমে দাঁড়াতে দেখল ও, যেটা শুরু থেকে ওদের পিছু পিছু আসছে। 'প্লিজ, আমাদের সাহায্য করুন!'

ভ্যান থেকে নেমে এসে রেলিঙের অক্ষত অংশ ধরে ঝুঁকল ঝাঁটাগুঁফো। জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, 'খুব খারাপ... খুব খারাপ, ড. ওয়ালডেন!'

চমকে উঠল মাইকেল। 'আপনি... আপনি আমার নাম জানেন?'

'শুধু নাম না, অনেককিছুই জানি,' লোকটা হাসল। 'জানি আপনি কেমন বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালান, জানি কত জোরে এই বাঁকটা পেরোন...সেজন্যই তো ভেবেচিন্তে এত আয়োজন করে অ্যাকসিডেন্টের ব্যবস্থা করলাম। রাস্তার দু'মাথায় রোডব্লক দিয়ে পুরো পথটা নির্জন করা, তারওপর টাইমিং মিলিয়ে ট্রাকটাকে বাঁক ঘোরানো... এসব কি কম ঝক্কি-ঝামেলার কাজ? ওটাকে গুঁতো না মেরে আপনি খুব খারাপ কাজ করেছেন। অবশ্য...' দু'পা পিছিয়ে অবস্থাটা ভাল করে দেখল সে। 'এটাও খুব একটা মন্দ নয়। হেড-অন কলিশনের চেয়ে ভালই বলতে হবে। নাহ্, ড. ওয়ালডেন, আপনাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষটা এড়িয়ে বেশ চমৎকার আরেকটা সেটআপ তৈরি করে দিয়েছেন।'

অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মাইকেলের, গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু দরজা বরাবর শূন্যতা থাকায় সেটা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে থেমে গেল। তা ছাড়া নড়লেই টলমল করছে কিনারায় আটকে থাকা বাহনটা, খসে পড়ার পাঁয়তারা করছে। www.boighar.com

হতাশ হয়ে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল মাইকেল। জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি? এসব কেন করছেন?'

'অধমের পরিচয় দিয়ে কী করবেন, বলুন? শুধু এটুকু জেনে রাখুন, এ-কাজের জন্য ছয় অঙ্কের পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে আমাকে। এনিওয়ে, আর কোনও কথা নয়। গুড বাই, ড. ওয়ালডেন। টেক কেয়ার।'

নেতার ইশারায় ভ্যান সামনে বাড়াল বিশালদেহী ড্রাইভার, ফ্রন্ট বাম্পার নিয়ে ঠেকাল টয়োটার রিয়ার এন্ডে, ধাক্কা দিতে শুরু করল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়তে শুরু করল ছোট্ট গাড়িটা, এখুনি খসে পড়বে। ভিতরে ডেবি উন্মত্তের মত চিৎকার করছে, জানালা দিয়ে মাইকেল চেঁচাল, 'এ কাজ কোরো না! এ কাজ কোরো না!!'

জবাবে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল ঝাঁটাগুঁফো, ডানহাত তুলে টা-টা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে কিনারা থেকে খসে পড়ল টয়োটা। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো বাতাসে ভেসে রয়েছে ওটা, কিন্তু তিনশো ফুট নীচের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়তেই বোঝা গেল, ওটা দৃষ্টিভ্রম ছিল।

নাক সোজা পড়ায় ফ্রন্ট-এণ্ড থেঁতলে গেল গাড়িটার, তারপরই একপাশে আছাড় খেয়ে গড়াতে শুরু করল, প্রতি পাকের সঙ্গে ভেঙেচুরে তুবড়ে যাচ্ছে ওটার ইস্পাতের শরীর। গড়ানো যখন থামল, তখন আর গাড়ি বলে চেনার উপায় নেই বাহনটাকে, স্রেফ একটা লোহার তালে পরিণত হয়েছে।

ইতোমধ্যে ফুয়েল লাইন ছিঁড়ে গেছে, পাথুরে জমির সঙ্গে ঘষা খেয়ে ইস্পাতের ছড়ানো ফুলকির সংস্পর্শে ছোট ছোট আগুন ধরে গেছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রইল ঝাঁটাগুঁফো। হতাশ হতে হলো না তাকে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রচণ্ড গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। কমলা রঙের আগুন গ্রাস করল উল্টে থাকা গাড়িটাকে, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল।

ওয়াকিটকি তুলে সব টিমকে ফেরার নির্দেশ দিল লোকটা। তারপর ভ্যানে

boighar.com

উঠে ড্যাশবোর্ডে লাগানো ওয়্যারলেস টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

'গারফিল্ড বলছি।'

'রিপোর্ট করো।' ওপাশ থেকে বলা হলো।

'মিশন সাকসেসফুল,' বলল ঝাঁটাগুঁফো গারফিল্ড। 'টার্গেট নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।'

'ভেরি গুড,' সন্তুষ্ট শোনাল অপরপ্রান্তের গলাটা। 'তোমাদের পেমেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লাইন কেটে দিল গারফিল্ড। পোড়া টয়োটা থেকে পাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়ার দিকে শেষবারের মত তাকাল সে। তারপর ড্রাইভারের দিকে ফিরে বলল, 'চলো, যাওয়া যাক।'

দুই

সাম্প্রতিক সময়। ফেব্রুয়ারি ১৩। নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

অত্যন্ত স্বাস্থ্যসচেতন লোক লুই পামার। পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তার বয়স, তারপরও শরীর দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। এর পিছনে গোপন রহস্যটা হচ্ছে পরিমিত আহার এবং নিয়মিত ব্যায়াম। প্রতি বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর কয়েক মাইল করে হাঁটে সে, সেটা রুটিনে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে রাতের খাওয়া শেষ করে নির্দিষ্ট একটা রুটে পুরো তিন মাইল সে হাঁটবেই হাঁটবে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

সেভেন্টি নাইন্থ স্ট্রীটের দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঠিক সাড়ে সাতটায় নেমেছে সে, চলে এসেছে সেন্ট্রাল পার্কে। লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছে, বাড়তি কোনও ক্যালরি যেন শরীরে জমা না থাকে। নিয়মিত রুটের মাঝামাঝি রয়েছে পামার, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাতটা পঞ্চাশ বাজে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে, টাইমিঙে পিছিয়ে পড়েছে।

আটশো তেতাল্লিশ একর আয়তনের সেন্ট্রাল পার্ক এক বিস্ময়কর জায়গা। হঠাৎ দেখায় প্রাকৃতিক মনে হলেও খুব কম লোকই জানে যে, পার্কটা আসলে ফ্রেডারিক অমস্টেড আর কালভার ভস নামে দুই ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্টের ডিজাইন করা এবং সেই অনুসারে কৃত্রিমভাবে গাছগাছালি লাগিয়ে ও জলাশয় খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে। আঠারোশো শতকের মধ্যভাগে গাণিতিক হারে বাড়ছিল নিউ ইয়র্কের জনসংখ্যা, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে গড়ে উঠছিল একের পর এক দালানকোঠা, তাই সিটি কাউন্সিল বিশেষ এক মিটিং ডেকে ইঁটপাথরের শহরের মাঝখানে নিদেনপক্ষে একটা নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক ম্যানহাটনের ঠিক মাঝখানে এই বিশাল পার্কটা তৈরি করা হয়। কৃত্রিমভাবে বানানো হলেও পার্কের পরিবেশটা দারুণ ভাল লাগে পামারের। এখানে এলেই ফুসফুসে বিশুদ্ধ বাতাস পেয়ে মনটা ভাল হয়ে যায়। বছরের পর

বছর ধরে পার্কের নির্জন একটা অংশের রুট ধরে সকাল-সন্ধ্যা হাঁটছে পামার—এই সময়টা তার একান্ত নিজের, জাগতিক কর্মকাণ্ডের কথা ভুলে প্রকৃতিকে উপভোগ করে সে।

এত বছরে কখনও হাঁটতে বেরিয়ে বিপদে পড়েনি পামার, তাই আজও ফুরফুরে একটা ভাব নিয়ে পা চালাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক আওয়াজ এসেছে কানে, সামনে-পিছনে দু'দিকেই হয়েছে শব্দটা—শুকনো পাতার মড় মড়...যেন খুব কাছেই কেউ পা ফেলছে। চোখ পিটপিট করল সে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে ঠাহর করতে পারল না কিছু।

ফস করে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল সামনে, সেই আলোয় কঠিন চেহারার এক যুবককে দেখতে পেল পামার, সিগারেট ধরাচ্ছে তার দিকে ফিরে। দু'পা ফাঁক করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে হাঁটার পথটা রুদ্ধ হয়ে যায়।

অবচেতন মনে সতর্ক হবার তাগিদ অনুভব করল পামার, হঠাৎ আজ ভয় করছে তার। গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'এক্সকিউজ মি, মিস্টার। তুমি আমার পথ আগলে রেখেছ। সরো, যেতে দাও।'

সিগারেটে জোরে এক টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল যুবক। বলল, 'আপনি কোথাও যাচ্ছেন না, মি. পামার।'

'মানে! কে তুমি? আমার নাম জানলে কী করে?'

'জানাটাই আমাদের কাজ।'

'আমাদের! কারা...' কথা শেষ করতে পারল না পামার। পিছনে খসখস শব্দ হলো, পরমুহূর্তে দুপাশ থেকে দু'জোড়া হাত শক্ত করে চেপে ধরল তার বাহু। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল পামার, লাভ হলো না। প্রতিপক্ষ যে শুধু সংখ্যায় বেশি, তা-ই নয়; তাদের গায়েও প্রচণ্ড জোর।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সামনে এগিয়ে এল প্রথম যুবক। এবার সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল পামার, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কে তোমরা? কী চাও? টাকা লাগলে আমার পকেটে ওয়ালেট আছে, ওটা নিয়ে আমাকে রেহাই...'

'টাকা চাই না আমরা,' বলে বন্দির নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ল যুবক। নীরস কণ্ঠে বলল, 'চাই আপনার প্রাণপাখিটা।'

সিগারেটের ধোঁয়া নাকে যাওয়ায় কাশছিল পামার, কথাটা শুনে থমকে গেল। বলে কী এই লোক! প্রাণপাখি চায় মানেটা কী! বিস্মিত অবস্থাতেই যুবককে নড়ে উঠতে দেখল সে, পরমুহূর্তে নাভীর নীচে খচ্ করে বিঁধল কী যেন, হ্যাঁচকা টানে নাভীর দু-ইঞ্চি উপরে উঠে এল জিনিসটা। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁচকে যেতে চাইল ওর শরীর। এবার পিছিয়ে গেল যুবক, পেটে ঢোকানো জিনিসটা বের করে নিয়েছে একইসঙ্গে। ব্যথাটা কমেনি একবিন্দু, পেট থেকে উষ্ণ একটা স্রোত বের হচ্ছে, টের পেল পামার। অকস্মাৎ বুঝল কী ঘটেছে—ছুরি মারা হয়েছে তাকে! কেন!

পামারকে ছেড়ে দিল আততায়ীর দুই সঙ্গী, মাটিতে পড়ে গেল সে, একহাতে তলপেট চেপে ধরে রক্তক্ষরণ থামানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু লাভ হলো না তাতে। অবিরাম বেরুচ্ছে রক্ত, প্রতি বিন্দুর সঙ্গে নিংড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে জীবনীশক্তি। চেঁচাল না পামার, জানে—তাতে লাভ নেই। পার্কের এই অংশে এই

boighar.com

সময় কোনও মানুষ থাকে না। লোকগুলোও জানে তা, সেজন্যই এখানে অপেক্ষা করছিল। পুরোপুরি প্রফেশনাল এরা, ছুরি মেরে পালিয়ে যায়নি, তিনদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, শিকারের মৃত্যু নিশ্চিত না করে নড়বে না।

সাধারণ একটা ছুরিকাঘাতে সঙ্গে সঙ্গে মরে না মানুষ, কয়েক ঘণ্টা টিকতে পারে। তবে পামারের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটল। নিখুঁত দক্ষতায় স্পর্শকাতর একটা জায়গায় ছুরি মেরেছে অভিজ্ঞ খুনী, মাত্র দশ মিনিটেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল স্বাস্থ্যবান মানুষটার। এই সময়টুকু নরকযন্ত্রণায় কাটল তার, শেষ দিকে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। কাতরাতে কাতরাতে অবিশ্বাসের চোখে নিজের হত্যাকারীর দিকে তাকিয়ে রইল সে, নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকে চলেছে যুবক, সঙ্গীদেরও অফার করল। ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল পামার।

নিস্পন্দ শরীরটাকে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মেরে নিশ্চিত হয়ে নিল প্রথম যুবক। সঙ্গীদের বলল, 'টাকা-পয়সা, ঘড়ি, চেইন... সব নিয়ে নাও। ব্যাপারটা ডাকাতির মত দেখাতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই সঙ্গী। খানিক পরেই তিনজনের দলটা মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

লুই পামারের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলো পরদিন সকালে। পুলিশ এল, তদন্ত হলো, কিন্তু তেমন কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মাদকাসক্ত কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের করা ছিনতাই ও খুন হিসেবে লেখা হলো রিপোর্ট। নিউ ইয়র্কের কয়েক হাজার অমীমাংসিত কেসের একটা হয়ে ফাইলবন্দি অবস্থায় পড়ে রইল লুই পামারের হত্যাকাণ্ড।

ফেব্রুয়ারি ২৭। বেলফাস্ট, উত্তর আয়ারল্যান্ড।

লুই পামারের ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ কুর্ট মাসডেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর নেই তার। মদ, মাদক আর মেয়েমানুষ—এগুলো তার জীবনযাত্রার একেবারে অবিচ্ছেদ্য অংশ। খাওয়াদাওয়ার বেলায়ও কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা মানে না। প্রলম্বিত আয়ুর প্রতি তেমন লোভ নেই তার, বরং যে ক'টা দিন বাঁচবে; আনন্দ, ফুর্তি আর নিয়মভাঙা জীবনযাপন করতে চায় সে। সৌভাগ্যই বলতে হবে—বিশাল একটা সফটওয়্যার কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ হওয়ায় টাকাপয়সার কোনও অভাব নেই তার, জীবনের প্রতিটা সাধ-আহ্লাদ ইচ্ছেমত মিটিয়ে নিতে পারছে।

কিন্তু এই প্রবল অত্যাচার আর অনিয়ম তার শরীর মেনে নিতে পারেনি। দিনে দিনে গোলাকার হয়ে উঠেছে সেটা—মেদ জমেছে, ভুঁড়ি বেড়েছে, একই সঙ্গে জায়গা করে দিয়েছে রোগব্যাধিকে। ফলে পঞ্চাশ পেরুনোর আগেই উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছে সে। গত এক বছরে দু'দফা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার, এখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ঝুলছে।

এই মুহূর্তে বেলফাস্টের নামকরা একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে মাসডেন, দ্বিতীয় দফা হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় তিনদিন আগে ওপেন হার্ট সার্জারি

করা হয়েছে। এ ক'দিন ইনটেনসিভ কেয়ারে ছিল, আজ সকালেই সাধারণ কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে তাকে।

রাত তিনটে দশ। হাসপাতালে কবরের নিস্তব্ধতা, ডিউটিরত স্টাফরাও যার যার স্টেশনে বসে ঘুমে ঢুলছে। ইমার্জেন্সি ইউনিট ছাড়া আর কোথাও কোনও ব্যস্ততা লক্ষ করা যাচ্ছে না।

পাঁচতলার এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ডাক্তারের পোশাক পরা এক লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে—গলায় স্টেথোস্কোপ লাগানো, অ্যাপ্রনের পকেট থেকে ঝুলছে একটা আই.ডি. কার্ড। রিসেপশনে বসে থাকা নার্সের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যসূচক একটু হাসল সে, হাতের ক্লিপবোর্ড দেখিয়ে বোঝাল—রাউন্ডে এসেছে। নার্সও একগাল হেসে তাকে যেতে বলল। ডাক্তারকে চিনতে পারছে না বটে, তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাল না। এই হাসপাতালে প্রশিক্ষণ দেয়া বা নেয়ার জন্য প্রায়ই বহিরাগত ডাক্তার আসে, আর রাতের এই জঘন্যতম শিফটটা গ্রহিতাদের ঘাড়েই গছানো হয়। এ-ও তেমন কেউ হবে নিশ্চয়। আবার নিজের কাজে মন দিল নার্স।

কারও মনে যাতে সন্দেহ না জাগে, তাই রাউন্ড নেয়ার ভঙ্গিতে পরপর তিনটে কেবিনে ঢুকল বহিরাগত ডাক্তার। শেষে করিডরে বেরিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল, কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না। তারপর দ্রুত ঢুকে পড়ল কুর্ট মাসডেনের কেবিনে।

বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে মাসডেন, নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে মস্ত ভুঁড়িটা। মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো তার, বিছানার পাশে স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো স্যালাইন ব্যাগ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় তরল বয়ে চলেছে সরু পাইপ ধরে, সরাসরি শিরায় ঢুকছে বাঁ হাতে লাগানো সুঁই দিয়ে। মাথার কাছে মেঝেতে চাকা লাগানো একটা বড় কার্ডিয়োগ্রাফির যন্ত্র আছে—রোগীর বুকে তার দিয়ে লাগানো প্যাডের সাহায্যে হৃৎস্পন্দন মনিটর করছে, যন্ত্রটার আট ইঞ্চি স্ক্রিনে সবুজ একটা রেখা হয়ে ফুটে উঠেছে তা।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করল ডাক্তার, তারপর পকেটে হাত দিয়ে বের করে আনল একটা খালি সিরিঞ্জ। চোখের সামনে তুলে সেটাতে বাতাস ভরল সে, এগিয়ে গিয়ে স্যালাইনের লাইনে সুঁইটা ঢোকাল, ধীরে ধীরে পুশ করে বাতাসটা ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। প্রবাহমান তরলের মাঝখানে বড় একটা বুদ্বুদের মত দেখাল সেটাকে, আস্তে আস্তে নীচে নেমে যাচ্ছে। নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে বাতাসটুকুকে মাসডেনের শিরায় ঢুকতে দেখল আততায়ী লোকটা, একই সঙ্গে কার্ডিয়োগ্রাফ থেকে খুলে নিল একটা তার।

বাতাসের বুদ্বুদটা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছুতেই চোখ মেলে তাকাল মাসডেন, অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় তার শরীরটা কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে। তৃতীয় দফা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বেচারার, এ অবস্থায় নার্সদের স্টেশনে তারস্বরে বেজে ওঠার কথা অ্যালার্ম, দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে আসার কথা কর্তব্যরত চিকিৎসক আর সেবিকাদের, কিন্তু কার্ডিয়োগ্রাফ থেকে বিশেষ তারটা খুলে ফেলায় সেসবের কিছুই ঘটল না। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল, কাঁপতে থাকল শরীর; একসময় থেমে গেল সব—মারা গেল

boighar.com

মাসডেন।

তাড়াহুড়ো করল না খুনী। শান্তভাবে কেবিন থেকে নিজের উপস্থিতির সমস্ত প্রমাণ আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে ফেলল। তারপর কার্ডিয়োগ্রাফের তারটা লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

এতক্ষণে বাজতে শুরু করল অ্যালার্ম। পাগলের মত ছুটে এল কর্তব্যরত ডাক্তার আর নার্সেরা। রোগীর জীবন বাঁচাতে তাদের অবিরাম প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হলো, কারণ মরা মানুষ তো আর জীবন ফিরে পায় না।

মার্চ ১০। ক্রাইস্টচার্চ, ইংল্যাণ্ড।

সাগরপারের চমৎকার একটা ভিলায় থাকে হার্বার্ট গ্র্যান্ট। দশ বছর আগে একটা সফটওয়্যার তৈরি করার পর তার জীবনটাই রাতারাতি বদলে গেছে; সারা বিশ্বের বড় বড় প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই ব্যবহার হচ্ছে সেটা। বুদ্ধি করে সফটওয়্যারটার স্বত্ব নিজের কাছে রেখে দিয়েছে সে, প্রতিবার ওটা বিক্রির একটা লভ্যাংশ পাচ্ছে এ কারণে। সেই থেকে বলতে গেলে আর কোনও কাজ করেনি গ্র্যান্ট, হাতে আসা অঢেল টাকা দিয়ে সাগরপারের ভিলাটা কিনেছে, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আরাম-আয়েশের জীবন কাটাচ্ছে।

গ্যারাজে চারটে বিভিন্ন মডেলের গাড়ি রয়েছে তার, প্রাইভেট জেটিতে বাঁধা আছে দুটো ইয়ট। তবে সবকিছুর চেয়ে তার প্রিয় বাহন হচ্ছে দশ মিটার লম্বা ধবধবে সাদা রঙের সেইলিং বোটটা। ইঞ্জিন আর প্রপেলার লাগানো ইয়টের চেয়ে সুনীল সাগরে পাল তুলে ভেসে বেড়াতেই সে বেশি পছন্দ করে।

প্রতি রোববার সকালে বোটটা নিয়ে সেইলিঙে বেরুনো তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, আবহাওয়া খারাপ না হলে সাধারণত এর ব্যত্যয় ঘটে না। আজ তেমনই এক রোববার—আকাশ পরিষ্কার, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। স্ত্রী-সন্তানকে না জাগিয়ে বরাবরের মত খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েছে গ্র্যান্ট।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তীর থেকে পাঁচ মাইল দূরে চলে এল বোট। বাতাস বেড়েছে, সেইল ফুলে উঠেছে তাতে, তরতর করে পানি কেটে ছুটে চলেছে ফাইবারগ্লাসে তৈরি নৌকাটা, নাক-মুখে ঝাপটা মারছে সমুদ্রের নোনা বাতাস। আহ্, কী শান্তি! প্রফুল্ল মনে চারপাশে তাকাল গ্র্যান্ট। সোনালি রঙের একটা ইয়ট নজর কাড়ল তার, পোর্ট সাইডে একশো গজ দূরে ভাসছে। শুরু থেকেই জলযানটাকে দেখতে পাচ্ছে সে, সারাক্ষণ ওর বোটের কাছাকাছি থাকছে। অনুসরণ করছে না তো!

পরক্ষণেই আপনমনে হেসে উঠল গ্র্যান্ট। কী সব আবোল-তাবোল ভাবছে! তাকে আবার অনুসরণ করবে কে? আর যদি করতেই হয়, সাগরে কেন? নাহ্, ওসব কিছু না। হয়তো ওর দক্ষ সেইলিঙে মুগ্ধ হয়েছে ইয়টের লোকজন, তাই কাছাকাছি থাকছে। ডেকের উপর বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে একটা লোক এদিকেই তাকিয়ে আছে দেখে ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হলো। অচেনা দর্শকের দিকে ফিরে হাত নাড়ল সে, মুখে হাসি ফোটাল।

রোদের মধ্যে অনেকটা সময় কাটানোয় গলা শুকিয়ে গেছে। হ্যাচ খুলে

আন্ডারওয়াটার কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা বিয়ারের ক্যান বের করল গ্র্যান্ট। এটা তার পার্মানেন্ট স্টক, সবসময় বোটেই থাকে বেশ কিছু পানীয়ের ক্যান।

মুখ খুলে চুমুক দিল গ্র্যান্ট, কয়েক দফায় ঢকঢক করে গিলে খালি করে ফেলল অর্ধেক ক্যান। তাকাল দিগন্তের দিকে। হঠাৎই দৃষ্টি ঘোলা হয়ে এল তার, মাথাও ধরেছে, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না ঠিকমত—ব্যাপার কী? বেচারার জানা নেই, ভোর রাতে তার বোটে উঠেছিল বাইরের কেউ; ইঞ্জেকশনের সুঁই দিয়ে ফুটো করে সবগুলো ক্যানে মিশিয়ে দিয়েছে রাসায়নিক দ্রবণ। কেন কী ঘটছে বোঝার সময় পেল না গ্র্যান্ট, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল বোটের মেঝেতে।

দৃশ্যটা দূরবীনে দেখতে পেয়ে ইয়টের চালককে হাত দিয়ে ইশারা করল ডেকে দাঁড়ানো কঠিন চেহারার যুবক। গর্জে উঠল শক্তিশালী প্রপেলার, গতি বাড়িয়ে সেইলিং বোটের পাশে গিয়ে থামল। ইতোমধ্যে ভিতর থেকে আরও দুজন বেরিয়ে এসেছে ডেকে, নাগালের মধ্যে আসতেই লাফ দিয়ে বোটে নামল তারা, হার্বার্ট গ্র্যান্টের অচেতন দেহ তুলে নিল। প্রথমে বোটের কিনারায় ঠুকে শিকারের কপালে কালসিটে ফেলল তারা, তারপর অজ্ঞান দেহটা ফেলে দিল সাগরের পানিতে। আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পেল না গ্র্যান্ট, বুদ্বুদ তুলে তলিয়ে গেল অতলে।

দক্ষতার সঙ্গে কাজ সারল খুনীর দল, বোট ছেড়ে উঠে আসার আগে বদলে ফেলল সমস্ত মাদক মেশানো বিয়ারের ক্যান, কম্পার্টমেন্টে রেখে এল মাদকবিহীন নতুন এক লট। এরপর তারা হারিয়ে গেল ইয়ট নিয়ে।

সেদিন সন্ধ্যায় কোস্টগার্ডের তল্লাশিদল খুঁজে পেল পরিত্যক্ত সেইলিং বোটটা। গ্র্যান্টের পচা, ফুলে-ফেঁপে ওঠা লাশটা পাওয়া গেল আরও দু'দিন পর। ময়নাতদন্ত হলো, কিন্তু লাশের শরীরে কোনও মাদক পাওয়া গেল না। নিজস্ব রাসায়নিক গুণের কারণে ওটা মানবদেহে ঢোকার কয়েক ঘণ্টা পর মিলিয়ে যায়; ঘটেছেও তা-ই। লাশের কপালে আঘাতের দাগ দেখে মৃত্যুর কারণটার ভুল ব্যাখ্যা করল ডাক্তার। ধারণা করা হলো, সেইলিঙের সময় ভেজা ডেকে পা পিছলে মাথায় আঘাত পায় গ্র্যান্ট, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় পানিতে।

এটা যে একটা খুনের ঘটনা, তা কেউ আর জানতে পারল না।

মার্চ ২৬। বার্মিংহ্যাম, ইংল্যাণ্ড।

রাত করে বাড়ি ফেরে ট্রিসিয়া মিলনার। না, আমোদ-ফুর্তি করে নয়... সাতচল্লিশ বছর বয়সে কেউ ক্লাব বা ডিসকোতে আমোদ-ফুর্তি করতে যায় না, ওটা ছেলে-ছোকরাদের কাজ। ট্রিসিয়ার সময় কাটে অফিসে। পাঁচ বছর আগে ব্যাভিচারী স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাবার পর সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে সে। কপাল ভাল যে, সন্তান-সন্ততি হয়নি তার, পিছুটান নেই সেজন্য। স্বামীর স্বরূপ দেখার পর থেকে গোটা পুরুষজাতির উপর ঘেন্না ধরে গেছে ট্রিসিয়ার, নতুন করে সঙ্গী খোঁজার রুচি হয়নি। একাকী জীবনটাকে নিজের পেশায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিয়েছে।

প্রায় প্রতিদিনই রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত অফিসে কাটায় ট্রিসিয়া, মাঝে মাঝে

boighar.com

তো আরও বেশি। আজ বেজেছে সাড়ে দশটা। এগারোটায় বাড়ি পৌঁছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাতের জিনিসপত্র সামনের ঘরে নামিয়ে রাখল সে, বেডরুমে ঢুকে কাপড় ছাড়ল, তারপর শাওয়ারে ভিজে শরীরটা ঝরঝরে করে নিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভেজা চুলে তোয়ালে জড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে অভ্যাসমত কিচেনের দিকে রওনা হলো ট্রিসিয়া। অন্যদের মত সন্ধ্যায় সাপার করে না সে, বাড়ি ফিরে তারপর খায়। সারাদিন তো কেনা খাবারই খেতে হয়, তাই রাতের বেলা বাড়ি ফিরে নিজ হাতে রান্না করে, যাতে অন্তত একটা বেলা ঘরে বানানো খাবারের স্বাদ পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ থেকেই মৃদু একটা গন্ধ পাচ্ছিল, কিচেনের দরজা খুলতেই সেটা তীব্র হয়ে ঝাপটা মারল নাকে। ফুসফুসে ঢুকতেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ট্রিসিয়ার, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, কেন গন্ধটা এত চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। গ্যাস... গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে রান্নাঘরের ভিতর, এবং সেটা বেশ প্রচণ্ড আকারে। ব্যাপারটা কীভাবে ঘটল, ভেবে পেল না সে। স্পষ্ট মনে আছে, সকালে অফিসে যাবার আগে নিজ হাতে বার্নারের চাবি বন্ধ করে গেছে। তা হলে কী... লাইনে লিক করেছে? কত বড় লিক যে এভাবে গ্যাস ছড়াচ্ছে? এই তো, এখনও গ্যাস বেরুনোর শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দেখতে হয় ব্যাপারটা—ভেবে দরজার পাশের সুইচে চাপ দিল ট্রিসিয়া, আলো জ্বালবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দুর্ঘটনা।

বালবের ভিতর যে কারসাজি করে রাখা হয়েছে, তা জানা ছিল না হতভাগ্য মহিলার। সুইচে চাপ দিতেই বিকট শব্দে ফেটে গেল সেটা, ফুলকি ছড়াল। আগুন ধরাতে ওটুকুই যথেষ্ট ছিল, প্রচণ্ড শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। কিচেনের জানালার কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল, সেই ফোকর দিয়ে এমনভাবে কমলা রঙের ধারা বেরুল, যেন মহাশূন্যের পথে রওনা হওয়া রকেটের একজস্ট দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

ট্রিসিয়া মিলনার অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল না। শরীরের বেশিরভাগটাই পুড়ে গেছে তার, ছাল-চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে সারা গা থেকে। মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র... এই অবস্থাতেই মুমূর্ষু শরীরটাকে হামাগুড়ি দিয়ে সে টেনে নিয়ে গেল কিচেনের পাশের স্টাডিরুমে, সেখানে একটা টেলিফোন আছে। শরীরের সর্বশক্তি একত্র করে টেবিল ধরে ওঠার চেষ্টা করল সে, কিন্তু নাক পর্যন্ত তুলতে পারল শুধু। টেলিফোন পর্যন্ত পৌঁছুল না হাত, অসহায়ের মত খামচাল কিছু ধরে রাখার চেষ্টায়। টেলিফোন সেটের ঠিক পাশে বসানো কম্পিউটারের কীবোর্ড আর মাউস রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল—ট্রিসিয়ার অন্তিম প্রয়াসের চিহ্ন হয়ে রইল তা। একটু পরেই হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল কাজপাগল মহিলা।

অবশ্য এতকিছু চাক্ষুষ করল না বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে গাড়িতে বসে অপেক্ষারত তিন খুনী। শুধু বিস্ফোরণটা দেখেই মুখে হাসি ফুটল তাদের, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। জানে, এই মৃত্যুটাকেও দুর্ঘটনা হিসেবেই আখ্যা দেয়া হবে। ভুলে চুলার গ্যাস ছেড়ে রাখা আর শর্ট সার্কিটে তাতে আগুন ধরে যাওয়া নতুন কিছু নয়। হাসিমুখে গাড়ি স্টার্ট দিল তারা, চলে গেল ঘটনাস্থল থেকে।

*

এপ্রিল ০৮। গ্রাম্পিয়ান পর্বতমালা, স্কটল্যাণ্ড।

শৌখিন পর্বতারোহী হিসেবে নামডাক আছে ভ্যাল মর্টিমারের। ফ্রী ক্লাইম্বার—মানে কোনওরকম যন্ত্রপাতি বা সিকিউরিটি গিয়ার ছাড়া যারা পাহাড়ে চড়ে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত দক্ষতা রয়েছে তার। অবশ্য এই দক্ষতা একদিনে আসেনি, বছরের পর বছর একাগ্র চেষ্টা আর পরিশ্রম করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দক্ষতাটা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যাতে চাইলেই ক্লাইম্বিংকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারত মর্টিমার। কিন্তু নেয়নি, এটা তার জন্য স্রেফ একটা শখ...অবসর কাটানোর উপায়। মূলত সে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, বহুজাতিক একটা আই.টি. কোম্পানির বড়সড় পদে আছে। বলে রাখা ভাল, পাহাড়ে চড়ার চেয়ে পেশাটাকে সে কয়েকগুণ বেশি ভালবাসে।

তারপরও সুযোগ পেলেই বিপজ্জনক শখটা নিয়ে মেতে ওঠে মর্টিমার, তার স্ত্রী বা বন্ধুবান্ধবের হাজার বারণ মানে না। এ এক অদম্য নেশার মত, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়কে জয় করে অন্যরকম আনন্দ পায় সে। যেখানে আর মাত্র দু'বছর পর জীবনের অর্ধশতক পার করতে যাচ্ছে, সেখানে এ ধরনের কাজ যে মোটেই উচিত নয়—সেটা বুঝেও বোঝে না। হাজার হোক, মানবশরীর তো, বয়সের সঙ্গে যুদ্ধে সেটাকে হারতেই হবে। কিন্তু যতদিন সম্ভব, শরীরটাকে যেমন খুশি ব্যবহারের স্বাধীনতা হারিয়ে যেতে দিতে চায় না সে, ছুটির দিনগুলোয় নিত্যনতুন পাহাড় জয়ের মাধ্যমে থামিয়ে রাখতে চায় সময়কে। www.boighar.com

গ্রাম্পিয়ান পর্বতমালার ঈগলস্ ক্লিফের চারশো ফুট খাড়া দেয়াল বেয়ে চূড়ায় যখন পৌঁছুল মর্টিমার, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। চূড়ার সমতল এক টুকরো জমিতে বসে হাঁপাতে লাগল সে, কোমরে ঝোলানো পানির বোতলটা তুলে একটা চুমুক দিল। ঠিক তক্ষুণি কানে ভেসে এল রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

কপালে হাত তুলে চোখদুটোকে রোদ থেকে আড়াল করল মর্টিমার, তাকাল আকাশে। মার্কিংবিহীন একটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসছে এদিকেই। তাকে বিস্মিত করে মালভূমির উপরে এসে থামল ওটা, ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। বাতাসের ধাক্কায় চোখ ছোট করে ফেলতে হলো মর্টিমারকে। উড়ন্ত ধুলোবালি প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে শরীরে, নিজের অজান্তেই পিছন ফিরে একটু কুঁজো হয়ে গেল সে।

ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার, ইঞ্জিন বন্ধ না করেই দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল পাইলট, তার পিছু পিছু আরও দুজন। লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে তিনজন, দেখে অবাক হলো মর্টিমার। কারা এরা? কী চায়?

'মি. মর্টিমার?' কাছাকাছি এসে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল পাইলট—কঠিন চেহারার এক যুবক সে।

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

চোখের সামনে বামহাতের কবজি তুলল যুবক, ঘড়ি দেখে বলল, 'আপনার দেরি হয়েছে। ভেবেছিলাম আরও দশ মিনিট আগে পৌঁছুবেন চূড়ায়... আপনার রেকর্ড অন্তত তা-ই বলে।'

boighar.com

বিভ্রান্ত বোধ করল মর্টিমার, লোকটা এসব কী বলছে? সে জানতে চাইল, 'আমার যে দেরি হয়েছে, তা বুঝলেন কীভাবে? কখন ক্লাইম্বিং শুরু করেছি, তা জানেন?'

'জানি,' হাসল যুবক। 'আপনার গত পাঁচটা ক্লাইম্বের প্রতিটাই মনিটর করা হয়েছে।'

'মনিটর করা হয়েছে?' মর্টিমার বুঝতে পারছে না। 'কেন?'

'যাতে আপনার জন্য নিখুঁতভাবে ফাঁদ পাতা যায়,' যুবকের মুখের হাসি বিস্তৃত হলো।

'এসব কী বলছেন আপনি!' মর্টিমার রেগে গেল। 'কীসের ফাঁদ?'

'এখুনি টের পাবেন।' বলে সঙ্গীদের ইশারা করল যুবক। তারা এগিয়ে গিয়ে হতভম্ব হয়ে থাকা মর্টিমারকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলল, নিয়ে গেল ক্লিফের কিনারায়।

এইবার ভয় পেল প্রৌঢ় পর্বতারোহী, কাঁপা গলায় বলল, 'কী হচ্ছে এসব? হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুয়িং?'

'দুর্ভাগা ফ্রী-ক্লাইম্বারদের কপালে যেটা ঘটে,' জবাব দেয়ার সুরে বলল যুবক। 'সেফটি লাইন না থাকার কুফল বলতে পারেন... নীচে পড়ে ছাতু হতে হয় ওদের।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মর্টিমারের। 'কে তোমরা? কেন এ-কাজ করছ?'

'আমরা আজরাইলের দূত। আপনার সময় ফুরিয়ে এসেছে তো, তাই জান কবচ করতে এসেছি।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল যুবক। 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব, জানি না। এমন বিপজ্জনক একটা শখ বেছে নিয়েছেন, তারওপর একা একা এসেছেন পাহাড়ে চড়তে—ওফ্! আমাদের কাজটা বড্ড সহজ করে দিয়েছেন আপনি।'

'এ-কাজ কোরো না,' অনুনয় করল মর্টিমার। 'প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দাও!'

'উঁহুঁ, সেটি হবার নয়,' মাথা নাড়ল যুবক। 'এনিওয়ে, এবার বিদায় জানাতেই হয়। গুড বাই, মি. মর্টিমার। মনে রাখবেন, ইট্স্ ন্যাথিং পার্সোনাল হ্যাভ আ নাইস ফ্লাইট!'

দোলনার মত একটা দোল দিয়ে মর্টিমারকে ক্লিফ থেকে ছুঁড়ে দিল খুনীরা। বুক চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল হতভাগ্য মানুষটার, হাত-পা ছুঁড়ে বাতাস খামচে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল, পতন থামাতে পারল না। কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে দেহটাকে প্রবল বেগে পড়ে যেতে দেখল খুনীরা, চারশো ফুট নীচে যখন 'থপ' করে আছড়ে পড়ল, এত উপর থেকেও শোনা গেল শব্দটা।

কাজ শেষ করে হেলিকপ্টারে গিয়ে উঠল তিন খুনী, টেকঅফ করে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

এপ্রিল ১৯। লণ্ডন, ইংল্যাণ্ড।

আগে যে পাঁচজনের কথা বলা হয়েছে, তাদের সবার চেয়ে ব্যতিক্রম ডুইট গার্ডনার। একমাত্র মিলটা বয়সের দিক থেকে, নইলে বাকি সবকিছুই তার

আলাদা। ছোটখাট মানুষ সে, চোখে ইয়া বড় এক চশমা পরে, ঘরকুনো স্বভাবের। শখ বলতে কিছুই নেই, বিপজ্জনক কোনও কাজ করে না—খুবই ভীতু টাইপের লোক, একা একা কোথাও যায় না। ইন্টারনেটভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সে, অফিস আর বাসাই হচ্ছে তার যাওয়া-আসার একমাত্র গন্তব্য। ছুটির দিনেও ঘরে বসে থাকে, বউ-ছেলেমেয়ের সঙ্গে সময় কাটায়।

টানা সাতদিন সার্ভেইলান্স চালিয়ে হতাশ বোধ করল তিন খুনী, দুর্ঘটনা ঘটাবার মত কোনও সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। হাল ছেড়ে দেয়ার মত অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে, উপায়ান্তর না দেখে দলনেতা ঝুঁকিপূর্ণ একটা প্ল্যান ঠিক করল। এ ধরনের পদ্ধতি সাধারণত শেষ চেষ্টা হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, অবস্থাটা সেরকমই হয়ে পড়েছে।

অ্যাকসিডেন্টের ভয়ে একা গাড়ি চালায় না গার্ডনার, পাবলিক বাসে যাতায়াত করে। এর ফলে মাত্র দুই মিনিটের জন্য উন্মুক্ত থাকে সে, যখন বাস স্ট্যাণ্ড থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে। ওই সময়টুকুই বেছে নিল খুনীরা, সবার সামনে তাকে মেরে ফেলার জন্য।

ঘটনাটার দিন নিজের বাড়ির দশ গজ দূরে মারা গেল গার্ডনার, আশপাশের বাড়িঘর আর ফুটপাথে চলতে থাকা পথচারীরা সবিস্ময়ে বেচারাকে গাড়িচাপা পড়তে দেখল। রাস্তা পার হচ্ছিল তখন গার্ডনার, আচমকা কোনও রকম জানান না দিয়ে উদয় হলো একটা উদ্দাম প্রাইভেট কার, সোজা লোকটাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেল।

যথারীতি পুলিশ এল, তদন্ত হলো, কিন্তু ঘাতক গাড়িটার কোনও হদিস পাওয়া গেল না। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বেশ কয়েকদিন মাথা ঘামাল কেসটা নিয়ে। তবে গোবেচারা গার্ডনারের কোনও শত্রু না থাকায় এবং খুনটার পিছনে কোনও জোরালো মোটিভ পাওয়া না যাওয়ায় ব্যর্থ হলো তারা। শেষে কাণ্ডটা কোনও বেপরোয়া মাতাল ড্রাইভার ঘটিয়েছে ভেবে হাল ছেড়ে দিল পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজাত পুলিশ বিভাগ।

ছ'টা খুন—ঘটেছে ছয় জায়গায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ছ'রকমভাবে। এর মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাওয়া না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মৃত্যুগুলোর তদন্তে যারা জড়িত ছিল, তাদের আরও গভীরে যাওয়া উচিত ছিল, তা হলে হয়তো প্রয়োজনীয় ক্লু পেয়ে যেত তারা। ফাঁস করতে পারত জটিল এক ষড়যন্ত্রের জাল, যেটা আগামী কিছুদিনের মধ্যে গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য পাতা হয়েছে।

boighar.com

তিন

পহেলা মে। স্যান বার্নাড্রিনো কাউন্টি, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

গোল্ডস্টোন অবজারভেটরি নামে পরিচিত নাসার গোল্ডস্টোন ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন কমপ্লেক্স, অর্থাৎ *জি.ডি.এস.সি.সি*-র অবস্থান মোহাভি মরুভূমির ঠিক মাঝখানটায়। কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কয়েক সারিতে মোট সত্তরটা বিশাল ডিশ অ্যান্টেনা রয়েছে এখানে, ওগুলোর সাহায্যে মহাশূন্য থেকে বিভিন্ন প্রোব ও স্যাটেলাইটের পাঠানো তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বস্তুত অবজারভেটরিটা নাসার ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে। এমন আরও দুটো অবজারভেটরি রয়েছে নাসার—একটা স্পেনের মাদ্রিদে, অন্যটা অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায়। গোলাকার পৃথিবীর পুরো কার্ভেচার কাভার করার জন্য ঠিক একশো বিশ ডিগ্রি তফাতে স্থাপন করা হয়েছে এই তিনটে অবজারভেটরি।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবরে স্পুটনিক উৎক্ষেপণের পর পেরিয়ে গেছে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়, আর এর মাঝে মনুষ্যনির্মিত হাজারো কৃত্রিম উপগ্রহে ভরে গেছে পৃথিবী নামের আমাদের সুনীল গ্রহটার চারপাশের মহাশূন্য। এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে অসংখ্য প্রোব, ওগুলো আমাদের গ্রহের বাড়তি চোখ হিসেবে কাজ করে। সূর্য, মঙ্গল বা শনি গ্রহ পর্যন্ত রয়েছে এসব প্রোব—দৈনিক ভিত্তিতে নিজ নিজ লক্ষ্যকে মনিটর করে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে ওগুলো। এছাড়াও রয়েছে ইন্টারস্টেলার প্রোব, সৌর-জগতের সীমানা পেরিয়ে এখন অসীমের পথে ছুটছে।

গোল্ডস্টোন অবজারভেটরির বিশালায়তন অপারেশন্স সেন্টারে বসে এমনই একটা প্রোবের রিপোর্ট রিসিভ করছে ডোনাল্ড সালিভান। একচল্লিশ বছর বয়স তার, আজ পাঁচ বছর হলো এখানে কাজ করছে। এই দীর্ঘ সময়ে তেমন সাড়াজাগানো কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি সে, তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। *ভয়েজার-টু* প্রোবের রিপোর্ট এবং সঙ্গে আসা একটা ট্রান্সমিশন তার ভুরু কুঁচকে দিয়েছে। স্ক্রিনে ফুটে ওঠা আঁকাবাঁকা রেখাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

১৯৭৭ সালের অগাস্টে লঞ্চ করা হয়েছিল *ভয়েজার-টু*-কে। ত্রিশ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে যাবার পরও সেটা আজও কার্যক্ষম। এই লম্বা সময়ে কয়েক কোটি মাইল পাড়ি দিয়েছে ওটা, সৌরজগতের সীমানা পেরিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। যে উদ্দেশ্যে ওটাকে পাঠানো হয়েছিল, তা কি সফল হতে যাচ্ছে তবে? কান থেকে হেডফোন নামিয়ে রাখল সালিভান, বুক ধক ধক করছে। আনমনে মাথা নাড়ল সে, পাশ থেকে তুলে নিল ইন্টারকমের রিসিভার, কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করল।

দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে সাড়া দিল জন কেলভিন, অবজারভেটরির অপারেশনাল ডিরেক্টর। 'হ্যালো?'

'সালিভান বলছি, স্যর।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ঘটেছে, স্যর। ভয়েজার-টু'র ট্রান্সমিশন রিসিভ করেছি আমি। ওটায়...কিছু একটা আছে!'

'কী আছে?'

মাথা নাড়ল সালিভান। 'বলে বোঝাতে পারব না, স্যর। ইউ হ্যাভ টু সি ফর ইয়োরসেলফ...'

দোসরা মে। লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র।

মেক্সিকো হয়ে দু'দিন আগে আমেরিকা পৌঁছেছে মাসুদ রানা, ওখানে ছোট্ট একটা রুটিন মিশন শেষ করে এসেছে। প্রথমে গিয়েছিল ওয়াশিংটনে, ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির কর্ণধার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে দেখতে। ভদ্রলোক বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বাংলাদেশের একজন সত্যিকার শুভানুধ্যায়ী—রানাকেও অসম্ভব স্নেহ করেন। হঠাৎ করেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাঁর। বয়স নিতান্ত কম হয়নি অ্যাডমিরালের, হৃৎযন্ত্র আচমকা গড়বড় করলে সেটাকে দোষ দেয়া যায় না। তারপরও অস্থির হয়ে উঠেছিল ও, যত দ্রুত সম্ভব ছুটে গেছে তাঁকে দেখতে। এখন অবশ্য বিপদমুক্ত হয়েছেন হ্যামিলটন, ডাক্তাররা তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখে সেরা চিকিৎসাটাই দিচ্ছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হতেই লস অ্যাঞ্জেলেসের ফ্লাইট ধরেছে রানা, হাতের কাজ সারার জন্য।

গত কয়েক মাস একের পর এক অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত থাকায় রানা এজেন্সির প্রশাসনিক কাজকর্মে একটা বড় গ্যাপ পড়ে গেছে। এই মুহূর্তে নতুন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নেই হাতে, কয়েকটা দিন ফ্রি পেয়ে যাওয়ায় এই সুযোগে বেশ কয়েকটা শাখার বাৎসরিক পরিদর্শনটা সেরে নেবে বলে ঠিক করেছে ও।

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে পৃথিবীব্যাপী নেটওঅর্ক গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে নাক গলাতে অসুবিধা হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটা দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস।

সবার আগে লস অ্যাঞ্জেলেসে এসেছে রানা, গত দেড় বছরে এখানে ওর পা পড়েনি, কী পরিমাণ কাজ জমে আছে, আল্লাহই জানে। রাতটা এজেন্সির ভাড়া করা একটা অ্যাপার্টমেন্টে কাটিয়ে সকাল ন'টায় অফিসে চলে এল ও, কিন্তু এলিভেটর থেকে বের হয়েই বুঝল, টাইমিঙে গড়বড় হয়ে গেছে।

চোখের সামনে পুরো ফ্লোর জুড়ে লঙ্কাকাণ্ড দেখতে পেল ও, ওভারঅল পরা ওয়ার্কার আর কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালে সে এক ভয়াবহ অবস্থা! লোকজনের কোলাহল, হাতুড়ি পেটার ঠক ঠক, দেয়ালে ড্রিল-মেশিন দিয়ে দিয়ে ছিদ্র করার

boighar.com

বিকট আওয়াজ—কান পাতা দায়। হতভম্ব হয়ে গেল রানা। নতুন অফিসে এসে উঠেছে লস অ্যাঞ্জেলেস শাখা, আগের ভাড়া করা বিল্ডিংটা ছেড়ে উইলশায়ার অ্যাভিনিউয়ের এই নবনির্মিত ভবনের টপ ফ্লোরটা কিনে নেয়া হয়েছে। এসব বেশ কয়েকদিন আগের কথা, এরা যে এখনও শিফটিং শেষ করতে পারেনি, তা ওর জানা ছিল না।

মহা হট্টগোলের মাঝখানে এলিভেটরের সামনে মুখে হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাখাপ্রধান নাফিজ ইমতিয়াজ, ভাবখানা এমন, যেন কিছুই ঘটছে না। ওকে বেরুতে দেখে দু'পা সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'সুপ্রভাত, মাসুদ ভাই।'

'ইয়াল্লা, নাফিজ! এ কী অবস্থা?' বিস্মিত গলায় বলল রানা।

'সরি, ইন্টেরিয়রের কাজটা এখনও শেষ করতে পারিনি।'

'মানে!' কানফাটা আওয়াজের কারণে গলা উঁচু করে কথা বলতে হচ্ছে রানাকে। 'এসব অন্তত দু'সপ্তাহ আগে শেষ হবার কথা।'

'এখানে দাঁড়িয়ে শুনবেন? তার চেয়ে আপনার রুমে চলুন, মাসুদ ভাই, ওখানেই সব বলছি।'

'আমার রুম! আছে কিছু? আমি তো স্রেফ ধ্বংসস্তূপ দেখছি।'

'আছে, আছে,' আশ্বাসের সুরে বলল নাফিজ। 'রুটিন কাজ চালাবার জন্য একটা উইং সবার আগে রেডি করেছি। আসুন আমার সঙ্গে।'

নাফিজের পিছু পিছু ফ্লোরের ডানদিকে গেল রানা। দেখা গেল কথাটা মিথ্যে নয়, সত্যিই বেশ খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে ডেস্ক আর টেবিল বসানো হয়েছে, এক কোণে কাঁচে ঘেরা ডিরেক্টরের চেম্বারও দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এই অংশটাও পুরোপুরি তৈরি বলা চলে না, মেঝেতে টাইলস্ বসানো থেকে শুরু করে ফলস্ সিলিং লাগানো, পার্মানেন্ট লাইট ফিটিংস স্থাপন করা—সব বাকি। তারপরও কাজ চালানোর একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাঁচঘেরা অফিসে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিতেই শব্দের অত্যাচার অনেকটাই কমে গেল। নিজের চেয়ারে বসল রানা, মুখোমুখি নাফিজ।

'এসব হচ্ছেটা কী, বলো তো?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল রানা। 'অফিসের ইন্টেরিয়র প্রিপারেশন আর শিফটিঙে পনেরো দিনের বেশি লাগার কথা নয়। এই বিল্ডিঙে গত মাসের এক তারিখেই তো এসেছ। সে হিসেবে ধরলে মাসের অর্ধেকের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার কথা।'

'এক তারিখে আসতে পারিনি, মাসুদ ভাই,' নাফিজ বলল। 'লিগাল ফর্মালিটিজ শেষ হয়নি বলে বিল্ডাররা পজেশন বুঝিয়ে দেয়নি। সব ঝামেলা মিটিয়ে আমরা এসেছি উনিশ তারিখে।'

'এত দেরি হয়েছে? আমাকে জানাওনি কেন?'

'পেলাম কোথায় যে জানাব?' পাল্টা অভিযোগ নাফিজের গলায়। 'কী নাকি এক সিক্রেট মিশন নিয়ে ইয়োরোপ গেছেন, হেড অফিস কোনও কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনই দিতে রাজি হলো না। শেষে ওদেরকেই ব্যাপারটা জানিয়ে রেখেছিলাম।'

'ও! তা-ই বলো। যাক গে, এ-ই যখন অবস্থা, আমাকে মানা করে দিলেই

পারতে। অফিস রেডি হলে নাহয় আসতাম।'

'জী না, মাসুদ ভাই। সেটি হচ্ছে না। একবার আপনার প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দিলে কবে আবার আপনার পদধূলি পড়বে, কে জানে! আমাদের কথা তো মনে হয় ভুলেই গেছেন। শেষ কবে এই ব্রাঞ্চে এসেছেন, মনে আছে?'

হাসল রানা। 'আসলে এত ব্যস্ত থাকি যে কী বলব...'

'সেটা আমরাও জানি। সেজন্য আপনার শিডিউলটা হাতছাড়া করতে চাইনি, অফিসে নরক গুলজার চললেও নিয়ে এসেছি। কী পরিমাণ কাজ জমে আছে, কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'নিয়ে এসো তা হলে,' রানা বলল। 'আজ-কালের ভিতর তোমাদের কাজগুলো দেখে নিয়ে অন্য ব্রাঞ্চে যেতে হবে।'

'বলতে হবে না, সব রেডি আছে।'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তিনজন জুনিয়র অপারেটর, সবাই দুহাতে ছোটবড় একগাদা ফাইল নিয়ে এসেছে। নাফিজের ইশারায় সব টেবিলের উপর নামিয়ে রাখা হলো। চোখ বড় বড় করে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল রানা, উঁচু উঁচু তিন সারি ফাইলের আড়ালে ও প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

'ইয়াল্লা! এগুলো সব আমাকে দেখতে হবে?'

'জী, হুজুর,' সকৌতুকে বলল নাফিজ। 'এবার বুঝুন, দেড় বছর লস অ্যাঞ্জেলেসের মত বড় শাখায় না এলে কী ঘটে!'

'আল্লাহ, রক্ষে করো! মরেই যাবো,' মাথায় হাত দিল রানা। তারপর গলায় মধু ঢেলে বলল, 'ভ্রাতা নাফিজ, এখান থেকে কিছু কমিয়ে আমাকে একটু ভারমুক্ত করতে পারো না?''

হেসে ফেলল নাফিজ। 'জানতাম, এত দেখে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না, সেজন্যে অনেকটা ভারমুক্ত করেই রেখেছি। লাল রঙের কাভারে যত ফাইল আছে, সব বাদ দিতে পারেন। আমি জোড়াতালি দিয়ে ওগুলোর সমাধান করে রেখেছি।'

'তা হলে সামনে দিয়েছ কেন?'

'যাতে বুঝতে পারেন, ডিরেক্টরেরও কাজ আছে শাখাগুলোয়। দূর থেকে শুধু সুপারভাইজ করলেই হয় না। প্রশাসনিক কাজকর্ম আর বড় বড় ফিন্যানশিয়াল ডিলগুলোর জন্য আপনাকে সশরীরে প্রয়োজন। আমরা এমনিতে ম্যানেজ করে নিই বটে, তবে সবসময় এভাবে কাজ চালানো যায় না। উই নিড আওয়ার ডিরেক্টর, মাসুদ ভাই... অন্তত ছ'মাসে-বছরে একবার হলেও!'

'যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, বাবা। যাও, এখন থেকে নিয়মিত আসব। এখন বাড়তি ঝামেলাগুলো সরিয়ে বাঁচাও আমাকে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'ঠিক আছে, সরাচ্ছি। এরপর যা থাকবে, সব কিন্তু দেখে দিয়ে যাবেন। ওগুলো সব ফিনানশিয়াল আর জটিল কেস সংক্রান্ত, জোড়াতালি দিয়ে ম্যানেজ করতে পারব না।'

'দেব, দেব। সরাও তো এখন।'

জুনিয়র অপারেটররা লাল রঙের সমস্ত ফাইল কাভার নিয়ে বেরিয়ে গেল, টেবিলের স্তূপটা অর্ধেকের চেয়ে কমে গেল তাতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

boighar.com

নাফিজকে বলল, 'এক কাপ কড়া কফি আনাও তো, সব কাজ আজই শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়াল নাফিজ। 'পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আর হ্যাঁ, আজকের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টগুলো পাঠিয়ে দিয়ো, চোখ বোলাব।'

দরজার কাছে চলে গিয়েছিল নাফিজ, উল্টো ঘুরে বলল, 'ওটা বোধহয় সম্ভব হবে না। এখন সব রিপোর্ট ই-মেইলে আসে, জানেন তো। অথচ আমাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এখনও চালু হয়নি।'

'সে কী! তা হলে তোমরা কাজ চালাচ্ছ কীভাবে?'

'জরুরি কিছু হলে স্যান ফ্রান্সিসকো ব্রাঞ্চ থেকে ফোনে জানিয়ে দেয়, তা ছাড়া দু'দিন পর পর লোক মারফত ডকুমেন্টও আনিয়ে নিচ্ছি। আপাতত এভাবেই চলছে।'

'দিস ইজ টোট্যালি আন-অ্যাকসেপ্টেবল,' রানা বিরক্ত হলো। 'কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সবার আগে চালু হওয়া উচিত। রায়হান কোথায়? ঢাকা থেকে ওকে আনাওনি?'

'আমাকে দোষ দেবেন না, খবর দিয়ে পাঁচদিন আগেই আনিয়েছি ওকে। ওর কম্পিউটার উইঙেরও সেটআপ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেডি করে দিয়েছি আমি। তবু কেন নেটওয়ার্ক চালু হয়নি, সেটা ও-ই বলতে পারবে।'

'কী আশ্চর্য! নেটওয়ার্কটা যে কত জরুরি, তা কি ও জানে না?'

'আপনিই জিজ্ঞেস করুন, আমার কথা তো কানেই তোলে না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'কোথায় ও? চলো তো!'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে পথ দেখাল নাফিজ, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কের মাঝখান দিয়ে জায়গা করে রানাকে নিয়ে এল ফ্লোরের অন্যপ্রান্তে, কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা মাঝারি আকারের কামরার সামনে—ওটাই এই ব্রাঞ্চের কম্পিউটার উইং। পার্টিশানের ওপাশে বড় বড় টেবিলের উপর বসানো হয়েছে মোট দশটা কম্পিউটার আর সার্ভার। এই মুহূর্তে একজন মাত্র মানুষকে দেখা যাচ্ছে কামরার ভিতরে।

দরজা ঠেলে ঢুকল রানা, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাণ্ডা বাতাস। এসি'র টেম্পারেচার অসম্ভব রকম কমিয়ে রাখা হয়েছে, রানা এজেন্সির কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ একদমই গরম সহ্য করতে পারে না। দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে রায়হান রশিদ, সামনের মনিটরের দিকে তাকিয়ে মগ্ন—রুমে যে নতুন মানুষ ঢুকেছে, তা টেরই পেল না। শব্দ না করে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, ছেলেটা কী নিয়ে এত ব্যস্ত, জানার ইচ্ছে। স্ক্রিনে ফুটে থাকা দুর্বোধ্য সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কিছুই বুঝতে পারল না ও, কিন্তু সবার উপরে জ্বলজ্বল করতে থাকা লেখাটা দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল:

"ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।"

'হুঁ, বসে বসে তা হলে নাসার কম্পিউটারে হানা দেয়া হচ্ছে!' গম গম করে উঠল রানার গলা।

কানের কাছে কথা শুনে চমকে উঠল রায়হান, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেল চেয়ারটা। ঘুরে রানার দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল সে, পরমুহূর্তে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা।

'মাসুদ ভাই! কখন এসেছেন?' আবেগের আতিশয্যে রানাকে জাপটে ধরল সে। কাজটা করতে গোটা এজেন্সির আর কারও সাহস হবে না, কিন্তু রায়হানের ব্যাপারটা ভিন্ন—আচার-আচরণ এখনও ছেলেমানুষের মত তার, রানাকে জাপটে ধরা ঠিক হবে কি হবে না, সে ধরনের কোনও চিন্তাই করে না। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা রায়হান, একহারা, ছিপছিপে শরীর। চেহারাটা খুব সুন্দর না হলেও অনাকর্ষণীয় নয়। মুখে একবিন্দু দাড়িগোঁফ না থাকায় বন্ধুরা তাকে মাকুন্দ বলে খেপায়। ছাব্বিশ বছর বয়স তার, কিন্তু দেখায় অনেক কম...প্রথম দেখায় কলেজ পড়ুয়া বলে ভ্রম হয়। চেহারা তো বটেই, চোখের মণিদুটোও এর একটা প্রধান কারণ, ওখানে নিপাট সরলতা ছাড়া আর কিছু নেই। মুহূর্তেই যে কাউকে আপন করে নেবার অদ্ভুত গুণ আছে রায়হানের মধ্যে, কেউ তাকে অপছন্দ করতে পারে না। স্বাভাবিক, এমন চমৎকার একটা ছেলেকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

বকাঝকা করতে এসেছে, তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, পাল্টা আলিঙ্গনের ইচ্ছেটা গলা টিপে মারল। 'হয়েছে, হয়েছে,' গলায় কপট রাগ ফোটাল ও। 'করছটা কী, জানতে পারি? আবার হ্যাকিং! তোমার কি এরই মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি?'

'না, না, মাসুদ ভাই। আপনি যা ভাবছেন, তেমন কিছুই নয়। এটা নির্দোষ অনুপ্রবেশ, কিছু চুরি করছি না।'

'তা হলে ঢোকার দরকারই বা কী?'

'কৌতূহল নিবৃত্তি,' রায়হান বলল। 'এবং চর্চা। প্র্যাকটিস না রাখলে ব্রেনে মরচে ধরে যাবে না? দরকারের সময় আপনাকে ইনফরমেশন এনে দেব কীভাবে?'

'তাই বলে নাসা?' রানা বিরক্ত, 'দুনিয়ার সবচেয়ে প্রোটেক্টেড এবং সিক্রেট মেইনফ্রেমগুলোর মধ্যে ওটা একটা। কী পরিমাণ সিকিউরিটি আছে, তা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জানো। একবার যদি ট্র্যাক করে ফেলে, তা হলে কী হবে ভেবে দেখেছ? পুলিশ, এফবিআই, সিআইএ, এনএসএ...সবাই একসঙ্গে পিছনে লেগে যাবে। কে সামলাবে ওসব?'

'খামোকা চিন্তা করছেন, মাসুদ ভাই,' রায়হানের মুখে অহংকারী হাসি। 'জানেন না? *ডাবল আর*-কে কেউ ট্র্যাক করতে পারে না।'

'ওহ্ নো, নট অ্যাগেইন!'

আজ থেকে তিন বছর আগে সারা পৃথিবীর সব গোপন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক *ডাবল আর* নামে এক হ্যাকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল...রায়হানই ছিল সেই হ্যাকার। অসম্ভব প্রতিভাবান আর মেধাবী সে, প্রোগ্রামিং আর কম্পিউটার সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে তার ভিতর একটা সহজাত দক্ষতা রয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র ছিল ও, ভাল ফলাফলের কারণে স্কলারশিপ পেয়ে চলে আসে আমেরিকায়,

boighar.com

ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে। ভার্সিটিতে কিছু অসৎ বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে হ্যাকিঙে উৎসাহী হয়ে ওঠে। সহজাত দক্ষতার কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হ্যাকারে পরিণত হয় ও। একটার পর একটা সিকিউরিটি সিস্টেম ভেদ করে নামীদামি সব প্রতিষ্ঠান আর সরকারী সংস্থার মেইনফ্রেম থেকে গোপন তথ্য চুরি করে কালোবাজারে বিক্রি করত রায়হান, পিছনে রেখে যেত একটা মাত্র চিহ্ন—পর পর দুটো ইংরেজি বর্ণ—*আরআর*।

ওকে ট্র্যাক করার কোনও উপায়ই ছিল না, নিজের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট মুছে দিতে বা লুকিয়ে ফেলতে দারুণ সেয়ানা ছিল ছেলেটা। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে এফবিআই ওকে ধরার জন্য একটা বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে—*অপারেশন ডাবল আর*। কম্পিউটারের মাধ্যমে যেহেতু ট্র্যাক করা সম্ভব নয়, তাই বিপরীত দিক থেকে কাজ শুরু করে তারা—রায়হানের বিক্রি করা তথ্যগুলোর উৎসের সন্ধানে নামে। তবে এমন তথ্য তো একটা নয়, কয়েকশো। এফবিআইয়ের সাইবার ক্রাইম ডিভিশনের স্বল্প লোকবল দিয়ে এই বিপুল কাজ সম্ভব ছিল না। হাতের কাছে যত বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ছিল, সবাইকেই কাজে লাগায় তারা—এর মধ্যে রানা এজেন্সিও ছিল। অন্য সবার চেয়ে ভাল কাজ দেখায় ওরা, রানা নিজেই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রায়হানের খোঁজ বের করে ফেলে ও, ততদিনে বিদেশি একটা ইন্টেলিজেন্সও কীভাবে যেন চিনে ফেলেছে তাকে। কিডন্যাপ করা হলো রায়হানকে, মাঝসাগরে একটা জাহাজ থেকে ছোটখাট একটা যুদ্ধ করে রানা কীভাবে ওকে উদ্ধার করে এনেছিল—সে আর এক গল্প।

এরপর রায়হানকে এফবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়াটাই ছিল সঙ্গত। কিন্তু রানা ভেবে দেখল, তাতে লাভ নেই কোনও। আমেরিকানদের ভাল করেই চেনে ও। জেলের চেহারাও দেখবে না ছেলেটা, ওকে সিআইএ বা অন্য কোনও সরকারি সংস্থা নিজেদের কুটিল কোনও স্বার্থে ব্যবহার করবে। তা ছাড়া ততদিনে রায়হানও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। রোমাঞ্চ এবং অল্প সময়ে বড়লোক হবার নেশায় না বুঝে হ্যাকিং করত ও, কিন্তু কিডন্যাপিঙের সেই ঘটনা ওর ভিতর আত্মোপলব্ধি এনে দিয়েছে—বুঝিয়ে দিয়েছে ওর ক্ষমতার ভালমন্দ দিক। সবকিছু ভেবে রানা ঠিক করল, রায়হানের এই অত্যাশ্চর্য দক্ষতা স্বদেশ এবং সারা পৃথিবীর কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে—মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানও সম্মতি দিলেন এতে। ফলে নতুন জীবন পেল রায়হান, যোগ দিল রানা এজেন্সি তথা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। বিসিআই এজেন্টরা ডাবল আর-কে খুঁজে বের করার মত সমস্ত সূত্র মুছে দিল, রায়হানও আর কোনওদিন সাইবার-ক্রাইমের পেশায় ফিরে যায়নি। বিসিআইয়ের ট্রেনিং শেষ করে ও এখন পুরো প্রতিষ্ঠানের চিফ আই.টি. এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করছে। মাঝে মাঝে হ্যাকিং অবশ্য করতে হয় ওকে, তবে সেটা দেশ ও দশের কল্যাণে—ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য।

'আমি এত কিছু বুঝি না,' বলল রানা। 'জলদি ওটা বন্ধ করো।' আঙুল তুলে মনিটরটা দেখাল ও। 'যতক্ষণ অনলাইন থাকছ, ডিটেক্ট হয়ে যাবার ভয় ততই

বাড়ছে।'

'রিল্যাক্স, মাসুদ ভাই,' রায়হান আশ্বাস দিল। 'অনলাইনে নেই আমি, দরকারি জিনিসটুকু ডাউনলোড করে অনেক আগেই কম্পিউটারটা অফলাইন করে রেখেছি। যেটা দেখছেন, ওটা সেভ করা ডেটা।'

'ডাউনলোড করেছ!' রানা অবাক হলো। 'কী ডাউনলোড করেছ?'

'অবিশ্বাস্য একটা জিনিস!' চোখ বড় করে বলল রায়হান। 'না দেখলে বিশ্বাসই হবে না আপনার। এদিকে আসুন, দেখাচ্ছি।'

বাধা দিল রানা। 'দেখাদেখির অনেক সময় পাওয়া যাবে। আগে কাজের কথায় এসো। এখানকার নেটওয়ার্ক এখনও চালু হয়নি কেন? নাসায় যখন ঢুকতে পারছ, তখন তো মনে হচ্ছে সব ঠিকঠাকই আছে।'

'খালি আমি ঢুকতে পারলেই তো হবে না, অন্য কেউ যাতে এখানে ঢুকতে না পারে, সে ব্যবস্থাও তো করতে হবে। আমাদের খুব শক্ত একটা সিকিউরিটি সিস্টেম তৈরি করা দরকার।'

www.boighar.com

'কেন, এতদিন সিকিউরিটি ছিল না?'

'হাহ্, পুরনো সিস্টেমটা?' রায়হানের চেহারায় অবজ্ঞা। 'ওই ফায়ারওয়াল ভাঙতে একজন হ্যাকারের আধঘণ্টাও লাগবে না। দিনকাল পাল্টে গেছে, মাসুদ ভাই। এখন আমাদের আরও উন্নত সিস্টেম বসাতে হবে।'

'বসাও না! কে মানা করছে? তোমাকে আনাই তো হয়েছে সেজন্য।'

'শুধু মুখে বসাও বললেই কী আর হয়? আমাকে তো মালমশলা দিতে হবে।'

'মালমশলা?'

'হ্যাঁ। হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার মিলিয়ে বিশ স্তরের একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা দাঁড় করাব আমি, কারও বাপেরও সাধ্য নেই চুরি করে ভিতরে ঢোকে।'

'তুমিও পারবে না?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'আমিও পারব না,' মাথা নাড়ল রায়হান। 'ইট উইল বি ইউনিক অ্যান্ড স্টেট অভ দ্য আর্ট। বিসিআই হেডকোয়ার্টারসহ এজেন্সির বেশ কয়েকটা ব্রাঞ্চে ইতোমধ্যে ওটা চালু করে দিয়েছি আমি। আগামী ছ'মাসের মধ্যে বাকি সমস্ত শাখায় ওটা ইন্সটল করার নির্দেশও দিয়েছেন চিফ।'

'তা...তোমার এই ইউনিক সিস্টেম বসাতে ক'দিন লাগে?'

'বেশি না, মাত্র একদিন।'

'একদিন!' রানা চোখ কপালে তুলল। 'তুমি এসেছ পাঁচদিন হয়েছে, এখনও সব বন্ধ কেন?'

'দোষটা আমার নয়,' বলল রায়হান। 'সফটওয়্যার রেডি আছে, অভাবটা হার্ডওয়্যারের। এখানকার সব কম্পিউটার অন্তত তিন বছরের পুরনো। ফায়ারওয়ালটার জন্য বেশ কিছু নতুন পার্টস লাগবে। নাফিজ ভাইকে তো আমি তিনদিন আগেই লিস্ট দিয়েছি, জিনিস না এলে কাজ করি কীভাবে?'

এবার নাফিজের দিকে ফিরল রানা। 'কথাটা কি সত্যি?'

'ও কী একটা কাগজ যেন পাঠিয়েছিল বটে,' কাঁচুমাচু মুখে বলল নাফিজ। 'আমি আসলে ব্যস্ততার জন্য দেখতে পারিনি।' বসের ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে দেখে

boighar.com

তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

একরকম পালিয়ে বাঁচল সে।

'বেচারাকে একটু ছাড় দিন, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'আসার পর থেকেই দেখছি, অফিস রেডি করার জন্য পাগলের মত খাটছে। তার মধ্যে আপনি আবার আসছেন বলে খবর পাঠিয়েছেন। ওর তো মাথা খারাপের মত অবস্থা—আপনি এলে কোথায় বসতে দেবে, কী করবে না করবে...এতসব ঝামেলার ভিতর আমার মেমোটা চোখ এড়িয়ে গেলে দোষ দেয়া যায় না।'

'দোষ দিচ্ছি কে বলল?' রানা ভুরু নাচাল। 'তবে মাঝে মাঝে একটু শাসন করতে হয়, বুঝেছ?'

'আপনার এ-সব সাইকোলজিক্যাল টেকনিক বুঝে কাজ নেই আমার,' বলে একটা চেয়ার টেনে ধরল রায়হান। 'বসুন, নাসা থেকে কী পেয়েছি—দেখাই আপনাকে।'

'বসতে হবে না, এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। স্ক্রিনের ওসব হায়ারোগ্লিফিক্স বোঝার ক্ষমতা নেই আমার—এটা তোমার জানা থাকা উচিত। সুতরাং ওগুলো দেখে মুগ্ধ হতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

'ওহ্, এটা?' হেসে উঠল রায়হান। 'সিগনালটাকে ভিজুয়্যালি ট্রান্সফার করেছি বলে এমন দেখাচ্ছে।'

'সিগনাল!' রানা অবাক। 'কীসের সিগনাল?'

'সেটাই তো আপনাকে দেখাতে...না, না, শোনাতে চাইছি। আসুন, বসুন এখানটায়।'

'আমার বসার সময় নেই, রায়হান,' রানা মাথা নাড়ল। 'নাফিজ একগাদা ফাইল দিয়ে রেখেছে...চোখ কপালে উঠে যাবার অবস্থা।'

'চোখ-কান শুধু কপালে নয়, মাথার তালুতে অলরেডি উঠে আছে আমার—নাসার এই জিনিসটার কল্যাণে। আপনারও একই অবস্থা হবে, চুপ করে বসুন এখানটায়। ফাইল-টাইলের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছি এখুনি।'

রায়হানের পীড়াপীড়ি দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা, ছেলেটাকে খুব শিয়োর দেখাচ্ছে ওকে চমকে দেয়ার ব্যাপারে! ঘটনাটা কী? 'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট সময় দেয়া গেল তোমাকে।' বলে বাড়িয়ে ধরা চেয়ারটা টেনে বসল ও।

'পাঁচ মিনিটও লাগবে না, স্রেফ দু'মিনিট নেব আমি,' বলে নিজের আসনে বসে পড়ল রায়হান। কী-বোর্ডের উপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য নেচে বেড়াল তার দু'হাত, তারপরই স্পীকার থেকে একটা নিচু লয়ের শব্দ ভেসে এল। আওয়াজটা অদ্ভুত, অস্বাভাবিক—এই মনে হয় হাজারটা কণ্ঠ একসঙ্গে সুর মেলাচ্ছে সিম্ফনিতে, পরমুহূর্তেই সে জায়গাটা দখল করে নিচ্ছে কেমন একটা চাপা গোঙানি! হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় যেন সাইরেন জাতীয় কিছু বাজছে, আবার মনে হয়—না, তা নয়, করুণ সুরে বিলাপ করছে অজানা কোনও প্রাণী। অতিপ্রাকৃত, অপার্থিব এই বিচিত্র সুর, যেন অশুভ কোনও সঙ্কেত দিয়ে চলেছে। পৃথিবীতে সৃষ্টি হওয়া কোনও শব্দের সঙ্গে এর মিল নেই। নিজের অজান্তেই গা শিরশির করে উঠল রানার, ঘাড়ের কাছে সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল খাটো চুলগুলো।

মিনিটখানেক চলল এই অদ্ভুত সুর, তারপর থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল রানা, বুকের ভিতরটা কাঁপছে, ঠাণ্ডাও লাগছে খুব—তবে সেটা এসি'র ঠাণ্ডা বাতাসে নয়, অন্য কোনও কারণে। অবাক লাগল ওর—ভয় পায়নি, তাও বুক ধক ধক করছে, হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে খাঁচা ছেড়ে। ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল ও, তারপর তাকাল রায়হানের দিকে। ছেলেটার মুখে দুষ্টু হাসি, ভুরু নাচিয়ে ভাব করল—কী, বলেছিলাম না?

'কী ছিল ওটা?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল রানা।

'ইউনিক একটা সাউন্ড সিগনাল,' জবাব দিল রায়হান। 'কেন ইউনিক বলছি, জানেন? বুক কাঁপছে না?'

'হ্যাঁ। কারণটা কী?'

'মানুষের কানে শোনা যায় না, এমন একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ বেরুচ্ছিল অদ্ভুত সুরটার সঙ্গে, সরাসরি নার্ভে হামলা চালায় ওটা।'

রানার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না—এভাবে কোনও শব্দ ওর বুক কাঁপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু দিল তো! জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি আসলেই সম্ভব?'

'হ্যাঁ,' রায়হান মাথা ঝাঁকাল। 'দুনিয়াজুড়ে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্যও পাওয়া গেছে। চোখে ফ্যাকোইমালসিফিকেশন সার্জারির কথা তো নিশ্চয়ই জানেন, সাউণ্ডওয়েভ দিয়ে এখন মানুষকে শুধু ভয় দেখানো নয়, হার্ট অ্যাটাকও করিয়ে দেয়া সম্ভব।'

'যেটা শুনলাম... সেটা ক্ষতিকর কিছু ছিল না তো!' রানা জিজ্ঞেস করল।

'না, না,' রায়হান মাথা নাড়ল। 'ওটা স্রেফ ভয় ভয় ভাব সৃষ্টি করে, আর কিছু না।'

'হুম! কিন্তু এ জিনিস নাসার কম্পিউটারে কেন? ওরা নিশ্চয়ই সাউণ্ডওয়েভ নিয়ে গবেষণা করছে না?'

'আসল জিনিসটাই তো ধরতে পারেননি, মাসুদ ভাই,' হাসল রায়হান। 'শুধু বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিটা নয়, পুরো সিগনালটাই একটা বিরাট রহস্য।'

'কেন? এই সিগনালে আর কী আছে?'

'কী আছে, সেটা পরের চিন্তা,' রায়হান হেঁয়ালি করছে। 'আগে জেনে রাখুন—এটা মানুষের তৈরি করা নয়।'

'কীভাবে শিয়োর হচ্ছ?'

'কারণ, এটা এসেছে আউটার স্পেস থেকে!' শান্ত গলায় বোমাটা ফাটাল রায়হান।

চার

'আউটার স্পেস!' রানা চমকে উঠল। 'তুমি বলতে চাইছ—এটা একটা অ্যালিয়েন কমিউনিকেশন? মানে...ভিনগ্রহবাসীদের পাঠানো মেসেজ?'

boighar.com

'আমার তা-ই ধারণা,' রায়হান মাথা ঝাঁকাল।

'এই উদ্ভট ধারণা তোমার মাথায় এল কেন? জিনিসটা নাসার কম্পিউটারে পাওয়া গেছে, তাই?'

'উঁহুঁ, আমি সংশ্লিষ্ট সমস্ত ডেটা সংগ্রহ করেছি। সিগনালটা রিসিভ করেছে ওদের ডিপ স্পেস প্রোব *ভয়েজার-টু*, ওটা সৌরজগতের বাইরে আছে এই মুহূর্তে। জটিল একটা পদ্ধতিতে সিগনালটার উৎসও বের করেছে নাসা—সেটা পৃথিবী থেকে দুই লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে...ক্যাডমিয়াম গ্যালাক্সিতে।'

'দু'লাখ আলোকবর্ষ!' রানার গলায় অবিশ্বাস। 'সেটা কীভাবে সম্ভব? এত দূর পর্যন্ত শব্দটা এল কেমন করে?'

'নিশ্চয়ই কোনও ধরনের বুস্টার ব্যবহার করা হয়েছে,' রায়হান আন্দাজ করল। 'পদ্ধতিটার ব্যাখ্যা চাইবেন না দয়া করে, বলতে পারব না। ভিনগ্রহের অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি—আমরা হয়তো ওটার মৌলিক ব্যাপারগুলোই এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি। শুধু এটুকু বুঝেছি—সিগনালটা লো ফ্রিকোয়েন্সিতে এনক্রিপ্ট করে দেয়া হয়েছিল, নিচু লয়ের শব্দ অনেক বেশি দূর কাভার করতে পারে, এটা জানেন তো!'

'আমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে ব্যাপারটা,' রানা বলল। 'এটা কোনও ভাঁওতাবাজি নয় তো?'

'মনে হয় না,' রায়হান মাথা নাড়ল। 'ভাঁওতাবাজি হলে এতক্ষণে বিষয়টা প্রচার করে নাম কামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত ওরা, দেরি করত না। হাজার হোক, ভিনগ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটা।'

'সিগনালটা কখন রিসিভ করা হয়েছে?'

'এই তো, চব্বিশ ঘণ্টার মত হবে। আমি ইলেকট্রনিক লগবুক ঘেঁটে দেখেছি—সত্যি সত্যি *ভয়েজার-টু* প্রোব থেকেই এসেছে ওটা।'

'হুঁ, তার মানে শব্দটার উৎস নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই?'

'না। আমেরিকানরা তো এরই মধ্যে রিসার্চ শুরু করে দিয়েছে—এরিয়া ফিফটি ওয়ানে ওটার একটা কপি পাঠানো হয়েছে। এয়ারফোর্সের তত্ত্বাবধানে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের টপ সিক্রেট কম্পিউটারে ওটার বিশ্লেষণ করছে বিজ্ঞানীদের একটা টিম। অবশ্য ওদের উচিত এখুনি আবিষ্কারটা সারা দুনিয়াকে জানিয়ে রাখা, নইলে পরে কৃতিত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কেন?'

'নাসার স্পেস বেজড প্রোব আর স্যাটেলাইটগুলোর ট্রান্সমিশন সারাক্ষণ মনিটর করে উন্নত সব দেশ—হ্যাকিঙের মাধ্যমে। আমি নিজেই বহুবার ডেটা চুরি করে বিক্রি করেছি। নিশ্চিত থাকতে পারেন, এতক্ষণে অনেকেই সিগনালটার কপি পেয়ে গেছে, গবেষণাও শুরু করে দিয়েছে। যে আগে ব্যাপারটার ঘোষণা দেবে, তারই নামডাক হবে।'

'চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে বলছ, এখনও সবাই চুপচাপ কেন?'

'এত বড় একটা ব্যাপার...সবাই শিয়োর হয়ে নিতে চাইছে আরকী। হাজার হোক, আমেরিকা ছাড়া বাকি সবাই তো সিগনালটা চুরি করেছে...প্রকাশ করার

পর এমনিতেই রোষের শিকার হতে হবে, তার ওপর যদি ভুয়া প্রমাণ হয়...বুঝতেই পারছেন। তা ছাড়া মেসেজটার অর্থ বের করারও একটা ব্যাপার আছে, আমি সে-চেষ্টাই করছিলাম।'

'আমি তো দেখলাম কী সব হিজিবিজির দিকে তাকিয়ে আছ।'

'হিজিবিজি না,' রায়হান হাসল। 'সাউন্ডটার ভিজ্যুয়াল কপি। কোনও প্যাটার্ন আছে কি না, তা-ই দেখছিলাম। শুনে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এটাই বিকল্প কায়দা। আসুন দেখাই।'

কী-বোর্ডের বাটন চেপে শুরুতে দেখা সেই দুর্বোধ্য লেখাগুলো আবার স্ক্রিনে ফিরিয়ে আনল রায়হান। বোকার মত তাকিয়ে রইল রানা, এসবে ও একেবারেই আনাড়ি। কালো পর্দায় ফুটে থাকা আবোলতাবোল সঙ্কেতগুলো কম্পিউটার-বিশারদদের কাছে অর্থবহ হতে পারে, কিন্তু ওর চোখে স্রেফ হিজিবিজিই বটে। রায়হান অবশ্য গভীর মনোযোগে স্টাডি করছে সঙ্কেতগুলো, পাশে রাখা নোটবুকে মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে, একটা অংশ দেখা হয়ে গেলে মাউস দিয়ে স্ক্রোল করে পরেরটুকু নিয়ে আসছে পর্দায়।

'এসব পড়ে তুমি বুঝতে পারছ কিছু?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

কাজ থামিয়ে হাসল রায়হান। বলল, 'না, মাসুদ ভাই। শোনার জিনিস কি আর পড়ে বোঝা যায়? শুধু রীডিং দিতে পারছি—অনেকটা বাংলা অক্ষর দিয়ে চিনা ভাষা লেখার মত ব্যাপার বলতে পারেন। পড়া যায়, কিন্তু অর্থ বোঝা যায় না। আমি আসলে এতে কোনও কমন প্যাটার্ন আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখছি।'

'ঠিক আছে, তুমি কাজ করো তা হলে,' রানা উঠে দাঁড়াল। 'আমি গিয়ে ফাইলপত্র নিয়ে বসি গে। তা ছাড়া তোমার এই আবিষ্কারের কথাও ঢাকায় রিপোর্ট করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল রায়হান, রানাও অফিসের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াল। রুম থেকে বেরুতে পারল না ও, দরজা পর্যন্ত পৌঁছুতেই শোনা গেল রায়হানের উত্তেজিত চিৎকার।

'ও, মাই গড!'

থমকে গেল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রায়হান। 'কী ব্যাপার, আবার কী হলো?'

'জলদি এদিকে আসুন, মাসুদ ভাই! অবিশ্বাস্য আরেকটা ব্যাপার পেয়েছি!'

কৌতূহলী হয়ে ফিরে এল রানা। 'কী পেয়েছ?'

প্রশ্নটা মনে হলো রায়হানের কানে যায়নি, ও বিড়বিড় করছে, 'এ...এটা কীভাবে সম্ভব? তা হলে কী...তা হলে কী...'

'অ্যাই, রায়হান!' গলা চড়াল রানা। 'কী হয়েছে?'

উত্তেজিত চোখে ওর দিকে তাকাল রায়হান, স্ক্রিনের একটা অংশে আঙুল ঠেকাল। বলল, 'এই...এই অংশটা আমি পড়তে পারছি, মাসুদ ভাই। বুঝতেও পারছি!'

অসঙ্গতিটা ধরতে এক মুহূর্তও লাগল না রানার। 'শ্রবণযোগ্য সিগনালে আবার পড়ে বোঝার জিনিস এল কীভাবে? এইমাত্র না বললে, ওটা সম্ভব নয়?'

boighar.com

‘উত্তরটা আমার জানা নেই, ব্যাপারটা আমার কাছেও ধাঁধার মত লাগছে।’

‘কেন? কী বলা হচ্ছে ওতে?’

‘তা-ও জানি না। অসম্ভব জটিল আর কঠিন একটা কোডে কিছু একটা লুকানো আছে মেসেজটায়। আমি শুধু কয়েকটা ডিজিট পড়তে পারছি।’

‘কী ধরনের ডিজিট?’

‘তারিখ আর সময়। এক ধরনের টাইম-ডিলেইড কমাণ্ড লুকিয়ে আছে এর ভিতরে, কিন্তু সেটা কী—বলতে পারব না।’

‘কবেকার তারিখ?’

‘চারদিন পরের,’ বলে ঘড়ির দিকে তাকাল রায়হান। ‘মোটামুটি নব্বুই ঘণ্টা পর কিছু একটা ঘটবে এই মেসেজটার ফলে।’

‘কী ঘটবে, সেটা জানার কোনও উপায় আছে?’ রানার গলায় থমথমে ভাব।

‘কোড ভেঙে পাঠোদ্ধার করতে হবে—ওটাই একমাত্র পথ।’

‘কত সময় লাগবে কোড ভাঙতে?’

মাথা নাড়ল রায়হান। ‘সরি, মাসুদ ভাই। মিথ্যে আশা দেব না, এই কোড ভাঙা আমার কম্মো নয়।’

‘মানে!’ রানা অবাক হলো। ‘আমি তো জানি—তোমার মত দক্ষ হ্যাকার আর কোডব্রেকার পৃথিবীতে কেউ নেই। আর তুমিই বলছ পারবে না! অন্তত চেষ্টা তো করে দেখো। নইলে নুমায় যোগাযোগ করে ল্যারি কিং আর ওর ভিনাসের সাহায্য নেব।’

অসহায়ের মত রায়হান কাঁধ ঝাঁকাল। ‘আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, মাসুদ ভাই। এই কোডটা আমি চিনি, এটা সম্পর্কে জানি। কম্পিউটার জগতের সবচেয়ে জটিল কোড—একেবারে অদ্বিতীয় বলতে পারেন। ভিনাস কেন, তার চেয়ে উন্নত কোনও কম্পিউটার দিয়েও ওটা ভাঙা যাবে না। সারা পৃথিবীতে মাত্র দশজন মানুষ এর ব্যবহার জানে। শুধু তারাই পারে এই কোডের মর্মোদ্ধার করতে, অন্য কেউ না।’

‘আর তুমি তাদের একজন নও?’

হেসে উঠল রায়হান। ‘হতে পারলে বর্তে যেতাম, মাসুদ ভাই। সাইবার জগতের ঈশ্বর হয়ে যেতে পারতাম!’

রানার চেহারায় বিরক্তি ফুটল। ‘তোমার কথাবার্তা হেঁয়ালির মত ঠেকছে। নিজে যদি না-ই পারো, তা হলে ডিজিটগুলো পড়লে কীভাবে?’

‘ওই দশজনের একজনকে আমি চিনি। তিনিই আমাকে মৌলিক কয়েকটা জিনিস শিখিয়েছেন। ভাগ্যের জোরে সংখ্যাগুলো চিনতে পেরেছি, অন্য কোনওভাবে লিখলে তা-ও পারতাম না।’

‘তা হলে কোড ভাঙার জন্য ওই মানুষটাকেই খবর দাও!’

‘ভদ্রলোক যে কোথায় আছেন, জানা নেই আমার।’

‘খুঁজে বের করা যাবে। তুমি নামটা দাও।’

‘ঠিক আছে,’ বলে নোটপ্যাডের উপর ঝুঁকল রায়হান, কলম চালাতে গিয়ে থমকে গেল, মুখ ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে—দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'কী হলো, থামলে কেন?'

'বিকল্প একটা উপায় আছে, মাসুদ ভাই!' খুশি খুশি গলায় বলল তরুণ হ্যাকার, আঙুল তুলল মনিটরের দিকে। 'এটা স্রেফ একটা প্রোগ্রাম, টাইম মিলিয়ে কমাণ্ড অনুসারে কাজ করবে। আমরা যদি কম্পিউটারের ঘড়িটা নব্বুই ঘণ্টা এগিয়ে দিই...'

'...তা হলেই ফলাফলটা এক্ষুণি দেখতে পাব,' বুঝতে পেরে বলে উঠল রানা। মুখে হাসি ফুটল ওর, কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞের পিঠ চাপড়ে দিল। 'চমৎকার বুদ্ধি, রায়হান। ডু ইট—করো দেখি।'

চেয়ার টেনে বসল রায়হান, পাশে রানা। কী-বোর্ডে দ্রুত কিছু টাইপ করল ছেলেটা, তারপর *এন্টার* বাটন চেপে হেলান দিল। বলল, 'পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে জানা যাবে ব্যাপারটা।'

উৎকণ্ঠার সঙ্গে শুরু হলো অপেক্ষা। সামান্য এটুকু সময়ও যেন কাটছে না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল রানা—এগোচ্ছে সেকেণ্ডের কাঁটা।

পাঁচ।

চার।

তিন।

দুই।

এক!

উত্তেজনায় স্ক্রিনের উপর ঝুঁকল দুজনেই। কিন্তু না, কিছুই ঘটছে না। কয়েক সেকেণ্ড কাটল এভাবে, তা-ও সব আগের মত।

'আশ্চর্য তো!' বিস্ময়ে বিড়বিড় করল রায়হান।

'কেন, কী হয়েছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'কিছু হয়নি, সেটাই অবাক ব্যাপার। হুঁ, স্মার্ট... ভেরি স্মার্ট!'

'কীসের কথা বলছ?'

'কমাণ্ডটা—আমরা যেভাবে জোচ্চুরি করেছি, তাতে যেন কাজ না হয়, সেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। প্রোগ্রামার যে-ই হোক, তার বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়।'

'তার মানে পুরো নব্বুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'এত সহজে হার মানছি না,' উৎসাহী দেখাচ্ছে রায়হানকে, একটা চ্যালেঞ্জ পেয়েছে সে, চোখেমুখে উত্তেজনা ফুটেছে তাই। 'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

টানা কয়েক মিনিট চুপ করে রইল ও, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। শেষে হাসি ফোটাল মুখে। বলল, 'আমি জানি কী করতে হবে। ভুলটা হয়েছে এক লাফে নব্বুই ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে। এভাবে না, প্রত্যেকটা সেকেণ্ড ধরে এক-এক করে এগিয়ে যেতে হবে। প্রোগ্রামটাকে ভাবতে দিতে হবে যে—সত্যিই সময়টা পার হয়েছে।'

'সেটা কীভাবে করা সম্ভব?' রানা জানতে চাইল।

'ছোট্ট একটা সাব-প্রোগ্রাম লিখতে হবে আমাকে, যেটা কম্পিউটারের ভিতরের ঘড়িটাকে রিপ্লেস করবে,' ব্যাখ্যা করল রায়হান। 'ওটা হবে একটা অ্যাকসিলারেটেড ক্লক, খুব দ্রুত সময়কে নব্বুই ঘণ্টা এগিয়ে নিয়ে যাবে।

boighar.com

সিগনালের প্রোগ্রামটাকে আর সবকিছু থেকে আইসোলেট করে আমার তৈরি করা ঘড়িটার সঙ্গে বাইপাস করে দেব। ফলে সময় সংক্রান্ত তথ্য শুধু ওখানটা ছাড়া আর কোথাও থেকে পাবে না ওটা, সত্যি সত্যি মনে হবে নব্বুই ঘণ্টা সময় পেরুচ্ছে।'

'এতসব টেকনিক্যাল কথাবার্তা বুঝতে পারছি না,' সাফ সাফ বলে দিল রানা। 'শুধু এটুকু বলো, কমাণ্ডটার অর্থ বের করতে পারবে কি না।'

'চমৎকার সম্ভাবনা আছে, মাসুদ ভাই,' রায়হান বলল। 'আমি কনফিডেন্ট।'

'সাব-প্রোগ্রামটা লিখতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশি না, বড়জোর আধ ঘণ্টা। আপনি চাইলে অফিসে গিয়ে কাজ করতে পারেন। রেডি হলে আমি খবর দেব।'

উঠল না রানা, কী এক আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেছে, শেষটা না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না। ওদিকে কী-বোর্ডে ঝড় তুলেছে রায়হান, যন্ত্রের মত দ্রুত লিখতে শুরু করেছে সাব-প্রোগ্রামটা, স্ক্রিনে চোখের পলকে ফুটে উঠছে একটার পর একটা লাইন, তাকে আদৌ কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে কি না সন্দেহ। অভিভূত হয়ে দৃশ্যটা চাক্ষুষ করল রানা, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো—ছেলেটা সত্যিই একটা প্রতিভা! সামান্য ভুলে বিপথে চলে গিয়েছিল, সময় থাকতেই বিসিআই নাক গলানোয় বেঁচে গেছে। নইলে এতদিনে জেলে পচত, আর না হয় মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের হাতের পুতুল হয়ে জীবন কাটাত। সোনার বাংলাদেশে ওর মত আরও কত প্রতিভা সামান্য দিক-নির্দেশনার অভাবে ঝরে যাচ্ছে! যদি পারত, তা হলে দেশটার তরুণ সমাজের একজনকেও নষ্ট হতে দিত না ও। অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যদ্দূর সম্ভব, তার একটুও বাকি রাখছে না রানা। ইতোমধ্যে রায়হানের মত বেশ কিছু তরুণকে বিসিআই এবং রানা এজেন্সিতে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছে ও, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় অর্থকষ্টে ভোগা বাঙালি ছাত্রদেরও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। কিন্তু দেশের বিশাল তরুণ সমাজের তুলনায় তা আর কতটুকুই বা!

রায়হানের ডাকে সংবিৎ ফিরল রানার।

'হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই।'

ঘড়ি দেখল রানা, আধঘণ্টা চাইলেও বাস্তবে তার প্রায় অর্ধেক সময়ে কাজটা সেরে ফেলেছে ছেলেটা। মুগ্ধ হয়ে ও বলল, 'বাহ্, মাত্র সতেরো মিনিট! তুমি তো দেখছি দারুণ করিৎকর্মা হে!'

লজ্জিত হাসি হাসল রায়হান, সামনাসামনি প্রশংসায় অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। বিনয় করে বলল, 'কী যে বলেন না! আসলে কাজটা বেশি ঝামেলার ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। শুরু করার আগে ভাবিনি এত সহজ হবে।'

'এখন এক্সপেরিমেন্টটা চালানো যাবে তো?'

'এক মিনিট,' বলে শেষ মুহূর্তে কিছু চেক করল রায়হান, সন্তুষ্ট হয়ে ফিরল রানার দিকে। 'হ্যাঁ, সব রেডি।'

'তা হলে শুরু করো তোমার ঘড়ি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এন্টার বাটন চাপল রায়হান, সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ভেসে উঠল

একটা ডিজিটাল ঘড়ি—এখনকার সময় আর তলায় আজকের তারিখ দেখাচ্ছে দ্বিতীয়বার এন্টার চাপতেই অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে বাড়তে লাগল সেকেণ্ড আর মিনিটের সংখ্যা, খালি চোখে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না—পরিবর্তনটা এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে।

'টার্গেট টাইমে পৌঁছুতে বিশ সেকেণ্ড লাগবে,' বলল রায়হান।

চোখের পলকে বাড়ল ঘণ্টা, তারিখও বদলাতে সময় লাগল না। হাতঘড়িতে চোখ রেখে টাইমিং মেলাচ্ছে তরুণ হ্যাকার। ঘোষণা করল, 'আর পাঁচ সেকেণ্ড...চার...তিন...দুই...এক... এখন!'

এরপর যা ঘটল, তার জন্য তৈরি ছিল না ওদের কেউই। স্ক্রিনের ঘড়িটা একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে থেমে গেল, নরক দক্ষযজ্ঞের সূচনাটা হলো তখনই।

স্ক্রিনে এতক্ষণ ধরে ভাসতে থাকা সবকিছু অদৃশ্য হলো প্রথমেই, সে-জায়গাটা দখল করল নানা রকম আঁকিবুঁকি আর জ্যামিতিক নকশা—প্রতি মুহূর্তে চেহারা পাল্টাচ্ছে। ভ্রূ কুঁচকে ফেলল রায়হান, ওর মুখের ভাব দেখে রানা বুঝল, কোথাও গোলমাল হয়েছে। কথা বলার সুযোগ পেল না ও, চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা, ছোটাছুটি করে রুমের বাকি কম্পিউটারগুলো চেক করল—সবগুলোর পর্দায় একই কাণ্ড ঘটছে।

'ও মাই গড!' মাথায় হাত দিল রায়হান।

কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল না রানা, স্পীকারে ভেসে আসা একটা ধুমধাড়াক্কা বাজনা শুনে থমকে গেল ও। চোখ ফেরাতেই দেখল, নকশা অদৃশ্য হয়েছে স্ক্রিন থেকে, সেখানে টকটকে লাল হরফে ভেসে উঠল একটামাত্র বাক্য:

www.boighar.com

ইউ আর ডুমড্!

ওটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পীকারে শোনা গেল পুরনো আমলের সিনেমার ভিলেনদের খনখনে হাসি—'হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হা!'

পরমুহূর্তে পায়ের কাছে কম্পিউটারের সিপিইউ-তে ছোট একটা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হলো, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল মনিটরের পর্দা, ইনপুট হারিয়েছে। চারপাশে তাকাতেই রানা বুঝল, শব্দ আসলে একটা নয়, কয়েকটা হয়েছে; একসঙ্গে হওয়ায় আলাদা করা যায়নি। নাকে পোড়া গন্ধ ঢুকল ওর, আর তার পরপরই একযোগে সব সিপিইউ-র পিছন দিয়ে তীব্রভাবে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে এল, তার ভিতর বিকট আওয়াজে ফট ফট করে ফাটছে একেকটা যন্ত্রাংশ। কম্পিউটার উইং চোখের সামনে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা বনে গেছে রায়হান, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের ফুলকি আর ধোঁয়া ছড়ানো কম্পিউটারগুলোর দিকে। কিন্তু রানা উপস্থিতবুদ্ধি হারাল না, বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে...লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'রায়হান! পাওয়ার কানেকশন! সবগুলোর পাওয়ার কানেকশন কেটে দাও!'

এবার নড়ে উঠল রায়হান, ছুট লাগিয়ে টেবিলের সারির উল্টোপাশে চলে এল রানার পিছু পিছু। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এল ওরা, তা সফল হলো না। হাত বাড়িয়েই

boighar.com

থমকে গেল দু'জনে, তীব্র উত্তাপে গলে গেছে সমস্ত ইলেকট্রিক কর্ডের ইনসুলেশন, তামার তার বেরিয়ে গেছে। ধরতে গেলে শুধু যে শক খেতে হবে, তা-ই নয়, হাতও পুড়ে যাবে।

'মেইন সুইচ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'মেইন সুইচ বন্ধ করতে হবে! কোথায় ওটা?'

'এলিভেটরের পাশে, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে।'

ছুট লাগাল রানা। এই সময় তীব্রস্বরে বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্ম, ছাতে লাগানো স্মোক-ডিটেক্টর ধোঁয়ার স্পর্শ পেয়েই চালু করে দিয়েছে সতর্ক-সঙ্কেত। দরজা খুলে কয়েক পা যেতেই মাথার উপর সক্রিয় হয়ে উঠল স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম, ঝাঁঝরির মত ছিটাতে শুরু করল পানি—পুরো ফ্লোর জুড়ে। যেসব শ্রমিক ইন্টেরিয়রের কাজ করছিল, তাদের আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালাতে দেখল ও, অন্যান্য ফ্লোরেও নিশ্চয়ই একই কাণ্ড ঘটছে। এজেন্সির অপারেটররা ছোটাছুটি না করলেও বিহ্বল হয়ে গেছে। আচমকা আগুন লাগার কোনও আশঙ্কাই ছিল না তাদের মধ্যে, তাই মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। নাফিজের হাঁকডাক শোনা গেল—ইমার্জেন্সি প্রসিডিওর দাঁড়ি-কমাসহ অনুসরণ করছে সে, গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র আর ইকুইপমেন্ট সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করছে।

সময় নষ্ট করল না রানা, পানির ধারাগুলো ভেদ করে দৌড়াতে থাকল। এলিভেটরের বাঁয়ে করিডরের শেষ প্রান্তে স্টেয়ারওয়েলে যাবার দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল ল্যান্ডিঙে। এক টানে দেয়ালে লাগানো সুইচবক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল ও, প্যান্টে হাত মুছে টান দিল সার্কিট ব্রেকারে। অ্যালার্মের গগনবিদারী আওয়াজ থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে অফিসে ফিরে এল রানা, কম্পিউটার উইঙে পা দিয়েই দেখতে পেল রায়হানের বিষণ্ন চেহারা—মেঝেতে গড়াতে থাকা পানি আর পোড়া কম্পিউটারের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা। তাকে ঘিরে রেখেছে নাফিজসহ আরও দুজন।

'সরি, মাসুদ ভাই,' মন খারাপ করা গলায় বলল রায়হান। 'আমি কিছুই বাঁচাতে পারিনি। সব গেছে!'

'কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কীভাবে?' রানা নিজেও হতবাক হয়ে গেছে। 'যেভাবে সব ফাটতে শুরু করল...শর্ট সার্কিট ছাড়া সম্ভব না। এই বিল্ডিঙে এ-ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঠেকাবার ব্যবস্থা নেই?'

'আছে, আমি নিজে সবকিছু চেক করে ফ্লোরটার বুকিং দিয়েছি,' নাফিজ জোর গলায় বলল।

'তা হলে কাজ করল না কেন?'

'কারণ এটা কোনও সাধারণ শর্ট সার্কিট ছিল না,' ধীরে ধীরে বলল রায়হান। 'অডিও সিগনালে লুকানো কমাণ্ডটা, মাসুদ ভাই... ওটাই এ-কাণ্ড ঘটিয়েছে। ওটা...ওটা আসলে একটা ভাইরাস। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাইরাস!'

পাঁচ

এক ঘণ্টা পর।

কাঁচঘেরা চেম্বারটায় গম্ভীর হয়ে বসে আছে রানা, টেবিল খালি। স্প্রিঙ্কলারের পানিতে ফাইলপত্র গেছে ভিজে; সেগুলো শুকানোর জন্য নিয়ে গেছে নাফিজের লোকজন, তাই আপাতত কাজ নেই হাতে। নাফিজ গেছে ফায়ার সার্ভিস আর বিল্ডিঙের অন্যান্য ফ্লোরের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে। একা একা বসে থাকতে হচ্ছে সে-কারণে। কোথাও যেতেও ইচ্ছে করছে না। ছোটখাট একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে এখানে; কেন সেটা ঘটল আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতখানি—তা না জেনে নড়তে মন সায় দিচ্ছে না। রায়হানকে কিচ্ছু বলেনি ও, কৈফিয়তও শুনতে চায়নি, শুধু বাকি সবার মত ড্যামেজ রিপোর্ট দিতে বলেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সেই থেকে চেম্বারে বসে আছে রানা, চোখের পলকে যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা নিয়ে ভাবছে। কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না, প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন প্রশ্ন এসে জমা হচ্ছে মনের ভিতর।

রায়হান বলল, কাণ্ডটা ঘটিয়েছে একটা কম্পিউটার ভাইরাস, কিন্তু ওর জানাশোনা কোনও ভাইরাসের সঙ্গে এর মিল পাচ্ছে না। ভাইরাস জিনিসটা কম্পিউটারের ফাইল নষ্ট করে, বড়জোর অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষতিসাধন করে—এর বেশি কিছু না; শর্ট সার্কিট ঘটিয়ে একই সময়ে দশটা কম্পিউটার পুড়িয়ে দেয় না। যত কিছুই হোক, ভাইরাস হলো একটা সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম—সেটা দিয়ে এ-ধরনের ফিজিক্যাল ক্ষতি কীভাবে করা সম্ভব?

গোলমালটা শুধু এখানে নয়, ভাইরাসটার উৎসের ব্যাপারটা আরও বেশি ভাবাচ্ছে ওকে। নাসার কম্পিউটারে পাওয়া গেছে ওটা, ডিপ স্পেস প্রোবে রিসিভ করা একটা বহির্বিশ্বের সিগনালের ভিতরে। রায়হানের ধারণা ওটা ভাঁওতাবাজি নয়, সত্যিই সৌরজগতের বাইরে থেকে এসেছে সিগনালটা। তার মানে কি ভাইরাসটা ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের তৈরি? সেজন্যেই এতটা ক্ষতি করতে পেরেছে? কিন্তু কেন তারা এমন একটা ভাইরাস পৃথিবীতে পাঠাতে যাবে? মতলবটা কী? পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে? এটা কি তবে গ্রহান্তরের আগ্রাসনের পূর্ব-সঙ্কেত?

হেসে ফেলল রানা। কী সব ভাবছে! এটা কোনও সায়েন্স ফিকশনের গল্প নয়, রূঢ় বাস্তব। ভিনগ্রহবাসীরা নয়, কুকীর্তিটা করেছে পৃথিবীরই কোনও দু'পেয়ে জীব—এ ব্যাপারে ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই। কীভাবে কাজটা সারা হয়েছে, সেটাই প্রশ্ন। কম্পিউটার ভাইরাস জিনিসটা মানুষের আবিষ্কার, আর সেটা ছড়িয়ে মজা পায়, এমন দুষ্ট প্রোগ্রামার আর হ্যাকারের কোনও অভাব নেই দুনিয়ায়। বিশেষ করে ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট হবার সময় স্ক্রিনে ভেসে ওঠা ইউ আর ডুমড্

boighar.com

আর সিনেমার ভিলেনের খনখনে হাসি অল্পবয়েসী হ্যাকারদের রসিকতা হিসেবেই বেশি মানানসই, ভিনগ্রহবাসীদের নয়। এসব দুষ্ট হ্যাকারদের কারণে গত পনেরো বছরে কম্পিউটার জগৎ বেশ কয়েকবার বড় ধরনের ভাইরাস-আক্রমণের শিকার হয়েছে। এসবের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, স্রেফ মজা করার জন্য ছড়ানো হয়েছিল ভাইরাস। এটাও সম্ভবত তেমন কিছু।

তবে এবারকার ক্ষয়ক্ষতির সীমা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে—ধ্বংসযজ্ঞটা দেখার পর তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। সৌভাগ্যক্রমে রায়হানের মত কৌতূহলী এবং দক্ষ একজন কম্পিউটার-বিশারদ হাতের কাছে থাকায় ব্যাপারটা আগেই টের পাওয়া গেছে। চারদিনের মত সময় পাওয়া গেছে, এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে।

মাঝখান থেকে রানা এজেন্সির দশটা কম্পিউটার নষ্ট হলো আর কী! রায়হানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, রানা চাপাচাপি করাতেই ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট করেছিল ও। নইলে হয়তো সময় পেলে গবেষণা করে প্রোগ্রামটার আসল উদ্দেশ্য বের করে ফেলতে পারত ছেলেটা, সেই কোডব্রেকার লোকটাকেও খুঁজে নিয়ে আসা যেত।

দরজায় শব্দ হতেই চিন্তায় ছেদ পড়ল। রায়হান উঁকি দিচ্ছে। 'আসতে পারি?' অনুমতি চাইল সে।

'এসো।'

মুখোমুখি এসে বসল তরুণ হ্যাকার, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, যেন ঝড় বয়ে গেছে। তারপরও ওর মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ করা গেল। বলল, 'ডি-ব্রিফিঙের জন্য আমি তৈরি, মাসুদ ভাই।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

'আমার পার্সোনাল ল্যাপটপটা ব্যবহার করেছি, তাই তাড়াতাড়ি হলো। ভাগ্যক্রমে ওটা নেটওয়ার্কে কানেক্টেড ছিল না, বেঁচে গেছে।'

'হুঁ। কী জানতে পারলে?'

'ভাইরাসই ওটা। ইউনিক...ওয়ান অভ আ কাইণ্ড। অত্যন্ত শক্তিশালী।'

'কিন্তু একটা ভাইরাসের পক্ষে কীভাবে কম্পিউটার পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব?'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন। সফটওয়্যার দিয়ে হার্ডওয়্যারের ক্ষতি করা যায় না...সাধারণত। তবে ব্যাপারটা যে পুরোপুরি সত্যি নয়, সেটার প্রমাণ ১৯৯৯ সালে পাওয়া গেছে। সিআইএইচ ভাইরাসের নাম শুনে থাকবেন হয়তো, ২৫শে এপ্রিল তারিখে সারা পৃথিবী জুড়ে আঘাত হেনেছিল ওটা। সেবারই প্রথম জানা গেল, সফটওয়্যার দিয়ে হার্ডওয়্যারের ক্ষতি করা যায়। তবে সিআইএইচ শুধু মাদারবোর্ডের ইন্টারনাল মেমোরি ধ্বংস করে দিতে পারত।'

'আর আজ যেটা দেখলাম?'

'সিআইএইচের চেয়ে কয়েক গুণ উন্নত এটা। কীভাবে করেছে জানি না, তবে সিপিইউ-র ভিতরে যত সার্কিট আছে, সবগুলোর ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স বাইপাস করে দিয়েছে এটা, ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয়েছে ওগুলোর মধ্য দিয়ে, পুড়ে গেছে সেজন্যই।'

'এটা কি আদৌ সম্ভব?' রানার খটকা লাগছে।

'থিয়োরিটিক্যালি...হ্যাঁ। তবে বাস্তবে পারা যাবে কি না, সন্দেহ আছে। ব্যাপারটা অনেকটা টাইম-ট্র্যাভেলের মত, তাত্ত্বিকভাবে করা যায়, কিন্তু সত্যি সত্যি করা সম্ভব নয়। এই রকম শক্তিশালী কমাণ্ড তৈরির মত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখনও আবিষ্কার হয়নি। এটা আমাদের চেয়ে কয়েক জেনারেশন উন্নত প্রযুক্তি।'

পুরনো ভাবনাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রানার ভিতরে। 'তুমি বলতে চাইছ—এটা একটা অ্যালিয়েন টেকনোলজি?'

'উঁহুঁ, তা-ও বলছি না,' রায়হান মাথা নাড়ল। 'এতক্ষণ যেটা বললাম, তা হলো অফিশিয়াল ভার্শান। আনঅফিশিয়ালি জেনে রাখুন—শক্তিশালী ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সত্যিই আবিষ্কার হয়েছে, তবে সেটার প্রমাণ নেই কোথাও।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কিছু একটা চেপে যাচ্ছ তুমি আমার কাছে।'

'তা হলে আপনাকে একটা গল্প শুনতে হবে। ব্যাপারটা একটা কিংবদন্তি...আমাদের কম্পিউটার জগতের আর্বান লেজেণ্ড বলতে পারেন। আজ থেকে পনেরো-বিশ বছর আগে...সঠিক সময়টা বলতে পারব না...দশজন অসম্ভব প্রতিভাবান কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ মিলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার কোড তৈরি করেন। সাধারণত কম্পিউটারের মৌলিক ভাষাটা হলো বাইনারি কোডের—কী-বোর্ড বা মাউসে আমরা যা-ই করি না কেন, কম্পিউটার সেটাকে নিজের মৌলিক ভাষায় এক আর শূন্যতে অনুবাদ করে নেয়। এই দুটো সংখ্যার নানা রকম ভেরিয়েশন দিয়েই সে প্রতিটা কমাণ্ড বোঝে। কিন্তু আমাদের সেই বিজ্ঞানীরা যে কোডটা বানালেন, সেটা আরও মৌলিক—শূন্যের কোনও স্থান নেই তাতে, শুধু *এক* আছে—ওটা ছিল একটা সিঙ্গুলার কোড।'

বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এক মিনিট...শুধু একটা সংখ্যা দিয়ে কীভাবে পুরো কোড বানানো সম্ভব হলো? অন্তত দুটো এলিমেন্ট না থাকলে তো কোনও পারমিউটেশন বা কম্বিনেশন করা যায় না।'

'একটা সংখ্যা দিয়েই সেটা সম্ভব করলেন তাঁরা। এককেবার সংখ্যাটার স্থায়িত্বের কমবেশি আর ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ দিয়ে ভেরিয়েশন আনা হলো—পদ্ধতিটা খুব জটিল, আমি ঠিকমত বোঝাতে পারব না।'

'ঠিক আছে। তারপর কী ঘটল—সেটা বলো।'

'যা হবার তা-ই,' রায়হান আবার খেই ধরল। 'ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মৌলিক কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে পরিণত হলো। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? পরিচিত বাইনারি কোডের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত ওটা, একটা মাত্র সংখ্যা নিয়ে কাজ করে। বাইনারি কোডে তৈরি যে কোনও সিস্টেম ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, প্রচলিত সমস্ত প্রোগ্রামই ওটার সামনে ঠুনকো কাঁচের মত। ছোটখাট দু-এক জায়গায় এই নতুন কোডটার প্রয়োগ ঘটিয়েই থেমে গেলেন আমাদের সেই দশ জিনিয়াস।'

'কেন?' রানা জানতে চাইল।

'হাজারটা জটিলতার কারণে। ওই সময়ের সামগ্রিক কাঠামোয় বাইনারি কোডকে এটা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব ছিল না...কে জানে, হয়তো এখনও

boighar.com

নয়। আমাদের পুরো কম্পিউটার জগৎটা শুরু থেকে গড়ে উঠেছে বাইনারি কোডের উপর ভিত্তি করে। এটাকে সমূলে একটা নতুন কোড দিয়ে রিপ্লেস করতে গেলে পুরো প্রযুক্তিটাই একেবারে গোড়া থেকে ঝাঁকি খাবে। এতদিন ধরে এই ফিল্ডে যত আবিষ্কার আর অগ্রগতি হয়েছে, সেগুলোকে নতুন এই ভাষায় ট্রান্সফার করা, পুরো দুনিয়াকে নতুন কোডটা শেখানো—সব মিলিয়ে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। আর এই সিঙ্গুলার কোডটাও এত জটিল যে, সেটা শেখানো আর তাতে সবাইকে অভ্যস্ত করে তুলতে দীর্ঘ একটা সময় ব্যয় হয়ে যাবে। অন্তবর্তী সময়টাতে কম্পিউটার-বিজ্ঞানে হয়তো নতুন কোনও আবিষ্কারও আর করা যাবে না, কারণ ভাষাটায় অভ্যস্ত না হলে বিজ্ঞানীরাও তা নিয়ে কাজ করতে পারবেন না।'

'তাই বলে এত উন্নত একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে হবে?'

'ঠিক ফেলে দেয়া হয়নি, মাসুদ ভাই,' রায়হান বলল। 'সেই দশ জিনিয়াস ঠিক করলেন—এটা এখুনি চালু করার সময় হয়নি। বিস্তর গবেষণা আর ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন আছে, যাতে কোডটাকে আরও সহজ করে তোলা যায়...একটা ব্যাকরণ জাতীয় কিছু প্রণয়ন করা যায়, যাতে মানুষ সহজে ওটা শিখতে পারে। সেই সঙ্গে তাঁরা একটা প্রসেস বের করার চেষ্টা চালালেন, যাতে এতদিনের বাইনারি-বেসড কম্পিউটার-জগৎটাকে খুব সহজে এবং কম সময়ে সিঙ্গুলার কোডে ট্রান্সফার করা যায়। বলে রাখা ভাল, আজ পর্যন্ত সফল হননি তাঁরা।'

'হুঁ, মাত্র দশজনে এত বড় কাজ করতে চাইলে তো এই অবস্থা হবেই। কিন্তু এত রাখঢাকের কারণ কী—তা-ই বুঝতে পারছি না। ওঁরা বিষয়টা প্রকাশ করে দুনিয়ার তাবৎ কম্পিউটার-বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিলেন না কেন?'

'সিঙ্গুলার কোডটার অবিশ্বাস্য ক্ষমতার কারণে। ব্যাপারটা আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না? যতক্ষণ না পুরো দুনিয়াকে আপনি এই কোডের আওতায় আনতে না পারছেন, ততক্ষণ ওটা স্রেফ একটা অস্ত্র ছাড়া আর কিছু না। হ্যাকারদের হাতে পড়লে সাইবার-সিকিউরিটি বলতে আর কিছু থাকবে না। বাইনারি কোডে যতই নিরাপত্তা খাড়া করুন, সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া যাবে। ব্যাংক, বীমা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কম্পিউটারাইজড্ ডিফেন্স সিস্টেম পর্যন্ত অসহায় শিকারে পরিণত হবে। এসব ভেবে তাঁরা একটা প্রতিজ্ঞা করলেন—যতদিন না তাঁদের গবেষণা সফল হচ্ছে, ততদিন আর কাউকে কোডটা শেখাবেন না তাঁরা, ওটার কথা কাউকে জানতেও দেবেন না। প্রতিজ্ঞাটা তাঁরা রাখলেন ঠিকই, কিন্তু শুরুতে করা ছোটখাট পরীক্ষাগুলোর কারণে সিঙ্গুলার কোড আবিষ্কারের ঘটনাটা চাপা রইল না, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল কম্পিউটার-জগতে। কোডটার একটা নামও দেয়া হলো—ইউনোকোড। স্প্যানিশ ভাষায় *উনো* মানে এক, লেখা হয় হয় ইউ-এন-ও দিয়ে...ওখান থেকেই এসেছে নামটা। সেই দশ স্রষ্টাকে লোকে ইউনো বলে ডাকতে শুরু করল। তবে ওই পর্যন্তই। সেই দশজন ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কেউ ইউনোকোড শিখতে পারেনি, এমনকী তাদের পরিচয়ও কেউ জানে না। একটা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন ইউনোরা, আমরা

মনে করি—তাঁরা সাইবার জগতের ঈশ্বর, তাঁদের মত দক্ষ এবং শক্তিশালী প্রোগ্রামার পৃথিবীতে আর কেউ নেই।'

লম্বা গল্পটা শেষ করে দম নেয়ার জন্য থামল রায়হান।

রানা প্রশ্ন করল, 'আমাদের বর্তমান সমস্যাটার সঙ্গে তোমার এই ইউনোকোডের সম্পর্ক কী?'

'ভাইরাসটা...ওটা ইউনোকোডে তৈরি,' বলল রায়হান। 'সে-কারণেই এত শক্তিশালী। কীভাবে দশ-দশটা কম্পিউটার ধ্বংস করে দিল, দেখলেন না? ভাগ্যিস, নতুন করে সেটআপের কাজ চলছে বলে আমরা বাইরের কোনও নেটওয়ার্কে যুক্ত ছিলাম না। নইলে ওটার সঙ্গে সংযুক্ত যত কম্পিউটার পেত, সব শেষ করে দিত। আর যদি ইন্টারনেটের সার্ভার কম্পিউটারগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে তো কথাই নেই। চোখের পলকে গোটা পৃথিবীর নব্বুই ভাগ কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'কী বলছ! এতই শক্তিশালী? কোনও রকম সিকিউরিটি দিয়ে ঠেকানো যায় না?'

'যাবে, যদি সেই সিস্টেমটাও ইউনোকোডে তৈরি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন জিনিস আমাদের কারও হাতে নেই।' www.boighar.com

রানা বাঁকা চোখে তাকাল। 'তুমি এখনও সব খোলাসা করছ না। ইউনোকোডটা যদি এতই গোপন একটা ব্যাপার হয়ে থাকে, তা হলে তুমি ওটা সম্পর্কে এতকিছু জানলে কেমন করে? দেখামাত্র চিনলেই বা কীভাবে? একজন লোক কোডটা ভাঙতে পারবে বলেছিলে...সে কে? একজন ইউনো?'

'জী, মাসুদ ভাই,' ইতস্তত করে বলল রায়হান। 'আমি একজন ইউনোকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর নাম ড. স্ট্যানলি ডোনেন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে আমার শিক্ষক ছিলেন। এতক্ষণ যা বললাম, সব ওঁর কাছেই শোনা। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন, পছন্দ করতেন, আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর। তিনি যে একজন ইউনো, সেটা ঘটনাক্রমে জেনে ফেলি আমি, কোডটা শেখার জন্য তাঁর পিছনে লেগে যাই। শেষ পর্যন্ত আমাকে ইউনোকোডের মৌলিক কয়েকটা ব্যাপার শিখিয়েছেন তিনি, তবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখাতে রাজি হননি। প্রতিজ্ঞায় অটল তিনি, যতদিন না সব সমস্যা মিটিয়ে আনতে পারছেন, ততদিন কাউকে ইউনোকোডে প্রোগ্রামিং শেখাবেন না। আমার কাছ থেকেও কথা আদায় করে নিয়েছেন, কাউকে যেন তাঁর পরিচয় না জানাই। এখন নেহায়েত এত বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বলেই বললাম, নইলে আপনাকেও ব্যাপারটা জানাতাম না।'

'বিশাল সমস্যা তো বটেই,' রানা বলল। 'সিগনালটা নাসার কম্পিউটারে আছে, সেখান থেকে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'বেশ ভাল সম্ভাবনা আছে,' রায়হান স্বীকার করল।

'সর্বনাশ! তা হলে তো মোটামুটি একটা প্রলয় ঘটতে যাচ্ছে। কী করা যায়? ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট হবার সময়টায় কম্পিউটার অফ রাখলে হয় না?'

'উঁহুঁ, ডেডলাইন পেরুনোর পর ওটা সচল হয়ে ওঠে। নব্বুই ঘণ্টা পার হবার

boighar.com

পর যখনই কম্পিউটার অন করা হোক, তখনই ওটা হামলা চালাবে। তা ছাড়া কতগুলো কম্পিউটারে ভাইরাসটার কপি ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে, তা জানি না আমরা; যদি স্পেসিফিক্যালি ওই কম্পিউটারগুলো বন্ধ রাখা যেত, তা হলে একটা কথা ছিল... নইলে একসঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার বন্ধ করে দিতে হবে। সেটা কি সম্ভব? ভুলক্রমে একটাও যদি অন থাকে, তা হলেই সব শেষ। ইন্টারনেটে সংযুক্ত সব কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'বুঝতে পারছি,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'প্রলয় বলছি সেজন্যেই। সব কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানে তো পৃথিবীকে ঠেলে প্রস্তরযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া!'

'সেটা বোধহয় হবে না,' রায়হান দ্বিমত পোষণ করল। 'আমেরিকাসহ পৃথিবীর যত দেশ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে, তারা কখনও নিজেদের সিস্টেমকে সরাসরি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটে যুক্ত করে না, তা ছাড়া ব্যাকআপও থাকে। ইউনোকোড যতই শক্তিশালী হোক, বাতাসে তো আর ভাসতে পারে না। এ-ধরনের বিচ্ছিন্ন একটা নেটওয়ার্কে ঢুকতে গেলে ওটাকে একটা প্রবেশপথ পেতেই হবে।'

'তারমানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি নিরাপদ বলতে চাইছ?'

'হুঁ, তবে তাতে বিশেষ কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পুরো পৃথিবীর অর্থনীতি এখন চলে কম্পিউটার দিয়ে। ভাইরাসের আঘাতে সেসবের আর অস্তিত্ব থাকবে না। অর্থনীতি ভেঙে পড়লে শুধু প্রতিরক্ষা দিয়ে আর কী লাভ হবে?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে রানা। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ায় চমকে উঠল। বলল, 'প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও নিরাপদ নয়, রায়হান। কী বলেছিলে, ভুলে গেছ? অডিও-সিগনালটা রিসার্চের দায়িত্ব নিয়েছে আমেরিকান এয়ারফোর্স, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের টপ-সিক্রেট কম্পিউটারে ওটার অ্যানালিসিস চলছে! হ্যাকিং করে যত দেশ ওটা সংগ্রহ করেছে, সবাই নিশ্চয়ই একই কাজ করছে। তারমানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে ঢুকে পড়েছে ওটা!'

'তাই তো! ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল রায়হান। 'সেজন্যই... সেজন্যই ওটাকে ভিনগ্রহবাসীদের সিগনালের মত করে ছাড়া হয়েছে! যে ছেড়েছে, সে জানে—এমন একটা জিনিস শুধু টপ সিক্রেট কম্পিউটারেই অ্যানালিসিস করা হবে!'

'কিন্তু নাসা ধাপ্পাটা ধরতে পারল না কেন?'

'ইউনোকোড...মাসুদ ভাই। ওটা দিয়ে করা হয়েছে কাজটা, *ভয়েজার-টু* প্রোবের ট্রান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করে পাঠানো হয়েছে সিগনালটা। এই ধরনের হ্যাকিং ডিটেক্ট করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'তারমানে এই ভাইরাসের পিছনে একজন ইউনো জড়িত আছে, এই তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা রীতিমত অস্বাভাবিক ঠেকছে আমার কাছে,' রায়হান মাথা চুলকাল। 'ইউনোরা এমনি এমনি ঈশ্বর খেতাব পাননি, তাঁদের কর্মকাণ্ডও এর পিছনে ভূমিকা রেখেছিল। পৃথিবীর সত্যিকার মঙ্গল চান তাঁরা, সেজন্যই ইউনোকোডকে বাইরের লোকের হাতে পড়তে দেননি। আজ এত বছর পর হঠাৎ

একটা ভাইরাস বানিয়ে ছাড়তে যাবেন কেন—এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়,' বলল রানা। 'ভালমানুষেরা হঠাৎ খেপে গেলে কী ঘটে, তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। নিশিকাওয়া ফাকুদা নামে এক জাপানি বিজ্ঞানীকে চিনি আমি, অসম্ভব প্রতিভাবান আর নিতান্ত ভালমানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু বছরখানেক আগে সব হারানোর বেদনায় রেগে গিয়ে সাগরের পানিতে সর্পলতা নামে এক জিনিস ছেড়ে দিয়ে পুরো পৃথিবীটাই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন প্রায়।'

'আপনিই তো ঠেকিয়েছিলেন তাঁকে, তাই না? ঘটনাটা আমি শুনেছি। ভাবছেন এখানেও তেমন কিছু ঘটেছে? ইউনোদের কেউ একজন খেপে গিয়ে সাইবার-বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে?'

'ভাইরাসটা যেহেতু ওই দশজন ছাড়া আর কেউ তৈরি করতে পারে না, সেক্ষেত্রে এই একটা ব্যাখ্যাই থাকে।'

'আমার কেন জানি বিশ্বাস হচ্ছে না,' রায়হানের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায়-আসে না,' রানা জোর দিয়ে বলল। 'সমস্যাটা খুবই গুরুতর, আমাদের কিছু একটা করতে হবে।'

'ইউনোকোডের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদের একজন ইউনো লাগবে, মাসুদ ভাই।'

'ঠিক বলেছ। তোমার ওই টিচার...ড. ডোনেন...তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে না?'

'হয়তো যাবে। কিন্তু তাঁকে পাচ্ছি কোথায়? আমি আমেরিকায় পৌঁছেই স্যারকে ফোন করেছিলাম, পাইনি। ভার্সিটি থেকে বলল, দু'মাস আগেই নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। স্যার বিপত্নীক, ছেলেমেয়ে নেই, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও তেমন একটা মেশেন না। তাই কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারছে না।'

'ইচ্ছে করে গায়েব হয়ে গেছেন?' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'ভদ্রলোক নিজেই এই ভাইরাসটা ছড়াননি তো?'

'অসম্ভব!' রায়হান দৃঢ় গলায় প্রতিবাদ করল। 'স্যারকে আমি খুব ভাল করে চিনি। তিনি আর যা-ই হোন, পৃথিবী ধ্বংস করে দেবার মত উন্মাদ নন।'

'এখুনি মন্তব্য করা ঠিক হবে না,' রানা শান্তস্বরে বলল। 'আগে ওঁকে খুঁজে তো বের করি!' ইন্টারকমের রিসিভার তুলে বোতাম টিপল ও। 'নাফিজ, ড. স্ট্যানলি ডোনেন নামে এক ভদ্রলোককে লোকেট করতে হবে—তিনি প্রিন্সটনের কম্পিউটার সায়েন্সে অধ্যাপনা করতেন। যেখানে যত সোর্স আছে, সব কাজে লাগাও। এটা একটা ইমার্জেন্সি।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' ওপাশ থেকে বলল নাফিজ।

রিসিভার নামাতেই রায়হান জানতে চাইল, 'আমরা এখন কী করব? চুপচাপ বসে থাকব?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে। দেখি, বিসিআই থেকে একটা জেনারেল অ্যালার্ট প্রচার করা যায় কি না।'

'শুধু অ্যালার্ট প্রচার করে লাভ হবে না,' রায়হান বলল। 'আমাদেরকে একটা

boighar.com

বিহিতও বের করতে হবে। লোকজনকে আর কতদিন কম্পিউটার বন্ধ করিয়ে রাখবেন!'

'অন্তত প্রাথমিক বিপর্যয়টা তো এড়ানো যাবে।'

'তা-ও যাবে না। এইমাত্র মনে পড়ল, গত বছর দু-দু'বার ইউনো-ভাইরাস আক্রমণ চালাবে বলে গুজব রটেছিল। শেষ পর্যন্ত কিচ্ছু ঘটেনি। আমরা অ্যালার্ট প্রচার করলে সেটাকেও গুজবই ভাববে লোকে।'

'কে ছড়িয়েছিল ওই গুজব?'

'কেউ জানে না। কেন ছড়াল, তা-ও জানা যায়নি।'

'হুঁ, মূল আক্রমণটার স্টেজিং হিসেবে ছড়ানো হয়নি তো? যাতে এবার সত্যিকার অ্যালার্টেও লোকে গুরুত্ব না দেয়?'

'অসম্ভব কিছু নয়। কারণ শুধু মুখের কথা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই আমাদের কাছে। এটুকুতে দুনিয়ার সমস্ত দেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের কমপিউটার নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেবে? কক্ষনো না। তারা চাক্ষুষ প্রমাণ চাইবে। প্রমাণ দেখানো সহজ নয়, আলাদা একটা সাব-প্রোগ্রাম লাগে, দেখলেনই তো!'

'ওটা তুমি তৈরি করে দিলে, তারপর আমরা বিলি করলাম—এমনটা করা যায় না? তা হলে তো সবাই নিজেরাই চেক করে নিতে পারবে।'

'এত সোজা না, মাসুদ ভাই। আমাদেরটা ছোট নেটওয়ার্ক ছিল, তা ছাড়া ওটার সমস্ত খুঁটিনাটি আমি জানতাম, তাই সাব-প্রোগ্রাম বানাতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু যেসব জায়গায় ওটা বিলি করবেন, তাদের নেটওয়ার্ক আর সিকিউরিটি সিস্টেম আলাদা আলাদা রকম হবে। কমন একটা প্রোগ্রাম দিয়ে সব ধরনের সিস্টেমের ইন্টারনাল ক্লক এগিয়ে দেয়া যাবে না।'

'তুমি যদি গাইডলাইন দিয়ে দাও, যার যার নিজস্ব প্রোগ্রামাররা কাজটা করে নিতে পারবে না?'

'প্রোগ্রামটা হয়তো বানাতে পারবে, কিন্তু ইউনো-ভাইরাসের সাথে ব্রিজ করতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজটা খুব জটিল, ইউনোকোড সম্পর্কে আমি কিছুটা জানি বলে পেরেছি, অন্যেরা এই সুবিধেটা পাবে না।'

'কী! তারমানে তোমাকেই সবখানে গিয়ে কাজটা করে দিয়ে আসতে হবে? আমাদের হাতে এত সময় কোথায়?'

'বললামই তো, এটা একটা বিরাট সমস্যা। শুধুমাত্র অ্যান্টি-ভাইরাস দিয়ে এটার সমাধান করা যেতে পারে—ইউনোকোডের তৈরি অ্যান্টি-ভাইরাস।'

'তারমানে ড. ডোনেন। আপাতত তাঁকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না আমরা, যে এ-কাজ করতে পারে।'

'ঠিক ধরেছেন,' রায়হান একমত হলো।

'কিন্তু তাঁকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তো আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। অন্তত আমেরিকানদের জানাতেই হবে। ওরা কী চিজ জানোই তো! নাইন-ইলেভেনের পর কীভাবে খেপে উঠল, দেখোনি? এবারের ঘটনাটা ঘটলে প্রতিশোধ নিতে আরও ক'টা যে মুসলিম দেশ ছারখার করে দেবে, খোদাই জানে!'

'ব্যাপারটা জানাবেন কাকে? সিআইএ-কে?'

'হুঁ। রেডি হও, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। ওদেরকে হাতে-কলমে ভাইরাসটার কীর্তি দেখিয়ে দিয়ে আসতে হবে।'

'আমরা কি ল্যাংলিতে যাব—ওদের হেডকোয়ার্টারে?'

'নাহ্, অত সময় নেই হাতে। লস অ্যাঞ্জেলেসে ওদের ব্রাঞ্চ আছে, ওখানেই দেখিয়ে দিয়ে আসব। বাকিটা ওরাই করে নিতে পারবে—যেখানে যেখানে জানাবার দরকার, জানাবে।'

'আমি তা হলে সিডিতে ভাইরাসটার কপি নিয়ে আসি। এখানে ওদের কাছে ওটা না-ও থাকতে পারে।'

'তুমিই বা পাচ্ছ কোথায়?'

'ল্যাপটপে তুলে রেখেছিলাম, অফিস থেকে ফিরেও রিসার্চ করব বলে।'

'যাও তা হলে। আমি এই ফাঁকে ঢাকায় কথা বলি।'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল রায়হান। রানা পাশ থেকে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে ঘড়ি দেখল। বাংলাদেশে এখন রাত সাড়ে ন'টার মত বাজে। চিফ কি অফিসে, না বাসায়? রাহাত খান অবশ্য বেশ রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ করেন, নাফিজকে তাই প্রথমে স্পেশাল সেলফোনের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারেই যোগাযোগ করবার নির্দেশ দিল ও। কপাল ভাল, ইলোরা রিসিভ করল কলটা, তারমানে চিফ এখনও অফিসেই আছেন। কুশল বিনিময়ের সময় নেই, তাই তাড়াতাড়ি বসকে লাইনটা দিতে বলল ও। কয়েক সেকেণ্ড খুটখাটের পর ওপাশ থেকে ভেসে এল গুরুগম্ভীর কণ্ঠ।

'ইয়েস, এমআরনাইন! অসময়ে হঠাৎ কী মনে করে?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, স্পটলাইটের আলোয় টেবিলের মাঝখানটা কেবল আলোকিত। চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনওরকমে নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে বলল, 'বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত, স্যর। তবে বিশাল একটা ক্রাইসিস দেখা দিতে যাচ্ছে আগামী চারদিনের মধ্যে...।' যতটা পারে, গুছিয়ে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল রানা।

সবটা শোনার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন রাহাত খান। শেষে বললেন, 'তুমি শিয়োর?'

'জী স্যর। ভাইরাসটার ক্ষমতা নিজ চোখে দেখেছি আমি।'

'এটা তো মারাত্মক একটা ক্রাইসিস তা হলে,' বললেন রাহাত খান, গলার স্বরে উদ্বেগটা চাপা রইল না। 'কীভাবে সমাধান করা যায়, কিছু ভেবেছ?'

'একজন ইউনোকে দিয়ে একটা অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করাতে হবে,' রানা বলল। 'আমরা একটা জেনারেল অ্যালার্টও ঘোষণা করতে পারি, তবে তাতে খুব একটা উপকার হবে বলে মনে হয় না।' রায়হানের যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করল ও।

'বুঝতে পেরেছি, তাই বলে তো বসে থাকা যায় না,' রাহাত খান বললেন।

boighar.com

'আমি অ্যালার্ট ঘোষণার ব্যবস্থা করছি, মানুষ অন্তত জানুক ব্যাপারটা।'

'জী স্যর। আর আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে সিআইএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়ে আসতে চাই।'

'অবশ্যই। ওদের তো জানাতেই হবে। তবে ভাল হত যদি জর্জের মাধ্যমে এগোতে পারতে,' নুমার চিফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা বলছেন রাহাত খান। 'এমন একটা সময়ে ওর হার্ট অ্যাটাক হলো...! যাক, গো অ্যাহেড, এমআরনাইন। আমেরিকানদের ব্যাপারটা জানাবার পর আমি চাই, যে ভাবে হোক, অ্যান্টিভাইরাসটা জোগাড়ের চেষ্টা করবে তুমি। তা ছাড়া কে এই ভাইরাস ছড়াল, তা-ও বের করো। দিস ইজ ভেরি সিরিয়াস প্রব্লেম। ঠেকানো না গেলে সারা পৃথিবীর পাশাপাশি আমাদের দেশও বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত না হলেও অর্থনীতি, ব্যাংকিং সিস্টেম আর শিক্ষা-দীক্ষার উপর ভয়ানক আঘাত আসবে। থামাও ওটাকে!'

'ইয়েস, স্যর!' বিশ্বস্ত সৈনিকের মত জবাব দিল রানা।

'রায়হান এই পরিস্থিতিতে একটা অ্যাসেট আমাদের জন্য, ওকে কাজে লাগাও। আর হ্যাঁ, সাবধানে থেকো। পুরো ষড়যন্ত্রটার পিছনে যে-ই থাকুক, সে নিশ্চয়ই তোমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করবে।'

'আমি চোখ-কান খোলা রাখব, স্যর।'

'বেস্ট অভ লাক, এমআরনাইন।' লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

ছয়

হার্বার ফ্রিওয়ে ধরে উইলশায়ার অ্যাভিনিউ থেকে ডাউনটাউনের বাঙ্কার হিল মাত্র বিশ মিনিটের পথ—ওখানেই ফেডারেল বিল্ডিঙের পনেরো তলায় সি.আই.এ-র লোকাল ব্যুরো অফিস। কিন্তু সকালবেলার রাশ আওয়ারের কারণে পাক্কা পৌনে এক ঘণ্টা লেগে গেল সামান্য পথটুকু পাড়ি দিতে। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেস, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সিটিগুলোর একটা; প্রায় তেরো মিলিয়ন মানুষ বাস করে এখানে। সকালে যখন এই বিপুল জনসংখ্যার বড় একটা অংশ কর্মক্ষেত্রে যেতে শুরু করে, তখন রাস্তাঘাটে দেখা দেয় তীব্র যানজট। উনিশটা ফ্রিওয়ে আর আণ্ডারগ্রাউণ্ড সাবওয়ে সিস্টেম থাকবার পরও পরিস্থিতিটার খুব একটা উন্নতি হয়েছে বলা চলে না। অবস্থা দেখে মনে মনে হাসল রানা, ট্রাফিক জ্যাম শুধু বাংলাদেশ নয়, অ্যামেরিকাতেও আছে।

হাসিটুকু অবশ্য ক্ষণিকের, মাথা থেকে উদ্বেগটা তাড়াতে পারছে না ও, সময় কমে আসছে প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে, ভিতরে ভিতরে তাড়া অনুভব করছে তাই। ড. স্ট্যানলি ডোনেনের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও, কত সময় প্রয়োজন হবে, বলা যাচ্ছে না। অবশ্য সি.আই.এ-কে সমস্যাটার গুরুত্ব বোঝাতে পারলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে। ওদের সার্চ করার টেকনিক অনেক আধুনিক, বড় বড় বিভিন্ন

ডেটাবেজের সাহায্যও নিতে পারে অনায়াসে।

যানজটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর লস অ্যাঞ্জেলেসের ফেডারেল কমপ্লেক্সে পৌঁছুল রানা ও রায়হান। পাশাপাশি পঞ্চাশ ফুট ব্যবধানে যমজ ডিজাইনের বিশতলা-উঁচু দুই টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে ওখানে—ফেডারেল বিল্ডিং, লস অ্যাঞ্জেলেসের বেশিরভাগ সরকারি ডিপার্টমেন্টের অফিস ঠাঁই পেয়েছে টাওয়ারদুটোয়।

গাড়িটা আন্ডারগ্রাউন্ডে পার্ক করে এক্সপ্রেস এলিভেটরে পনেরো তলায় উঠে এল ওরা। চওড়া করিডর ধরে একটু এগোতেই চোখে পড়ল কাঁচের পাল্লাঅলা বড় দরজা, তাতে সি.আই.এ-র মনোগ্রাম বসানো। তলায় লেখা: *লস অ্যাঞ্জেলেস ব্যুরো।* সুটপরা দুজন এজেন্ট রয়েছে পাহারায়, কোটের বগলের নীচটা সামান্য ফুলে আছে—সশস্ত্র এরা। এগিয়ে যেতেই পথরোধ করল লোকদুটো।

'আই.ডি, প্লিজ!'

নিজের পরিচয় দিল রানা, পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে দেখাল।

'মিস্টার মাসুদ রানা, ডিরেক্টর, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি,' কার্ডটা জোরে জোরে পড়ল প্রথম লোকটা, তারপর মুখ তুলে তাকাল। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, স্যর?'

'আপনাদের ব্যুরো চিফের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ব্যাপারটা জরুরি।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'আমি রওনা হবার পর অফিস থেকে ফোন করে দেবার কথা, দিয়েছে নিশ্চয়ই।'

'শুধু ফোন করলেই হবে? অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন কি না, সেটা শিয়োর হয়ে আসা উচিত ছিল।'

'দেখুন, ব্যাপারটা খুব জরুরি,' রায়হান বলল। 'এতসব ফর্মালিটির সময় পাইনি আমরা। আপনারা ভিতরে খোঁজ নিয়ে দেখুন, আপনাদের চিফ নিশ্চয়ই খুব আগ্রহ নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মি. মাসুদ রানা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলে কেউ ফিরিয়ে দেয় না।'

'এসব বলে লাভ নেই,' বলল গার্ড। 'অনুমতি ছাড়া ভিতরে ঢুকতে পারবেন না।'

'অনুমতি আছে কি নেই ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন।'

'জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, কেউ আসার কথা থাকলে আমাদের এমনিতেই জানানো হয়।'

'বলতে ভুলে যেতে পারে না?' বলল রানা। 'এক্ষুণি খোঁজ নিন বলছি। ব্যাপারটা খুব জরুরি। আমাদের দেরি করালে কিন্তু পরে আপনাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে—আগেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল দুই গার্ড। শেষে প্রথমজন বলল, 'ঠিক আছে, দাঁড়ান একটু। আমি খোঁজ নিচ্ছি।' দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল সে, ফিরল মিনিট তিনেক পরে।

'সুসংবাদ। আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন স্যর।'

boighar.com

পা বাড়াতে গেল রানা, কিন্তু লোকটা হাত তুলে বলল, 'জাস্ট আ মিনিট, স্যর। অফিসে ঢোকার আগে আপনাদের দেহতল্লাশি করতে হবে আমাদের—সেটাই নিয়ম।'

জ্যাকেটের আড়াল থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে দিল রানা। 'তল্লাশির প্রয়োজন নেই, আমার কাছে শুধু এটাই আছে। রায়হান নিরস্ত্র।'

পিস্তলটা নিল গার্ড। 'আগেই জমা দেয়ায় ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখিত, সার্চ আমাদের করতেই হবে।'

বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল রানা, এদের কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। রায়হানকে কথা শোনার ইশারা করে দুই গার্ডের হাতে নিজেকে সঁপে দিল ও। করিডরের দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করানো হলো দুজনকে, হাত-পা ফাঁক করিয়ে দক্ষ হাতে তল্লাশি চালানো হলো শরীরে। ইউনো-ভাইরাসের সিডি আর দুজনের কাছে মোবাইল ফোন, ওয়ালেট ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না, জানা কথা—যাবার কথাও নয়। তারপরও হাল ছাড়ল না দুই সি.আই.এ. এজেন্ট, বার বার একই জায়গায় খুঁজে দেখছে। সন্দেহ হলো রানার—ইচ্ছে করেই বোধহয় দেরি করছে এরা। কারণটা কী?

'করছটা কী তোমরা, জানতে পারি?' প্রশ্ন করল ও, সম্বোধনটা এক ধাক্কায় আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে এনেছে। এই ফাজিলদুটোকে সম্মান দেখানোর কোনও মানে হয় না। 'ন্যাংটো করেও দেখবে নাকি? আর কত সার্চ করবে?'

কথাটা শুনে বোধহয় টনক নড়ল দুই প্রহরীর, রানা আর রায়হানকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল। হে হে করে অপ্রস্তুত হাসি হেসে একজন বলল, 'কিছু মনে করবেন না, স্যর। মাসুদ রানার কীর্তি-কাহিনি কম শুনিনি তো! কী না কী লুকিয়ে রেখেছেন শরীরে...বলা যায় না। তাই শিয়োর হয়ে নিলাম। ব্যাপারটা পিয়োরলি প্রফেশনাল।'

দেয়ালের দিক থেকে ঘুরে সোজা হলো রানা। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কিছু লুকিয়ে রেখেছি মানে? তোমরা কি ভাবছ, আমি এখানে কোনওরকম হামলা চালাতে এসেছি?'

অপ্রস্তুত দেখাল গার্ডদেরকে। 'না, না...তা বলিনি তো!'

'তা হলে এভাবে সার্চ করার মানেটা কী?'

'খামোকা রাগ করছেন, স্যর,' বলল দ্বিতীয় এজেন্ট। 'আমরা শুধু আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। আসুন আমার সঙ্গে, নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে।'

'আমাদের জিনিসপত্র ফেরত দাও।'

'ওয়ালেটদুটো আপাতত নিতে পারেন। বাকি জিনিস ফেরার পথে পাবেন। সরি...সিকিউরিটির ব্যাপার, বোঝেনই তো!'

'কিন্তু যে-কাজে এসেছি, তার জন্য সিডিটা আমাদের দরকার।'

'সেটার ব্যাপারে আমাদের ব্যুরো চিফ সিদ্ধান্ত দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা নাহয় আমাদের কাছেই থাক।'

'আর এর মধ্যে যদি মোবাইলে জরুরি কল আসে?'

'কথা বলতে দেয়া হবে, চিন্তা করবেন না।'

কী আর করা, শুধু ওয়ালেট ফেরত নিয়েই লোকটাকে অনুসরণ করে দরজা ঠেলে অফিসের ভিতরে ঢুকল রানা আর রায়হান। সামান্য এগিয়েই চোখে পড়ল রিসেপশন এরিয়া, সেখানে বড় একটা ডেস্ক নিয়ে বসে আছে অল্পবয়েসী এক মেয়ে। ডেস্কটার সামনে পৌঁছে থেমে গেল গার্ড।

'ওয়েলকাম টু সি.আই.এ, মি. রানা অ্যান্ড মি. রশিদ!' হেসে বলল তরুণী, একটা রেজিস্টার ঠেলে দিল।

'এটা কী?' জানতে চাইল রানা।

'ভিজিটরস্ বুক, স্যর। নাম-ঠিকানা লিখে সই করুন, তারপর পূরণ করে ফেলুন এটা।' ডেস্কের উপর দু'সেট ফর্ম ঠেলে দিল মেয়েটা।

'ওটা আবার কী?'

'পার্টিকুলার্স ফর্ম, স্যর। ভিজিটরদের সমস্ত রেকর্ড রাখার জন্য।'

'ওরেব্বাপরে!' ফর্মটা তুলে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল রায়হান। 'এখানে তো দেখি শুধু আমার না, পুরো চোদ্দপুরুষের ইতিহাস লিখতে হবে!'

'একটু তাড়াতাড়ি করবেন, স্যর,' মেয়েটার মুখে অনাবিল হাসি। 'আপনাদের আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ব্লাড-স্যাম্পল আর ডি.এন.এ-স্যাম্পল দিতে হবে। ছবিও তুলতে হবে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তোমরা কি তামাশা করছ আমাদের সঙ্গে?'

'না স্যর, তামাশা হবে কেন? এটা এখানকার স্ট্যাণ্ডার্ড প্রসিডিওর। ভিজিটর সেজে কেউ ভিতরে ঢুকে যদি স্যাবোটাজ করে রেখে যায়, তা হলে যেন লোকটার সমস্ত রেকর্ড থাকে—সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।'

'ভেবেছটা কী আমাকে? এই প্রথম সি.আই.এ-র ব্রাঞ্চ অফিসে আসিনি আমি, ল্যাংলির হেডকোয়ার্টারেও গেছি। তখন কোথায় ছিল এসব প্রসিডিওর?'

'কোনও কারণে হয়তো আপনার ব্যাপারে শিথিল করা হয়েছিল নিয়মটা,' বলল রিসেপশনিস্ট। 'তবে তখনকার রেফারেন্স দিয়ে লাভ নেই। দুঃখিত, ভিতরে যেতে হলে আপনাদেরকে এখন সব ফর্মালিটি সেরেই যেতে হবে।'

কিছু একটা গোলমাল আছে, বুঝতে পারছে রানা। ইচ্ছে করেই ওকে হেনস্থা করছে এরা, ভিতরে যেতে বাধা দিচ্ছে। কারণটা কী, জানতে হবে।

'তো মি. রানা?' জানতে চাইল মেয়েটা। 'কী ঠিক করলেন? ফর্মালিটি কমপ্লিট করবেন, নাকি ফিরে যাবেন?'

'চলেই যাই, মাসুদ ভাই,' রাগী গলায় বলল রায়হান। 'মরুক এরা...জাহান্নামে যাক!'

'মাথা গরম কোরো না,' বাংলায় ওকে বলল রানা। 'এরা তো চাইছেই আমাদের খেপিয়ে দিয়ে তাড়াতে। দেখাই যাক, না গেলে কী করে?'

'তাই বলে এভাবে অপমানিত হব? সময়ও তো নষ্ট হচ্ছে।'

'নাফিজ যতক্ষণ না ড. ডোনেনের খোঁজ বের করতে পারছে, ততক্ষণ সময় আছে আমাদের হাতে। চলো, এদের নিয়মেই খেলি আপাতত। চিন্তা কোরো না, অপমানের প্রতিশোধটা সময়মত নেব অবশ্যই।'

রিসেপশনিস্টের দিকে ফিরল রানা। ইংরেজিতে বলল, 'কলম হবে?'

boighar.com

দুটো বলপয়েন্ট এগিয়ে দিল মেয়েটা, তারপর আঙুল তুলে পাশের একটা দরজা দেখিয়ে দিল। বলল, 'ওখানে চলে যান, বসার ব্যবস্থা আছে।'

ভিজিটরস্ বুকে সই করে ফর্মসহ ছোট্ট রুমটায় গিয়ে ঢুকল রানা আর রায়হান। ওয়েইটিং রুম ওটা, সোফা আর সেন্টারটেবিল আছে। বিশ মিনিট লাগিয়ে জটিল ফর্মটা পূরণ করল ওরা। খানিক পরে অ্যাপ্রন পরে ডাক্তারের সাজে দুজন লোক হাজির হলো। ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিল, রক্ত নিল, হাঁ করিয়ে গালের ভিতর দিক থেকে নরম কোষও সংগ্রহ করল—ডি.এন.এ অ্যানালিসিসের জন্য। সবশেষে একজন ফটোগ্রাফার এসে ছবি তুলল ওদের।

ঘড়ি দেখল রানা, চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে। ফটোগ্রাফারকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ভড়ং শেষ হয়েছে?'

থতমত খেয়ে গেল লোকটা। বোকার মত বলল, 'জী, হয়েছে।'

'এখন তা হলে ব্যুরো চিফের সঙ্গে দেখা করা যাবে তো?'

'জী, আসুন।'

লোকটার পিছু পিছু বেরুল রানা আর রায়হান। দরজায় দাঁড়ানো ছিল আরও দুজন এজেন্ট, ওরা বেরোতেই এসকর্ট করে এগিয়ে নিয়ে চলল। হাঁটার ফাঁকে একজন এজেন্টকে জিজ্ঞেস করে দেখল রানা, কোনও ফোন এসেছিল কি না; জবাবটা নেতিবাচক এল। তারমানে নাফিজ এখনও ড. ডোনেনকে ট্রেস করতে পারেনি।

হলঘরের মত বিশাল একটা রুমে ছোট ছোট কিউবিকলে বসে কাজ করছে জুনিয়র এজেন্টরা, তার মাঝখান দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের, রুমটার অন্যপ্রান্তে এখানকার ইনচার্জের অফিস। প্রথমেই কাঁচঘেরা আউটার রুম, সেখানে ছোট্ট একটা টেবিল নিয়ে বসে আছে মাঝবয়েসী এক মহিলা—ইনচার্জের পার্সোনাল সেক্রেটারি। মুখোমুখি দেয়াল ঘেঁষে একসেট সোফা আছে, দর্শনার্থীদের বসবার জন্য। এসব অবশ্য পরে দেখল রানা, প্রথমে দেখল কাঁচের দরজার পাল্লায় বড় বড় হরফে ইনচার্জের নাম, আর সেটা দেখেই থমকে দাঁড়াল।

এতক্ষণে পরিষ্কার হচ্ছে রহস্যটা, বোঝা যাচ্ছে—মাসুদ রানার নাম শুনেও কেন দেখা করতে উতলা হয়নি লোকটা। কেনই বা ওদের দেরি করানো হয়েছে এতক্ষণ, করা হয়েছে হেনস্থা। সবকিছুর কারণ এই লোকটা...দরজার গায়ে ফুটে থাকা তার নামটা জ্বল জ্বল করে সেটাই জানান দিচ্ছে। ওখানে লেখা:

ডগলাস বুলক

ব্যুরো চিফ

'ওহ্ নো!' কপাল চাপড়াবার দশা হলো রানার। 'বুলডগ!'

সাত

পোড়া কপাল বোধহয় একেই বলে। একটা বাংলা প্রবাদ মনে পড়ে গেল

রানার—যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়! বড় জুতসই এ পরিস্থিতিতে। নইলে দুনিয়ায় এত লোক থাকতে বুলডগই এখানকার ব্যুরো চিফ হতে যাবে কেন? তাড়াহুড়োয় রানা এজেন্সির অফিস থেকে বের হবার সময় জেনে আসা হয়নি—এখানকার দায়িত্বে কে আছে। তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয়নি। যে-রকম জরুরি একটা ব্যাপার জানাতে ছুটে এসেছে, সেটা যে-কেউই সিরিয়াসলি নেবে, সব ধরনের সহযোগিতা করবে। কিন্তু দরজায় লেখা নামটা দেখে বিশ্বাসটা উবে গেল ওর, ডগলাস বুলক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতের মানুষ। তার মত প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং গোঁয়ার মানুষ খুব কম দেখেছে রানা। দুনিয়া জাহান্নামে গেলেও লোকটার কিছু যায়-আসে না, ব্যক্তিগত শত্রুতার ঝাল মেটানোই তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। www.boighar.com

খারাপ খবর এই যে, মাসুদ রানাকে বুলডগ নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রের ল-এনফোর্সমেন্ট সেক্টরে একসময় ডাকসাঁইটে লোক ছিল ডগলাস বুলক—এফবিআই-এর কাউন্টার-এসপিওনাজ ডিপার্টমেন্টের হেড ছিল, কাউন্টার-টেরর এবং অর্গানাইজড ক্রাইম ডিভিশনও চালিয়েছে অনেকদিন। পরিচিত প্রতিটা মানুষ তাকে বাঘের মত ভয় পেত। কারও জীবন নরকে পরিণত করায় তার জুড়ি ছিল না। এ-কারণে জুনিয়ররা ঠাট্টা করে তাকে আড়ালে-আবডালে বুলডগ ডাকত, সেটাই বেচারার ডাকনাম হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। কর্মদক্ষতার কারণে এক পর্যায়ে সিআইএ-তে নিয়ে আসা হয় তাকে, সেখানে অপারেশন শাখার স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ পায়। তর তর করে এগোতে থাকা বুলডগের এই চমৎকার ক্যারিয়ারে রানার কারণে একমাত্র লাল দাগটা পড়েছে, আর দাগটা এতই মোটা যে—এক ধাক্কায় সিআইএ-র স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টরের সম্মানিত পদ থেকে সাধারণ কাতারে নেমে আসতে হয়েছে তাকে।

ঘটনাটা বছরখানেক আগের। নিউ অর্লিয়েন্সে একটা জনসভায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটনের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়, আর গুপ্তঘাতক বলে ফাঁসিয়ে দেয়া হয় রানাকে। পুরোটাই ছিল ষড়যন্ত্র, র‍্যামডাইন নামে সিআইএ-র একটা গোপন অঙ্গ-সংগঠন নিজেদের কুটিল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘটায় কাণ্ডটা। ডগলাস বুলক তখন এফবিআই-এর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কো-অর্ডিনেট করার জন্য নিউ অর্লিয়েন্সেই ছিল, তাকেই দায়িত্ব দেয়া হয় হামলাকারীকে গ্রেফতার এবং পুরো রহস্যটা উদঘাটন করার জন্য। নিজের গোঁয়াতুর্মির কারণে অপারেশনটায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় বুলডগ—র‍্যামডাইনের ছড়িয়ে রাখা মিথ্যে সূত্র দেখে রানাকে ধরার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায়, গ্রেফতার করতে না পেরে এক পর্যায়ে ওকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করে। অথচ গভীরে গিয়ে মূল রহস্যটা উদঘাটনের কোনও তৎপরতাই ছিল না তার মধ্যে, বরং এরিক স্টার্ন নামে এক এফবিআই এজেন্ট সঠিক সূত্র নিয়ে এগিয়ে এলে উল্টো ওই বেচারাকেই সাসপেন্ড করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত রানা যখন নিজের চেষ্টায় সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এল, তখন প্রকাশ পেয়ে গেল বুলডগের অদক্ষতা আর একগুঁয়ে স্বভাবের কথা।

boighar.com

রেগে গিয়ে খোদ প্রেসিডেন্ট শাস্তি দিলেন তাকে—ডাবল ডিমোশন করে। ল্যাংলির হেডকোয়ার্টার থেকে অপসারণ করে এরপর তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ক্যানসাসের এক ছোট্ট শহরের শাখা-অফিসে। এতদিন লোকটা ওখানেই ছিল বলে জানত রানা, লস অ্যাঞ্জেলেসে কবে এল খবরই পায়নি। শুধু এটুকু জেনেছিল—সেই ঘটনার পর থেকে ওকে নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করে বুলডগ। ডিমোশনের পর মাতাল হয়ে প্রকাশ্যে কথাটা ঘোষণাও করেছে সে বেশ কয়েকবার।

আজব এক লোক এই ডগলাস বুলক—নিজের ব্যর্থতা দেখতে পায় না, দোষ দেয় না র‍্যামডাইনকেও। তার বদ্ধমূল ধারণা, রানার হাতে নাকানিচোবানি খাওয়ার ফলেই আজ তার এই অবস্থা। আগে জানলে এখানে আসতই না রানা, সি.আই.এ-কে সতর্ক করার জন্য বিকল্প কোনও পথ বের করে নিত। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক, অন্য কোথাও যাবার সময় নেই। সবকিছু বুলডগের কাছেই খুলে বলতে হবে।

ওদেরকে ঢুকতে দেখে মুখে হাসি ফোটাল মাঝবয়েসী সেক্রেটারি। ইতোমধ্যে দুপুর গড়িয়ে গেছে; অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন, মি. রানা। প্লিজ, টেক আ সিট।' সোফা দেখাল সে।

'বসার সময় নেই আমাদের,' রানা বলল। 'মি. বুলক কোথায়? অফিসে নেই?' দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'আছেন, তবে এখন তো লাঞ্চ ব্রেক চলছে। আপনাদের বসতে হবে।'

'কতক্ষণ?'

'ব্রেক তো কেবল শুরু হলো... এই ধরুন, এক ঘণ্টা।'

আর কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে—ইচ্ছে করেই ওদের হেনস্থা করছে বুলডগ, দেরি করাচ্ছে। নইলে গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটরকে সেক্রেটারির সামনে বসিয়ে রেখে এক ঘণ্টা ধরে লাঞ্চ করে না কেউ। ব্যাপারটা রায়হানও বুঝতে পেরেছে, দুচোখে রাজ্যের বিতৃষ্ণা ফুটল তার। রানারও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।

'লাঞ্চ ব্রেক?' থমথমে গলায় বলল ও। 'আমাদের বসিয়ে রেখে খাওয়া-দাওয়া করবেন উনি?'

'ইয়ে...' বোকার হাসি হাসল সেক্রেটারি। 'কী করবেন, বলুন? বসুন না আপনারা, আমি কফির ব্যবস্থা করছি।'

এসকর্টরা ইতোমধ্যে চলে গেছে ওদের পৌঁছে দিয়ে, তার মানে বাধা দেয়ার কেউ নেই। সেটা লক্ষ করে রানা বলল, 'জী না, কফি না, আমরাও লাঞ্চ করব। মি. বুলক আমার খুব কাছের মানুষ, লাঞ্চ শেয়ার করতে মোটেই আপত্তি করবেন না।'

সেক্রেটারি থতমত খেয়ে গেছে, কী বলবে বুঝতে পারছে না। এই সুযোগে রায়হানকে নিয়ে ঘুরল রানা, হন হন করে হাঁটতে শুরু করল বুলডগের কেবিনের দরজার দিকে।

কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মহিলা, চেঁচিয়ে বলল, 'থামুন, মি. রানা! খবরদার, জোর করে ঢুকতে যাবেন না...'

যেন শুনতেই পায়নি, এই ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল রানা আর রায়হান, ওদের থামাতে ছুটে এল সেক্রেটারি। অযাচিতভাবে এই দুই অতিথি ঢুকে পড়ায় বুলডগ তার উপরই খেপে যায় কি না, এই ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বেচারি। ছুটে আসার সময় ধাক্কা খেয়ে বিকট শব্দে তার চেয়ারটা যে উল্টে পড়েছে, সেটা খেয়ালই করল না।

'যিশুর দোহাই, মি. রানা! প্লিজ...ঢুকবেন না ওখানে!'

পিছন থেকে ভেসে আসা মহিলার অনুনয়-বিনয়ে কান দিল না রানা, দরজায় পৌঁছে গেছে ও, হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকাল ডগলাস বুলক, প্রাণের শত্রুকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল। ছোটখাট গড়নের মানুষ সে, হঠাৎ দেখায় কেউকেটা বলে মনে হয় না। তবে সেটা কেবলই বাহ্যিক রূপ, কাজেকর্মে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ লোকটা—মানুষের জীবন বিষিয়ে তুলতে তার তুলনা হয় না, তার স্বভাব-চরিত্র হিংস্র কুকুর বুলডগেরই মত। প্রায় এক বছর পর লোকটাকে দেখছে রানা, খুব একটা পরিবর্তন আসেনি চেহারায়, চোখের নীল মণিতে এখনও আগের মতই তীক্ষ্ণতা আর শয়তানি।

টেবিলে ঢাউস আকারের দুটো ফাইল খুলে বসে আছে বুলডগ, হাতে কলম—কাজ করছিল নিশ্চয়ই। টিপ্পনী কাটার লোভটা সামলাতে পারল না রানা। বলল, 'বাহ্, বাহ্! আজকাল শুকনো কাগজ দিয়েই লাঞ্চ সারছেন বুঝি? ছুরি-কাঁটাচামচও নেই দেখছি। কিন্তু কাটলারি হিসেবে কলম জিনিসটা বড্ড স্থূল হয়ে গেল না? হাত ব্যবহার করতে ক্ষতি কী?'

কোঁচকানো ভুরু সোজা করে হা হা করে হেসে উঠল বুলডগ। বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানা! আপনার সেন্স অভ হিউমার এখনও আগের মতই আছে দেখছি!'

'আপনিও বদলাননি। এতক্ষণ যা ঘটল, সেসব নিশ্চয়ই আপনার নির্দেশে?'

দরজায় উঁকি দিল সেক্রেটারি, আতঙ্কে তার চেহারা ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যর। এঁরা কোনও কথাই শুনলেন না...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল বুলডগ। 'ইটস্ ওকে, ম্যাডেলিন। তুমি যেতে পারো।' তারপর তাকাল রানার দিকে। 'দাঁড়িয়ে কেন আপনারা, বসুন।'

ইশারা পেয়ে বসল রায়হান। রানাও চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'খামোকা আমাদের দেরি করিয়ে দিয়ে কাজটা ভাল করেননি আপনি।'

'কমপ্লেন করবেন নাকি?' বুলডগের গলায় বিদ্রূপ। 'আজকাল তো শুনেছি প্রেসিডেন্ট কার্লটনের সঙ্গে আপনার দারুণ দহরম-মহরম। যান না, ল্যাংলি-হোয়াইট হাউস... যেখানে খুশি গিয়ে বিচার দিন। কিচ্ছু হবে না আমার। আমি শুধু স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি প্রসিডিওর ফলো করেছি, এটা কোনও অপরাধ নয়। বরং আপনারাই জোর করে আমার অফিসে ঢুকে অভদ্রতা করেছেন, বুঝলেন?'

'তা-ই? কাগুজে আইন দেখিয়ে আমাদের হেনস্থা করাটাকে জাস্টিফায়েড বলছেন আপনি? এ স্রেফ রেষারেষি ছাড়া আর কিছু নয়। যা-ই বলুন, মি. বুলক,

boighar.com

আপনার পজিশনের লোকের জন্য এভাবে ব্যক্তিগত শত্রুতা প্রকাশ করাটা শোভন নয়।'

'হাহ্! ক্যানসাসের ওই নরকে বছরখানেক কাটালে বুঝতেন—কোনটা শোভন, আর কোনটা শোভন নয়। পজিশনের খোঁটাও দয়া করে দেবেন না আমাকে, ওই ইঁদুরের গর্তে কোনও পদস্থ লোককে পাঠানো হয় না।' উত্তেজনা ফুটল বুলডগের গলায়। 'আপনার...শুধু আপনার কারণে একটা ঝাড়ুদারের চেয়েও তলায় নেমে গিয়েছিলাম আমি। লস অ্যাঞ্জেলেসের এই সভ্যজগতে ফিরতে আমাকে কী পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তা আপনি কল্পনা করতে পারেন?'

'দোষটা আমার নয়,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'র‍্যামডাইনের কেসটাতে অযোগ্যতা আপনি দেখিয়েছিলেন, আমি নই।'

'ধোয়া তুলসীপাতা সাজবেন না, মি. রানা,' রাগী গলায় বলল বুলডগ। 'হাতে যা সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল, সেগুলোর অনুসারে কাজ করছিলাম আমি, আপনাকে ধরার চেষ্টা করছিলাম। ব্যাপারটা আপনার পছন্দ হয়নি, সেজন্যই সবকিছু চুকে-বুকে যাবার পর প্রেসিডেন্টকে বলে আমার ডিমোশন আর ট্রান্সফার করিয়েছেন আপনি...প্রতিশোধ নিয়েছেন।'

'এটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'আমি কিছুই করিনি। আমার সঙ্গে যা-ই ঘটেছিল, তার জন্য র‍্যামডাইন দায়ী ছিল, আপনি নন। আপনার উপর শুধু শুধু রাগ পুষে রাখব কেন আমি?'

'তা হলে প্রেসিডেন্টকে বলে আমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন না? সেটা করেননি কেন?'

'আপনার মত মানুষ যে আমার সাহায্যের আশায় থাকবেন, সেটা তো আমার মাথাতেই আসেনি।' সত্যি কথাটাই বলল রানা।

'যাক গে, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই কোনও।' আশ্চর্য দক্ষতায় রাগটা দমাল বুলডগ, এখন তার কণ্ঠ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'কী কারণে পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন, সেটাই বলুন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বিষয়টা নিয়ে ও-ও আর কথা বলতে চায় না। সঙ্গীকে দেখিয়ে বলল, 'এ হলো রায়হান রশিদ—আমার ইনভেস্টিগেশন ফার্মের চিফ আই.টি. স্পেশালিস্ট। নাসার ডিপ স্পেস প্রোব *ভয়েজার*-এর পাঠানো একটা ট্রান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করেছে ও...'

কথাটা শেষ হলো না, বাধা দিয়ে বুলডগ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'ইন্টারসেপ্ট মানে? আপনারা নাসার কম্পিউটার হ্যাক করেছেন?'

'এটা তেমন কিছু না, নাসা সারা বছরে কয়েক লক্ষবার হ্যাকিঙের শিকার হয়,' রায়হান বলল। 'জানেন কি না জানি না, প্রতিষ্ঠানটা পৃথিবীর মোস্ট টার্গেটেড হ্যাকিং স্পটগুলোর একটা।'

'এটা তো সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ!' বুলডগ হতভম্ব। 'কোন্ সাহসে বুক ফুলিয়ে আমাকে বলতে এসেছেন?'

'বাগড়া না দিলে এখুনি জানতে পারবেন,' বলল রানা। 'দয়া করে

আইন-টাইনের ব্যাপারটা আপাতত মাথা থেকে দূর করে দিন। পুরোটা শুনলে আপনি বরং ধন্যবাদ দিতে চাইবেন; ও হ্যাকিং করেছিল বলেই এত বড় একটা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পাওয়া গেছে।'

'কীসের বিপর্যয়?'

আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল রানা, মাঝে মাঝে কথা জোগাল রায়হান। বিপদের ধরন, প্রকৃতি, সময়সীমা—সবই ব্যাখ্যা করল। শুনতে শুনতে বুলডগের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা যাবে বলে ভেবেছিল ওরা, দৃষ্টিতেও হয়তো শঙ্কা ফুটবে... কিন্তু সেসবের কিছুই ঘটল না। বরং ওদের বলা যখন শেষ হলো, তখন লোকটার মুখে মিটিমিটি হাসি।

'আপনি হাসছেন কেন?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল রানা। 'বিপদটা যে কত বড়, তা কি বুঝতে পারেননি?'

'যা বোঝার বুঝে নিয়েছি আমি,' হালকা গলায় বলল বুলডগ। 'এসব আষাঢ়ে গল্প অন্য কোথাও গিয়ে শোনান, মি. রানা। আমার এখানে সুবিধে করতে পারবেন না।'

'আষাঢ়ে গল্প!'

'জী হ্যাঁ। ভেবেছেন কী...বিদেশি একজন স্পাইয়ের কথায় গোটা অ্যামেরিকার ডিফেন্স থেকে শুরু করে সব ধরনের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বন্ধ করিয়ে দেব, এতই বোকা আমি? যান, যান, আপনার এসব কূটচাল অন্য কোথাও গিয়ে চালুন। এই দেশে সফল হতে পারবেন না, আমরা এত সহজে ভয় পাই না।'

'আপনার ধারণা, আমি কোনও কুমতলব নিয়ে এসব কথা শোনাতে এসেছি?'

'ঠিক ধরেছেন,' বুলডগের মধ্যে আত্মতৃপ্তি দেখা গেল। 'শুনুন মি. রানা, সাইবারওয়ার্ল্ড সম্পর্কে কমবেশি আমিও জানি। আপনার ওই ইউনোকোড আর ইউনো-ভাইরাস...স্রেফ একটা মিথ, একটা কিংবদন্তি। অ্যামেরিকার বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন—এমন কোনও কোড নেই, থাকতে পারে না। একটা মাত্র ডিজিট দিয়ে কিছুতেই অর্থবহ ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া গত বছর দু-দু'বার ইউনো-ভাইরাসের আক্রমণের গুজব ছড়িয়েছিল ইন্টারনেটে, কোনওবারই কিছু হয়নি। মাঝখান থেকে সতর্কতা নিতে গিয়ে সরকারের মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার, লোকবল আর সময়ের অপচয় হয়েছে।'

'আমাদের ধারণা, গুজবটা ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো হয়েছিল... এবারেরটার স্টেজিং পার্ট হিসেবে। পর পর দুবার মিথ্যে ঘোষণায় অসতর্ক হয়ে পড়বে লোকে, সত্যিকার আক্রমণটার সময় ওয়ার্নিং দেয়া হলেও গুরুত্ব দেবে না। রাখালবালক আর বাঘের গল্প শুনেছেন না? অনেকটা সেরকম।'

'ভুল জিনিসের উপমা দিচ্ছেন,' কাঠখোট্টা গলায় বলল বুলডগ। 'দিতেই যদি হয় তো নিজেদের আজগুবি গপ্পোটার উপমা দিন। ওটা হলো জুজুর ভয়, বুঝলেন? ওসব শুনিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো যায়, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রকে নয়।'

'জানতাম, এ-ধরনেরই কিছু বলবেন আপনি,' রানা বলল। 'সেজন্যেই সঙ্গে

boighar.com

প্রমাণ নিয়ে এসেছি আমরা।'

'কী প্রমাণ?'

রায়হান বলল, 'ভাইরাসটার কপি নিয়ে এসেছি আমরা। ইউনোকোড সত্যি না মিথ্যে, তা এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি। ওটা কতটা শক্তিশালী, সেটাও টের পাবেন।'

বাম হাত নেড়ে নিজের অফিশিয়াল কম্পিউটারটা দেখাল বুলডগ। 'দেখান। আমার কম্পিউটারেই দেখান।'

'এটা নিশ্চয়ই আপনাদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত?'

'তা তো বটেই। কেন, কোনও অসুবিধে?'

'আপনি কি এখনই ভাইরাসটা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'অন্য কোনও কম্পিউটার দিন। স্ট্যান্ড-অ্যালোন...নেটওয়ার্কে যুক্ত নয়। পুরনো-টুরনো হলে ভাল হয়, যাতে নষ্ট হয়ে গেলে আপনাকে হা-হুতাশ করতে না হয়।'

ভুরু কোঁচকাল বুলডগ, তারপর ইন্টারকমে কার সঙ্গে যেন কথা বলল। শেষে রিসিভার নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

লোকটার পিছু পিছু অফিস থেকে বেরুল রানা আর রায়হান। হলঘরের মত বড় কামরাটার মাঝামাঝি গিয়ে বাঁয়ে ঘুরল ওরা, দরজা পেরিয়ে সরু একটা করিডরে পৌঁছুল। ওটার শেষ মাথায় আরেকটা দরজা, তাতে ছোট্ট একটা ফলক লাগানো: *মেইন্টেন্যান্স স্টোর।*

রানাদের নিয়ে স্টোরের ভিতরে ঢুকল বুলডগ। রুমটা মাঝারি আকারের, তিনদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে স্টিলের তৈরি র‍্যাক আর লকার, তাতে হরেক রকমের জিনিসপত্র—বেশিরভাগই বাতিল মালের মত দেখাল। অবশিষ্ট দেয়ালটাও উন্মুক্ত নয়, সেটার গায়ে ঠেস দিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে পুরনো বাক্স-পেঁটরা, কাগজের কার্টন, বাতিল তার আর লোহালক্কড়। এসবের মাঝ দিয়ে কষ্ট করেই যেন ঠাঁই করে নিয়েছে দুটো জানালা—সেখান দিয়ে মুক্ত আকাশের বদলে দেখা যাচ্ছে ফেডারেল বিল্ডিঙের দ্বিতীয় টাওয়ারটা। মেইন্টেন্যান্স স্টোরটা দুই টাওয়ারের পরস্পরমুখী অংশে পড়েছে, সরাসরি সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে না অন্য ভবনটার জন্য, তাই দিনের বেলাতেও এখানে অন্ধকার-অন্ধকার একটা ভাব। ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা দুটো বালব জ্বেলে আলোকিত করা হয়েছে ভিতরটা।

রুমটার এক কোণে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর পুরনো একটা কম্পিউটার জোড়া দিচ্ছে সুটপরা এক এজেন্ট, সেদিকে দুই অতিথিকে নিয়ে গেল বুলডগ। যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল রানা, এক্কেবারে প্রাচীন দশা কম্পিউটারটার। গায়ের রং কোনও এককালে সাদা ছিল হয়তো, এখন সেটা মলিন হতে হতে হলুদ...না, হলুদেরও দিন পার হয়ে গেছে; এখন ওটা প্রায় কমলা রং ধারণ করেছে। মনিটরটা ঘোলা, কী-বোর্ডে ময়লার আস্তর, সিপিইউ-র ধাতব আবরণের জায়গায় জায়গায় রং চটে গিয়ে উঁকি দিচ্ছে করাল মরিচা।

'আপনারা দেখি আমার কথাটা একেবারে আক্ষরিকভাবে নিয়েছেন,' রানা

বলল। 'পুরনো কম্পিউটার চেয়েছিলাম, তাই বলে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক জিনিস বের করে ফেললেন?'

'নষ্ট হলে যেন হা-হুতাশ করতে না হয়—একথা বলেছিলেন না?' বলল বুলডগ। 'সারা অফিসে আপাতত এটা ছাড়া আর কোনও মেশিনের মায়া ত্যাগ করতে পারছি না বলে দুঃখিত। অবশ্য আপনারা এটারই আদৌ কোনও ক্ষতি করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে আমার।'

'এটা তো অলরেডি নষ্ট মনে হচ্ছে,' রায়হান বলল। 'আমরা আর কী করব? ডেল কোম্পানির পেন্টিয়াম-ওয়ান মেশিন...এ তো জাদুঘরে দেয়ার জিনিস। এখনও চলে?'

'জী, চলে,' টেবিলের উপর থেকে সোজা হলো সুট পরা এজেন্ট, অ্যাসেমব্লিঙের কাজ শেষ করেছে। 'আগের আমলের জিনিস অনেক টেকসই হতো। আজকাল তো ইচ্ছে করেই নাজুক জিনিস বানায়। সেগুলো যত কম টিকবে, নতুনগুলো ততই বিক্রি হবে—এই আশায়। ব্যবসায়ীদের কুবুদ্ধি দেখলে অবাক হতে হয়।' ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল সে। 'হাই, আমি এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক নিউটন, এখানকার আই.টি. ইঞ্জিনিয়ার।'

হাত মিলিয়ে নিজ নিজ পরিচয় দিল রানা আর রায়হান।

'কাজ শুরু করো জলদি।' বুলডগ তাড়া লাগাল। 'ফ্র্যাঙ্ক, তোমার এই কম্পিউটার অন হবে তো?' তার নিজেরও সন্দেহ হচ্ছে।

'হবে, স্যর। আমি কয়েকদিন আগেই একবার চেক করে দেখেছি। মেশিনটা আসলে নষ্ট হয়নি, শুধুমাত্র আজকালকার হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যারের সঙ্গে কম্প্যাটিবল না হওয়ায় ফেলে দিতে হচ্ছে।'

ইলেকট্রিক্যাল সকেটে পাওয়ার কর্ড লাগিয়ে সুইচ অন করল নিউটন। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল সিপিইউ-র ভিতরে, জ্যান্ত হয়ে উঠল আদ্দিকালের যন্ত্রটা। ঘোলা স্ক্রিনে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল লেখা আর ছবি।

'এই রে, এত ঘোলা হলে কাজ করব কীভাবে?' বলে উঠল রায়হান।

'ঠিক হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিল নিউটন। 'পাওয়ার স্ট্যাবিলাইয হতে পাঁচ মিনিটের মত লাগে মনিটরটার...হাজার হোক, বয়স তো কম হয়নি। আপনি বসুন।' কোনা থেকে একটা কাঠের চেয়ার টেনে রায়হানকে কম্পিউটারের সামনে বসতে দিল সে। 'কী নাকি এক ডেনজারাস ভাইরাস দেখাবেন, আমি খুব আগ্রহ বোধ করছি।'

বাটন টিপে সিডি-রমের ট্রে-টা বের করল রায়হান, ইউনো-ভাইরাসের ডিস্কটা ঢোকাল কম্পিউটারে—ইতোমধ্যে বুলডগের নির্দেশে ওটা দিয়ে গেছে বাইরে পাহারায় থাকা এক এজেন্ট। ও জানতে চাইল, 'ড্রাইভটা নষ্ট না তো? ডিস্কটা পড়তে পারবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলল নিউটন। 'পারবে। ঠিকই আছে ওটা।'

নিশ্চিত হবার জন্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রায়হান, তারপর হাত রাখল কী-বোর্ডে। বলল, 'এই কম্পিউটারের সিকিউরিটি প্রটোকলগুলো জানতে হবে আমাকে। দয়া করে বলবেন?'

boighar.com

'হোয়াট?' গর্জে উঠল বুলডগ। 'কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ সিকিউরিটি প্রটোকল জানতে চাইছেন...মানে কী এর?'

চেয়ারটা ঘুরিয়ে বুলডগের দিকে ফিরল রায়হান। 'একটা অ্যাকসিলারেটেড ক্লকের সাব-প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডেডলাইনটা এগিয়ে এনে ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট করব আমি। তবে তার আগে কম্পিউটারের ইন্টারনাল ক্লক আর সব ধরনের ডেটা-ফ্লো আইসোলেট করে ফেলতে হবে। সিকিউরিটি প্রটোকল ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।'

'কী সব বলছেন, বুঝতে পারছি না,' বলল বুলডগ, বলার ভঙ্গিতে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে। 'তবে সাফ সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, কোনও অবস্থাতেই আপনার মত একজন হ্যাকারের হাতে আমি সিআইএ-র কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি কোড তুলে দেব না। অন্য কোনও কায়দা বের করুন।'

মাথা নাড়ল রায়হান। 'আর কোনও কায়দা নেই, সিকিউরিটি প্রটোকল ভাঙতেই হবে। কোডটা যদি না দেন, তা হলে হ্যাকিঙের মাধ্যমে ভাঙাটাই একমাত্র বিকল্প। তবে তাতে খামোকা সময়ই নষ্ট হবে।'

'কিন্তু...'

'রাজি হয়ে যান, মি. বুলক,' রানা বলল। 'ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার জানামতে সব ধরনের কোডই পরিবর্তনশীল, আমাদের কাজ শেষে আপনার সিকিউরিটি প্রটোকলটা নাহয় বদলে ফেলবেন!'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিউটনের দিকে তাকাল ব্যুরো চিফ। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কথাটা ভুল বলেননি মি. রানা। প্রটোকলটা বদলে ফেলা যাবে।'

খানিক ভাবল বুলডগ, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়ার সুরে বলল, 'ঠিক আছে, কোডটা দাও ওঁদের।'

পাশে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সংখ্যা আর অক্ষর বলতে থাকল নিউটন, কী-বোর্ডের বোতাম টিপে সেগুলোকে কম্পিউটারে প্রবেশ করাল রায়হান। তারপর বলল, 'সাব-প্রোগ্রামটা তৈরি করছি আমি, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।'

কী-বোর্ডে ঝড়ের বেগে আঙুল চালাতে শুরু করল ও, পাশ থেকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল এজেন্ট নিউটন, চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। একই ফিল্ডে কাজ করে সে, কৌতূহলটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রানা আর ডগলাস বুলকের ব্যাপারটা ভিন্ন। পিছনে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, অলস ভঙ্গিতে, ধীরে ধীরে বিরক্ত হয়ে উঠছে। দুজনের মধ্যে এমন কোনও সখ্যতা নেই যে, গল্প-গুজব করে সময় পার করে দেবে। ঘড়ির দিকে বার বার তাকাল রানা—কাঁটা যেন ঘুরছেই না। নীরবতা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায় কফি আনাল বুলডগ, কাপে চুমুক দিতে দিতে কাটানো গেল কয়েকটা মিনিট, তবে তারপর আবার সেই থমথমে পরিবেশ।

অবশেষে...যেন অনন্তকাল পরে শেষ হলো রায়হানের প্রোগ্রাম বানানো। অবশ্য কথাটা মোটেই ঠিক নয়, আগেও একবার করেছে বলে এবার তুলনামূলকভাবে কম সময় লেগেছে ওর—মাত্র চোদ্দো মিনিট। বোর হতে থাকা

রানা আর বুলকের কাছে এটাই অস্বাভাবিক দীর্ঘ বলে মনে হয়েছে।

'আমরা রেডি, মি. বুলক,' রিপোর্ট দিল নিউটন।

'তাড়াতাড়ি ছাড়ো,' অধৈর্য গলায় বলল বুলডগ। 'এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর না।'

ড্রাইভ থেকে সিডিটা বের করে নিয়েছে রায়হান। বলল, 'ঠিক আছে।' তারপর চাপ দিল *এন্টার* বাটনে। নিউটনকে বলে দেয়া হয়েছিল, সে ইতোমধ্যে স্মোক অ্যালার্মের সুইচ অফ করে দিয়েছে।

চারজোড়া চোখের সামনে রানা এজেন্সির সেই দৃশ্যটারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। দ্রুতবেগে ডেডলাইনে পৌঁছে গেল স্ক্রিনে ভাসতে থাকা ঘড়িটা, এরপর আঁকিবুকি আর নকশা...স্ক্রিনে "*ইউ আর ডুমড*" কথাটা ভেসে ওঠা, স্পিকারে খনখনে হাসি...সব আগের মতই ঘটল। সিপিইউতে বিস্ফোরণ আর আগুনের ফুলকিও বেরুল যথারীতি। পোড়া গন্ধে ভরে গেল পুরো স্টোর। ফায়ার অ্যালার্ম বন্ধ করা ছিল বলে রক্ষা, নইলে এতক্ষণে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেত।

বুলডগ আর নিউটনের দিকে তাকাল রানা—তাদের দৃষ্টি বিস্ফারিত, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে রইল তারা, তারপর নিজেকে সামলে নিল পোড়-খাওয়া ব্যুরো চিফ। রানার দিকে ফিরে থমথমে গলায় জানতে চাইল, 'এ...এটা ভাইরাস ঘটিয়েছে?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

নিউটন এগিয়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কম্পিউটারটা পরীক্ষা করছে। বিস্মিত গলায় বলল, 'এটা...এটা অবিশ্বাস্য! একটা ভাইরাসের পক্ষে কীভাবে গোটা একটা কম্পিউটার এভাবে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব?'

'একটা না,' শুধরে দিল রায়হান। 'নেটওয়ার্কে থাকলে এটার সঙ্গে যত কম্পিউটার সংযুক্ত থাকবে, তার সবগুলোকেই ধ্বংস করে দেবে।'

'বলছেন কী!' চোখ কপালে তুলল নিউটন, তাকে বিস্তারিত সব খুলে বলা হয়নি, অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। 'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'ইউনোকোড দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়,' সংক্ষেপে জবাব দিল রায়হান।

'ইউনোকোড! এ...এটা ইউনোকোডে তৈরি ভাইরাস?'

নিজের আই.টি বিশেষজ্ঞের বিস্ময় নিয়ে মাথা ঘামাল না বুলডগ, রানাকে বলল, 'দেখা যাচ্ছে আপনি ভুয়া হুমকি দিতে আসেননি।'

'দুঃখ প্রকাশ করলে আমি সব অপমান ভুলে যেতে রাজি আছি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

হেসে উঠল বুলডগ। 'নাহ্, আপনাকে হারানো সোজা কাজ নয়। ঠিক আছে, যা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত।'

'শুনে খুশি হলাম। তবে ভবিষ্যতে কেউ জরুরি খবর নিয়ে এলে শুরুতেই তাকে হেনস্থা করবেন না। তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।'

'সেটা তো বুঝতেই পারছি,' বুলডগ মাথা ঝাঁকাল। 'রাগ করে আপনি চলে গেলে কী বিপদটাই না হতো! এত বড় একটা ব্যাপার তো জানতেই পারতাম

boighar.com

না।' নীচের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল সে। তারপর মুখ তুলে বলল, 'গোটা ঘটনাটাই অত্যন্ত সিরিয়াস, মি. রানা। দ্রুত কিছু একটা করা দরকার। এক্ষুণি একটা ফোন করতে হবে আমাকে, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবেন এখানে? বোঝেনই তো আপনাদের সামনে কথা বলাটা...'

'কোনও অসুবিধে নেই,' রানা বলল। 'যান, কথা বলে আসুন।'

'থ্যাঙ্কস্, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি।'

এজেন্ট নিউটনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলডগ, যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে গেল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল রায়হান, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, অন্তত এদের তো বোঝানো গেছে। বড় একটা দায়িত্ব শেষ হলো।'

রানা কিছু বলল না, ওর ভুরু কুঁচকে আছে। কেন যেন খটকা লাগছে ওর, গোলমালের আভাস পাচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে বিপজ্জনক পেশায় থাকবার কারণে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাধারণ মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ, সাধারণত বিনা কারণে খুঁতখুঁত করে না মনটা।

'ওঠো,' রায়হানকে বলল রানা। 'ঝামেলার শেষ হয়নি এখনও। মনে হচ্ছে আরও বড় বিপদ দেখা দিতে যাচ্ছে।'

'মানে!' রায়হান অবাক।

'বুলডগের হাবভাব ভাল ঠেকছে না আমার কাছে। আমাদের যদি অপেক্ষাই করাতে হয়, এখানে কেন? ভাল কোনও ওয়েইটিং রুম বা অফিসে বসাতে পারত না?'

'কী বলতে চাইছেন?'

'ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, বেরুলে হয়তো জানা যাবে। ওঠো!'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা আর রায়হান, পড়ে গেল দুজন সিআইএ এজেন্টের সামনে, করিডর ধরে তারা এদিকেই আসছিল। ওদেরকে দেখে পথরোধ করে দাঁড়াল।

'সরো! যেতে দাও আমাদের!' ধমকের সুরে বলল রানা।

'কোথায় যাচ্ছেন, স্যর?' জানতে চাইল প্রথম এজেন্ট।

'মি. বুলকের সঙ্গে জরুরি কথা আছে। পথ ছাড়ো।'

'স্টোরেই অপেক্ষা করুন। স্যর এখুনি ফিরে আসবেন।'

'ওখানকার পরিবেশ পছন্দ হচ্ছে না আমাদের,' রানা বলল। 'বসতে হলে বাইরে বসব।'

'দুঃখিত, করার কিছু নেই। স্যর না ফেরা পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হবে আপনাদের।' আদেশের সুর লোকটার গলায়।

'মানে! তোমরা আমাদের বাধা দেয়ার কে?'

'আমাদের পাঠানো হয়েছে আপনাদের পাহারা দিতে, যাতে কোথাও চলে যেতে না পারেন,' বলল এজেন্ট। 'প্লিজ, স্টোরে ফিরে যান।'

'না গেলে?'

কোটের আড়াল থেকে পিস্তল বের করে ওদের দিকে তাক করল লোকটা,

দেখাদেখি তার সঙ্গীও। কঠিন গলায় বলল, 'কথা না শুনলে আপনাদের গুলি করবার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাদের, মি. রানা। যান, ভালয় ভালয় ঢুকে পড়ুন ভিতরে।'

থমকে গেল রানা আর রায়হান। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওরা তাকিয়ে রইল মসৃণ, চকচকে, কালো পিস্তলদুটোর দিকে।

আট

মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড ক্রোধ ভর করল রানার ভিতর, ইচ্ছে হলো কেড়ে নেয় পিস্তলদুটো, মেরে তক্তা বানিয়ে দেয় লোকগুলোকে। সঙ্গে রায়হান আছে, সে-ও আনআর্মড কমব্যাট জানে; দুইয়ের বিপক্ষে দুই—লড়াইটা মোটেই অসম হবে না। কিন্তু প্রতিপক্ষের চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিল ও। উঁচু দরের ট্রেনিং পাওয়া অভিজ্ঞ এজেন্ট এরা, মোটেই আনাড়ি নয়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে, অস্ত্র কেড়ে নেয়া সহজ হবে না। তা ছাড়া মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, লড়াইয়ের চেষ্টা করলে নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে এরা—বুলডগ সেরকম নির্দেশই দিয়ে রেখেছে। আর এই সরু করিডরে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোনও কারণ নেই, ফলাফলটা মারাত্মক হবে।

রানার চেহারায় ওর মনের ভাব সম্ভবত কিছুটা ফুটে উঠেছে, তা লক্ষ করে প্রথম এজেন্ট বলল, 'প্লিজ, মি. রানা, বোকার মত কিছু করতে যাবেন না। যা বলছি, সেটা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'কেন এই ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে, জানতে পারি?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'আপনার জিজ্ঞাসার কোনও জবাব নেই আমাদের কাছে। আমরা হুকুমের চাকর।'

'কোথায় মি. বুলক?' রাগী গলায় বলল রানা। 'ডেকে আনো। তাকেই জিজ্ঞেস করব।'

'স্যর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন। প্রশ্ন-ট্রশ্ন যা করার, তখনই করবেন নাহয়।' পিস্তল নাড়ল লোকটা। 'এখন ভিতরে ঢুকুন।'

করার কিছু নেই, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে স্টোররুমে ফিরে গেল রানা আর রায়হান, পিছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল দুই সিআইএ এজেন্ট। নবে খুটখাট শব্দ হলো—তালাও লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে।

'এসব হচ্ছেটা কী?' বিস্মিত গলায় বলল রায়হান। 'এরা আমাদের বন্দি করল কেন?' বিসিআই-এ যোগ দেয়ার পর এবারই প্রথম ফিল্ড মিশনে এসেছে ও, চোখের পলকে মানুষকে রূপ পাল্টাতেও প্রথমবারই দেখছে।

'এসপিয়োনাজের দুনিয়ায় স্বাগতম!' তিক্ত হাসি হাসল রানা। 'কী ঘটছে বুঝতে পারছ না? ইউনোকোড আর ভাইরাসের কথা সিআইএ-কে জানিয়ে খাল

boighar.com

কেটে কুমির ডেকে এনেছি আমরা। ওদের হাতে অসম্ভব শক্তিশালী আর অব্যর্থ এক অস্ত্র তুলে দিয়েছি।'

'তারমানে...তারমানে...' ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পেরে কথা আটকে যাচ্ছে রায়হানের।

'হ্যাঁ,' রানা মাথা ঝাঁকাল, সিআইএ-র এমন আচরণের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। 'এরা চায় না—আর কাউকে গিয়ে ভাইরাসটার ব্যাপারে সতর্ক করে দিই আমরা।'

'কী ভয়ানক কথা! তা হলে তো গোটা পৃথিবীর কম্পিউটার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'অ্যামেরিকারটা ছাড়া,' রানা বলল। 'অবস্থাটা বুঝতে পারছ না? পুরো দুনিয়ার অর্থনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা আর প্রতিরক্ষায় ধস নামলে ওদের কত সুবিধা? চিন-উত্তর কোরিয়াসহ যেসব দেশ ওদের বিরোধিতা করে, তাদের উপর সরাসরি হামলা চালাতে পারবে, অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় যে-কোনও দেশের ভাগ্য নিয়েও ছিনিমিনি খেলতে পারবে। অ্যামেরিকা তখন শুধু সুপার-পাওয়ার নয়, আলটিমেট-পাওয়ার হয়ে যাবে। এত বড় একটা সুযোগ বুলডগ কীভাবে হাতছাড়া করে, বলো?'

'ইয়াল্লা! লোকটা মানুষ, না পিশাচ?'

'তারচেয়েও খারাপ। ওকে স্বার্থপর আর গোঁয়ার বলে জানতাম, তাই বলে এত নীচে নামবে—সেটা ভাবতেই পারিনি।' রানার গলায় আক্ষেপ। 'ভুলটা আমারই হয়েছে। এখানে আসার আগেই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভালমত চিন্তা-ভাবনা করা উচিত ছিল। সমস্যাটা শুধু বুলডগের কারণে নয়, ওর জায়গায় সিআইএ-র যে-কোন বদমাশ ব্যুরো চিফ থাকলেও একই কাজ করত।'

'কিন্তু মাসুদ ভাই...নিজেদের কম্পিউটার-ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে তো অ্যান্টি-ভাইরাস প্রয়োজন হবে ওদের। সেটা কোথায় পাবে?'

'হায় হায় করছি কেন, বুঝতে পারছ না? ইউনোকোডের গল্প বলার সময় ড. ডোনেনের নাম বুলডগকে বলে দিয়েছি আমরা। তাঁকে খুঁজে বের করবে ওরা, অ্যান্টি-ভাইরাস তৈরি করাবে।'

রায়হান মাথা নাড়ল। 'স্যর এদের মত বদমাশদের সাহায্য করবেন বলে মনে হয় না আমার।'

'করবেন...করতে বাধ্য হবেন। কথা না শুনলে শারীরিক আর মানসিক টর্চার চালানো হবে। ওই ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেয়া যায়।'

www.boighar.com

'কী শোনাচ্ছেন!' রায়হানের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছায়া পড়তে শুরু করেছে। 'কিছু একটা করতেই হবে, মাসুদ ভাই। সব অ্যামেরিকান খারাপ—তা আমি বিশ্বাস করি না। আমরা যদি উপযুক্ত কারও কাছে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলতে পারি, নিশ্চয়ই সাহায্য পাব।'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল রানা। একজনই আছেন এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করবার মত—অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, নুমার চিফ। কিন্তু কপালটাই

মন্দ, তিনি তো এখন হাসপাতালে... ইনটেনসিভ কেয়ারে। এদেশে রানার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই বটে, কিন্তু তারা কোনও কাজে আসবে না। সিআইএ-র বিরুদ্ধে কিছু করবার মত ক্ষমতা এবং পজিশন একমাত্র অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনেরই ছিল।

সরাসরি প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটনের কাছে যাওয়া যায় কি না, সেটাও ভেবে দেখল রানা; নিউ অর্লিয়েন্সের সেই শুটিঙের ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর মোটামুটি একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভালমত ভেবে প্ল্যানটা বাতিল করে দিতে হলো। প্রথমত, ওকে প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছুতেই দেবে না সিআইএ, যতভাবে সম্ভব বাধা দেবে। শেষ পর্যন্ত যদি পৌঁছুনো যায়ও, তাতে বিশেষ লাভ হবে না। আগেই ভদ্রলোকের মগজ ধোলাই করে রাখবে বুলডগের বসেরা। সিআইএ-র মতলবটা প্রেসিডেন্টের পছন্দ না হলেও তিনি প্রকাশ্যে কোনও পদক্ষেপ নেবেন না—মার্কিন রাষ্ট্রপতিরা কখনোই তাঁদের ডিফেন্স এবং ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইযরদের পরামর্শকে অগ্রাহ্য করেন না।

মানেটা দাঁড়াল—আসন্ন মহাবিপর্যয়টাকে ঠেকানোর জন্য এই মুহূর্তে ও আর রায়হান ছাড়া আর কেউ নেই। অ্যামেরিকার আশা তো বাদই, অন্য কোনও সুপার-পাওয়ারের সাহায্যও পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। ইউনোকোডের খবর পেলেই সবাই ওটাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এবার ও বুঝতে পারছে, কেন কোডের স্রষ্টারা জিনিসটাকে গোপন করে রেখেছেন, কেন এটার খবর কাউকে জানতে দেননি। অসহায় বোধ করল রানা, হঠাৎ করে বন্দি হওয়ায় বিশাল সমস্যায় পড়ে গেছে ওরা। কী করা যায়, সেটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল ও। রায়হানকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করায় সে-ও নিশ্চুপ হয়ে গেল।

দশ মিনিট পর শব্দ হলো তালা খোলার। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল বুলডগ, মুখে বিজয়ীর হাসি। বলল, 'সরি, মি. রানা। একটু দেরি হয়ে গেল। ল্যাংলিতে আমাদের ডিরেক্টর এত উত্তেজিত হয়ে আছেন যে ফোন ছাড়তেই চাইছিলেন না।'

রানার ইচ্ছে হলো লোকটার টুঁটি চেপে ধরতে, কিন্তু পিছনে টান টান ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দুই পাহারাদারের কারণে খায়েশটাকে মাটিচাপা দিতে হলো। থমথমে গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'এসব হচ্ছেটা কী, জানতে পারি?'

'কাম অন, মি. রানা!' বুলডগের হাসিটা উজ্জ্বল হলো। 'একথা বলবেন না যে, আপনার মত অভিজ্ঞ একজন এজেন্টকে সবকিছু ভেঙে বলে দিতে হবে।'

'ভাইরাসটাকে আপনারা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন, তাই না?' অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'অন্যান্য সুপার-পাওয়ার, সেইসঙ্গে গোটা পৃথিবীর উপর ছড়ি ঘোরানোর এত বড় সুযোগ আর কখনও আসেনি আপনাদের সামনে, এটাকে তাই হাতছাড়া করতে চাইছেন না। ঠিক বলেছি?'

'এই তো ধরতে পেরেছেন ব্যাপারটা। আপনি অত্যন্ত স্মার্ট লোক, মি. রানা। ইশারাতেই সব বুঝে ফেলেন।'

'এর মধ্যে স্মার্টনেসের কিছু নেই। আপনাকে চিনতে আর বাকি নেই আমার। আপনাদের মত লোকদের কাছে বিবেক আর মানবতার চেয়ে অনেক বেশি বড় হচ্ছে অ্যামেরিকার সাম্রাজ্যবাদ।'

boighar.com

'ফাঁপা বুলি আওড়াবেন না, মি. রানা,' মুখ বাঁকা করে বলল বুলডগ। 'আমি হচ্ছি সত্যিকার দেশপ্রেমিক—সবার উপরে দেশের স্বার্থকে স্থান দিই। কীসের বিবেক আর কীসের মানবতা? সবার আগে হলো দেশ, বুঝলেন?'

'এতে আপনার ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ নেই, বলছেন? এত বড় একটা বিজয় হবে অ্যামেরিকার...আপনি তার উদ্যোক্তা হিসেবে পুরস্কার আশা করছেন না? ভাবছেন না, এর ফলে হারানো সম্মান ফিরিয়ে দেয়া হবে আপনাকে...পাবেন মস্ত বড় কোনও পদ?'

হেসে উঠল ধুরন্ধর ব্যুরো চিফ। 'দেশের সঙ্গে নিজেরও যদি একটু-আধটু উপকার হয় তো ক্ষতি কী, বলুন? যা-ই হোক; আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। এত বড় সুযোগটা আপনিই এনে দিয়েছেন আমাকে। পোয়েটিক জাস্টিস, বুঝলেন? আপনি আমাকে টেনে তলায় নামিয়েছিলেন, আবার আপনিই আমাকে সবার উপরে তুলে দিতে যাচ্ছেন!'

'আপনার এই ষড়যন্ত্র আমি সফল হতে দেব না,' কঠিন গলায় বলল রানা।

'তাই নাকি?' সকৌতুকে বলল বুলডগ। 'চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, মি. রানা। একটা পিঁপড়েকেও ঠেকানোর সাধ্য নেই আপনার। সামনে চোদ্দোশিক নেই বলে কোনও ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকবেন না, প্লিজ। আপনি আর আপনার চ্যালা সত্যিই আমার বন্দি। শুধুমাত্র আমাদের অফিসে কোনও হাজত নেই বলে স্টোররুমে রেখেছি, তবে খুব শীঘ্রি শ্রীঘরে পাঠানো হবে আপনাদের।'

'কেন? কী করেছি আমরা?'

'ওমা! নাসার কম্পিউটারে হ্যাক করেননি আপনারা? ওটা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কত বড় একটা হুমকি, জানেন না?'

'বিরাট একটা ভুল করতে যাচ্ছেন আপনি, মি. বুলক। এর পরিণাম ভাল হবে না।' রানা হুমকি দিল।

'প্লিজ, এমন ভুল বার বার করার সুযোগ দেবেন আমাকে,' গা-জ্বালানো সুরে বিদ্রূপ করল বুলডগ। 'বাই দ্য ওয়ে, ড. ডোনেনের নামটা বলে দেয়ায় ধন্যবাদ। ওটা জানা না থাকলে আমাদের পুরো প্ল্যানটাই মাঠে মারা যেত। হাজার হোক, এত বছর ধরে ইউনোরা তাদের পরিচয় লুকিয়ে রেখেছে, এত অল্প সময়ে কি আমরা আর তাদের খুঁজে বের করতে পারতাম?'

'ভদ্রলোক কোথায় আছে, জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখনও না, তবে জেনে ফেলব। নাম জানা থাকলে মানুষ খুঁজে বের করতে আমাদের সময় লাগে না।' এবার বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ব্যুরো চিফ। 'গুড বাই, মি. রানা। এবার আমাকে যেতে হয়। চেষ্টা করব প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় যেন বিদায় দিতে পারি। ততক্ষণ পর্যন্ত...হ্যাভ আ নাইস টাইম।'

দুই প্রহরী নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলডগ। দরজায় আবার তালা লাগিয়ে দেয়ার শব্দ হলো। নিষ্ফল আক্রোশে পাল্লায় একটা ঘুসি বসাল রানা।

রায়হান আনমনে মাথা নাড়ছে, এখনও ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না ও—মানুষ এত কুচক্রী হয়! ক্ষমতা আর স্বার্থের লোভে পুরো মানবসভ্যতাকে এভাবে জলাঞ্জলি দিতে পারে! ঘোর লাগা গলায় ও বলল, 'ব্যাপারটা আমি মানতে

পারছি না, মাসুদ ভাই। এত বড় একটা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পাবার পরও সেটাকে ঠেকাতে পারব না? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব?'

নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা, সাহস দেয়ার সুরে বলল, 'এখুনি হতাশ হচ্ছ কেন? প্রায় চুরাশি ঘণ্টা সময় আছে আমাদের হাতে। এর মধ্যে কত কিছুই তো ঘটতে পারে!'

'চুরাশি ঘণ্টা যা, চুরাশি সেকেণ্ডও তা। এরা আমাদের যেতে দেবে ভেবেছেন?'

'তা দেবে না। যা করার নিজেদেরকেই করতে হবে।'

'কী করব?'

'বুলডগের প্ল্যানের বারোটা বাজিয়ে দেব।'

'কীভাবে?'

'সহজ,' বলল রানা। 'ওর আগে ড. ডোনেনের কাছে পৌঁছুতে হবে আমাদের। তাঁর কাছ থেকে অ্যান্টিভাইরাসটা জোগাড় করে ছড়িয়ে দেব সবখানে। বুলডগের কিছুই করার থাকবে না।'

'সেটার জন্য মুক্ত হতে হবে প্রথমে,' রায়হান বলল। 'যাবেন কীভাবে—মারামারি করে?'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'পুরো একটা অফিসভর্তি সিআইএ এজেন্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে ওঠা যাবে না।'

'ইস্‌স্‌, মোবাইলগুলো নিয়ে গেছে ওরা!' আক্ষেপ করল রায়হান। 'নইলে নাফিজ ভাইকে একটা খবর দিলেই যেভাবে হোক আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেত।'

'সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন খামোকা ভেবে লাভ কী, বলো?'

'তা হলে?'

স্টোররুমটার উপর নজর বোলাল রানা—ভাল করে দেখল কী কী আছে ভিতরে। ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ ভাবল ও, তারপর বলল, 'দরজা দিয়ে যেহেতু বেরোতে পারছি না, জানালাটা ব্যবহার করলে কেমন হয়?'

'কী বলছেন!' রায়হান বিস্মিত। 'আমরা পনেরো তলায় আছি। এখান থেকে জানালা দিয়ে কীভাবে পালানো সম্ভব? গ্রাউণ্ড ফ্লোর হলে নাহয় একটা কথা ছিল।'

'দেখাই যাক!'

একটা জানালার দিকে এগিয়ে গেল রানা, শার্সি সরিয়ে মাথা বের করে উঁকি দিল নীচে, ওর দেখাদেখি রায়হানও। ফেডারেল কমপ্লেক্সের পাথুরে চত্বর এত উপর থেকে স্রেফ এক চিলতে রুমালের মত দেখাচ্ছে, চলতে-ফিরতে থাকা মানুষদের লাগছে গুটি গুটি বিন্দুর মত।

'ওরে বাবা রে!' বলে উঠল রায়হান। 'আমার রীতিমত মাথা ঘুরছে।'

কতটা উঁচুতে আছে, মনে মনে হিসেব করে ফেলল রানা। পনেরো তলা...একেক ফ্লোরের উচ্চতা দশ ফুট করে ধরলে নীচের চোদ্দো তলার মোট উচ্চতা দাঁড়ায় একশো চল্লিশ ফুট। উনিশ-বিশ হতে পারে...আচ্ছা, ধরা যাক দেড়শো ফুটই। স্টোররুমের এককোণে স্তূপ হয়ে পড়ে পুরনো বেশ কিছু তার,

boighar.com

সেদিকে ইঙ্গিত করে রায়হানকে বলল, 'ওখানে কতটা তার আছে, দেখো তো। পঞ্চাশ গজ হবে?'

'মনে হয় না,' কাছে গিয়ে স্তূপটা ঘেঁটে বলল তরুণ হ্যাকার। 'টেনে-টুনে বিশ-বাইশ গজ হতে পারে।'

'তা-ও মন্দ না,' একটু ভেবে বলল রানা। 'আমাদের ওজন বইতে পারবে?'

পরীক্ষা করল রায়হান—নেটওয়ার্কিঙের জন্য ব্যবহার হওয়া পুরনো কো-অ্যাক্সিয়াল কেইবল্ এগুলো, বেশ মোটা। বলল, 'পারা তো উচিত। কিন্তু কী মতলব আঁটছেন, বলুন তো? জানালা দিয়ে তার বেয়ে নামবেন? কিন্তু মাত্র ষাট ফুট নেমে লাভটা কী? তলায় আরও প্রায় শ'খানেক ফুট বাকি রয়ে যাবে...ওটুকু পেরোবেন কীভাবে?'

'নীচে যাব বলেছি নাকি?' রানার মুখে হাসি।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালা দিয়ে তাকাতেই বিশতলা উঁচু দ্বিতীয় ফেডারেল টাওয়ারের ওপর চোখ পড়ল রায়হানের। আঁতকে উঠে বলল, 'ওহ্ নো! আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না...'

'নীচে যেহেতু যেতে পারছি না, সেক্ষেত্রে পাশে যাওয়াটাই কি একমাত্র পথ নয়?' বলল রানা। 'দূরত্বটা আমার কাছে পঞ্চাশ ফুটের মত মনে হচ্ছে, ওই দৈর্ঘ্যের কেইবল্ আছে আমাদের কাছে। তা ছাড়া, ওই বিল্ডিঙে যেতে পারলে পালানোটা খুব সহজ হয়ে যাবে...আফটার অল, ওখানে আমাদের বাধা দেয়ার জন্য একদল সিআইএ এজেন্ট বসে নেই।'

'বুঝলাম সবই,' রায়হান মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু ওপাশে যাচ্ছি কীভাবে? তার আছে বটে, কিন্তু ডগাটা ওই বিল্ডিঙে পার করব কী করে...সেখানে ওটা আটকে দেবেই বা কে? আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না।'

'হুম, দেখা যাচ্ছে তোমাকে ইম্প্রোভাইজেশনের ওপর ট্রেনিং দিতে হবে।'

'কী?'

'ইম্প্রোভাইজেশন—হাতের কাছের জিনিস দিয়ে নতুন নতুন প্রয়োগ বের করা।'

'শব্দটার অর্থ জানা আছে আমার, মাসুদ ভাই। কিন্তু আপনি এখানে কী ইম্প্রোভাইজ করতে যাচ্ছেন, সেটাই বলুন।'

'এক্ষুণি দেখতে পাবে,' রানা বলল। 'আগে একটা টুলবক্স খুঁজে বের করো। মেইনটেন্যান্সের স্টোররুম যখন—দু'একটা থাকার কথা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তল্লাশিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তরুণ হ্যাকার। রানা খালি হাতে মাপতে শুরু করল জানালাটা—দেখা গেল, ওটা চারফুট চওড়া। পাশের বিল্ডিঙের দিকে তাকাল ও—এটারই যমজ সংস্করণ ওটা; জানালার মাপও একই রকম হবে বলে মনে হচ্ছে। সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ওর মুখে।

একটা লকার খুলে টুলবক্স পেয়ে গেছে রায়হান, সেটা নিয়ে হাজির হলো রানার সামনে। 'এবার কী?'

স্টিলের তৈরি ছ'ফুট উঁচু একটা র‍্যাক দেখাল রানা। 'ওটার একটা পায়া খুলে ফেলতে হবে। এসো।'

‘পায়া খুলবেন! কেন?’

‘সময় হলেই দেখতে পাবে। কথা বাড়িয়ো না তো! এসো।’

টুলবক্স থেকে দুটো স্প্যানার নিয়ে কাজে নেমে পড়ল দুজনে।

নামেই পায়া—আসলে ছ’ফুট উঁচু স্টিলের দণ্ডটা র‍্যাকের একটা স্ট্যাণ্ড, কাঠামোটার মূল ভিত্তি। এরকম মোট ছ’টা খাড়া স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে নাট-বল্টু দিয়ে সমান্তরালভাবে বসানো হয়েছে মোট তিন সারি তাক। প্রথমে র‍্যাক থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেলল ওরা। একটা স্ট্যাণ্ড খুলে ফেললে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে পুরো জিনিসটা যাতে হুড়মুড় করে পড়ে না যায়—সেজন্যে এই সতর্কতা। এরপর স্প্যানার দিয়ে নাট-বল্টু খুলতে শুরু করল দুজনে।

সময় বেশি লাগল না, মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা স্ট্যাণ্ড খুলে ফেলা গেল। জিনিসটা দুহাতে তুলে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করল রানা—হ্যাঁ, কাজ চলবে। রায়হানকে তারের টুকরোগুলো জোড়া দিতে বলল ও। ‘ভাল করে গিঁট দিয়ো, খুলে যেন না যায়।’

‘ভাববেন না,’ বলল তরুণ হ্যাকার। ‘তার ছিঁড়ে পনেরো তলার উপর থেকে ডানা মেলার কোনও ইচ্ছে আমারও নেই। শক্ত করেই বাঁধব।’

রায়হান যখন কাজ করছে, সেই ফাঁকে পোড়া কম্পিউটারের সামনে থেকে চেয়ারটা এনে কোনাকুনিভাবে স্টোররুমের দরজার নীচে আটকে দিল রানা। এখন আর দরজা খুলে ওদের কাজে আচমকা বাগড়া দিতে পারবে না কেউ।

একটু পরেই রেডি হয়ে গেল পুরো বাইশ গজ তার। রায়হান বলল, ‘এবার ব্যাখ্যা করুন প্ল্যানটা!’

তারের একটা মাথা স্টিলের দণ্ডটার মাঝামাঝি বাঁধছে রানা। বলল, ‘স্কুল-কলেজের অ্যাথলেটিক্সে বর্শা নিক্ষেপ করেছ কখনও?’

‘বর্শা-নিক্ষেপ!’

‘হুঁ। করোনি?’

‘নাহ্। খেলাধুলোয় কখনোই খুব একটা ভাল ছিলাম না আমি।’

‘তা হলে তো দেখছি কাজটা আমাকেই করতে হবে,’ বলল রানা, ছ’ফুট দীর্ঘ দণ্ডটার ওজন পরীক্ষা করল আরেকবার। ‘অ্যাথলেটিক্সের জ্যাভেলিনের চেয়ে ভারী হয়ে গেছে, তবে পঞ্চাশ ফুট পার করতে পারব আশা করি।’

পালা করে একবার রানার মুখ, আরেকবার জানালার দিকে তাকাল রায়হান—এতক্ষণে ধরতে পারল গুরুর উদ্দেশ্যটা। ‘ইয়াল্লা, মাসুদ ভাই...আপনার মাথায় এসব বুদ্ধি আসে কোত্থেকে!’

জবাব না দিয়ে পায়ে পায়ে জানালা বরাবর পেছাতে শুরু করল রানা—রানআপের জন্য জায়গা করে নিচ্ছে, তারবাঁধা স্ট্যাণ্ডটা ধরে রেখেছে কাঁধের উপর...ছোঁড়ার ভঙ্গিতে, কোনাকুনিভাবে। ‘কলেজে থাকতে দুবার সিলভার মেডেল পেয়েছিলাম,’ রায়হানকে বলল ও। ‘দোয়া করো, বিদ্যেটা যেন এখনও কাজে লাগে।’

হেসে উপরদিকে দুহাত তুলে প্রার্থনার একটা ভঙ্গি করল তরুণ হ্যাকার। দম নিয়ে ছুট লাগাল রানা, জানালায় পৌঁছে দক্ষ জ্যাভেলিন-থ্রোয়ারের মত ছুঁড়ে দিল

boighar.com

লোহার দণ্ডটা। ধনুকের মত বাঁকা একটা পথে উড়ে গেল ওটা, তবে টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছুল না। পাশের বিল্ডিংটার পাঁচ ফুট দূরে থাকতেই গতি হারাল, খসে পড়ল নীচে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

'আরও জোরে ছুঁড়তে হবে, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান।

মাথা ঝাঁকাল রানা, তার ধরে টেনে তুলে আনল দণ্ডটা। পিছিয়ে গিয়ে আবার পজিশন নিল ও, তারপর দৌড়ে এসে দ্বিতীয়বার ছুঁড়ল ওটা।

এবারও ব্যর্থ হলো রানা। দূরত্ব পুরোটা অতিক্রম করল বটে, কিন্তু জানালা দিয়ে না ঢুকে আঘাত করল একফুট বাঁয়ের দেয়ালে। ঠং করে একটা শব্দ তুলে আবারও পড়ে গেল নীচে।

'ধেত্তেরি!' সখেদে বলে উঠল রানা।

'হয়ে যাবে, মাসুদ ভাই,' উৎসাহ দিল রায়হান। 'দান-দান-তিন দান।'

দণ্ডটা আবার তুলে আনতে শুরু করল রানা। বেশ ভারী ওটা, পর পর দুবার ছোঁড়ায় কাঁধ ব্যথা করছে। হাত ঝাড়া দিয়ে ব্যথাটা সয়ে নিল ও, একই সঙ্গে মনে মনে হিসেব করে নিল—কতটুকু কারেকশন দিতে হবে। প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলে দৃঢ় পদক্ষেপে ছুট লাগাল আবার, জানালার সামনে পৌঁছে নিশ্চিত ভঙ্গিতে থ্রো করল দণ্ডটা। ফলাফল দেখার জন্য আগ্রহের আতিশয্যে মুখ বাড়িয়ে দিল রায়হান।

এইবার হয়েছে কাজ—দু'জোড়া আগ্রহী দৃষ্টির সামনে পঞ্চাশ ফুট দূরের জানালাটার উপর সজোরে এক মাথা দিয়ে আছড়ে পড়ল স্টিলের দণ্ডটা। জোরালো শব্দে ভাঙল শার্সির কাঁচ, এতদূর থেকেও শোনা গেল তা। কাঁচভাঙা ফোকর দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল জিনিসটা।

'বুলস্ আই!' খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রায়হান। 'দারুণ দেখিয়েছেন, মাসুদ ভাই!'

'কথা না বলে হাত লাগাও,' রানার কণ্ঠে তাড়া। 'সময় নেই আমাদের হাতে।'

ওর আশঙ্কাটা সত্যি প্রমাণ করার জন্যই যেন দরজায় শব্দ হলো, তালা খোলা হচ্ছে। ভিতরে ধুপধাপ আওয়াজে সন্দিহান হয়ে উঠেছে বাইরে দাঁড়ানো দুই পাহারাদার। ঘটনাটা কী, জানতে আসছে ওরা।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার দরজা, আরেকবার জানালা দিয়ে চলে যাওয়া তারের দিকে তাকাল রায়হান, ধরা পড়ে যেতে বসেছে ওরা। ফিসফিস করে বলল, 'ইয়াল্লা, মাবুদ!'

নয়

'কুইক!' চাপা গলায় বলে উঠল রানা।

তার ধরে টানতে শুরু করল ওরা, একটু পরেই পাশের বিল্ডিঙের জানালার চৌকাঠে উঠে এল স্টিলের দণ্ডটা, তবে বেরুল না। চার ফুট প্রস্থের জানালায় ওটার ছ'ফুট দৈর্ঘ্য আড়াআড়িভাবে আটকে গেছে। টান দিয়ে পরীক্ষা করল রানা—না, খুলে চলে আসার ভয় নেই।

দরজার তালা খুলে ফেলেছে দুই প্রহরী, এখন নবে মোচড় দিয়ে পাল্লাটা ঠেলছে, কিন্তু চেয়ারটা আটকে থাকায় খুলতে পারছে না দরজাটা।

'হচ্ছেটা কী ভিতরে?' ওপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল। 'ঢুকতে দাও আমাদের!'

জবাব না দিয়ে রায়হানের দিকে তাকাল রানা। 'হারি আপ, এ-মাথাটা আটকাতে হবে আমাদের।' আঙুল তুলে সিলিঙে লাগানো একটা ফ্যান ঝোলানোর খালি হুক দেখাল ও।

মাথা ঝাঁকাল রায়হান। রানা বসে পড়েছে, লাফ দিয়ে উঠে গেল কাঁধে। ওকে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। হুকটা নাগালে পেতেই হাতে ধরা কো-অ্যাক্সিয়াল কেইবলের প্রান্তটা ফোকর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল তরুণ হ্যাকার, টান টান করে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে ফেলল।

রায়হানকে মেঝেতে নামাল রানা। 'আগে তুমি যাও।'

'কিন্তু...'

'ধরা পড়ার মত পরিস্থিতি যদি দেখাই দেয়, তা হলে আমিই ধরা পড়ি,' রানা বলল। 'এই মিশনটার জন্য আমার চেয়ে তোমার প্রয়োজন বেশি। কথা বোলো না, যাও বলছি।'

চাপাচাপিতে পড়ে জানালার চৌকাঠে উঠে পড়ল রায়হান। নীচের দিকে তাকাতেই চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা।

'আমার ভয় করছে, মাসুদ ভাই!' সরল স্বীকারোক্তি করল ও।

'নীচে তাকিয়ো না,' বলল রানা। 'রোপ-ট্রেনিঙে যা যা শেখানো হয়েছে, তা মাথায় রেখো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কেইবল্ ধরে ঝুলে পড়ল রায়হান। ভয় পেলেও তা আর প্রকাশ পাচ্ছে না ওর মধ্যে। তারটা ধরে তর তর করে বেয়ে একটু পরই ও পৌঁছে গেল অপর প্রান্তে। ঝুলে থাকা অবস্থায় শার্সির বাকি কাঁচগুলো পরিষ্কার করে নিল, তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে।

এবার রানার পালা।

একবার পিছনে ফিরে স্টোররুমের দরজার দিকে তাকাল ও। ধাক্কাধাক্কি থেমে গেছে। দুই প্রহরীর ধাক্কায় ভাঙেনি দরজাটা—চেয়ারটা খুব শক্ত হয়ে

boighar.com

আটকেছে, পাল্লাটাও শক্ত। ভিতরে ঢোকার জন্য ওরা এখন কী কৌশল করবে কে জানে। সেটা জানবার কোনও ইচ্ছে নেই, জানালার চৌকাঠে উঠে পড়ল ও।

প্রবল শক্তিতে ঠেলেও যখন দরজার পাল্লাটা খোলা গেল না, বোকা বনে গেল পাহারায় থাকা দুই সিআইএ এজেন্ট। যার কাস্টডি, সে নয়, উল্টো বন্দিরা দরজা আটকে দিচ্ছে...তাকেই বরং যুদ্ধ করতে হচ্ছে দরজা খুলতে...এমন ঘটনা কে কবে শুনেছে! কিছু একটা যে গোলমাল আছে, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না দুই এজেন্টের।

শেষ পর্যন্ত দরজা খোলায় ব্যর্থ হয়ে কোমর থেকে ওয়াকি-টকি বের করল প্রথমজন, যোগাযোগ করল বুলডগের সঙ্গে।

'কী ব্যাপার?' নিরাসক্ত গলায় জানতে চাইল ব্যুরো চিফ।

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যর,' বলল প্রথম এজেন্ট। 'স্টোর রুম থেকে কীসের যেন আওয়াজ হচ্ছিল, কিন্তু কী হয়েছে সেটা দেখার জন্য আমরা ভিতরে ঢুকতে পারছি না। বন্দিরা ভিতর থেকে দরজাটা আটকে দিয়েছে।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল বুলডগ।

'জী, স্যর,' এজেন্টের গলায় সন্ত্রস্ত ভাব। 'সত্যি।'

'আমি আসছি,' বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বুলডগ। 'যেভাবে হোক, তোমরা দরজা ভাঙো!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে মেইনটেন্যান্স স্টোরের করিডরে পৌঁছে গেল সে, সঙ্গে আরও দুজন এজেন্টকে নিয়ে এসেছে। দুই প্রহরী ততক্ষণে গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে দরজার নব। সঙ্গীদের ওদের সঙ্গে যোগ দিতে ইশারা করল সে।

চারজনের সম্মিলিত ধাক্কার সামনে টিকতে পারল না চেয়ারটা, ব্যাকরেস্ট ভেঙে কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। খোলা ডোরওয়ে দিয়ে পিস্তল হাতে ঝড়ের বেগে ঢুকল বুলডগ—খোলা জানালা আর সেখান দিয়ে চলে যাওয়া তারটা দেখে যা বোঝার বুঝে গেল সে। পাগলের মত ছুটে গেল চৌকাঠের দিকে। ওপারের দৃশ্যটা দেখে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে গেল প্রতাপশালী ব্যুরো চিফের।

রায়হান তো আগেই পৌঁছেছে, রানাও কেইবলের শেষ প্রান্তে। বুলডগের বিস্ফারিত চোখের সামনে ওকে টেনে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করল তরুণ হ্যাকার। মেঝেতে পা রেখে ঘুরে প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল রানা, হাত নেড়ে টা-টা জানাল।

'রানা!!!' তীব্র আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল বুলডগ।

'বেটার লাক নেক্সট টাইম!' রানাও গলা উঁচু করে শোনাল কথাটা। পরমুহূর্তেই স্টিলের দণ্ড থেকে তারের বাঁধনটা খুলে সেটা ফেলে দিল বাইরে। দেখি এবার কীভাবে এপারে আসো বাছাধন! জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ও আর রায়হান।

'গড্‌ড্যাম ইট!' পাগলের মত চৌকাঠে কিল বসাল বুলডগ।

'এ কীভাবে সম্ভব!' বোকা বোকা গলায় বলল তার পাশে দাঁড়ানো এক এজেন্ট। 'লোকটা ম্যাজিশিয়ান নাকি! ওই বিল্ডিঙে গেল কী করে?'

ঘুরে এজেন্টের কলার চেপে ধরল বুলডগ। 'ও ম্যাজিশিয়ান না। ও হচ্ছে মাসুদ রানা! পালিয়ে যে গেল, সব তোমাদের কারণে! চোখে চোখে রাখোনি কেন?'

'স্যর, আপনি তো শুধু বাইরে পাহারা দিতে বলেছিলেন...

'শাট আপ!' হুঙ্কার ছাড়ল বুলডগ। 'যে ফ্লোরে গেল, ওটা কীসের অফিস?'

'ইয়ে...জানি না, স্যর,' থতমত খেয়ে বলল এজেন্ট। 'তবে জেনে নিতে পারি এক্ষুণি।'

তাকে ছেড়ে দিল বুলডগ। 'বের করো। আর ওখানকার বিল্ডিং সিকিউরিটিকে খবর দাও। পুরো টাওয়ার সিল করে দেয়া চাই, বাঙালির বাচ্চাদুটো যেন ওখান থেকে বেরুতে না পারে কিছুতেই।'

'ইয়েস স্যর!' বলে ছুট লাগাল চার এজেন্টই, বসের রুদ্রমূর্তির সামনে থাকতে রাজি নয়।

www.boighar.com

এজেন্টরা বেরিয়ে যেতেই সচকিত হয়ে উঠল বুলডগ। পাগলের মত জানালার ধারে আবার ছুটে গেল সে। পাশের বিল্ডিঙে তারস্বরে বাজতে শুরু করেছে ফায়ার অ্যালার্ম। কাজটা কার—বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না ধুরন্ধর সিআইএ কর্মকর্তার, রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকল সে।

'রানা, ইউ কানিং সান অভ আ বিচ!'

আগুনের আতঙ্কে পাগলের মত বেরুতে যাচ্ছে বিশতলা টাওয়ারটার প্রতিটা মানুষ। এর ভিতর থেকে সিকিউরিটির পক্ষে কোনও ভাবেই সম্ভব হবে না নির্দিষ্ট দুজন মানুষকে খুঁজে বের করা বা তাদের আটকানো।

নিষ্ফল হতাশায় খালি মেইনটেন্যান্স স্টোরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল ডগলাস বুলক।

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাতে উঠে বসল রানা আর রায়হান। পার্কিং লট থেকে নিজেদের গাড়িটা আনতে গেলে ধরা পড়ে যাবে, তাই ট্যাক্সিই ভরসা। দ্বিতীয় টাওয়ার থেকে লোকজনের স্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে কোনও অসুবিধেই হয়নি ওদের। কপাল ভাল, পনেরো তলার যে রুমটায় ওরা নেমেছিল, ওটা ছিল ফেডারেল ট্যাক্সেশন অফিসের ফাইলিং কক্ষ—কোনও মানুষ ছিল না রুমটাতে। কাঁচ ভাঙার শব্দ কেউ না কেউ নিশ্চয়ই শুনেছে, কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। হয়তো গুরুত্ব দেয়নি, অথবা ব্যাপারটা দেখা নিজের দায়িত্ব নয় ভেবে এড়িয়ে গেছে...ট্যাক্সেশন অফিসে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয় সবাইকে, নিজের কাজের বাইরে অন্য জিনিসে নজর দেয়ার ফুরসত থাকে না কারও। অবশ্য ফাইলিং রুম থেকে অচেনা দুজন মানুষকে বেরোতে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল কয়েকজন, মুখে ভদ্রতাসূচক হাসি ফুটিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করে অফিসটা থেকে রায়হানকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে রানা, সৌভাগ্যক্রমে কেউ পথ আটকে দাঁড়ায়নি। করিডরে পৌঁছে ফায়ার অ্যালার্মের সুইচ টিপে দিয়েছিল ওরা...বাকিটা তো পানির মত সহজ!

'কোথায় যাবেন?' যাত্রীরা উঠে বসতেই জিজ্ঞেস করল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

boighar.com

‘আগে চলতে শুরু করো,’ জবাব দিল রানা। ‘পরে বলছি কোথায় যাব।’

কী বুঝল কে জানে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাড়িটাকে সামনে বাড়াল ড্রাইভার।

‘এবার কী?’ ধাতস্থ হয়ে প্রশ্ন করল রায়হান।

‘ড. ডোনেনের কাছে যেতে হবে,’ রানা বলল। ‘এবং সেটা বুলডগের আগেই। নাফিজের সঙ্গে কথা বলা দরকার...’

‘আমাদের ফোনদুটো রেখে দিয়েছে ওরা,’ মনে করিয়ে দিল রায়হান।

‘হুঁ,’ মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে গলা চড়াল। ‘এই যে ভায়া, তোমার কাছে মোবাইল-টোবাইল আছে?’

‘মোবাইল!’ ড্রাইভার ভুরু কোঁচকাল।

‘হ্যাঁ। একটা ফোন করা দরকার। বিনিময়ে বাড়তি দশ...না, না, বিশ ডলার পাবে।’

‘ভারি অদ্ভুত লোক তো আপনারা! কোথায় যাবেন, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই...এখন আবার ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে মোবাইল চাইছেন!’

‘এত কথা বলতে বলেছে কে তোমাকে?’ বিরক্ত হয়ে বলল রায়হান। ‘থাকলে দাও, নইলে চুপ করে থাকো।’

বাড়তি টাকার লোভ বোধহয় সামলাতে পারল না ড্রাইভার, পকেট থেকে নিজের মটোরোলা সেটটা বের করে বাড়িয়ে দিল।

ফোনটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডায়াল করল রানা। একবার রিং হতেই ওপাশ থেকে কল রিসিভ করল নাফিজ।

‘হ্যালো?’

‘নাফিজ...আমি বলছি। বাংলায় কথা বলো।’

‘মাসুদ ভাই!’ নাফিজের গলায় উৎকণ্ঠা। ‘কোথায় আপনারা? সেই কখন থেকে রিং দিচ্ছি...কেউ ফোন ধরছেন না কেন?’

‘ফোনগুলো আমাদের কাছে নেই যে!’

‘নেই কেন?’

হালকা গলায় রানা বলল, ‘কী আর বলব...নতুন মডেলের সেট ছিল তো, বুলডগের খুব পছন্দ হয়ে গেল। কিছুতেই আর ফেরত দিল না, রেখে দিল। দেখতে পাচ্ছ না, ধার করা নম্বর থেকে তোমাকে কল করছি?’

‘বুলডগ রেখে দিয়েছে...হায় খোদা!’ বুঝতে পেরে চমকে উঠল নাফিজ। ‘আপনাকে তো বলতেই ভুলে গেছি—ডগলাস বুলক দেড় মাস হলো ব্যুরো চিফ হিসেবে জয়েন করেছে এখানে। আপনাকে দুচোখে দেখতে পারে না লোকটা, কোনও ঝামেলা করেছে নাকি?’

‘ঝামেলা মানে আমাকে আর রায়হানকে ঠেকানোর জন্য খেপে উঠেছে—এই আর কী! যাক গে, কাজের কথায় এসো। ড. ডোনেনের খোঁজ পেয়েছ?’

‘হ্যাঁ, সেটা জানাবার জন্যই ফোন করছিলাম। কপাল খুব ভাল বলতে হবে, মাসুদ ভাই। আমার এক সোর্স কয়েকদিন আগে নিজ চোখে দেখে এসেছে ভদ্রলোককে, নইলে খুঁজে বের করা খুব মুশকিল হত।’

‘কেন? কোথায় তিনি?’

'আলাস্কার উত্তরে, আর্কটিক সার্কেলের মন্টেগো আইস শেলফে একটা ক্লাসিফায়েড রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করছেন তিনি। বেশিরভাগ ডেটাবেজ থেকে তাঁর নাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে, দু'একটাতে যা-ও আছে, সেখান থেকে তথ্য পেতে হলে হাই-লেভেলের ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন। বুঝতেই পারছেন, সোর্স লোকটাকে না পেলে ওভাবে তাঁর লোকেশন বের করা প্রায় অসম্ভব ছিল।'

'এত লুকোচুরি কেন? কীসের প্রজেক্ট ওটা—সরকারি?'

'না। ব্রাইটন টেকনোলজিস্ নামে প্রাইভেট একটা কোম্পানি আইস শেলফে ন্যানোটেকনোলজি সংক্রান্ত গবেষণা চালাচ্ছে। খনিজ পদার্থ মাইনিং করবার চেষ্টা করছে বলে শুনলাম। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজের ভয়ে অস্বাভাবিক রকমের সতর্কতা পালন করছে ওরা—সেজন্যেই এই কাণ্ড।'

'আমাদের ওখানে যেতে হবে, নাফিজ,' সিরিয়াস গলায় বলল রানা। 'এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি। ব্যবস্থা করো।'

'একটা প্লেন চার্টার করব?' জিজ্ঞেস করল নাফিজ। 'তবে তাতে সমস্যা আছে। ক্লিয়ারেন্স ছাড়া রিসার্চ প্রজেক্ট এরিয়ায় আপনাদের ল্যান্ড করতে দেয়া হবে না।'

'বুলডগ যেভাবে পিছনে লেগেছে, তাতে এমনিতেও বিমান চার্টার করা ঠিক হবে না,' রানা বলল। 'গোপনে ওখানে ঢোকার কোনও উপায় আছে?'

'হুঁ, আজ রাতে একটা কোম্পানি-বিমান যাবে আইস শেলফে,' বলল নাফিজ। 'তিন দিন পর পর লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে যায় ওটা—লজিস্টিক রি-সাপ্লাই নিয়ে, সঙ্গে লোডিং-আনলোডিঙের জন্য কিছু ওয়ার্কারও থাকে। একটু চেষ্টা করলে আজকের দুজন শ্রমিকের জায়গায় আপনাদের রিপ্লেস করে দিতে পারব আশা করি—টাকা খাওয়াতে হবে দু'চার জায়গায়, আর নকল কাগজপত্র ম্যানেজ করতে হবে...এই যা। তবে সমস্যা একটাই—বিমানটা ল্যান্ড করার পর মাত্র দু'ঘণ্টা থাকে ওখানে। ওই সময়ের ভিতর যদি ড. ডোনেনকে খুঁজে বের করে ফের বিমানে চড়তে না পারেন, তা হলে পাক্কা তিন দিনের জন্য আটকা পড়ে যাবেন।'

'যখনকারটা তখন ভাবা যাবে। ফ্লাইটটা কখন?'

'রাত দশটায়।'

'বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে,' চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। 'বুলডগের তো ক্লিয়ারেন্স নিয়ে ঝামেলা নেই, রাতের মধ্যে ডক্টরকে লোকেট করতে...এমনকী গায়ের জোরে রিসার্চ প্রজেক্টেও ঢুকে পড়তে পারবে।'

'সরি, মাসুদ ভাই,' দুঃখ প্রকাশ করল নাফিজ, 'আপাতত এরচেয়ে ভাল কোনও রাস্তা আমার হাতে নেই। যদি চান তো গোপনে একটা বিমানে করে আইস শেলফে ড্রপ দিয়ে আসতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রজেক্টে ইনফিলট্রেট করতে সমস্যায় পড়বেন আপনারা। ওয়ার্কার সেজে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ, সহজে ঢুকে পড়তে পারবেন। বুলডগের লোকজন যদি আগেভাগে পৌঁছেও গিয়ে থাকে, ছদ্মবেশের আড়ালে থাকায় আপনাদের চিনতে পারবে না।'

'কী আর করা!' অগত্যা রাজি হলো রানা। 'তুমি ব্যবস্থা নিতে থাকো। আমি

boighar.com

পরে আবার যোগাযোগ করব।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

লাইন কেটে দিল রানা, ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিল ফোনটা। তারপর রায়হানের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। বাংলায় চলল কথোপকথন, যাতে ড্রাইভার শুনেও বুঝতে না পারে কিছু।

'হুঁ, আমাদের মূল সমস্যা তা হলে ডগলাস বুলক,' সব শুনে বলল রায়হান। 'তাকে সরিয়ে রাখতে পারলেই পুরো কাজটা কয়েক গুণ সহজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য, তাই না, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'সমস্যা হলো, সব ধরনের ডেটাবেজে অবাধ অ্যাকসেস আছে লোকটার। তোমার টিচার কোথায় আছেন, সেটা জেনে নিতে খুব বেশি সময় প্রয়োজন হবে না তার।'

'যদি তার অ্যাকসেস নষ্ট করে দিই?' রায়হান বলল। 'যদি এমন অবস্থা করি যে, সব ধরনের ডেটাবেজে সি.আই.এ-র যে-কোনও ইউযারের প্রবেশ নিষিদ্ধ? বিশেষ করে ড. স্ট্যানলি ডোনেনের নামে কোনও সার্চ চালাতে গেলেই যদি ওদের পুরো সিস্টেম হ্যাং করে যায়?'

'সেটা কি সম্ভব?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'খুব সহজ কাজ, মাসুদ ভাই,' রায়হান হাসল। 'আমি শুধু ছোট্ট একটা ভাইরাস ছেড়ে দেব ওদের মেইনফ্রেমে—যা করার ওটাই করবে।'

'সিআইএ-র মেইনফ্রেমে ঢুকবেটা কীভাবে? হ্যাকিং করে? সেটা তো অনেক সময়ের ব্যাপার!'

'একদমই সময় লাগবে না। ওদের সিকিউরিটি প্রটোকল জানি আমি—ওই যে...সাব-প্রোগ্রাম বানাবার সময় যে দিল, ভুলে গেছেন? এত তাড়াতাড়ি বদলে ফেলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। হ্যাকিং করতে হবে না, বুক ফুলিয়ে খোলা দরজা দিয়ে গট গট করে হেঁটে ঢোকার মত মেইনফ্রেমে ঢুকে যেতে পারব।'

'কোডটা এখনও তোমার মনে আছে?' রানা অবাক।

'হ্যাকাররা সাধারণত একবার কোনও কোড পেলে সেটা আর ভোলে না,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল রায়হান। 'এখন আমার শুধু ইন্টারনেট কানেকশনসহ একটা কম্পিউটার দরকার, তা হলেই বুলডগকে সত্যি সত্যি পাগলা কুত্তা করে দিতে পারি।'

চওড়া হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যে ভায়া, সবচেয়ে কাছের সাইবার-ক্যাফেটায় নিয়ে চলো দেখি আমাদের!'

দশ

তেসরা মে। সকাল আটটা।

সূর্য উঠেছে অনেকক্ষণ হলো, তবে জানালা গলে চোখে রোদ পড়ার আগে

ঘুম ভাঙল না রানার। গতকালকের ছোটাছুটির ধকল আর উত্তেজনায় ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল ও আর রায়হান. প্লেনে উঠে সিটে পিঠ ঠেকানোর পর কখন যে ঘুমে ঢলে পড়েছে—বলতে পারবে না কেউই। রাতের ফ্লাইট হওয়ায় এক দিক থেকে সুবিধে হয়েছে—শুধু ওরাই নয়, সহযাত্রীরাও সবাই এক ঘুমে রাত কাবার করে দিয়েছে। দীর্ঘ যাত্রাপথের বেশিরভাগ সময় কেটে গেছে এতে, অন্য কারও সঙ্গে আলাপচারিতা বা সখ্য গড়তে হয়নি। হাজার হোক, ভুয়া পরিচয়ে রয়েছে ওরা—পরিচয়দুটো খুব তড়িঘড়ি করে অ্যারেঞ্জ করা। নতুন চরিত্রে অভ্যস্ত হবার জন্য কোনওরকম সময় পায়নি রানা বা রায়হান, লোকজনের সঙ্গে যত বেশি কথা বলবে, ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ততই বেশি।

সিআইএ-র লস অ্যাঞ্জেলেস ব্যুরো থেকে পালানোর পর গতকালকের বাকি সময়টা মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটেছে। রায়হানের অনুমান ঠিক ছিল—সিকিউরিটি প্রটোকল বদলে ফেলতে পারেনি বুলডগের লোকজন, তার আগেই সাইবার ক্যাফেতে বসে দ্রুত একটা ভাইরাস তৈরি করেছে ও, সেটা প্ল্যান্ট করে দিয়েছে সিআইএ মেইনফ্রেমে। এর ফলে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা ড. ডোনেনকে কোনও রকম ডেটাবেজ থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না বলে আশা করছে ওরা। অবশ্য বুলডগের হাতে যদি নাফিজের সোর্সের মত এমন কোনও লোক থাকে, যে বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের খবর জানে—তা হলে আলাদা কথা। ওটুকু ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে, করার কিছু নেই।

রাত পর্যন্ত পালিয়ে বেড়িয়েছে ওরা, কোথাও পনেরো-বিশ মিনিটের বেশি থাকেনি, ট্যাক্সি বা সিটি সার্ভিসের বাসে ঘুরেছে সারা শহরে। নাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে পে-ফোনের মাধ্যমে। শেষে রাত আটটায় একটা নির্জন পার্কিং লটে ওদের সঙ্গে দেখা করেছে শাখাপ্রধান—জাল পরিচয়পত্র, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্ট, ব্রাইটন টেকনোলজিসের নিয়োগপত্র, সেই সঙ্গে ছদ্মবেশের সরঞ্জাম তুলে দিয়েছে হাতে। চেহারা পাল্টে মেক্সিকান ওয়ার্কার সেজেছে রানা আর রায়হান, কাগজপত্র নিয়ে ঠিক রাত ন'টায় হাজির হয়েছে ব্রাইটনের প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপে—সেখানে রি-সাপ্লাই নিয়ে যাবার জন্য একটা ডিসি-থ্রি কার্গো এয়ারক্রাফট অপেক্ষা করছিল। কাগজপত্র আর ছদ্মবেশ নিখুঁত ছিল, রানাদের সন্দেহ করেনি কেউ—আসল ওয়ার্কারদের টাকা খাইয়ে আগেই বিদায় করে দিয়েছে নাফিজ, তা ছাড়া ওরা এই প্রথম ব্রাইটনের হয়ে কাজ করতে আসছিল, তাই এয়ারস্ট্রিপে আসল মেক্সিকানদের পূর্ব-পরিচিত কেউ ছিল না। নির্বিঘ্নে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে মাল তোলার কাজ করেছে রানা আর রায়হান, লোডিং শেষ হলে চড়ে বসেছে বিমানে। রিসার্চ এরিয়ায় সমস্ত মালামাল আনলোড করে ফিরে আসার কথা শ্রমিকদলটার।

চোখের পাতায় রোদের অত্যাচারে দৃষ্টি মেলল রানা, পাশে তাকিয়ে দেখল—রায়হান এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সামান্য হাঁ হয়ে আছে মুখটা, চেহারাটা কেমন যেন বাচ্চা-বাচ্চা দেখাচ্ছে। ওকে না জাগিয়ে টয়লেটে গেল রানা, প্রাতঃকৃত্য আর হাত-মুখ ধোয়া সারল। যখন ফিরে এল, তখন জেগে গেছে তরুণ হ্যাকার, হাতের তালু দিয়ে শরীরের এখানে-সেখানে ডলছে।

boighar.com

'ভালই ঠাণ্ডা লাগছে দেখি,' রানাকে এগোতে দেখে বলল ও।

'হুঁ, আর্কটিক সার্কেলে পৌঁছে গেছি,' বলল রানা। ওভারহেড বিন থেকে ব্যাগ নামিয়ে বাড়তি একটা ইনসুলেটেড জ্যাকেট দিল রায়হানকে, নিজেও পরল। প্লেনে চড়ার সময় ব্রাইটনের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন গিয়ার—তার মধ্যে জ্যাকেট ছাড়াও উলের ক্যাপ, নায়লনের প্যান্ট, গ্লাভস্ আর মুনবুট আছে।

'অন্যেরা জেগে ওঠার আগেই বাথরুম সেরে এসো,' বলল রানা। 'একটু একটু করে ঠাণ্ডা কিন্তু বাড়তেই থাকবে, দেরি করলে অসুবিধেয় পড়বে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল রায়হান, ও চলে যেতেই জানালার পাশের সিটটা দখল করল রানা, তাকাল বাইরে।

প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় ছুটে চলেছে বিমানটা, ইঞ্জিনের গর্জনে কান ঝালাপালা। এই উচ্চতায় গোলাকার পৃথিবীর বড়সড় একটা অংশ দৃষ্টিগোচর হবার কথা, কিন্তু বিমানটার নীচে মেঘের স্তরের কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁকফোকর পাওয়া যায়, সেখান দিয়ে তাকিয়ে সাগরের সুনীল পানি দেখতে পেল রানা, এখানে-সেখানে উঁকি দিচ্ছে শুভ্র আইসবার্গের ঝলমলে চূড়া—যেন নীল এক চাঁদোয়ায় খচিত হীরকখণ্ড ওগুলো।

হাতঘড়ি দেখল রানা, মনে মনে হিসেব করে বুঝল, অন্তত দু'ঘণ্টা আগে আলাস্কার উপকূল পেরিয়ে এসেছে ওরা, সামনে আরও এক ঘণ্টার জার্নি। ডিসি-থ্রি'র গতি এমনিতেই কম, তার উপর কার্গোতে ভর্তি থাকায় ভারী হয়ে গেছে ওদের বিমানটা; সে-কারণে স্বাভাবিকের চাইতেও ধীরে যাচ্ছে। তিন হাজার মাইলের দূরত্ব পেরোতে সময় নিচ্ছে এগারো ঘণ্টার মত। এটা একটা জেট ফাইটার হলে কতই না ভাল হতো! অর্ধেকেরও কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যেত গন্তব্যে।

পাশে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা—রায়হান ফিরে এসেছে। সিটে বসতে বসতে বলল, 'বাপরে! পানি তো না, যেন বরফ ছুঁয়ে এলাম।'

হেসে ফেলল রানা। 'আমি তো জানতাম তুমি গরম সহ্য করতে পারো না, ঠাণ্ডা বেশি পছন্দ করো। অন্তত তোমার রুমের এসি-র টেম্পারেচার যেভাবে কমিয়ে রাখো...'

'মাইনাস টেম্পারেচার আর এসি-র পনেরো-ষোলো ডিগ্রি কী এক হলো, মাসুদ ভাই। একটা টেম্পারেচার শরীর ঠাণ্ডা করে, অন্যটা আইসক্রিম বানায়। ভয়ই লাগছে এখন।'

'হুম, মেরু অঞ্চলের সার্ভাইভাল ট্রেনিং নাওনি এখনও—সেটা কথা শুনেই বুঝতে পারছি।'

'এ বছরের শুরুতে নাম এসেছিল, কাজের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছি।' বলেই দাঁত দিয়ে জিভ কামড়াল রায়হান। 'এই রে, কথাটা বলে দিয়ে ভাল করলাম না বোধহয়।'

'ভালই করেছ,' রানার গলায় কপট রাগ। 'তোমার ট্রেনিং যে শেষ হয়নি, সেটা জেনে গেলাম। এবার ফিরে গিয়েই তোমার জন্য স্পেশাল ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করতে হবে।'

‘মরে যাবো, গুরু!’ হাত জোড় করল রায়হান। ‘এত বড় শাস্তি দেবেন না।’

‘শাস্তি আর দেখলে কোথায়? এই যে এখন আর্কটিকে যেতে হচ্ছে, ট্রেনিংটা করা থাকলে কত্তো সুবিধে হতো, ভাবো তো!’

‘অসুবিধেই বা দেখছেন কোথায়? ঠাণ্ডায় কাবু মনে হচ্ছে নাকি আমাকে? সম্পূর্ণ ফিট আমি...’ বলতে বলতেই *হ্যাচ্চো* করে বিশাল এক হাঁচি দিল তরুণ হ্যাকার। নিজেকে সামলে মাথা তুলতেই রানার কপালে ভ্রূকুটি দেখতে পেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘যেখানে বাঘের ভয়...কপালটাই মন্দ আমার। কী আর করা, দিন মাসুদ ভাই, ভালমত ট্রেনিং দিন। বরফ তো বরফ, চাইলে জ্বলন্ত নরকেও পাঠাতে পারেন।’

ওর বলার ভঙ্গি শুনে মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। আর কিছু না বলে চোখ রাখল জানালায়। কিছুক্ষণ পরেই দিগন্তের কাছে উদয় হলো ভূখণ্ড। আবছা একটা আকৃতি—ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। আরেকটু কাছাকাছি যেতেই চোখে ধরা পড়ল আইস শেলফটার খুঁটিনাটি।

মন্টেগো আইস শেলফ উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বড় নিরেট বরফখণ্ডগুলোর একটা। বিরাশিতম অক্ষাংশের উপরে, আলাস্কার উত্তর উপকূল থেকে দুইশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। সাড়ে ষোলো বর্গমাইল আয়তনের এই দ্বীপটার পুরুত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচশো ফুট—বেশিরভাগটাই পানিতে ডুবে আছে। ভাসমান হলেও অবিশ্বাস্য আয়তনের কারণে মন্টেগোর নড়াচড়া খুব কম, নেই বললেই চলে। সাগরের স্রোতের এত শক্তি নেই যে, এত বড় একটা জিনিসকে নড়াবে।

পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে বরফে গড়া উঁচু উঁচু একসারি পাহাড় দেখতে পেল রানা, চুড়োগুলো থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে সূর্যের আলো। অবারিত বরফের প্রান্তর থেকেও প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ, পুরো দ্বীপটাই যেন ঝলমল করছে—একটানা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে চায়। মে মাস হওয়ায় দিনের এই চমৎকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, নইলে আর্কটিক এলাকা বছরের বেশিরভাগ সময় অন্ধকারে ডুবে থাকে।

‘উরিব্বাস!’ জানালার দিকে ঝুঁকে বাইরের দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে বলে উঠল রায়হান, জীবনে এই প্রথম আইস শেলফ দেখছে ও। ‘কী এক দৃশ্য! অপূর্ব!’

‘ল্যান্ড করে নিই খালি,’ মুচকি হাসল রানা। ‘ঠাণ্ডার কামড়ে সমস্ত উচ্ছ্বাস কর্পূরের মত উবে যাবে তোমার।’

ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, উচ্চতা কমে আসছে—ল্যান্ড করবে এখন বিমান। তিন হাজার ফুট পর্যন্ত নামতেই অনেক কাছে চলে এল দ্বীপটা, দূরত্ব কমে আসায় জায়গাটাও দেখা গেল পরিষ্কারভাবে। দিগন্ত আড়াল করে দেয়া পর্বতের সারির গোড়া থেকে সাগর পর্যন্ত এলাকাটা বিশাল উপত্যকার মত—পুরোটা তুষারের ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। আইস শেলফের কিনারাগুলো পাহাড়ের খাড়া ক্লিফের মত, ঝপ করে নেমে গেছে এক-দেড়শো ফুট, সোজা গিয়ে মিলেছে সাগরের হিমশীতল পানিতে। উচ্চতা আরও কমতেই বিশাল এক

boighar.com

সাদা রঙের গম্বুজ দেখা গেল বরফের উপরে—একটা ডোম। ওটার ভিতরেই সম্ভবত রিসার্চ চলছে।

বাল্কহেডে বসানো স্পিকার জ্যান্ত হয়ে উঠল, সবাইকে সিটবেল্ট বাঁধতে বলছে পাইলট, কয়েক মিনিটের মধ্যে মাটি ছোঁবে ডিসি-থ্রি।

হারনেসের বাকল আটকাতে আটকাতে রায়হান বলল, 'বরফের উপরেই ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে নাকি?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' পোর্টহোল দিয়ে নীচে দৃষ্টি বোলাল রানা। এতক্ষণে কয়েকটা আইস-ট্র্যাক্টর চোখে পড়ল ওর—ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর সাহায্যে বেশ কিছুটা জায়গার বরফ সমান করে একটা মেক-শিফট এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করা হয়েছে।

নাক নামিয়ে নীচের দিকে ছুটে যাচ্ছে বিমানটা, পাঁচশো ফুটে নামতেই শুরু হলো টার্বিউলেন্সের অত্যাচার—গোটা ফিউজলাজ প্রবল ঝাঁকুনিতে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত পিষে উপদ্রবটা সহ্য করবার চেষ্টা করছে যাত্রীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিউজলাজের আর্তনাদ ছাপিয়ে রেট্র্যাক্টেবল ল্যান্ডিং গিয়ার এনগেজ হবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

প্রবল বাতাস বইছে আইস শেলফের উপর দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে অবাধ্য আকাশযানটাকে। এই আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আশ্চর্য কৌশলে ব্যালেন্স ধরে রাখল দুই পাইলট—এসব নতুন কিছু নয়, তিন দিন পর পর এখানে আসতে হয় ওদের। অল্প সময়ের মধ্যেই সারফেসের কাছাকাছি চলে এল বিমানটা, সেই সঙ্গে যেন চোখের পলকে গায়েব হয়ে গেল টার্বিউলেন্সের উৎপাত। নাক উঁচু করে পিছনের দুই চাকার উপর ভর দিয়ে ল্যান্ড করল ডিসি-থ্রি, পোর্টহোল দিয়ে দুপাশে তুষার ছিটকাতে দেখল যাত্রীরা। লাগামহীন ঘোড়ার মত বেশ কিছুদূর ছুটল যান্ত্রিক পাখিটা, তবে ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে...দুশো গজ পেরিয়ে একেবারে থেমেই গেল।

ইঞ্জিনের আওয়াজ পাল্টে গেছে, ওটা এখন আইড্‌লে। সুস্থির হয়ে সবার আগে সামনের সারির সিট থেকে উঠে দাঁড়াল ওয়ার্কারদের ফোরম্যান। নিজের দলের দশ সদস্যের দিকে ফিরে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল সে, তা থেকে জানা গেল—ফুল আর্কটিক গিয়ার পরে সবাইকে নামতে হবে প্লেন থেকে। আইস-ট্র্যাক্টর আসবে অল্প সময়ের মধ্যে, কার্গো সেকশন থেকে সমস্ত মালামাল আনলোড করে ওগুলোয় তুলতে হবে, আবার রিসার্চ প্রজেক্টের স্টোরেজ সেকশনে গিয়ে নামাতে হবে সব। কাজ শেষ হবার পর সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে মেস-হলে, সেখানে খাওয়াদাওয়া এবং বিশ্রাম শেষে দু'ঘণ্টা পর আবার উড়াল দেবে বিমানটা। সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হলো—অকারণে কেউ যেন এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা না করে, রিসার্চ প্রজেক্ট একটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া।

যার যার গিয়ার দ্রুত পরে নিল সবাই। সাধারণ জামাকাপড় তো আছেই, তার উপর দিয়ে নায়লনের জাম্পসুট পরতে হলো প্রথমে, তারপর থাকল পশমের তৈরি ভারী প্যান্ট আর হুড লাগানো জ্যাকেট। সাধারণ জুতো খুলে উলের মোটা দুই প্রস্থ করে মোজা আর মুনবুটও পরল দলটা, হাতে গলাল মোটা মোটা গ্লাভস।

প্লেনের কেবিনের ভিতরে এখনও উত্তাপ আছে, আর্কটিকের পোশাক-আশাকে ঘামতে শুরু করল মানুষগুলো। কিন্তু একটু পরে একজিটের দরজা খুলতেই হিংস্র পশুর মত হানা দিল চরম শীতল বাতাস, মুখের উন্মুক্ত চামড়ায় নির্মম কামড় বসাতেই প্রত্যেক যাত্রী উপলব্ধি করতে পারল এই পোশাকের গুরুত্ব।

ফোরম্যান সবাইকে তাড়া দিচ্ছে নীচে নামার জন্য, সিটের সারির মাঝখানের আইল্ ধরে অন্যান্য ওয়ার্কারদের পিছু পিছু এগোল রানা ও রায়হান, দরজা গলে ল্যাডার বেয়ে আইস শেলফের বরফে পা রাখল। নতুন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে আশপাশে—ভারি। শব্দটা বাড়াতে বাড়াতে দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো দুটো বড়সড় আকারের আইস-ট্র্যাক্টর—চওড়া মাল্টিট্রেডের খাঁজকাটা ট্র্যাকগুলো বরফে কামড় বসিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছে যানদুটোকে। দুটোরই পিছনে কন্টেইনার আকারের বড় বড় ট্রেইলার লাগানো আছে—ওতে করেই কার্গো নেয়া হবে। একেবারে বিমানের লেজের কাছে গিয়ে থামল ট্র্যাক্টরগুলো, ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে ট্রেইলারদুটোকে অ্যালাইন করল বিমানের সঙ্গে। www.boighar.com

ডিসি-থ্রি'র পিছনের র‍্যাম্প খুলে গেছে, ওয়ার্কারদের সঙ্গে এগোল রানা আর রায়হান, হাত লাগাল আনলোডিঙের কাজে। কার্গো সেকশনের নেট আর সব ধরনের বাঁধন খুলে ফেলা হলো, হাতে বা কাঁধে করে একের পর এক বাক্স আর কার্টন ট্রেইলারে নিয়ে যেতে শুরু করল সবাই। কঠিন কোনও কাজ নয়, পনেরো মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেল তা। তবে এরপরেই আরও পনেরো মিনিট ব্যয় হলো পোর্টেবল একটা ড্রিলিং মেশিন শিফট করতে—আকারে বেশ বড় ওটা, ওজনও অনেক—রিসার্চ প্রজেক্টের অকযিলারি ইকুইপমেন্ট হিসেবে রিসাপ্লাই ফ্লাইটে এসেছে ওটা। ভারী জিনিসটাকে নামাতে প্রায় সব ওয়ার্কারকেই হাত লাগাতে হলো—র‍্যাম্প ধরে নামাতে, তারপর আবার ট্রেইলারে তুলতে ঘাম বেরিয়ে গেল সবার। এত কষ্ট হবার কথা নয়, আসলে পুরু আর্কটিক ক্লোদিঙের কারণে স্বাভাবিক নড়াচড়া করতে পারছে না কেউ, সেজন্যেই এত ঝামেলা হয়েছে।

অবশেষে, আধঘণ্টা পর যখন শিফটিঙের কাজ শেষ হলো, ওয়ার্কারদের তুলে নেয়া হলো আইস-ট্র্যাক্টরে। সংখ্যায় ওরা দশজন, তা ছাড়া ফোরম্যান আর দুই পাইলটও রয়েছে... প্লেক্সিগ্লাসে মোড়া কেবিনে জায়গা হলো না সবার, অর্ধেকের বেশি লোককে দুই ট্রেইলারে মালামালের সঙ্গে গাদাগাদি করে বসতে হলো। ট্র্যাক্টরের কেবিন বায়ু-নিরোধী, তারওপর হিটারের মাধ্যমে চমৎকারভাবে উত্তপ্ত করা—এমন আরামের পরিবেশটাতে যারা জায়গা পেল না, তাদের মুখ দিয়ে গালাগালের তুবড়ি ছুটল।

ইচ্ছে করেই দ্বিতীয় গ্রুপের সঙ্গে রইল রানা আর রায়হান—মিথ্যে পরিচয় আর ছদ্মবেশে রয়েছে ওরা, যতটা পারে বিরূপ পরিবেশে থাকাই ভাল, সঙ্গী-সাথীরা খেজুরে আলাপের সুযোগ পাবে না।

ট্রেইলারের রিয়ার ডোর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ভিতরটায় আবছা অন্ধকার। সামনের দিকে, মানুষ-সমান উঁচুতে সরু এক ফালি প্লেক্সিগ্লাস বসানো—সেখান দিয়ে সামান্য আলো আসছে ভিতরে। মৃদু ঝাঁকি আর ইঞ্জিনের শব্দ শুনে বোঝা

boighar.com

গেল, চলতে শুরু করেছে ট্র্যাক্টরদুটো। উঠে দাঁড়াল রানা ও রায়হান, চোখ রাখল ট্র্যাক্টরের মাথার উপর দিয়ে বাইরে। বাকি দুজন ওয়ার্কার হয়তো আগেও এসেছে এখানে, তাই বাইরে তাকাবার আগ্রহ বোধ করছে না, ঠায় বসে শীতে কাঁপছে; দুলছে ঝাঁকুনিতে; সময় গুনছে রিসার্চ প্রজেক্ট পর্যন্ত ছোট্ট জার্নিটা শেষ হবার অপেক্ষায়।

ছোট একটা টিলা পেরিয়ে এল ট্র্যাক্টরদুটো; প্লেক্সিগ্লাসের কল্যাণে সামনের বিস্ময়কর দৃশ্য দুচোখ ভরে উপভোগ করল রানা ও রায়হান।

বরফে মোড়া বিশাল এক প্রান্তর ছড়িয়ে রয়েছে সামনে, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। একেবারে সমতল নয় জায়গাটা, উঁচু-নিচু খানা-খন্দ রয়েছে প্রচুর, তবে এই দূরত্ব থেকে সেগুলোর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সফেদ রঙের প্রাচুর্য ঢেকে দিয়েছে আইসশেলফের পিঠের সমস্ত খুঁত, মনে হচ্ছে যেন বিশাল এক সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। মাঝখানে একেবারে বেমানান হয়ে মাথা তুলে রেখেছে রিসার্চ প্রজেক্টের বিশাল গম্বুজ-আকৃতির কমপ্লেক্সটা...যেন ফোস্কা পড়েছে বরফের গায়ে—এখনও দু'মাইল দূরে ওটা।

বৃহদায়তন ডোমটা বর্তমান পরিস্থিতির চেয়ে একটা সায়েন্স ফিকশন মুভিতেই মানাবে বেশি। হঠাৎ দেখায় এস্কিমোদের ঈগলু'র মত লাগে জিনিসটাকে, তবে ভাল করে তাকালে চোখে ধরা পড়ে পার্থক্যটা। বরফের চাঁই নয়, ওটা আসলে প্লেক্সি-পলিসরবেট নামে এক ধরনের অত্যাধুনিক মাল্টি-স্টেজ ইনফ্লেটেবল পলিমারে তৈরি। একেকটা অংশ ঈগলুর চৌকোনা বরফখণ্ডের মতই, বাতাস ভরে ফুলিয়ে নিতে হয়। শেপগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা নিখুঁতভাবে এয়ারটাইটভাবে জোড়া দেয়ার ব্যবস্থা আছে—সেভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে গম্বুজের মত আকৃতি দেয়া হয়েছে, তারপর গোটা জিনিসটাকে তাঁবু খাটানোর পদ্ধতিতে নানা রকম ওয়ায়্যার ও পিটনের সাহায্যে বসানো হয়েছে বরফের উপর। এর ভিতরেই গড়ে উঠেছে ব্রাইটন টেকনোলজির রিসার্চ ফ্যাসিলিটি—অভ্যন্তরের ডায়ামিটার চারশো গজের মত—আকৃতিটা অবিশ্বাস্য।

টিলার ঢাল বেয়ে নীচে নেমে ধীর গতিতে এগোতে শুরু করেছে আইস-ট্র্যাক্টরদুটো, পিছনে মালপত্রভরা ভারী ট্রেইলার টানছে, তাই স্পিড বাড়াতে পারছে না। কমপ্লেক্সের দিকে সরলরেখায়ও যাচ্ছে না—অবারিত আইস শিটের এখানে-ওখানে লুকিয়ে রয়েছে বাহনগুলোকে আটকে ফেলার জন্য অসংখ্য ফাঁদ, সেগুলোকে ফাঁকি দিতে আঁকাবাঁকা একটা ট্রেইল ধরে যাচ্ছে ওগুলো।

চোখের সামনে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল—ঝিরঝির করে তুষার পড়তে শুরু করেছে, ট্র্যাক্টরদুটোর উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে দুরন্ত বাতাস...*ক্যাবাটিক উইন্ড* বলে একে। ক্যাবাটিক শব্দটা গ্রিক, অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামা। মেরু অঞ্চলের ভারী, ঠাণ্ডা বাতাস পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে উন্মত্ত নদীর প্রবাহের মত নীচে ধেয়ে আসে বলে এমন নাম রাখা হয়েছে।

আবহাওয়ার এই হঠাৎ পরিবর্তন দেখে অবাক হবার কিছু নেই—মেরু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই এমন। এই ভাল তো এই খারাপ। ঝকঝকে নির্মল প্রকৃতিকে

নিমেষে গ্রাস করতে পারে প্রবল তুষারঝড়—স্থায়িত্ব হতে পারে টানা দু'তিন দিন, আবার চোখের পলকে থেমে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়।

গতি কম হলেও আঁকাবাঁকা ট্রেইলটা ধরে আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ি দেয়া সম্ভব পথটা, তবে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় দশ মিনিট বেশি লেগে গেল। প্রকৃতির নিদারুণ রসিকতাই বলতে হবে, ছোট্ট কনভয়টা কমপ্লেক্সের একদম কাছাকাছি পৌঁছুতেই ঝড়-টড় সব থেমে গেল, আবারও উজ্জ্বল রোদে হেসে উঠল দিগ্বিদিক। ব্যাপারটা লক্ষ করে তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। অতীতের বাজে কিছু অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেছে।

বেশ কয়েকটা প্রবেশপথ আছে ডোমে ঢোকার জন্য, ট্রেইলার সহ আইস-ট্র্যাক্টরদুটো চলে গেল সার্ভিস অ্যাকসেসে। স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে যেতেই একটা র‍্যাম্প ধরে ঢুকে পড়ল স্টোরেজ সেকশনে, পিছনে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করে প্লেক্সিগ্লাসের কেবিন থেকে নেমে এল ড্রাইভার, সেইসঙ্গে অন্যান্য আরোহীরা; ট্রেইলারদুটোর রিয়ার ডোরও খুলে দেয়া হলো।

লাফ দিয়ে মাটিতে নামল রানা আর রায়হান। আধো-অন্ধকার থেকে আবার আলোয় ফিরে আসায় ওদের দুই সঙ্গী দৃষ্টি সইয়ে নিতে চোখ পিট পিট করল বারকয়েক। স্টোরেজ সেকশনটা আসলে বিশাল একটা গুদামঘর, অ্যাকসেস ডোর বরাবর সামনে ফাঁকা রয়েছে বেশ অনেকখানি জায়গা—লোডিং-আনলোডিঙের জন্য। গুদামের বাকি অংশের পুরোটা আট-ন'ফুট উঁচু অসংখ্য র‍্যাকে ভর্তি, তাতে হরেক রকমের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ডোমের ভিতরটা সেন্ট্রাল এসি-র নিয়ন্ত্রণে থাকায় আরামদায়ক একটা তাপমাত্রা বিরাজ করছে, জাম্পসুট ছাড়া উপরের সব কাপড় খুলে ফেলা গেল। মাথার উপরে বড় বড় টিউবলাইট ঝুলিয়ে ভালমত আলোকিতও করা হয়েছে জায়গাটা।

ফোরম্যান তাড়া দিচ্ছে, আনলোডিঙের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওয়ার্কাররা। বেশিরভাগ কার্টন আর বাক্সের ঠাঁই হলো ওয়্যার-হাউসের বিভিন্ন র‍্যাকে, খাবারভর্তি প্যাকেজগুলো নিয়ে এক গ্রুপ চলে গেল কুক-হাউসে। সবশেষে এল ভারী ড্রিলিং মেশিনটার পালা। ওয়্যারহাউসে চেইন-পুলিসহ কেইবল্-উইঞ্চ আছে, এ-কারণে মাত্র চারজনেই ওটাকে ট্রেইলার থেকে একটা চাকা-লাগানো ট্রলিতে নামিয়ে আনতে পারল।

'গুড জব,' কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করল ফোরম্যান।

অ্যাপ্রন পরা একজন টেকনিশিয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, চোখেমুখে বিরক্ত ভাব ফুটে রয়েছে তার। কাছে এসে বলল, 'এটাকে এখানে রেখে দিলেন কেন? মেইন চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে তো, জানেন না?'

শ্রমিকদের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন শুরু হলো, সবাই বিরক্তিসূচক শব্দ করছে। ট্রলিতে বসানো হলেও ড্রিলিং মেশিনটা হালকা কোনও বস্তু নয়, ঠেলে নিয়ে যেতে জান বেরিয়ে যাবে। ব্যাপারটা জানা আছে ফোরম্যানেরও। সে বলল, 'আমাদের কাজ শুধু স্টোরেজ এরিয়াতে মাল পৌঁছানো পর্যন্ত। ভিতরে নিতে হলে নিজেরা নিয়ে যান।'

'কী আশ্চর্য! নিজেরা নিয়ে যান মানে? আমি লোক কোথায় পাব?'

boighar.com

'কেন, এতবড় প্রজেক্ট চালাচ্ছেন...ওখান থেকে দু'চারটে লোক আনতে পারছেন না?'

'এখানকার সবাই বিজ্ঞানী আর তাঁদের সাপোর্ট স্টাফ, কেউ গতর খাটানো শ্রমিক নয়,' গরম গলায় বলল টেকনিশিয়ান। 'এসব কাজ করার জন্য আপনাদের আনা হয়েছে।'

আঁতে ঘা লেগেছে ফোরম্যানের, মুহূর্তেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল তার। এগিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের গায়ে গা লাগিয়ে মুখোমুখি হলো সে। 'কী বললেন? আমরা গতর খাটানো শ্রমিক?'

লড়াই একটা বেধেই যেত, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে এল রানা। বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান! ঝগড়া করার মত কিছু ঘটেনি এখানে।' মেক্সিকান অভিবাসীদের অনুকরণে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে ইংরেজি বলছে ও। ফোরম্যানের দিকে ফিরল। 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, স্যর...আমি আর এস্তেবান গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি ট্রলিটা।'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না ফোরম্যান, কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল প্রতিপক্ষের দিকে—চোখের আগুনে ভস্ম করে দিতে চায়। টেকনিশিয়ান লোকটাও একইভাবে তাকিয়ে আছে দেখে বুঝল, সুবিধে করতে পারবে না। উল্টো ঘুরে গটমট করে হেঁটে চলে গেল সে।

'এসো আমার সঙ্গে,' রানাকে বলল টেকনিশিয়ান।

হাতছানি দিয়ে রায়হানকে ডাকল রানা। দুজনে মিলে ভারী ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে পিছু নিল লোকটার।

ইচ্ছে করেই ব্যাপারটায় নাক গলিয়েছে রানা। ওয়্যারহাউসে পা রাখার পর থেকেই ওখান থেকে প্রজেক্টের মূল অংশে যাবার উপায় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল ও—ওখানেই কোথাও ড. ডোনেনের থাকবার কথা। কিন্তু শুধু গুদামের সিকিউরিটি দেখেই দমে যেতে হয়েছে। ওয়ার্কারদের চোখে চোখে রাখবার জন্য আলাদা লোক আছে, ওয়্যারহাউস থেকে বেরুবার দরজায়ও আছে সশস্ত্র গার্ড। প্লেন থেকে নামার আগে ফোরম্যান যা বলেছিল, তা বানোয়াট কিছু ছিল নয়, সত্যিই এখানকার সিকিউরিটি অত্যন্ত কড়া। যাকে-তাকে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেয়া হবে না। এ পরিস্থিতিতে ড্রিলিং মেশিনটা একটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে—বিনা বাধায় প্রজেক্টের ভিতরে ওদের নিয়ে যাবার একটা অজুহাত খাড়া করে দিয়েছে ওটা।

এরপর বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে খুঁজে বের করার পালা। সত্যিই তিনি আছেন তো এখানে?

এগারো

'সাহায্য করায় ধন্যবাদ,' হাঁটতে হাঁটতে বলল টেকনিশিয়ান। 'তবে ঝামেলাটা কিন্তু

আমার জন্য শুরু হয়নি। রজার...মানে তোমাদের ওই ফোরম্যান...আস্ত খচ্চর একটা। প্রতিবারই এসে একটা না একটা গোলমাল পাকায়। আরে বাবা, দু'একটা ইকুইপমেন্ট ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলে ক্ষতিটা কোথায়?'

'আপনিও অবশ্য খোঁচা মেরে কথা বলেছেন।' ফোরম্যানকে একা দোষারোপ করতে রাজি নয় রানা। 'শ্রমিকরা আপনাদের মত বিদ্বান না হতে পারে, তাই বলে ওদের ছোট করে দেখাটা উচিত নয়।'

'ও! গতর খাটাও বলেছি দেখে দুঃখ পেয়েছ? সরি!'

'শরীর খাটিয়ে কাজ করাটা খারাপ কিছু নয়—শ্রমিকরা এতে গর্ববোধ করে। আসলে আপনার বলার ভঙ্গিটা ভাল ছিল না।'

অন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল টেকনিশিয়ান—এই মেক্সিকান ওয়ার্কারের ভিতরে কী যেন একটা আছে...ব্যক্তিত্ব, তাই না? আটপৌরে চেহারার সঙ্গে একেবারেই বিসদৃশ ব্যাপারটা। কথা বলার ভঙ্গিতে অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে এই যুবকের, আর চোখ... সেদিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল সে—মণিদুটো আশ্চর্য গভীর, সেখানে মায়া, মমতার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতার ছাপ! একজন সাধারণ শ্রমিকের সামনে নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হতে পারে, তা ওর কল্পনাতেও ছিল না।

রানার কথায় বাস্তবে ফিরে এল লোকটা।

'দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? পথ দেখান।'

আবার হাঁটতে শুরু করল টেকনিশিয়ান। জানতে চাইল, 'নাম কী তোমার?'

'হিউগো। আর ও হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই এস্তেবান।'

'আমি নেভিল ব্রিক,' হাসল লোকটা। 'কদ্দিন ধরে ব্রাইটনে কাজ করছ তোমরা?'

প্রশ্নবাণ শুরু হচ্ছে দেখে শঙ্কিত বোধ করল রানা—হিউগো আর এস্তেবান সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না ওরা। এই মুহূর্তে মিথ্যে আর বানোয়াট কথাবার্তা বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে, তবে পরে লোকটা সেসব তথ্য কোথাও মিলিয়ে দেখতে গেলেই গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে আলাপচারিতার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে রাখতে হবে।

'এই প্রথম এসেছি আমরা,' জবাব দিল রানা, তারপর অপরপক্ষকে দ্বিতীয় কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই ছুঁড়ে দিল একটা প্রশ্ন। 'এখানে কী ধরনের গবেষণা চলছে, মি. ব্রিক?'

'এক্সপেরিমেন্টাল মাইনিং অপারেশন—ন্যানোটেকনোলজির সাহায্যে,' বলল ব্রিক। 'প্রযুক্তিটার নাম শুনেছ?'

'শ্রমিক হতে পারি, তাই বলে অকাট মূর্খ নই আমরা, স্যার,' লোকটার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ টের পেয়ে বিরক্তগলায় বলল রানা। 'বিভিন্ন পদার্থের মলিকিউলার লেভেলে কাজ করার পদ্ধতিকেই তো ন্যানোটেকনোলজি বলে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল ব্রিক। 'তোমরা দেখি অনেক কিছু জানো।'

'আমরা শিক্ষিত মানুষ,' বলল রানা। 'ঠেকায় পড়ে শ্রমিকের চাকরি নিয়েছি।'

'তা-ই তো দেখছি।'

স্টোরেজ এরিয়া থেকে বেরিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে

boighar.com

ওরা। ফ্যাসিলিটির আবরণটা প্লেক্সিপলিসরবেটের হলেও ভিতরের সবকিছু পার্টিশান করা হয়েছে কাঠ দিয়ে। মোটামুটি বৃত্ত আকারেই কয়েকটা স্তর তৈরি করা হয়েছে, একেকটা স্তরকে আড়াআড়ি দেয়ালের মাধ্যমে ভাগ করে বানানো হয়েছে বিভিন্ন কামরা—ছোট-বড়, সব আকারেরই আছে। মূল ওয়ার্কিং এরিয়াটা পড়েছে কেন্দ্রে, ওখানেই যাচ্ছে ওরা। এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যেতে নির্দিষ্ট প্যাসেজ আছে, সামনে তেমনই একটা তীক্ষ্ণ বাঁক পড়ল, সেখানে দুজন সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়ানো। হাত নেড়ে দুই ওয়ার্কারের ব্যাপারে তাদের আশ্বস্ত করল ব্রিক, তারপর আবার এগোল সামনে। পুরো ফ্যাসিলিটি জুড়েই এমন প্রহরা আছে, কিছুক্ষণ পর পর সেগুলো পেরোতে হচ্ছে ওদের।

ডোমটা বিশাল, এর কোথায় ড. ডোনেন আছেন, কে জানে! রানা ভেবে দেখল, আলাপচারিতার একটা সুযোগ যখন সৃষ্টি হয়েছে, ব্রিকের কাছ থেকে কথাচ্ছলে ব্যাপারটা জেনে নেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। তাই ও প্রশ্ন করল, 'আইস শেলফে কী ধরনের মাইনিং করা সম্ভব...তাও আবার ন্যানোটেকনোলজির সাহায্যে?'

'বায়ুমণ্ডলের চেয়ে নিরেট বরফ থেকে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন...এমনকী ডিউটেরিয়ামও পাওয়া অনেক সহজ, আমরা ন্যানোরোবোটিক্সের মাধ্যমে ওই কাজটাই করবার চেষ্টায় আছি।'

'ন্যানোরোবোটিক্স!'

'হ্যাঁ, মাইক্রোস্কোপিক সাইজের মেশিন ওগুলো—সাধারণ মানুষ, বা যন্ত্রের চেয়ে অনেক দ্রুত আর দক্ষভাবে কাজ সারতে পারে। বরফের মলিকিউলার লেভেলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় ওগুলো—বরফ গলিয়ে সাধারণ পানি বানায়, তারপর সেটাকে দ্বিতীয় একটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে ডিউটেরিয়াম অক্সাইড, মানে ভারী পানিতে রূপান্তরিত করে।'

www.boighar.com

ভারী পানি কী জিনিস, জানা আছে রানার—নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার হয় ওটা। প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না, ভারী পানি কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করতে হয়। সারা পৃথিবীর প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন বেশ কম, ফলে জিনিসটার চাহিদা খুব বেশি, দামও অনেক। ব্রাইটন টেকনোলজি তাদের ব্যবসার জন্য ভাল একটা সেক্টরই বেছেছে। তবে ওরা যে পদ্ধতিতে উৎপাদনের কথা বলছে, সেটা আগে কখনও শোনেনি ও। তাই একটু বিস্ময় নিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ন্যানোটেকনোলজির সাহায্যে ডিউটেরিয়াম অক্সাইড মাইনিঙে সফল হয়েছেন?'

'পুরোপুরি সফল হলে কি আর এতবড় রিসার্চ প্রজেক্ট খুলে বসে আছি?' হাসল ব্রিক। 'গবেষণা চলছে, বুঝলে? ছোটখাট অগ্রগতি দুয়েকটা হয়েছে বটে, তবে পুরো প্রসেসটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি প্রয়োগ করতে এখনও অনেক দেরি।'

'কী ধরনের অগ্রগতি হয়েছে?'

'মাইক্রোস্কোপিক রোবট বা ন্যানোবট তৈরি করা হয়েছে, তবে ওগুলোকে এখনও পুরোপুরি কর্মক্ষম করা সম্ভব হয়নি। আপাতত ওগুলোর এফিশিয়েন্সি বাড়াবার চেষ্টা চলছে...'

বক বক করে যাচ্ছে নেভিল ব্রিক, এই ফাঁকে ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি

অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখে নিল রানা—প্যাসেজের মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র গার্ড আছে, কেউ কেউ টহলও দিচ্ছে; এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে ক্লোজ সার্কিট টিভি ক্যামেরা দেখতে পেল ও। প্যাসেজের দুপাশে কিছুক্ষণ পর পর দরজা দেখা যাচ্ছে—ওগুলো নানা ধরনের ল্যাব আর ওয়ার্কশপের প্রবেশপথ—সবগুলোতেই ইলেকট্রনিক কম্বিনেশন লক ফিট করা আছে, অ্যাকসেস কোড ছাড়া ঢোকা যাবে না। ন্যানোটেকনোলজি সংক্রান্ত আবিষ্কার যাতে চুরি হয়ে না যায়, সেজন্য নিখুঁত ব্যবস্থা করেছে ব্রাইটন। ব্রিকের কথায় আবার মনোযোগ ফেরাল ও।

'...কম্পিউটারাইজড্ অপারেশনটা ডেভেলপ করেছেন অত্যন্ত প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী—ড. স্ট্যানলি ডোনেন,' গল্প করার মেজাজে রয়েছে ব্রিক, গড়গড় করে প্রজেক্ট সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে যাচ্ছে সে। 'ইতোমধ্যে ন্যানোবটের এফিশিয়েন্সি শুরুর অবস্থা থেকে দুইশো পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।'

'তাই নাকি?' বলল রানা। 'ভারি গুণী লোক তো! তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ব্রিক। 'ভদ্রলোক ভীষণ কাজপাগল, দরকার ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করেন না। এই যে...এই করিডর ধরে একটু সামনে গেলেই তাঁর অফিস আর ল্যাবরেটরি।' আঙুল তুলে ডানদিকের একটা প্যাসেজ দেখাল ব্রিক। 'গিয়ে লাভ নেই, দরজাই খুলবেন না হয়তো।'

রানা আর রায়হান দাঁড়িয়ে পড়েছে, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে প্যাসেজটার দিকে—লক্ষ্যের এত কাছাকাছি পৌঁছে অন্য কোথাও যেতে মন চাইছে না।

'থেমে গেলে কেন? তাড়াতাড়ি চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে,' তাগাদা দিল ব্রিক।

আবারও ট্রলিটা ঠেলে টেকনিশিয়ানের পিছু নিল রানা আর রায়হান। একটু পরেই বড় একটা অ্যাকসেস ডোর পেরিয়ে ওয়ার্কিং এরিয়ায় পৌঁছে গেল তিনজনে। ডোমের কেন্দ্রস্থল এটা—বিশাল একটা বৃত্তাকার চত্বরের মত। নানা ধরনের ইউনিফর্ম পরে বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানরা কাজে ব্যস্ত ওখানে। যন্ত্রচালিত উইঞ্চ, মোটর, ড্রিলসহ হাজারো যন্ত্রপাতি আর মানুষের কোলাহলে কান ঝালাপালা।

প্রবেশপথের পাশেই একটা বড় টেবিলে রাখা আছে অনেকগুলো হার্ডহ্যাট, সেখান থেকে দুটো তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ব্রিক, নিজেও পরল একটা। 'এগুলো মাথায় দাও।'

হার্ডহ্যাট পরে লোকটাকে অনুসরণ করল রানা ও রায়হান, ট্রলিটা নিয়ে গেল ওয়ার্কিং এরিয়ার একটা পাশে, অন্যান্য আরও ইকুইপমেন্ট আছে ওখানে।

'এই যে...এখানে রাখো।...হ্যাঁ, হয়েছে।' সন্তোষ ফুটল ব্রিকের চেহারায়। 'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের।'

'না, না, ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই,' তাড়াতাড়ি বলল রায়হান। 'আমাদের কাজই তো এটা।'

'তাতে কী? আর তো কেউ এল না। ওরা সবাই গেছে খাওয়া-দাওয়া করতে, অথচ তোমরা কষ্ট করে এই ভারী জিনিসটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে এলে...কৃতজ্ঞতা না জানালে অন্যায় হবে।'

'ইটস্ ওকে,' হাত তুলে টেকনিশিয়ানকে থামাল রানা। 'আমরা কি যেতে পারি

boighar.com

এখন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বলল ব্রিক। 'এদিকে অনেক কাজ, এগিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না বলে দুঃখিত। নিজেরা ফিরতে পারবে?'

'পারব। সবখানে সাইনবোর্ড আছে দেখেছি, মেস-হল খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক আছে, তা হলে বিদায়। আশা করি ভবিষ্যতে কোনও রি-সাপ্লাই ফ্লাইটে এলে আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই,' বলে দ্রুত পা চালাল রানা ও রায়হান। হার্ড-হ্যাটদুটো আগের জায়গায় রেখে বেরিয়ে এল ওয়ার্কিং এরিয়া থেকে।

'এবার কী, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল রায়হান।

'প্রশ্ন করছ যে? ড. ডোনেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, ভুলে গেছ?'

'তা ভুলিনি। কিন্তু সবখানে সিকিউরিটি আছে, দেখতে পাচ্ছি। স্যরের ল্যাবে যাবার পথে কেউ আটকালে কী জবাব দেব?'

'যাতে না আটকায়, সে-ব্যবস্থা নিতে হবে। আসার পথে একটা ড্রেসিং রুমের দরজা দেখেছি, ওখানে চলো।'

কপাল ভাল ওদের, ড্রেসিং রুমটা শূন্য। ক্লজিটে অ্যাপ্রনসহ ট্রাউজার আর টেকনিশিয়ানদের রাবার বুটও পাওয়া গেল। দ্রুত পোশাক পাল্টে প্রজেক্টের স্টাফ সাজল ওরা, মাথায় দিল জকি ক্যাপ—ট্রলি নিয়ে আসবার পথে অনেককেই দেখতে পেয়েছে এই পোশাকে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে দ্রুত পা চালাল দুই বিসিআই এজেন্ট, মাথা নিচু করে ক্যাপের কার্নিশে মুখ ঢেকে রেখেছে। একটু পরেই পৌঁছে গেল নেভিল ব্রিকের দেখিয়ে দেয়া করিডরটার মুখে। আসবার পথে দু'একজন ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে বটে, তবে এই মুহূর্তে কেউ নেই আশপাশে। দ্বিধা না করে প্যাসেজে ঢুকে পড়ল রানা আর রায়হান, হাঁটতে হাঁটতে দুপাশের দরজাগুলোর ওপর নজর বোলাচ্ছে—ড. ডোনেনের ল্যাবের সামনে নিশ্চয়ই তাঁর নামফলক থাকবে।

দেখতে দেখতে প্রায় ত্রিশ গজ দীর্ঘ করিডরটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা, এখন পর্যন্ত কোনও দরজায় কোনও ধরনের ল্যাব বা ড. ডোনেনের নাম চোখে পড়েনি। সামনে নিরেট দেয়াল, এগোবার পথ নেই। থেমে দাঁড়াতে হলো।

'ব্যাপারটা কী?' বোকা বোকা গলায় বলল রায়হান। 'স্যরের তো চিহ্নও দেখছি না। এদিকে এমনকী মানুষজনেরও সাড়াশব্দ নেই। ব্রিক ব্যাটা ভুল করল না তো!'

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে রানার মাথায়, ও নিজেও কম অবাক হয়নি। পরমুহূর্তে একটা সম্ভাবনা মাথায় আসতেই সচকিত হয়ে উঠল। তাই তো, না চাইতেই ব্রিক লোকটা নিজ থেকে এই করিডরটা দেখিয়ে দিল কেন? এমন একটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়ায় ওদেরকে এসকর্ট ছাড়া মেস-হলে একা ফিরতে বলল কেন? তা ছাড়া ড্রেসিং রুমটা খালি ছিল, এ পর্যন্ত আসতেও কেউ বাধা দেয়নি...ব্যাপারগুলো অস্বাভাবিক নয়? স্টোরেজ সেকশনে, এমনকী ওয়ার্কিং এরিয়ায় পৌঁছানো পর্যন্ত করিডরের বাঁকে বাঁকে সিকিউরিটি ছিল, অথচ এখানে ড. ডোনেনের মত গুরুত্বপূর্ণ একজন বিজ্ঞানীর ল্যাবের কাছে কেউ নেই কেন?

প্রশ্নগুলোর জবাব একটাই, আর সেটা বুঝতে পেরে তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন। নিজেকে চড় কষাতে ইচ্ছে হচ্ছে, স্রেফ আনাড়ির মত কাজ করে বসেছে ও। বিরক্ত গলায় বলল, 'ব্রিক ভুল করেনি, রায়হান। ইচ্ছে করেই দেখিয়ে দিয়েছে এই করিডরটা।'

'কিন্তু কেন?'

'এটা একটা ফাঁদ...আর তাতে গাধার মত পা দিয়ে বসেছি আমরা।'

রানার কথাটাকে সত্যি প্রমাণের জন্যই যেন কানে ভেসে এল মেঝেতে বুটের ভারি পদশব্দ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো ছ'জন সিকিউরিটি গার্ড—সবার হাতে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, তাক করে রেখেছে দুই অনুপ্রবেশকারীর দিকে।

'ওয়েল, ওয়েল, আমার ধারণাই তা হলে ঠিক?' পিছন থেকে গার্ডদের ঠেলে সামনে বেরিয়ে এল নেভিল ব্রিক। 'আমাদের সুশিক্ষিত দুই শ্রমিক আসলে পরিচয় গোপন করছে? শুরুতেই সন্দেহ হয়েছে আমার—তোমরা সাধারণ কেউ নও। আমাকে এতই বোকা পেয়েছ? এখন তো ঠিকই ধরা পড়ে গেলে...কী, ঠিক বলেছি না?'

সংকীর্ণ এই করিডরটা থেকে পালাবার পথ নেই, অদৃষ্টকে মেনে নিল দুই বাঙালি যুবক। ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলে আনল দু'হাত।

বারো

লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র। সকাল ন'টা।

সারারাত অফিসে কাটিয়েছে ডগলাস বুলক, বাড়ি ফেরেনি। ফিরতে দেয়নি কাউকেই। রাতটা কেটেছে নির্ঘুম অবস্থায়। মাথায় আগুন জ্বলছে তার, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সেই আগুনের উত্তাপ। রায়হানের ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক—সত্যিই মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা হয়েছে লোকটার।

নিষ্ফল রাগে চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে বুলডগ, যখন টের পেয়েছে সর্বনাশটা। প্রথমে মনে হচ্ছিল যান্ত্রিক ত্রুটি, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ভাইরাসটা সনাক্ত করতে পেরেছে এজেন্ট নিউটন। ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। সিআইএ ডেটাবেজ কাজ করছিল না বলে এফবিআই ডেটাবেজ ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল—রায়হানের ভাইরাসটা ঢুকে পড়েছে ওখানেও। এ এক অদ্ভুত কাণ্ড—স্বাভাবিক কাজকর্ম সবই করা যাচ্ছে, শুধু ড. স্ট্যানলি ডোনেন সংক্রান্ত যে-কোনও তথ্য খুঁজতে গেলেই হ্যাং হয়ে যাচ্ছে দেশজোড়া গোটা নেটওয়ার্ক। পুরো সিস্টেমটা বন্ধ করে আবার রি-স্টার্ট করলে তবেই নতুন করে কাজ করা যায়। বেশ কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংলির হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছে ফোন—স্বয়ং ডিরেক্টর গালাগাল করে চোদ্দোগুষ্টি উদ্ধার করেছেন বুলডগের, ধমক দিয়ে বলে দিয়েছেন—ভাইরাসটা না সরানো পর্যন্ত যেন সে আর ডেটাবেজ ব্যবহারের

boighar.com

চেষ্টা না করে।

কে এই ভাইরাস ছড়িয়েছে এবং কীভাবে ছড়িয়েছে, তা জানতে বাকি নেই কারও। মাসুদ রানার হ্যাকার সঙ্গীর হাতে গোটা নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি প্রটোকল তুলে দিয়েছে বুলডগ, ওদের দুজনকে আটকে রাখতে পারেনি, এমনকী ওরা পালিয়ে যাবার পর দ্রুত প্রটোকলটা বদলে ফেলারও ব্যবস্থা নেয়নি, এমন অযোগ্যতার ক্ষমা হয় না। গালাগাল খাবে না তো খাবেটা কী? কিন্তু এসব যুক্তি মাথায় ঢুকছে না বুলডগের, সে শুধু একটা কথাই ভাবছে—আরও একবার মাসুদ রানার কারণে সবার কাছে অপদস্থ হতে হলো তাকে। এত বছরের ক্যারিয়ারে যেখানে কেউ কোনওদিন বাঁকা চোখে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি, সেখানে ওই বাঙালি ছোকরার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে শুধু অপমান আর অসম্মান জুটছে কপালে। ব্যাপারটা ভাবলেই রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে বুলডগ, সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চারপাশ থেকে, চেতনায় ভাসছে শুধু রানাকে নিজ হাতে খুন করার জিঘাংসা।

তবে সেটা শুধু কল্পনাই, বাস্তবে প্রাণের শত্রুকে কাছে না পেয়ে অফিসের সবার ওপর ঝাল মেটাচ্ছে ব্যুরো চিফ—যে-ই তার সামনে পড়ুক, গালিগালাজ না খেয়ে ফিরতে পারছে না। শুরুর দিকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় রিপোর্ট দিতে, সেইসঙ্গে এটা-ওটা প্রয়োজনে চিফের কাছে আসা-যাওয়া করছিল এজেন্টরা; পরে গালি খেতে খেতে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে তারা, একেবারে অনন্যোপায় না হলে কিছুতেই আসছে না।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা এজেন্ট নিউটনের। আই.টি. এক্সপার্ট সে, রায়হানকে সিকিউরিটি প্রটোকল দেয়ার ব্যাপারেও সমর্থন জানিয়েছিল...এ কারণে বুলডগের রাগ সবচেয়ে বেশি তার উপরে। সামনে পড়তে হচ্ছে না, ইন্টারকমে খানিক পর পরই তাকে বাক্যবাণে উত্তম-মধ্যম দেয়া হচ্ছে। নাওয়া-খাওয়া-ঘুম...কোনও কিছুরই সুযোগ দেয়া হয়নি বেচারাকে। গতকাল থেকে সে কম্পিউটারের সামনে, অবিরাম রায়হানের ছড়িয়ে দেয়া ভাইরাসটাকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজটা সহজ নয় মোটেই, একজন জন্মগত জিনিয়াসের প্রোগ্রামিঙের সঙ্গে পাল্লা দিতে নিজের সমস্ত মেধা ব্যয় করতে হচ্ছে নিউটনকে।

কম্পিউটারের সাহায্য নিতে না পারায় হাতের কাছে যত এজেন্ট ছিল, তাদের সবাইকে মাঠে নামিয়েছে বুলডগ, সেই সঙ্গে নেয়া হচ্ছে পুলিশ এবং এফবিআইয়ের সাহায্য। যত রকম ইনফরমার আর সোর্স আছে, তাদেরকেও কাজে নামানো হয়েছে। এত কিছুর পরও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন ড. ডোনেন, খোঁজ পাওয়া যায়নি রানা বা তার হ্যাকার সাগরেদেরও। বিজ্ঞানীকে যে পাওয়া যায়নি, তার পিছনে রানা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস শাখাপ্রধান নাফিজের কূটকৌশলের যে বিরাট ভূমিকা আছে, সেটা জানে না বুলডগ।

যারা ড. ডোনেনের অল্প-স্বল্প হদিসও জানে, নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে তাদের তালিকা জোগাড় করেছে নাফিজ। বুলডগ তার নিজস্ব লোকজনকে মাঠে নামাবার আগেই এসব মানুষকে দূর-দূরান্তের বিভিন্ন সেফহাউসে লুকিয়ে ফেলেছে ও—কেউ কেউ স্বেচ্ছায় গেছে, আর যারা যেতে চায়নি, তাদের জোর করে তুলে আনা হয়েছে। পুরো পৃথিবীকে বাঁচাবার মিশনে নেমেছে বিসিআই, এখন আর কারও ব্যক্তিগত মতামত শোনার অবস্থা নেই। তবে তুলে আনা এসব মানুষগুলোকে

-কোনও অসম্মান করা হয়নি, খাতিরযত্নের মধ্যে বহাল তবিয়তেই আছেন তাঁরা... রানারা ড. ডোনেনের কাছে পৌঁছে গেলে ওঁদের আর লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পাবেন।

রাতভর কুরে কুরে খাওয়া অবিরাম টেনশনের হাত থেকে নিজেকে রেহাই দিতে সূর্য ওঠার পর নিজের অফিসের সোফায় শুয়ে চোখ বুজেছিল বুলডগ, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেও জানে না। ন'টা বাজতেই দরজায় টোকার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল।

পাল্লা ফাঁক করে এজেন্ট নিউটন উঁকি দিচ্ছে। 'আসতে পারি, স্যর?'

'এসে তো পড়েইছ! আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?' খেঁকিয়ে উঠল বুলডগ, তার মেজাজ এখনও আগের মতই চড়া।

কী বলবে বুঝতে না পেরে থতমত খাওয়া চেহারা নিয়ে চুপ করে রইল নিউটন।

'গাধার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' ধমক লাগাল বুলডগ। 'ঢোকো ভিতরে।'

'ইয়েস, স্যর,' বলে ঢুকে পড়ল নিউটন, পিছনে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

সোফা থেকে উঠে ডেস্কের অন্যপাশে নিজের চেয়ারে বসল বুলডগ। কাঁচা ঘুম ভাঙায় মাথা ধরেছে খুব—ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে কফি দিয়ে যেতে বলল। তারপর তাকাল আইটি এক্সপার্টের দিকে। না কামানো গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে জিজ্ঞেস করল, 'খবর আছে কোনও? নাকি নিজের চাঁদবদন দেখাতে এসেছ?'

'সুখবরই নিয়ে এসেছি, স্যর। ভাইরাসটা দূর করা গেছে—সারারাত ল্যাংলির এক্সপার্টদের সাহায্য নিয়ে কাজ করেছি আমি, সফল হয়েছি।'

নিউটনের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কথার সত্যতা। এক রাতেই বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেছে তার—চামড়ায় পড়েছে ভাঁজ, দু'চোখের নীচে কালি, মণিদুটো ঘুমের অভাবে টকটকে লাল হয়ে আছে। উস্কোখুস্কো মাথার চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির মাঝখানেও চেহারায় আনন্দিত একটা ভাব ফুটে রয়েছে—সম্ভবত সাফল্যের কারণেই। এক ধমকে বেচারার ওই খুশিটুকুও কেড়ে নিল বুলডগ।

'দাঁত কেলাচ্ছ কেন? ভাইরাস সরিয়ে দুনিয়া উদ্ধার করে ফেলেছ নাকি? অকর্মার ধাড়ি কোথাকার...ডোনেনের বাচ্চার খোঁজ পেয়েছ কি না সেটা বলো!'

বিষম খেল নিউটন। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'জ্... জী, স্যর। সেটাও সম্ভব হয়েছে।'

'তা হলে আসল কথা না বলে নিজের গুণকীর্তন করছ কেন?' হুঙ্কার ছাড়ল বুলডগ। 'কোথায় লোকটা?'

'ব্রাইটন নামে একটা কোম্পানির মেইনফ্রেমে হানা দিতে হয়েছে আমাদেরকে...বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ওদের হয়ে একটা গোপন গবেষণার কাজ করছেন, সেজন্যেই এত লুকোচুরি। এই মুহূর্তে মন্টেগো আইস শেলফে ওদের রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে আছেন তিনি।'

'মন্টেগো আইস শেলফটা আবার কোথায়?'

boighar.com

'আর্কটিকে...আলাস্কা থেকে দুশো মাইল উত্তর-পুবে।'
'হোয়াট! লোকটা অ্যামেরিকার মাটিতেই নেই?'
'জী না, স্যর।'

ঝামেলা কয়েক গুণ বেড়ে গেল—পরিষ্কার বুঝতে পারছে বুলডগ। ড. ডোনেন দেশের ভিতরে...এমনকী ইয়োরোপে থাকলেও কোনও অসুবিধে ছিল না, ওখানকার স্থানীয় সিআইএ এজেন্টদের পাঠিয়ে খুব অল্প সময়েই তুলে আনা যেত। গতকাল থেকে শুধু এই একটা বিষয় ভেবেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল সে—লোকটার খোঁজ পেতে একটু কষ্ট হলেও তাকে বাগে পেতে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু এখন সেই সান্ত্বনাটুকুও উবে গেছে। সভ্যজগৎ ছেড়ে ওই হতভাগা বিজ্ঞানীটা কিনা ঠাঁই নিয়েছে মেরু অঞ্চলে... এক টুকরো ভাসমান বরফের উপরে! ওখানে তার নাগাল পাওয়া যাবে কেমন করে?

সমস্যা শুধু এই একটা নয়, হারামজাদা মাসুদ রানার ভয়ও মন থেকে তাড়াতে পারছে না বুলডগ। সমস্ত লোক লাগিয়ে কাজ হয়নি, বাঙালি ছোকরার টিকিটিরও খোঁজ পাওয়া যায়নি। যেমন ত্যাঁদোড় লোক, বাজি ধরে বলা যায়—ডোনেনের খোঁজ বহু আগেই পেয়ে গেছে সে, আইস শেলফের দিকে রওনা হয়ে গেছে...বলা যায় না, হয়তো পৌঁছেও গেছে। যদিও সব ধরনের বাস-ট্রেন স্টেশন আর এয়ারপোর্টে ফেউ বসানো হয়েছিল, তারপরেও রানার মত ওস্তাদ স্পাইয়ের জন্য ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া কোনও ব্যাপারই নয়। আতঙ্কিত বোধ করল বুলডগ—ড. ডোনেন একবার বিসিআইয়ের হাতে চলে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ভেবে-চিন্তে একটাই আশার আলো দেখতে পাচ্ছে বুলডগ। সন্দেহ নেই যে, রানা তার উপরমহলের মাধ্যমে সবখানে ইউনো-ভাইরাসের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে; তারপরও দুনিয়ার কোনও দেশই বিদেশি একটা ইন্টেলিজেন্সের দেয়া ওয়ার্নিং শুনে নিজেদের কম্পিউটারাইজড্ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবে না—স্বস্তি বলতে এটাই। মানেটা হলো, রানা আর ওর হ্যাকার চ্যালাটাকে আটকাতে পারলে...সেই সঙ্গে যদি বিজ্ঞানীটাকেও হাত করা যায়, তা হলে ভাইরাসটাকে ঠেকাবার আর কেউ থাকে না। www.boighar.com

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, বুঝতে পারল বুলডগ। পরিস্থিতি এখনও আয়ত্তের বাইরে যায়নি, চেষ্টা করলে সামাল দেয়া সম্ভব। তিন টার্গেট—মাসুদ রানা, রায়হান রশিদ আর ড. স্ট্যানলি ডোনেনকে কোথায় পাওয়া যাবে—জানা আছে তার। সমস্যা দূরত্ব এবং লোকবল নিয়ে। তিন হাজার মাইল দূরের ওই আইস শেলফে এই মুহূর্তে লোক পাঠানো যাবে কীভাবে? নিজেই বা স্বল্পতম সময়ে ওখানে পৌঁছুবে কেমন করে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুদ্ধি পেয়ে গেল ধুরন্ধর সিআইএ কর্মকর্তা। করণীয় ঠিক করতে এক মুহূর্তও লাগল না।

'নিউটন, এক্ষুণি খোঁজ নাও—আইস শেলফটার এলাকায় আমাদের নেভি বা কোস্ট গার্ডের কোনও শিপ আছে কি না। কুইক!'

ছুটে বেরিয়ে গেল এজেন্ট নিউটন, ফিরে এল একটু পরেই। বুলডগ তখনও সেক্রেটারির দিয়ে যাওয়া কফিটা শেষ করতে পারেনি।

'আছে, স্যর!' উত্তেজিত গলায় রিপোর্ট দিল আই.টি. বিশেষজ্ঞ। 'কোস্ট গার্ডের একটা কাটার—*নিউবার্গ*...মন্টেগো থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে টহল দিচ্ছে ওরা। অর্ডার দিলে দু'ঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে পারবে।'

'দ্যাটস্ গ্রেট!' এই প্রথম হাসি ফুটল বুলডগের ঠোঁটে। নিউটনকে বিদায় করে দিয়ে টেনে নিল টেলিফোনটা, যোগাযোগ করল সিআইএ ডিরেক্টরের সঙ্গে।

এখনও অফিসে পৌঁছাননি ডিরেক্টর, রাস্তায়...গাড়িতে আছেন। ফোন পেয়ে খুব একটা খুশি শোনাল না তার গলা। নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যালো?'

'ডগলাস বুলক, স্যর।'

'হ্যাঁ...কী ব্যাপার?'

গুছিয়ে পুরো পরিস্থিতিটা খুলে বলল বুলডগ—ড. স্ট্যানলি ডোনেন কোথায় আছেন, সেই সঙ্গে রানা আর রায়হানের কারণে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে—সব।

'কী করতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করলেন ডিরেক্টর।

'কাছাকাছি কোস্টগার্ডের একটা শিপ আছে। আমি চাই, ওরা গিয়ে বিজ্ঞানী ব্যাটাকে তুলে আনুক। রানাকে যদি পাওয়া যায়, তা হলে ওকেও অ্যারেস্ট করুক। এ ছাড়া এয়ারফোর্সের একটা এফ-১৪ ফাইটারও দরকার, যাতে আমি চারঘণ্টার মধ্যে মন্টেগোতে পৌঁছুতে পারি।'

'তোমার যা ক্ষমতা এবং পজিশন, তাতে এই কাজগুলো তুমি নিজেই করতে পারো। আমাকে বলছ কেন?'

'আপনার ক্লিয়ারেন্স চাই, স্যর।'

'ক্লিয়ারেন্স-ট্লিয়ারেন্স দিতে পারব না,' পরিষ্কার বলে দিলেন ডিরেক্টর। 'দেখো ডগলাস, তুমি পুরনো লোক, আশা করি সবকিছু ভেঙে বলে দিতে হবে না? প্রাইভেট একটা কোম্পানির রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে জোর করে ঢুকে স্বনামধন্য একজন বিজ্ঞানীকে তুলে আনতে চাইছ, সেই সঙ্গে চাইছ বিদেশি দুজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে আটক করতে...অ্যামেরিকার সীমানার বাইরে! এসবের পিছনে মূল উদ্দেশ্য হলো একটা ভাইরাসের আঘাতে গোটা পৃথিবীর কম্পিউটার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়া...ব্যাপারটা কতটা গুরুতর, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই? সফল হলে আমরা তোমার পিছে আছি, কিন্তু যদি ব্যর্থ হও—এতবড় কেলেঙ্কারির বোঝা টানা সম্ভব নয় আমাদের দেশের পক্ষে। কেন অনুমোদন দেব না, বুঝতে পারছ তো? যা করার একা তোমাকেই করতে হবে, ব্যর্থ হলে যাতে আমরা বলতে পারি—তুমি সব নিজ থেকে করেছ, আমরা কিচ্ছু জানতাম না। পারমিশন চেয়ো না, এজেন্সির রিসোর্স ব্যবহার করো যত খুশি, আমি বাধা দেব না। তবে যতক্ষণ না সাকসেসফুল হচ্ছ, কোনও স্বীকৃতি পাবে না। ঠিক আছে?'

'বুঝতে পারছি, স্যর।'

'চোখ-কান বন্ধ করে রাখলেও তোমার সাফল্য কামনা করছি আমি, ডগলাস। খুব বড় একটা সুযোগ আমাদের সামনে; দেখো, গড়বড় যেন না হয়। বিশেষ করে ওই রানা ছেলেটা কিন্তু খুব ডেনজারাস।'

'আপনি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন, স্যর,' দৃঢ় গলায় বলল বুলডগ।

boighar.com

'মাসুদ রানা কেন, দুনিয়ার কারও সাধ্য নেই এবার আমাকে ব্যর্থ করে।'
'তা-ই যেন হয়। শুভকামনা রইল।' বলে লাইন কেটে দিলেন ডিরেক্টর।

তেরো

মন্টেগো আইস শেলফ।

ব্রাইটন টেকনোলজির বিশালাকৃতি ডোম থেকে এক মাইল দূরে পাহাড়ের দুইশ' ফুট উঁচু ঢালে বসে আছে তিন জনের আততায়ী দলটা। সাদা রঙের ক্যামোফ্লাজ পোশাক তাদের পরনে, সঙ্গে যেসব ইকুইপমেন্ট আর অস্ত্র আছে, সেগুলোও ক্যামোফ্লাজ করা। তুষারশুভ্র এই জগতে হঠাৎ দেখায় ওদের আলাদা করা যায় না। অস্তিত্ব গোপন করার ক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব শুধু পোশাক আর ইকুইপমেন্টের রঙের নয়, মানুষ তিনজনকেও দিতে হবে। কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে নিজেদের অদৃশ্য করে ফেলতে হয়, তা ওদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না।

সাধারণ কোনও ভাড়াটে খুনী নয় ওরা, দুনিয়ার সবচেয়ে কঠোর ট্রেনিং পাওয়া কমাণ্ডো বাহিনী—অ্যামেরিকান আর্মির ডেল্টা ফোর্সের প্রাক্তন সদস্য তিনজনেই। চাইলে আজও দেশসেবা করে যেতে পারত, তবে দেশের চাইতে নিজেকে বেশি গুরুত্ব দেয় ওরা, চায় অঢেল অর্থ আর ক্ষমতার মালিক হতে। সেজন্যেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে মানুষ খুনের পেশা বেছে নিয়েছে।

তারমানে এই নয় যে, দক্ষতায় একবিন্দু মরচে ধরেছে ওদের। ডেল্টা ফোর্সকে ট্রেনিং দেয়াই হয় মানুষ মারার অব্যর্থ যন্ত্র হবার জন্য। অবিশ্বাস্য দ্রুততা এবং নিপুণ কৌশলে শত্রু নিধন করতে তাদের তুলনা নেই। কথাটার সত্যতা গত ছ'টা টার্গেটকে পৃথিবী থেকে সরাবার সময় প্রমাণ দিয়েছে এরা। ছ'জন মানুষকে নিখুঁত প্ল্যানিঙের মাধ্যমে এমনভাবে সরিয়েছে; যাতে কোথাও সামান্যতম আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু সাত নম্বর টার্গেটে এসে অসহায় বোধ করছে তিন খুনী। ডুইট গার্ডনারের বেলায় ঝুঁকিপূর্ণ একটা কোর্স অভ অ্যাকশনের মাধ্যমে কাজটা সারা সম্ভব হলেও এখানে এমনকী সেরকম কোনও সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে না, দুর্ঘটনা ঘটানো তো অনেক পরের কথা। হাতের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়, ডেডলাইন থেকে পাক্কা দুটো দিন বেশি পেরিয়ে গেলেও কার্যোদ্ধার হয়নি। আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে প্যারাশুটে করে রাতের অন্ধকারে আইস শেলফে নেমে এসেছে ওরা, সেই থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রেকনাইস্যান্স চালানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমেই—খাবারদাবার যা আছে, তাতে আর একটা দিন হয়তো চালানো যাবে কষ্ট করে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে আবহাওয়াটা। আর্কটিক পরিবেশে ভাল একটা আশ্রয় ছাড়া রাত কাটানোটা অভিশাপের মত, এর সঙ্গে যখন যুক্ত হয় অস্তিত্ব ফাঁস হবার ভয়ে আরোপিত

হাজারটা বিধিনিষেধ, তখন পুরো ব্যাপারটা নরকবাসের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। সঙ্গে থাকা ছোট্ট তাঁবুটা রাত না হলে খাটানো যায় না, ধোঁয়া আড়াল করার জন্য আগুন জ্বালতে হয় কদাচিৎ—তা-ও ছোট্ট করে; এ ছাড়াও পাহাড়ের ঢালে পজিশন নেয়ায় সারাক্ষণ সইতে হচ্ছে ক্যাবাটিক উইন্ডের অত্যাচার—এই কষ্টকে দুনিয়ার আর কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

শুধু ট্রেনিঙের জোরে টিকে আছে টিমটা, তারপরেও সাতদিন পেরিয়ে যাওয়ায় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, ওরা ভেঙে পড়তে পারে যে কোনও মুহূর্তে। এত কষ্ট করার কোনও ইচ্ছেই ছিল না খুনীদের নেতা কঠিন চেহারার যুবকের; বিশেষ করে তিন দিনের মাথাতেই যখন সে বুঝতে পেরেছে যে, এখানে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে টার্গেটকে মারা সম্ভব নয়, তখুনি বিকল্প কায়দায় কাজটা সারতে চেয়েছিল...কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র—সবই আছে খুনীদের কাছে। রিসার্চ প্রজেক্টের একশো লোক বা ত্রিশজন সিকিউরিটি পার্সোনেল কোনও সমস্যাই নয়, সরাসরি হামলা চালিয়ে টার্গেটকে খতম করে দিয়ে আসতে পারে ওরা...এতসব মানুষকে মোকাবেলা করেও! কিন্তু ওদের নিয়োগকর্তা...যাকে রেডিও কমিউনিকেশনে ওরা *আলফা-যিরো* বলে ডাকে...সে অত্যন্ত সতর্ক মানুষ, নিতান্ত বাধ্য না হলে চরম পদ্ধতি ব্যবহার করতে রাজি নয়। আর সেটারই মাশুল গুনতে হচ্ছে রেডিও ল্যাঙ্গুয়েজে *আলফা টিম* নাম পাওয়া এই দলটাকে, সব ধরনের সাপ্লাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের এখানে বসিয়ে রাখছে আলফা-যিরো; আদেশ দিয়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা দুর্ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করতে।

ছোট্ট একটা চাতালের মত জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে রিসার্চ ফ্যাসিলিটির উপর নজর রাখছে খুনীদের নেতা আর তার সহকারী—এদের কোডনেম হচ্ছে *আলফা-ওয়ান* আর *টু।* তৃতীয় সদস্য, মানে *আলফা-থ্রি* বসে আছে কয়েক গজ পিছনে, কানে হেডফোন লাগিয়ে। আকাশের দিকে মুখ করে এক ফুট ডায়ামিটারের একটা পোর্টেবল স্যাটেলাইট ডিশ বসানো হয়েছে ওখানটায়—ওটার সাহায্যে নিজেদের কমিউনিকেশন চালানোর পাশাপাশি ফ্যাসিলিটির সঙ্গে বহির্বিশ্বের সব ধরনের যোগাযোগ মনিটর করছে ওরা।

হঠাৎ একটা রেডিও কমিউনিকেশন শুরু হওয়ায় হেডফোনটা ভাল করে কানের উপর চেপে ধরল আলফা-থ্রি। আর দশটা সাধারণ কমিউনিকেশনের মত নয় এটা, দু'পক্ষের উত্তপ্ত বাদানুবাদ শুনতে শুনতে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল তার, চোয়াল ঝুলে পড়ল। ঝট করে হেডফোন নামিয়ে চেঁচাল সে, 'আলফা-ওয়ান! আলফা-ওয়ান!!'

'কী হয়েছে?' বিনকিউলার নামিয়ে সঙ্গীর দিকে বিরক্ত চোখে তাকাল দলনেতা।

'বিশাল সমস্যা...সব কেঁচে যেতে বসেছে।'

'মানে!'

'ইউ. এস. কোস্ট গার্ডের একটা জাহাজ থেকে ফ্যাসিলিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে—দু'ঘণ্টার মধ্যে আসছে ওটা এখানে, ড. স্ট্যানলি ডোনেনকে তুলে নিয়ে যাবে। কী নাকি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি...ভদ্রলোককে দরকার, রেডি থাকতে

boighar.com

বলেছে।'

'হোয়াট!'

'ফ্যাসিলিটির ওরা প্রতিবাদ করছে, কিন্তু কথা শুনতে রাজি নয় কোস্টগার্ড। বলছে, বাধা দিলে শক্তি ব্যবহার করা হবে।'

'গড ড্যাম ইট!' তড়াক করে উঠে বসল আলফা-ওয়ান। 'যিরোর সঙ্গে যোগাযোগ করো—এখুনি!'

কমিউনিকেশন সেটের নব ঘোরাতে শুরু করল তৃতীয় খুনী, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল আলফা-যিরোর। 'ইয়েস?'

হেডপিসটা মাথায় দিল কঠিন চেহারার যুবক। 'দিস ইজ আলফা-ওয়ান।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'বিরাট বিপদ দেখা দিয়েছে...টার্গেটকে পিকআপ করতে দু'ঘণ্টার মধ্যে ইউ.এস. কোস্টগার্ডের একটা শিপ আসছে এখানে।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আলফা-যিরো।

'কানে ভুল শুনছ না, ঠিকই বলছি আমি।'

'সান অভ আ বিচ...'

'গালাগালটা কাকে দিচ্ছ, জানতে পারি? নিজেকে দাও...এসব তোমার দোষেই ঘটছে কি না! আগেই বলেছিলাম টার্গেটকে শেষ করে দিই, ডেডলাইন পেরুনোর দুদিন পরও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে এমন তো হবেই!'

'মুখ সামলে কথা বলো!' খেঁকিয়ে উঠল আলফা-যিরো। 'ভুলে যেয়ো না, আমি কে! পুরো নকশাটা আমি সাজিয়েছি...একা আমি! এখন পর্যন্ত যতদূর এগোনো গেছে...প্ল্যানটা সফল হবার মত একটা পরিস্থিতি যে সৃষ্টি হয়েছে...সব আমার কারণে। আমার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার মত স্পর্ধা তোমার হলো কী করে?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হার মানার ভঙ্গিতে বলল আলফা-ওয়ান। 'আমারই ভুল হয়েছে। এখন কী করব, তা-ই বলো।'

'দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে যখন, সরাসরি অ্যাকশনে যাওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। দু'ঘণ্টা মাত্র সময়...এর ভিতরে কাজটা সারতে পারবে?'

'কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। মূল সমস্যাটা অন্যখানে। কাজ শেষ করবার পর আমাদের পালানোর কী হবে? ধরা পড়ে যাই, তা নিশ্চয়ই চাও না?'

'পালানো নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। মন্টেগোর কাছাকাছি একটা গ্লেশিয়ারে তোমাদের জন্য হেলিকপ্টার রেখেছি আমি—পাইলটসহ। সিগনাল দিলে বিশ মিনিটের মধ্যে এসে তোমাদের পিকআপ করে নিয়ে যেতে পারবে। গ্লেশিয়ারটায় ক্যামোফ্লাজ নেট আছে, ফিরে গিয়ে গা-ঢাকাও দিতে পারবে। কেউ তোমাদের খুঁজে পাবে না।'

'গুড। তা হলে কাজে নামছি আমরা।'

'গো অ্যাহেড। খবরদার, ডোনেন যেন অ্যামেরিকানদের হাতে কিছুতেই না পড়ে!'

'পড়বে না,' কথা দিল আলফা-ওয়ান। 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না—ওরা লোকটার পিছে লাগল কেন? ইউনোদের কেউ চেনে না বলে

জানতাম।'

'এসব নিয়ে পরেও ভাবা যাবে,' বলল আলফা-যিরো। 'আগে ওর মুখ বন্ধ করাটা জরুরি।'

'ধরে নাও, মুখ বন্ধই হয়ে গেছে।' হেলিকপ্টারকে সিগনাল দেয়ার কোড আর ফ্রিকোয়েন্সি জেনে নিয়ে রেডিও লিঙ্কটা বিচ্ছিন্ন করে দিল আলফা-ওয়ান।

পুরো আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে ভাল করে তল্লাশি করা হয়েছে রানা আর রায়হানকে, তারপর হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে রিসার্চ ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি ইনচার্জের অফিসে। এই মুহূর্তে দুটো চেয়ারে বসে আছে ওরা, অস্ত্র তাক করে পাহারা দিচ্ছে তিনজন গার্ড। মুখ যেন পাথরে খোদাই করা লোকগুলোর, কোনও অভিব্যক্তি ফুটছে না। কথাও বলছে না কেউ, অস্বস্তিকর নীরবতায় কেটে গেছে আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট। শেষ পর্যন্ত উসখুস করতে করতে রায়হান বলল, 'একটু পানি হবে? আমার খুব পিপাসা পেয়েছে।'

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না প্রহরীদের মধ্যে, আগের মতই অনড় রইল তারা, জবাবও দিল না।

'ভীষণ অভদ্র তো!' গজগজ করল রায়হান। 'এক গ্লাস পানি দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

'বাদ দাও,' রানা বলল। 'অর্ডার ছাড়া কিচ্ছু করবে না ওরা, খামোকা রাগ করে কোনও লাভ নেই। সিনিয়র কেউ আসুক, তার কাছে যত খুশি পানি আর খাবারদাবার চেয়ো।'

ওর কথাতেই যেন খুলে গেল দরজাটা। ইউনিফর্ম পরা নতুন একজন মানুষকে ঢুকতে দেখা গেল—বয়স্ক, হাবভাবে নেতৃত্বের ছাপ। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোনও ঝামেলা করেনি তো?'

মাথা নাড়ল এক প্রহরী। 'পানি খেতে চাইছিল।'

'দাও পানি। সঙ্গে বিস্কুট-টিস্কুটও দাও। একটু পর তো মার-ই খাবে...তার আগে পেটে দানা-পানি কিছু পড়ুক। পেটে খেলে পিঠে সয়—এটা জানো তো?'

মাথা ঝাঁকাল প্রহরী, বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

'মারবেন নাকি?' আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল রায়হান।

'সেটা নির্ভর করছে আপনারা নিজ থেকে মুখ খোলেন কি না, তার উপর,' টেবিলের অপরপাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল লোকটা। 'তবে আমার অভিজ্ঞতায় বলে, প্যাঁদানি না দেয়া পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজ এজেন্টরা মুখ খোলে না।'

'সেটাই ভাবছেন আপনি?' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনার ধারণা, আমরা অন্য কোম্পানির হয়ে স্পাইং করতে এসেছি এখানে?'

'ধারণা নয়, স্থির বিশ্বাস।' নিশ্চিত একটা ভাব লোকটার বলার ভঙ্গিতে। 'অবশ্য...স্যাবোটাজ করতেও এসে থাকতে পারেন। কোন্‌টা আপনাদের আসল উদ্দেশ্য—তা খুব শীঘ্রি জেনে নিতে যাচ্ছি আমি।'

'আপনি ভুল করছেন, মিস্টার...'

'ট্রেভর ব্লিকম্যান—আমি এই ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি চিফ।' পালা করে দুই

boighar.com

বন্দির চেহারা দেখল ব্লিকম্যান। 'আপনাদের নামদুটো জানতে পারি? নাকি ওগুলোও প্যাঁদানি না খাওয়া পর্যন্ত বলবেন না?'

'আমি মাসুদ রানা। আর ও হচ্ছে রায়হান রশিদ।'

'মাসুদ রানা?' ব্লিকম্যানের ভুরু কুঁচকে গেছে।

'হ্যাঁ। আমরা কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্ট নই, মি. ব্লিকম্যান। এখানে এসেছি ড. স্ট্যানলি ডোনেনের খোঁজে—সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কারণে। আমি আসলে একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্মের...'

হাত তুলে ওকে থামাল ব্লিকম্যান। 'জাস্ট আ মিনিট, রানা এজেন্সির কথা বলছেন তো? ত্রিশ বছর ধরে সিকিউরিটি সেক্টরে কাজ করছি, ওদের সম্পর্কে ভালই আইডিয়া আছে আমার। সমস্যা হচ্ছে, এজেন্সিটার ডিরেক্টরের ছবি দেখেছি আমি, আপনার সঙ্গে তার চেহারার কোনও মিল নেই।'

টান দিয়ে গোঁফ আর আলগা দাঁতের পাটিটা খুলে ফেলল রানা। 'এবার মেলে?'

'মাই গড!' বিস্মিত গলায় বলল ব্লিকম্যান। 'আপনি দেখছি সত্যিই মি. রানা!'

'এবার আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে?'

হাসি ফুটল ধুরন্ধর সিকিউরিটি চিফের ঠোঁটে। 'মোটেই না, মি. রানা। ছদ্মবেশ খুলে আপনি বরং আমার সন্দেহটাকে আরও পাকাপোক্ত করে দিয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্টের চেয়ে কয়েক গুণ খতরনাক লোক আপনি, স্যর। নিশ্চয়ই কোনও কুমতলব আছে, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ফ্যাসিলিটিতে ঢুকেছেন সেজন্যেই।'

'একথা কেন ভাবছেন?'

'উদ্দেশ্য যদি ভাল কিছুই হতো, ব্রাইটনের হেড অফিস থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে পারতেন না?'

'পারমিশন নেয়ার মত পরিস্থিতি বা সময়—কোনওটাই ছিল না আমাদের হাতে।'

'তাই নাকি? কী এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, জানতে পারি?'

থমকে গেল রানা। আস্তে আস্তে বলল, 'সেটা খুব গোপনীয় একটা বিষয়—আপনাকে বলা যাবে না।'

হেসে উঠল ব্লিকম্যান। 'এই তো ধরা পড়ে গেলেন, মি. রানা! সৎ কোনও উদ্দেশ্য থাকলে আমাকে বলতে দ্বিধা কেন?'

'খামোকা সন্দেহ করছেন আপনি, মি. ব্লিকম্যান,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলে লাভটা কী আমার? আমি একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্ম চালাই, আপনাদের এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটি নিয়ে আমার কী এমন স্বার্থ থাকতে পারে?'

'আমাকে বোকা ভাববেন না, মি. রানা,' গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল সিকিউরিটি চিফের। 'আপনার ওই ফার্মের কীর্তিকলাপ ভাল করেই জানা আছে আমার—বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে ওটা। প্রবাসী বাঙালিদের মালিকানাধীন বেশ কয়েকটা কোম্পানি আমাদের কম্পিটিটর, ওদেরই কেউ নিশ্চয়ই আপনাকে ভাড়া করেছে এখান থেকে ফর্মুলা আর ডেটা চুরি করার জন্য।'

'চুরি করার নীতিতে চলে না রানা এজেন্সি, আমিও ঘৃণা করি এ-ধরনের কাজ। এখানে আমরা এসেছি স্রেফ ড. ডোনেনের সঙ্গে দেখা করতে, আর কিছু নয়।'

'আমাদের প্রজেক্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটার সঙ্গে নিশ্চয়ই শুধু কুশল বিনিময় করতে আসেননি? কী দরকার তাঁকে?'

'সেটা আপনার না জানলেও চলবে।'

'আমাকেই জানতে হবে, মি. রানা...সবার আগে!' রাগী গলায় বলল ব্লিকম্যান। 'আমি জানতে চাই, ভদ্রলোক হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলেন কেন? আপনি এসেছেন...আসছে ইউ.এস. কোস্টগার্ডের একটা শিপও। কেন...কী প্রয়োজন তাঁকে?'

'কোস্টগার্ড!' রানার ভুরু কুঁচকে গেল। www.boighar.com

'হ্যাঁ, রীতিমত হুমকি দেয়া হয়েছে আমাকে—ডক্টরকে ভালয় ভালয় ওদের হাতে তুলে না দিলে গায়ের জোরে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু কেন? কী করেছেন তিনি?'

রানা আর রায়হান দুজনই চমকে গেছে খবরটা শুনে। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একটা শব্দই উচ্চারণ করল ওরা—'বুলডগ!'

'কী?' কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে ভ্রূকুটি করল সিকিউরিটি চিফ।

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস, মি. ব্লিকম্যান। হাতে একদম সময় নেই, কোস্টগার্ড এসে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমাদেরকে এক্ষুণি ড. ডোনেনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ইম্পসিবল, মি. রানা, তা সম্ভব নয়। ড. স্ট্যানলি ডোনেন আমাদের প্রজেক্টের একজন কী-পার্সোনেল। তাঁর মাথায় গিজগিজ করছে রিসার্চ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য। আপনারা তো দূরের কথা, কোস্টগার্ডের হাতেও ভদ্রলোককে তুলে দেব না আমরা। হেড অফিসে যোগাযোগ করা হয়েছে, ব্রাইটনের ডিরেক্টররা ওয়াশিংটনের কোস্টগার্ড হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলে এর একটা বিহিত বের করছেন।'

হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, এই লোককে বোঝাতে যাওয়া বৃথা—বুলডগেরই আরেক সংস্করণ যেন সে।

পানির গ্লাস আর বিস্কুট নিয়ে ফিরে এসেছে প্রথম গার্ড। সে যখন ঢুকছে, তখন দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে হইচই শোনা গেল, কে যেন ভিতরে আসতে চাইছে, দরজার বাইরে দাঁড়ানো সেন্ট্রিরা বাধা দিচ্ছে তাকে।

'ঢুকতে দাও আমাকে!' চিৎকার শোনা গেল।

'হোয়াট দ্য হেল...' উঠে দাঁড়াল ব্লিকম্যান, দরজার পাল্লা খুলে মুখোমুখি হলো উত্তেজিত মানুষটার। 'ড. ডোনেন! আপনি এখানে কী করছেন?'

'সরে দাঁড়াও, ট্রেভর। আমাকে ভিতরে যেতে দাও।'

'এখানে আসাটা একদম উচিত হয়নি আপনার।'

ধাক্কা দিয়ে সিকিউরিটি চিফকে সরিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী। 'সরো! উচিত-অনুচিত আমি বুঝব।'

একরকম জোর করেই রুমে ঢুকে পড়লেন প্রৌঢ় মানুষটা। দেহটা ছোটখাট, ঠোঁটের উপরে সুন্দর করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা গোঁফ। নাকের উপরে বসানো আছে

boighar.com

মাঝারি পাওয়ারের চশমা—লেন্সের মাঝ দিয়ে দু'চোখে উঁকি দিচ্ছে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার ঝিলিক।

'আপনার অনেক কাজ,' অভিযোগের সুরে বলল ব্লিকম্যান। 'সেসব ফেলে সামান্য দুজন কয়েদিকে দেখতে আসাটা ঠিক না। এদের নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য আমরা আছি।'

'হুঁহ্, কাজ-টাজ সব লাটে উঠেছে,' বললেন ডোনেন। 'কোস্টগার্ডের শিপ আসছে আমাকে নিতে, জানো না? তোমার সাধ্য নেই ওদের বাধা দাও।'

'আমাদের এত ছোট করে দেখাটাও ঠিক না, ডক্টর।'

'ওসব ডায়ালগ মেরো না, তোমাদের দৌড় আমার জানা আছে।'

বিরক্তি ফুটল সিকিউরিটি চিফের চেহারায়। 'এত খেপেছেন কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'যাবার আগে এদের চেহারাটা দেখতে চাই আমি।' দুই বন্দির দিকে ফিরলেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী। 'জানতে চাই, কারা এরা? কেন আমার মরণ চায়?'

'মরণ!'

'হ্যাঁ, ট্রেভর,' থমথমে গলায় বললেন ড. স্ট্যানলি ডোনেন। 'এই দুজন আমাকে খুন করতে এসেছে!'

চোদ্দো

প্রৌঢ় বিজ্ঞানীর কথা শুনে চমকে উঠল রানা আর রায়হান। কী বলছেন ভদ্রলোক! ওরা তাঁকে খুন করতে এসেছে—এমন ধারণা করার কারণটা কী?

'আপনি শিয়োর?' জিজ্ঞেস করল ব্লিকম্যান, তার কপালে ইতোমধ্যে ভাঁজ পড়ে গেছে।

'মোর দ্যান শিয়োর,' দৃঢ়গলায় বললেন ডোনেন, রানার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের পরিচয় কী? কে তোমাদের পাঠিয়েছে এখানে?' বলার ভঙ্গিতে উত্তেজনা ফুটল।

'আমাদের কেউ পাঠায়নি, ডক্টর,' শান্তভাবে জবাব দিল রানা। 'আমরা আপনাকে খুন করতেও আসিনি।'

'মিথ্যে কথা বলে লাভ হবে না,' ডোনেন মাথা নাড়লেন। 'আমি জানি, তোমরা ভাড়াটে খুনী ছাড়া আর কিছু নও।'

'আপনার ধারণা ভুল।'

'স্যর, আমাকে চিনতে পারছেন না?' রায়হানের গলায় ব্যাকুলতা। 'আমি রায়হান।'

'কোন্ রায়হান?'

'রায়হান রশিদ...আপনার ছাত্র!' হঠাৎ ছদ্মবেশের কথা মনে পড়ল তরুণ হ্যাকারের—রাবারের তৈরি একটা নকল নাক আর পরচুলা পরেছে ও। তাড়াতাড়ি

খুলে ফেলল সেগুলো। 'এবার চিনতে পারছেন?'
চোখ বড় বড় হয়ে গেল বিজ্ঞানীর। 'ও মাই গড...রায়হানই তো!' নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেলেন দু'পা। 'কতদিন পর দেখা...কিন্তু তুমি এখানে কী করছ, মাই বয়?'
ভদ্রলোক ওকে চিনতে পেরেছেন দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রায়হান। বলল, 'আপনার কাছেই এসেছি স্যর...খুব জরুরি একটা বিষয় নিয়ে।'
ভুরু কোঁচকাল ব্লিকম্যান। 'আপনি একে চেনেন, ডক্টর?'
'হ্যাঁ, আমার পুরনো ছাত্র। অনেকদিন দেখা নেই।' রায়হানের দিকে ফিরলেন ডোনেন। 'হঠাৎ করে কী হয়েছিল তোমার, তা আজও জানতে পারিনি। স্কলারশিপ সারেন্ডার করে দেশে ফিরে গিয়েছিলে কেন?'
'ইয়ে...ওটা এক লম্বা গল্প,' ইতস্তত করে বলল রায়হান। 'পরে কখনও শোনাব আপনাকে। কিন্তু এখন অন্য একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। সেটা আপনার ওই...মানে...বিশেষ কোডটা নিয়ে।'
চেহারায় মেঘ জমল ডোনেনের। চোখের ইশারায় রানাকে দেখালেন। 'এটা কে?'
'আমার বস...এক অর্থে বড় ভাইও বলতে পারেন—মি. মাসুদ রানা।'
'নাইস টু মিট ইউ, ডক্টর,' হাসিমুখে বলল রানা। 'দুঃখিত, মি. ব্লিকম্যান এত চমৎকারভাবে তশরিফ রাখতে দিয়েছেন যে, আপনার সঙ্গে হাতটা মেলাতে পারছি না।' হাতকড়াটা দেখাল ও।
সিকিউরিটি চিফের দিকে তাকালেন ডোনেন। 'এদের হাতকড়া খুলে দাও, ট্রেভর।'
ব্লিকম্যানের চেহারায় বিস্ময় ফুটল। 'হলোটা কী আপনার! যারা আপনাকে খুন করতে এসেছে, তাদেরই হাতকড়া খুলে দিতে বলছেন?'
'ভুল হয়েছে আমার। রায়হান আর যা-ই করুক, আমাকে খুন করতে চাইতে পারে না। ও আমার ছেলের মত।'
'ওই ছোকরার কথা বলতে পারি না, তবে এই মাসুদ রানাকে আপনি চেনেন না, ডক্টর। ওর মত ডেনজারাস লোক পৃথিবীতে খুব কম আছে। সত্যি সত্যি আপনাকে খুন করতে এসে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। তা যদি না-ও হয়, নির্ঘাত স্যাবোটাজ করতে এসেছে।'
'কী, মি. রানা, সত্যিই স্যাবোটাজ করতে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন বিজ্ঞানী।
হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তেমন কিছু করতে চাইলে তো যখন ওয়ার্কিং এরিয়াতে গেলাম, তখনই করতে পারতাম।'
'শুনলে তো?' ব্লিকম্যানকে বললেন ডোনেন। 'ছাড়ো ওদের এবার। এই দুজনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'
গজগজ করে উঠল সিকিউরিটি চিফ, তবে মেনে নিল কথাটা। আদেশ পেয়ে এক প্রহরী এগিয়ে এসে দুই বন্দির হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিল। মুক্তি পেয়ে দুই কবজি ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল রানা আর রায়হান।

boighar.com

'এবার বলুন, হয়েছেটা কী?' জানতে চাইলেন ডোনেন।
আড়চোখে ব্লিকম্যানকে দেখল রানা। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'শুনলেনই তো, আপনার সেই কোডটা সংক্রান্ত ব্যাপার। একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাই আপনাকে প্রয়োজন।'
ভুরু কুঁচকে প্রাক্তন ছাত্রের দিকে তাকালেন ডোনেন। 'কী কী বলেছ তুমি মি. রানাকে?'
'ইয়ে...' আমতা আমতা করল রায়হান। 'আমি যা জানি, তার সবটাই।'
'গড ড্যাম ইট, রায়হান!' রেগে গেলেন বিজ্ঞানী। 'মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলাম না তোমাকে?'
'হ্যাঁ...কিন্তু...
'আমি কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। শুধু এটা বলো—ইউ. এস. কোস্টগার্ড কি এ-কারণেই আমাকে নিয়ে যেতে আসছে?'
মনে মনে বিজ্ঞানীর বুদ্ধির তারিফ করতে বাধ্য হলো রানা। একই সময়ে অ্যামেরিকান জাহাজ আর ওদের দুজনের উপস্থিতির মধ্যে যোগসূত্রটা ধরে ফেলেছেন ভদ্রলোক।
আচমকা আক্রমণে ঘাবড়ে গেছে রায়হান। ফ্যাল ফ্যাল করে রানার দিকে তাকাল সাহায্যের আশায়, কিন্তু ও কিছু বলছে না দেখে মৃদু স্বরে দিল উত্তরটা, 'হ্যাঁ, স্যর। ঠিকই ধরেছেন।'
'কোস্টগার্ড আমার ব্যাপারে জানল কী করে?'
এবার মুখ খুলল রানা। 'আসলে ডক্টর...কোস্টগার্ড না, আপনাকে হাতে পেতে চাইছে সিআইএ। আমার ধারণা, ওরাই শিপটাকে অর্ডার দিয়েছে আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য।'
'চমৎকার!' বিদ্রূপ ঝরল ডোনেনের কণ্ঠে। 'কোস্টগার্ড হলে ব্যাপারটা ঠিক জমছিল না। তা...এই যে আমার পিছনে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি লেগে গেল, সেটা নিশ্চয়ই গুণধর রায়হান রশিদ পেটে কথা রাখতে পারেনি বলে?'
উত্তর দেয়ার আগে একটু দ্বিধা করল রায়হান। অভিযোগটা মিথ্যে নয় একেবারে—ইউনোদের সম্পর্কে ওর কাছ থেকে রানা, আর রানার কাছ থেকে বুলডগ জেনেছে। ওভাবে চিন্তা করলে দোষটা ওরই। তাই কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'ইয়ে...এক অর্থে ধরতে গেলে...হ্যাঁ, আমিই ফাঁস করেছি আপনার নাম।'
ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. ডোনেন। 'আমি খুব হতাশ হয়েছি, রায়হান। তোমাকে আমি নিজের ছেলের মত ভাবতাম, বিশ্বাস করে নিজের গোপন কথাটা জানিয়েছিলাম, আর তুমিই কি না...'
'পুরো ঘটনাটা না জেনে ওকে দোষারোপ করাটা উচিত হচ্ছে না আপনার,' মন্তব্য করল রানা।
'বলুন তা হলে, কী এমন ঘটেছে যে ও আমাকে এত বড় একটা বিপদে ফেলতে পারল।'
'সবার সামনে শুনবেন?' ব্লিকম্যান আর গার্ডদের দিকে ইশারা করল রানা।

'একান্তে কথা বললে ভাল হয় না?'

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'জাস্ট আ মিনিট, স্যর,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ব্লিকম্যান। 'দুজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আমি এই ফ্যাসিলিটির এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।'

'ওদেরকে ফ্যাসিলিটির ট্যুর করাতে নিয়ে যাচ্ছি না আমি,' বিরক্ত গলায় বললেন ডোনেন। 'যাচ্ছি আমার লিভিং কোয়ার্টারে। পথ ছাড়ো।'

'আমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যাচ্ছে না,' হুমকির সুর সিকিউরিটি চিফের গলায়। 'আপনাদের কথাবার্তা খুব রহস্যজনক ঠেকছে আমার কাছে। কী নিয়ে এত ফিসফাস করছেন, বলুন তো।'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তোমার মাথাব্যথা কীসের?'

'মাথাব্যথাটা আমারই, স্যর। কারণ এখানকার সিকিউরিটি নিয়ে আমাকে জবাবদিহি করতে হয়। আপনারা তিনজন গোপনে কী নিয়ে শলা-পরামর্শ করবেন, সেটা জানার অধিকার আছে আমার।'

'বললাম না, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত?' ডোনেন রেগে যাচ্ছেন। 'আমি কোনও গোপন শলা-পরামর্শ করতে যাচ্ছি না।'

'সেটাই শিয়োর হতে হবে আমাকে। হাজার হোক, এই প্রজেক্টের সমস্ত গোপন তথ্য জানেন আপনি, সেগুলো যে এদের কাছে পাচার করে দেবেন না, তার গ্যারান্টি কী?'

'আমাকে এত নীচ ভাবো তুমি?' ডোনেন ফুঁসে উঠলেন। 'টাকার লোভে আমি তথ্য বিক্রি করে দেব?'

'আমার ভাবাভাবিতে কিছু যায়-আসে না,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল ব্লিকম্যান। 'সরি স্যর, গোপন কোনও আলোচনার অনুমতি দেব না আমি। কথা বলতে হয় আমার সামনে বলুন।'

'ক্...কী...ব্...বললে...' রাগে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীর, চেহারা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে।

তাড়াতাড়ি নাক গলাল রানা। বলল, 'একটু থামুন, ডক্টর। মি. ব্লিকম্যান কোনও অন্যায্য কথা বলছেন না। সিকিউরিটি চিফ হিসেবে অবশ্যই আমাদের সব কথা শুনতে চাইতে পারেন উনি।'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল রায়হান, কী বলছে মাসুদ ভাই? বাইরের একটা লোককে ইউনোকোডের কথা জানতে দেবে? ড. ডোনেনও হতবাক।

সিকিউরিটি চিফের মুখে হাসি ফুটেছে সমর্থন পেয়ে। বলল, 'যাক, অন্তত একজন আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারছে।'

'নিশ্চয়ই,' রানা বলল। 'তবে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা অত্যন্ত সিক্রেট। আপনি থাকুন, কিন্তু ওদেরকে...' আঙুল তুলে তিন প্রহরীকে দেখাল রানা, '...বেরিয়ে যেতে হবে।'

দ্বিধা ফুটল ব্লিকম্যানের চেহারায়। প্রস্তাবটা মেনে নিতে ইতস্তত করছে।

'চিন্তা করছেন কেন?' রানা বলল। 'একেবারে তো চলে যেতে বলছি না।

boighar.com

দরজার বাইরে থাকবে, গড়বড় দেখলে আপনি এক ডাকেই ওদেরকে ভিতরে নিয়ে আসতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, বলে দিন যাতে আড়ি না পাতে।'

যুক্তিটা মেনে নিল সিকিউরিটি চিফ। মাথা ঝাঁকিয়ে প্রহরীদের বেরিয়ে যেতে ইশারা করল।

উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল রানা, তারপর পাশ থেকে দুটো চেয়ার এনে ওর আর রায়হানেরটার মুখোমুখি বসাল। ডোনেন আর ব্লিকম্যানকে বলল, 'এখানে এসে বসুন। গলা চড়িয়ে কথা বলা যাবে না, ব্যাপারটা খুব সিক্রেট কি না।'

বিজ্ঞানী বসলেন একটা চেয়ারে, সিকিউরিটি চিফও ডেস্কের ওপাশ থেকে খুশি খুশি ভঙ্গিতে উঠে এল। রানাকে পাশ কাটিয়ে চেয়ারের দিকে এগোচ্ছে লোকটা, এমন সময় আচমকা ছোবল দিল রানা—এক হাতে পিছন থেকে চেপে ধরল ব্লিকম্যানের মুখ, অন্য হাতের দু'আঙুলে ঘাড়ের কাছে নার্ভ সেন্টারে চাপ দিচ্ছে। শব্দ করতে পারল না বেচারা, চাপ বাড়তেই দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল—নিঃশব্দে জ্ঞান হারাল ব্লিকম্যান।

সাবধানে অজ্ঞান দেহটা অ্যাটাচড্ বাথরুমে নিয়ে গেল রানা, ওখানে শুইয়ে রেখে ফিরে এল। রুমের ভিতরে একটা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা আছে, সেটার দিকে রায়হান আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে অভয় দিল। সারাক্ষণ ট্রান্সমিট করছে না ক্যামেরাটা। যখন ছবি তোলে, তখন একটা লাল বাতি জ্বলে ওটায়—এখন জ্বলছে না। রানা খেয়াল করে দেখেছে, প্রতিবার ট্রান্সমিশনের মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের একটা গ্যাপ আছে। ওটার সঙ্গে টাইমিং মিলিয়েই সিকিউরিটি চিফকে বেহুঁশ করেছে ও। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল রায়হানকে।

তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারে বসে পড়ল রানা। আবারও ট্রান্সমিশনের সময় হয়েছে। রায়হান বলল, 'ক্যামেরায় যারা চোখ রাখছে, তারা এখন মি. ব্লিকম্যানকে না দেখে সন্দেহ করবে না?'

'লোকটার যে এখানে আমাদের সঙ্গে বসে আলাপ করার কথা, সেটা তো জানে না ওরা, তাই না? তা ছাড়া ড. ডোনেন আছেন আমাদের পাশে, তাঁকে প্রাইভেসি দিতে চিফ চলে গেছেন—এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক।'

রানার কাণ্ডকারখানা দেখে চোয়াল ঝুলে পড়েছে ড. ডোনেনের। ও বলল, 'কী হলো, ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'

'ট্রেভর দেখছি ভুল বলেনি, আপনি সত্যি একটা ডেনজারাস্ লোক, মি. রানা,' বললেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কী করব বলুন, এমন নাছোড়বান্দা লোককে বুঝ দেয়ার অন্য কোনও কায়দা জানা নেই আমার।'

'তাই বলে এখানকার সিকিউরিটি চিফকে তারই অফিসে আক্রমণ করবেন? লোকটা জেগে ওঠার পর আপনার কী হাল করবে, ভেবে দেখেছেন?'

'ততক্ষণ আমরা এখানে থাকছি না,' রানা বলল। 'আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

'আমাকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন, বলুন তো?'

'বিশাল একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে, ডক্টর। আপনাকে সেটা সমাধান

করতে হবে।'

'কীসের ক্রাইসিস?'

'একটা কম্পিউটার-ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পৃথিবীতে—প্রচণ্ড শক্তিশালী। আপনি ছাড়া আর কেউ ওটাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'ভাইরাস!' ড. ডোনেনের কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। গোটা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবার সময় নেই এখন। চলুন আমাদের সঙ্গে, নিজ চোখেই সব দেখতে পাবেন।'

'সেটা সিম্পলি ইম্পসিবল, মি. রানা,' বললেন ডোনেন। 'ব্লিকম্যানকে বোকা বানিয়ে অজ্ঞান করেছেন মানে এই নয় যে, আমাকেও বের করে নিয়ে যেতে পারবেন। বিজ্ঞানী আর স্টাফদের উপর বিশেষভাবে নজর রাখে সিকিউরিটির লোকেরা, তা ছাড়া এই ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জেলখানার মত। যদি কোনওভাবে ডোম থেকে বের হতেও পারেন, লাভটা কী? সাগরের মাঝখানে একটা বরফের তৈরি দ্বীপে আছি আমরা, যাবোটা কোথায়?'

'সেসব নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে, আমরা সব আয়োজন করে এসেছি। ডোম থেকে বেরিয়ে ঘণ্টাদুই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলেই হয়। আমার এজেন্সির অপারেটররা এয়ারলিফট করে নিয়ে যাবে আমাদের।'

'তার আগেই কোস্টগার্ডের শিপটা এসে যাবে। শুধু ব্লিকম্যানের লোকেরা নয়, ওরাও আমাদের খুঁজতে শুরু করবে।'

'জানি, শিপটার কারণে আমাদের সমস্যাটা দ্বিগুণ জটিল হয়ে যাচ্ছে। তবে এরচেয়ে কঠিন আর প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার মত ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা আমাদের আছে।'

'সবচেয়ে বড় বাধাটার কথাই তো বলিনি এখনও,' শান্ত গলায় বললেন ড. ডোনেন। 'সেটা হচ্ছি আমি। আমি নিজেই এখান থেকে যেতে চাই না।'

'প্লিজ, স্যর, অমন কথা বলবেন না,' রায়হান অনুরোধ করল। 'কত বড় একটা বিপদ দেখা দিয়েছে, তা আপনি জানেন না। আপনাকে আমাদের খুব দরকার।'

'হতে পারে,' বললেন ডোনেন। 'কিন্তু ইউনোকোড সংক্রান্ত যে-কোনও সমস্যা আমি এখানে বসেই সমাধান করে দিতে পারি। আমার কাছে কম্পিউটার, ইন্টারনেট অ্যাকসেস, সফটওয়্যার—সব আছে। তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে কেন?'

'ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না, স্যর। কোস্টগার্ডের জাহাজটা এসে পড়লে সমস্যা সমাধানের কোনও সুযোগই দেয়া হবে না আপনাকে, সোজা ধরে নিয়ে যাবে।'

www.boighar.com

'আসুক,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন ডোনেন। 'যদি যেতেই হয়, তা হলে তোমাদের চাইতে ওদের সঙ্গে যাওয়াটাই আমি বেশি প্রেফার করব। অন্তত একটা সরকারি বাহিনীর হাতে অনেক বেশি নিরাপদ থাকব, পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচবে।'

'আপনি এখনও ভাবছেন, কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে?' কথাটার অর্থ অনুধাবন করতে পেরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এমনটা মনে হবার কারণ কী?'

boighar.com

এক মুহূর্ত নীরব থেকে রানার দিকে অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকালেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী। ঘোর লাগা গলায় বললেন, 'কারণ ইউনো-রা সবাই মারা যাচ্ছে, মি. রানা। আপনারা সম্ভবত পৃথিবীর শেষ ইউনোর সঙ্গে কথা বলছেন।'

পনেরো

পাহাড়ের চাতাল থেকে ঢাল বেয়ে সারফেসে নেমে এসেছে আততায়ীদের দুজন—আলফা-ওয়ান আর টু। তৃতীয়জন রয়ে গেছে উপরে, ব্যাকআপ হিসেবে। এই মুহূর্তে একটা বরফের ঢিবির আড়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ওরা দুজন। একটা অ্যামবুশ করতে যাচ্ছে ওরা, অপেক্ষা করছে শিকারের জন্য।

ব্রাইটনের রিসার্চ ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা বাহিনী আর অন্যান্য লোকজন মিলে একশোর বেশি লোকের বিপক্ষে দুজন মাত্র খুনী আসলে কিছুই না—সঙ্গে যতই অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট থাকুক না কেন। তারপরও পিছু হটছে না আলফা ওয়ান আর টু—কারণ ওদের বিশ্বাস, প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের চমকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে পারবে ওরা। একটা সফল আক্রমণের প্রধান শর্তই হচ্ছে এলিমেন্ট অভ সারপ্রাইয। শত্রুকে চমকে দিতে পারলে পুরো কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না, তাই তাকে ঘায়েল করা যায় অনায়াসে। এই পদ্ধতিটাই কাজে লাগাতে যাচ্ছে ওরা।

রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে ঢোকাটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা—কড়া পাহারা রয়েছে প্রতিটা এন্ট্রি পয়েন্টে, চোখ এড়িয়ে ঢোকা এক কথায় অসম্ভব। তবে এই সমস্যার সমাধান চারদিন আগেই বের করে রেখেছে আলফা ওয়ান।

প্রতিদিন সকালে পুরো ফ্যাসিলিটির চব্বিশ ঘণ্টার আবর্জনা নিয়ে বেরিয়ে আসে একটা আইস-ট্র্যাক্টর। দু'মাইল পাড়ি দিয়ে আইস শেলফের কিনারায় যায় ওটা, সমস্ত ময়লা সাগরে ডাম্প করে। আজও গেছে, ফেরার পথে ওটাকে আটকাবে ওরা, আরোহীর ছদ্মবেশে ডোমে ঢুকবে। আবর্জনা ডাম্প করার কাজটা এতই রুটিন প্রকৃতির হয়ে পড়েছে যে, ঢোকা বা বেরুনোর সময় ট্র্যাক্টরটাকে মোটেই চেক করে না সিকিউরিটির লোকজন—এটা দারুণ একটা সুবিধে হয়ে দাঁড়াবে ওদের জন্য।

ঘড়ি দেখল আলফা-ওয়ান, প্রায় দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে আলফা-যিরোর কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স পাবার পর থেকে। মনে মনে উদ্বিগ্ন বোধ করল—টাইম-টেবলে পিছিয়ে পড়ছে, আজ বড্ড দেরি করছে ট্র্যাক্টরটা ফিরে আসতে। এদিকে অ্যামেরিকান শিপটারও আসার সময় হয়ে যাচ্ছে, ওরা পৌঁছে গেলে আর সম্ভব হবে না অপারেশন চালানো। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল সে, এর মধ্যে ট্র্যাক্টরটা এলে ভাল, নইলে ডোমের অ্যাকসেস পয়েন্টে সরাসরি হামলা চালিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত যদি তা-ই করতে হয়, সফল হবার সম্ভাবনা কী পরিমাণ কমে যাবে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আলফা-ওয়ান। হতচ্ছাড়া ট্র্যাক্টরটা গেল কোথায়? ওটা পেলে কী সুন্দরভাবে ঢুকে যাওয়া যেত

ডোমে! কোনও দুশ্চিন্তাই করতে হত না।

কোমরের কাছে ঝোলানো ওয়াকি-টকি খড় খড় করে উঠল, ওদের তৃতীয় সঙ্গী ডাকাডাকি করছে উপর থেকে।

'আলফা-ওয়ান, দিস ইজ আলফা-থ্রি। রিপ্লাই।'

সেটটা মুখের কাছে তুলল কঠিন চেহারার যুবক। 'আলফা-ওয়ান স্পিকিং। বলো।'

'আসছে...আসছে ওটা!' আলফা-থ্রি উত্তেজিত।

'আণ্ডারস্টুড। তুমি পজিশন মেইনটেন করো। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কানে ভেসে এল আইস-ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিনের ভারি গর্জন। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো ওটা, শামুক গতিতে এগোচ্ছে। ময়লা ফেলে দিয়ে আসায় ওটার পিছনে লাগানো ছাদবিহীন ক্যারিয়ারটা খালি, তারপরও এত আস্তে আসছে কেন—কে জানে!

ওয়াকি-টকিটা আবার মুখের কাছে তুলল আলফা-ওয়ান। 'আলফা-থ্রি, আমরা মুভ করছি। হেলিকপ্টারটাকে এখুনি সিগনাল দিয়ে দাও, চলে আসুক। কাজ শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে হবে।'

'ওটার আসতে তো বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না,' বলল আলফা-থ্রি। 'এর মধ্যে মিশন কমপ্লিট করতে পারবে?'

'আশা করি পারব। বাই চান্স যদি দু-চার মিনিট দেরি হয়, কপ্টারটাকে বোলো আশপাশে চক্কর দিতে।'

'বুঝতে পেরেছি। ওভার অ্যান্ড আউট।'

ওয়াকি-টকিটা নামিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল কঠিন চেহারার যুবক, মাথাটা একটু নুইয়ে ইশারা দিল। ঝটপট উঠে পড়ল দুজনে, আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে লম্বা কদমে এগিয়ে একদম ট্র্যাক্টরটার ট্র্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আচমকা দুজন মানুষকে উদয় হতে দেখে চমকে উঠল ট্র্যাক্টরের ড্রাইভার আর তার সহযোগী। তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে বাহনটাকে দাঁড় করাল তারা, দুই আগন্তুকের মাত্র কয়েক গজ তফাতে থমকে গেল কাঁটা বসানো ট্র্যাক।

শান্তভাবে হেঁটে ট্র্যাক্টরের দুপাশ দিয়ে এগোল আলফা ওয়ান আর টু, ড্রাইভারস্ কেবিনের দুই জানালা বরাবর গিয়ে থামল।

জনমানবহীন এই আইস শেলফে বহিরাগত মানুষ দেখে অবাক হয়ে গেছে ড্রাইভার। জানালার কাঁচ নামিয়ে কঠিন চেহারার যুবককে দেখল এক পলক, তারপর প্রশ্ন করল, 'কে তোমরা? এখানে কোত্থেকে এলে?'

জবাব না দিয়ে একটু হাসল যুবক, পরমুহূর্তেই চোখ ধাঁধানো দ্রুততায় শরীরের আড়াল থেকে বের করে আনল সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা। গুলি করল।

'দুপ!' করে মৃদু শব্দ হলো, ড্রাইভারের বিস্ফারিত দু'চোখের মাঝখানে কপালে একটা তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল বুলেটটা। প্রায় একই সময়ে আলফা-টু-ও গুলি করেছে। সিটের ওপর এলিয়ে পড়ল দুটো নিষ্প্রাণ দেহ।

যান্ত্রিক দ্রুততায় পরের কাজগুলো সারল দুই খুনী—প্রথমে লাশদুটো নামিয়ে আনল ট্র্যাক্টর থেকে, শরীরের কাপড়চোপড় খুলে মৃতদেহগুলো ফেলে দিল একটা

boighar.com

ফাটলের মধ্যে, কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই ওগুলো তুষারে ঢেকে যাবে। এরপর পোশাকগুলো গায়ে চড়িয়ে নিজেরাই ড্রাইভার আর সহকারী সাজল ওরা, ট্র্যাক্টরে উঠে বসে চোখ-মুখ ঢেকে ফেলল স্নো-মাস্ক আর গগলস্ দিয়ে, এখন আর চেহারা দেখা যাচ্ছে না ওদের। ফ্যাসিলিটির দিকে আবার রওনা হয়ে গেল ভারি যানটা—পুরো ঘটনাটা ঘটতে পাঁচ মিনিটও লাগেনি।

দশ মিনিটের ভিতর ডোমের গ্যারাজ এন্ট্র্যান্সে পৌঁছে গেল ট্র্যাক্টর, হর্ন বাজাতেই গুড়গুড় করে খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজা, গ্যারাজে ঢুকে পড়ল বাহনটা। ওটাকে পার্ক করে নেমে এল দুই খুনী, গ্যারাজ থেকে ডোমের মূল অংশে যাবার দরজায় দুই প্রহরী আছে, তবে তাদের বিনা বাধায় পেরিয়ে গেল। মৃত দুই স্টাফের আইডি ঝুলছে খুনীদের বুকে—তা দেখেই সন্তুষ্ট প্রহরীরা। মাস্ক আর গগলস্ দেখে সন্দেহ করল না কিছু; ঠাণ্ডা থেকে কেবলমাত্র এসেছে ড্রাইভার আর তার সহকারী, তাই হয়তো খুলছে না ভেবে চুপ করে রইল।

মূল প্যাসেজে পৌঁছে পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করল আলফা-ওয়ান—ফ্যাসিলিটির ব্লু-প্রিন্ট ওটা, আইস শেলফে আসার আগে ব্রাইটনের মেইনফ্রেম কম্পিউটার থেকে হ্যাকিঙের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। ম্যাপ দেখে গন্তব্য ঠিক করল সে, সঙ্গীকে নিয়ে রওনা হলো সেদিকে। গ্যারাজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে ডোমের অপারেশন সেন্টার। সিকিউরিটি লুকআউট থেকে শুরু করে পানি, ইলেকট্রিসিটি, এয়ার সাপ্লাই, টেম্পারেচার—সব নিয়ন্ত্রণ করা হয় ওখান থেকে, পুরো ফ্যাসিলিটির প্রাণকেন্দ্র এই মাঝারি আকারের কামরাটা। ওখানেই যাচ্ছে দুই খুনী। সামান্য দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে গিয়ে মাত্র একবার নিরাপত্তারক্ষীদের মুখোমুখি হলো ওরা। যেন মাস্ক আর গগলস্ খুলে ফেলছে, এমন ভাব করতে করতে লোকগুলোকে পেরিয়ে এল দুজনে।

কাজে লাগল ধোঁকাটা, চেহারা দেখার চেষ্টা না করে শুধু আড়চোখে আই.ডি. দেখে সন্তুষ্ট থাকল গার্ডেরা। আসলে বহিরাগত কারও প্রবেশের সুযোগ নেই ফ্যাসিলিটিতে, রি-সাপ্লাই প্লেনে যে-দু'জন এসেছিল, তারা ধরা পড়ে গেছে—এ-কারণেই সামান্য ঢিলেঢালা ভাব প্রহরীদের মধ্যে।

শেষ মোড়টায় পৌঁছে থামল দুই খুনী, উঁকি দিয়ে দেখে নিল অপারেশন সেন্টারের প্রবেশপথ। করিডরটা নির্জন, তবে দরজার সামনে মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে দুজন গার্ড। এরা কোনও ছাড় দেবে বলে মনে হয় না, পুরো ফ্যাসিলিটিতে এদের দায়িত্বটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—প্রাণকেন্দ্রটাকে পাহারা দেয়া। সামান্য একজন ভেহিকল ড্রাইভার আর তার সহকারী কেন অপারেশন সেন্টারে ঢুকতে চাইছে, তা নিঃসন্দেহে জানতে চাইবে।

কী করবে ঠিক করে ফেলল দুই চতুর খুনী। মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল, দৃঢ় পায়ে হাঁটছে দরজার দিকে। পায়ের শব্দে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল দুই গার্ড, চেহারা ঢাকা দুই আগন্তুককে দেখে সন্দেহ ঘনাল তাদের চোখে, কিন্তু লোকদুটো নির্দ্বিধায় এগোচ্ছে দেখে বোকাও বনে গেল। অস্ত্রে হাত রেখে অপেক্ষা করতে থাকল তারা, নবাগতরা কাছাকাছি এলে চ্যালেঞ্জ করবে।

কিন্তু বেচারাদের সেই সুযোগ দিল না আলফা টিমের দুই দক্ষ সদস্য। দশ ফুট

দূরে থাকতেই জ্যাকেটের আড়াল থেকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলদুটো বেরিয়ে এল ওদের হাতে, হাঁটার ছন্দ বিন্দুমাত্র নষ্ট না করে দুপ দুপ শব্দে দুটো গুলি ছুঁড়ল। প্রতিক্রিয়ার কোনও সময়ই পেল না গার্ডেরা, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে লাশদুটোকে পাশ কাটাল খুনীরা, হাতলে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল অপারেশন সেন্টারের দরজা, ঢুকে গেল রুমটাতে। ভিতরে নানা ধরনের কনসোলের সামনে বসে কাজ করছে মোট ছ'জন স্টাফ, সবার পিঠ দরজার দিকে। পিস্তল তো হাতেই ছিল, চৌকাঠ পেরিয়েই তিনটে করে গুলি করল আলফা ওয়ান আর টু—আশ্চর্য দক্ষতা এবং অসাধারণ রিফ্লেক্স নিয়ে। কথা বলতে হয়নি, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে যার যার টার্গেট বেছে নিয়েছে ওরা; গুলি করার পর দেখা গেল, কেউ কারও ভাগে হাত দেয়নি। পুরো কাজটাই তারা করেছে রোবটের মত; মোড় ঘোরার পর যে পদক্ষেপে হাঁটছিল, তাতে ছন্দপতন ঘটেনি একটুও।

আর্তনাদেরও সময় পায়নি, মাথার পিছনে গুলি খেয়ে কনসোলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছয় স্টাফ। লাশগুলোর দিকে তাকাল না খুনীরা, প্রথমে করিডর থেকে দুই গার্ডের লাশ টান দিয়ে ভিতরে নিয়ে এল, তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা। এবার সিকিউরিটি কনসোলের দিকে নজর দিল তারা।

ইউনিফর্ম পরা দুজন মানুষ কাজ করছিল ওখানটায়, এখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। টান দিয়ে মৃতদেহদুটো চেয়ার থেকে মেঝেতে ফেলল দুই খুনী, নিজেরা বসল সে-জায়গায়।

কনসোলের ঠিক সামনে দেয়ালে তিন সারিতে বসানো আছে ন'টা আট-ইঞ্চি টিভি স্ক্রিন। নির্দিষ্ট একটা ছন্দে পুরো ফ্যাসিলিটি জুড়ে বসানো ষাটটা ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে ট্রান্সমিট হওয়া দৃশ্য দেখাচ্ছে ওগুলো। চেয়ারে হেলান দিল আলফা-ওয়ান, মাস্ক সরিয়ে বলল, 'চলো দেখা যাক, আমাদের ডক্টর সাহেব এই মুহূর্তে কোথায় আছেন।'

ড. ডোনেনের কথাটা ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে রানার কাছে। ভুরু কুঁচকে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী বলতে চাইছেন আপনি, ডক্টর? শেষ ইউনোর সঙ্গে কথা বলছি মানে?'

'শেষ মানে শেষ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজ্ঞানী। 'গত তিন মাসে আমাদের ছ'জন মারা গেছে, সপ্তমজনও আছে কি না, তা বলতে পারছি না। সম্ভবত আমিই সবশেষে বাকি আছি।'

'জাস্ট আ মিনিট, হিসেব মিলল না তো। সাত আর আপনি এক...মানে আটজন। বাকি দুজন কোথায়?'

'ওরা বহু আগেই মারা গেছে, দুর্ঘটনায়। তবে ক'দিন হলো মনে হচ্ছে, ওরাও খুন হয়ে থাকতে পারে।'

'কী যে বলছেন, তার কিছুই বুঝতে পারছি না,' বিরক্ত হলো রানা। 'পরিষ্কার করে বলুন না!'

'তা হলে আপনাকে পুরো গল্পটা শুনতে হবে।'

'গল্প-টল্প শোনার উপায় নেই আমাদের, তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে। একটা ভয়ঙ্কর ক্রাইসিসে পড়েছে গোটা বিশ্ব...'

boighar.com

'আমার মনে হয়, স্যরের সব কথা শুনে নেয়াই ভাল, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল রায়হান। 'এখান থেকে বের হবার পর তো দৌড়ের উপর থাকতে হবে, কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তারচেয়ে এখনই যদি সব জেনে নিই, হয়তো পুরো ব্যাপারটার পিছনে কে লুকিয়ে আছে—তার একটা সূত্র পাওয়া যাবে।'

প্রস্তাবটার ভালমন্দ ভেবে দেখল রানা—ব্লিকম্যান অজ্ঞান থাকবে বেশ কিছুক্ষণ, তার ডাক না পেলে গার্ডরাও রুমে ঢুকবে না। তারমানে শান্তিতে কথা বলবার জন্য বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যাচ্ছে। এই ফাঁকে কোস্টগার্ডের শিপটা চলে এলেও ভালই হয়। ব্লিকম্যান তো বললই, ওরা কিছুতেই ডোনেনকে হাতছাড়া করবে না; সেক্ষেত্রে কোস্টগার্ড আর ফ্যাসিলিটির লোকজনের মধ্যে একটা গণ্ডগোল অনিবার্য। হৈ-হট্টগোলটা ওদের পালানোর সময় ভাল কাভার হতে পারে। এই মুহূর্তে রুম ছেড়ে বেরুনো যাবে না বলে অ্যান্টিভাইরাস তৈরির কাজটা শুরু করতে পারবেন না বিজ্ঞানী ভদ্রলোক, ওটা এখান থেকে পালানোর পর সুবিধেজনক একটা জায়গায় করতে হবে ওঁকে। কাজেই সময়টা তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কাটানো যেতে পারে। তা হলে হয়তো এটাও জানা যাবে, ভয়ঙ্কর ভাইরাসটা ইউনোদের মধ্যে কে ছড়িয়েছে।

সিকিউরিটি চিফের রুমে সময়টুকু কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। প্রৌঢ় বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, স্যর। বলুন আপনার গল্প, তবে সংক্ষেপে সারার চেষ্টা করবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করলেন ডোনেন, 'পুরো ব্যাপারটার সূত্রপাত ইংল্যাণ্ডে...অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানেই কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি, ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৭৯ সালে। সে-আমলে একটু অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলাম আমি, তার উপর গেছি আরেক মহাদেশ থেকে; স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে তেমন কোনও বন্ধুবান্ধব ছিল না। তবে এক জায়গায় দীর্ঘদিন থাকলে যা হয়, আস্তে আস্তে দু-একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে শুরু করল, ওরাই হয়ে উঠল আমার বন্ধু। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদের মধ্যে সহপাঠী কেউ ছিল না বললেই চলে, বেশিরভাগই হয় সিনিয়র, নয় জুনিয়র। তা হলে বন্ধুত্ব হলো কী করে? এর পিছনে কারণটা হলো একটা কমন বিষয়ের উপর আমাদের সবার সীমাহীন আগ্রহ—জিনিসটা কম্পিউটার। সমবয়েসী অন্যান্যদের মত গান-বাজনা, ফ্যাশন, চলচ্চিত্র বা রাজনীতি—এসব নিয়ে কোনও আগ্রহই ছিল না আমাদের, ধ্যান-জ্ঞান সব পড়ে থাকত কম্পিউটার নিয়ে। কম্পিউটারই ছিল আমাদের হবি, প্যাশন—সবকিছু। আজকাল যদিও এমন কম্পিউটার-আসক্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়, তারপরও সে-আমলে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিকই ছিল। কারণ তখন ওটা কাঠখোট্টা একটা হিসাবের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না, আজকালকার মত বিনোদনের বস্তু তো নয়ই।'

'তা হলে আপনারা সারাক্ষণ কম্পিউটার নিয়ে করতেন কী?'

'যন্ত্রটা নিয়ে গবেষণা করতাম আমরা, কীভাবে ওটার উন্নতি করা যায়, তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম। অবস্থা দেখে ভার্সিটির সবাই আমাদের *"নীরস পণ্ডিতের দল"* বলে খেপাত।'

'হুঁ, দশজনই ছিলেন তখন?'

'সবসময় না। আমাদের গ্রুপটার বন্ধুদের সংখ্যা বিভিন্ন সময় বেড়েছে-কমেছে। তবে দশজনে এসে একসময় স্থির হয়ে গেল ওটা...অবশ্য নিজ থেকে হয়নি, আমরাই স্থির করে দিলাম। পরে নতুন যারা যোগ দিতে চেয়েছে, তাদের আর দলে নিইনি।'

'কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'কারণ ওঁরা তখন ইউনোকোড আবিষ্কার করে ফেলেছেন, ওটার কথা কাউকে জানতে দিতে চাইছিলেন না,' বুঝতে পেরে বলে উঠল রায়হান। 'ঠিক বলেছি, স্যর?'

হাসলেন ডোনেন। 'হ্যাঁ। তবে ওটা অনেক পরের ঘটনা। শুরুতে আমরা অমন ধরনের কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলাম না, আমাদের চেষ্টা ছিল তখনকার প্রচলিত সিস্টেমটাকেই আরও কার্যক্ষম করে তুলবার। যে যার মত গবেষণা করতাম আমরা, এক্সপেরিমেন্ট চালাতাম, পরে একত্র হয়ে ফলাফলগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করতাম, একে অন্যের ভুল ধরিয়ে দিতাম—এভাবেই চলছিল দিনকাল।

'দশজন ছিলাম আমরা—সাতজন ছেলে, তিনজন মেয়ে। ব্রিটিশ ছিল পাঁচজন, এর মধ্যে মাইকেল আর ডেবি ওয়ালডেন ছিল হাইস্কুল-সুইটহার্ট...ভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় থাকতেই বিয়ে করে ওরা, একটা মেয়েও হয়েছিল। বাকি তিন ব্রিটিশ হলো ট্রিসিয়া মিলনার, হার্বার্ট গ্র্যান্ট আর ডুইট গার্ডনার। এ ছাড়া কুর্ট মাসডেন ছিল আইরিশ, আর ভ্যাল মর্টিমারের বাড়ি স্কটল্যাণ্ডে। অ্যামেরিকান ছিলাম আমরা তিনজন—আমি, লুই পামার আর গ্রুপের সবচেয়ে কমবয়েসী সদস্যা—এলিসা ভ্যান বুরেন। ও আবার আধা-ডাচ, বাবা হল্যাণ্ডের মানুষ ছিল কি না। আমাদের চার বছরের জুনিয়র ছিল মেয়েটা।'

'চার বছর! আপনাদের গ্রুপে ঢুকল কী করে?'

'কম্পিউটার সায়েন্সেই পড়ত, মেধাবীও ছিল...আর ছিল কুর্টের গার্লফ্রেন্ড,' বললেন ডোনেন। 'ওভাবেই আমাদের একজন হয়ে যায় ও। ওদের সম্পর্কটা অবশ্য বেশিদিন টেকেনি, তারপরও আমাদের ছেড়ে যায়নি এলিসা, গ্রুপে রয়ে গেছে, বন্ধুর মত থেকেছে কুর্টের সঙ্গে। তাতে আমরাও খুশি হয়েছিলাম। ওরা দুজনই ছিল একটু পাগলাটে আর উড়নচণ্ডী স্বভাবের, আমাদের রসকষহীন গ্রুপটায় ওরাই ছিল আনন্দের উৎস—আমাদের প্রাণশক্তি।'

'হুম,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'সবার পরিচয় জানা গেল। এবার ইউনোকোডের ইতিহাস বলুন।'

'ওটা অনেক পরের ঘটনা। সালটা সম্ভবত '৮৮ কি '৮৯ হবে। আমাদের লেখাপড়া প্রায় শেষ তখন, ডক্টরেট করছি, এমন সময় একদিন উত্তেজিত অবস্থায় মিটিঙে হাজির হলো মাইকেল আর ডেবি। সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক একটা কোড নাকি আবিষ্কার করে বসেছে ওরা, ওটা দিয়ে বাইনারি কোডকে রিপ্লেস করা যাবে। সিঙ্গুলার কোডের কথা শুনে আমরা বেশ অবাক হলাম, কারণ বিষয়টা স্রেফ আইডিয়া নয়, আমাদের দেখাবার মত একটা নমুনাও নিয়ে এসেছে ওরা। এমন একটা কোডের ধারণা কবে ওদের মাথায় এল, বা কবে থেকে কাজ করে

boighar.com

জিনিসটাকে ডেমোনস্ট্রেশনের মত পর্যায়ে নিয়ে এল, তা আমাদের বলেইনি। অবস্থা দেখে মনে হলো, ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোপন রাখছিল ওরা। সেজন্যে কেউ কেউ খুব রাগ করল, তবে সেটা বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না। সিঙ্গুলার কোডের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে সব ভুলে গেলাম আমরা; জিনিসটা তখন খুব কাঁচা অবস্থায় ছিল, ওটাকে ডেভেলপ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মাস চারেকের মধ্যে মোটামুটি একটা ওয়ার্কিং কণ্ডিশনে নিয়ে আসা গেল কোডটাকে, এবার এক্সপেরিমেন্টের পালা। সিঙ্গুলার কোড দিয়ে নিজেরা একটা সফটওয়্যার তৈরি করলাম আমরা, সেটা ভার্সিটির কম্পিউটার ল্যাবে চালিয়ে দেখলাম।

'ফলাফলটা হলো ভয়াবহ—ভার্সিটির গোটা সিস্টেম ক্র্যাশ করল কয়েক মিনিটের মধ্যে। নিজেদের অজান্তেই একটা ভাইরাস তৈরি করে বসেছিলাম আমরা—সিঙ্গুলার কোডের প্রোগ্রামটা এতই শক্তিশালী ছিল যে, বাইনারি কোডের সবকিছুকে ওভাররাইড করে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। নিশ্চিত হবার জন্য আরও দু'জায়গায় পরীক্ষা চালালাম আমরা, প্রতিবারই একই কাণ্ড ঘটল।

'ঘটনাগুলোর পর কোডটার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আঁচ করতে পারলাম আমরা। চেষ্টা করে দেখা গেল, ওটা দিয়ে বাইনারি কোডের যে-কোনও সিকিউরিটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে। এসব দেখে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম, অনেকগুলো সমস্যা এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। যতক্ষণ না কোডটাকে সবখানে চালু করতে পারছি, ততক্ষণ এটা বাইনারি সিস্টেমের বিরুদ্ধে স্রেফ একটা অস্ত্র ছাড়া আর কিছু না। অথচ অল্প সময়ে জিনিসটা চালুও করা সম্ভব নয়...' রায়হানের কাছে ইউনোকোড সংক্রান্ত যে-সব অসুবিধের কথা শুনেছিল রানা, সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন ডোনেন। শেষে বললেন, 'এ-কারণে কোডটার কথা গোপন করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। সবাই মিলে শপথ করলাম, যতদিন সমস্ত সমস্যার সমাধান করে কোডটাকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপনের মত একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে না পারছি, ততদিন কাউকে ওটার কথা বলব না, শেখাব না। প্রতিজ্ঞাটা আজও রক্ষা করে চলেছি আমরা।'

'কিন্তু ওটার কথা তো পুরোপুরি চাপা দিতে পারেননি আপনারা,' রানা বলল। 'গুজব বলুন, বা মিথ হিসেবে বলুন, লোকে ওটার কথা জেনেছে। *ইউনোকোড* নাম দিয়েছে, আপনাদের ইউনো বলছে...এমনকী সবমিলিয়ে যে দশজন ইউনো আছে, তা-ও জানে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো?'

'ভার্সিটির সিস্টেম ক্র্যাশ করার পর একটা তদন্ত হয়েছিল,' ব্যাখ্যা করলেন ড. ডোনেন। 'ইউনোকোডের সামান্য ট্রেস পাওয়া গিয়েছিল ওই নষ্ট হয়ে যাওয়া কম্পিউটারগুলোর হার্ডডিস্কে। ডিপার্টমেন্টের পণ্ডিতেরা যদিও ওটাকে কোনও কোড হিসেবে মানেননি, তবে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারটা আলাদা। বেশ কয়েকজন ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ আগ্রহী হয়ে পড়ে, মিথটারও সূচনা ওদের মাধ্যমেই হয়। তদন্তে আমরা ধরা পড়িনি বটে, তবে এটুকু বের হয়ে এসেছিল যে, দশজন ইউজার মিলে সিস্টেমটা ক্র্যাশ করিয়েছে। ওখান থেকেই দশজন ইউনোর কাহিনিটা ছড়ায়।'

www.boighar.com

'আচ্ছা! ঠিক আছে, গল্পটা শেষ করুন এবার। ব্যর্থ এক্সপেরিমেন্ট আর

ইউনোকোড গোপন করার শপথ নেয়ার পর কী ঘটল?'

'লেখাপড়া শেষ করলাম আমরা, তারপর জীবিকার টানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হলো সবাইকে। চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা—বিভিন্ন পেশায় ব্যস্ত হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লাম আমরা। অবশ্য ইউনোকোড সংক্রান্ত গবেষণাটা বন্ধ করলাম না কেউই, যার যার মত গবেষণা চালিয়ে গেলাম, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগও বন্ধ করিনি। ততদিনে ইন্টারনেট চালু হয়ে গেছে, রুটিন করে সাইবারস্পেসে মিলিত হতাম আমরা, মিটিং করতাম। কে কী অগ্রগতি করল, তা নিয়ে আলোচনা চলত। ভালই চলছিল সবকিছু, হঠাৎ নব্বুই সালের মাঝামাঝি ঘটল মর্মান্তিক ঘটনাটা। মাইকেল আর ডেবি—সিঙ্গুলার কোডের উদ্ভাবক, আমাদের প্রিয় দুই বন্ধু...সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল। ইউ.কে-র কিংসউড ইলেকট্রনিক্সে কাজ করত ওরা, এক বিকেলে অফিস শেষে বাড়ি ফিরছিল, পাহাড়ি রাস্তায় ব্রেক ফেল করে নীচে পড়ে যায় গাড়িটা—দুজনেই মারা যায়।'

'ব্রেক ফেল?'

'অফিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনে আর কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরাও খুব একটা অবিশ্বাস করিনি। মাইকেল খুব জোরে গাড়ি চালাত।'

'একটু আগে কী যেন বলছিলেন আপনি...দুর্ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে মানেন না। এই অ্যাকসিডেন্টটার কথাই বলছিলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. ডোনেন।

'কিন্তু এত বছর পর এমনটা মনে হবার কারণটা কী, স্যর?' জিজ্ঞেস করল রায়হান। 'আপনি ছাড়া বাকিরাও মারা গেছে বললেন, সেটা কীভাবে?'

'বলছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী। 'মাইকেল আর ডেবির মৃত্যুতে খুবই মুষড়ে পড়ি আমরা। একে তো ওরা আমাদের খুব প্রিয় দুজন মানুষ ছিল, তার ওপর ওরা মারা যাওয়ায় লোকবল কমে গেল আমাদের। যে বিশাল কাজে আমরা হাত দিয়েছি, তাতে দশজনই কম হয়ে যায়, ওরা না থাকায় আরও সমস্যায় পড়ে গেলাম আমরা। কোডের আবিষ্কর্তা হওয়ায় মাইকেল আর ডেবিই ওটার খুঁটিনাটি সবচেয়ে বেশি জানত, ইউনোকোডের গ্রামার বানাতে পারত সবচেয়ে সহজে, এমনকী বাইনারি থেকে ইউনোর ট্রান্সফারের ব্যাপারেও চমৎকার কয়েকটা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছিল। ওদের অভাবে অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গেলাম বাকিরা, আজ পর্যন্ত যে কাজটা শেষ করতে পারিনি, তা ওরা না থাকাতেই।

'যা হোক, আমরা অবশ্য হাল ছাড়িনি কখনও। কাজ চালিয়ে গেছি, নিয়মিত যোগাযোগও রেখেছি বাকিরা। মাঝখানের অনেকগুলো বছর চুপচাপ কেটে গেছে। ঝামেলার শুরুটা হয়েছে তিন মাস আগে...ফেব্রুয়ারিতে। প্রথমে লুই নিউ ইয়র্কে ছিনতাইকারীর হাতে খুন হলো, কয়েকদিন পর মারা গেল কুর্ট—হার্ট অ্যাটাক করেছিল, অপারেশন সাকসেসফুল ছিল, কিন্তু রিকভার করেনি। দুই বন্ধুর মৃত্যুতে খুব কষ্ট পেলাম আমরা, কিন্তু তখনও সন্দেহ করিনি কিছু। মার্চের শুরুতে ইন্টারনেটে একটা মিটিং ছিল আমাদের, ওটায় গর-হাজির থাকল হার্বার্ট। একটু পাগলাটে টাইপের সে, মাঝে মাঝেই কিছু না বলে ডুব দেয়, তাই বিশেষ পাত্তা দিলাম না কেউ। মাসশেষের দ্বিতীয় মিটিঙেও থাকল না ও, একই সঙ্গে দেখলাম

boighar.com

ট্রিসিয়াও গায়েব। এবার টনক নড়ল আমাদের, খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল—হার্বার্ট একটা বোট অ্যাকসিডেন্টে আর ট্রিসিয়া নিজ বাড়িতে গ্যাস বিস্ফোরণে মারা গেছে। সাধারণ দুর্ঘটনা ভেবে পত্রিকাঅলারা মাথা ঘামায়নি, তাই কাগজেও আসেনি কিছু। কিন্তু কী ঘটছে বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না আমার। পর পর চারজন ইউনোর মৃত্যু কাকতালীয় হতে পারে না কিছুতেই, কেউ নিশ্চয়ই আমাদের টার্গেট করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা আমি বাকি তিনজনকে জানালাম—ডুইট বিশ্বাস করল, এলিসা বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনওটাই করল না, তবে সাবধান থাকবে বলে কথা দিল; আর ভ্যাল তো রীতিমত হেসেই উড়িয়ে দিল। ফলাফলটা হাতেনাতেই পেয়েছে বেচারা—এপ্রিলের শুরুতে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ওকেও মরতে হয়েছে। আরেকটা দুর্ঘটনা...চিন্তা করা যায়?'

নিশ্চুপ রইল রানা আর রায়হান—ভদ্রলোকের সঙ্গে ওরাও একমত, নির্দিষ্ট পাঁচজন মানুষ পর পর দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে না।

একটু অপেক্ষা করে আবার খেই ধরলেন ডোনেন। 'এনিওয়ে, ওটা পরের ঘটনা। হার্বার্ট আর ট্রিসিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়েই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলাম আমি। কেন আমাদের খুন করা হচ্ছে, এটা বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারছিলাম, পাক্কা প্রফেশনাল খুনী পাঠানো হয়েছে আমাদের পিছে—যারা শুধু খুন করে না, খুনটাকে দুর্ঘটনার চেহারা দিতেও ওস্তাদ। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা...চার-চারজন মানুষ মরে গেল, অথচ কেউ কিছু সন্দেহও করতে পারল না! বাকিদের বাঁচার জন্য পুলিশের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলা যেত, কিন্তু সেক্ষেত্রে খুনীদের চেয়েও ভয়ঙ্কর লোকজন ইউনোকোড হাতে পাবার জন্য আমাদের কবজা করতে চাইত—সেটা আরও ভয়াবহ। কাজেই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বিকল্প ভাবতে হলো আমাকে। চিন্তা করে দেখলাম, প্রত্যেকটা খুন দুর্ঘটনার আদলে ঘটানো হচ্ছে। তাই আমাকে চিরাচরিত জীবনযাত্রা পাল্টে ফেলতে হবে, চলে যেতে হবে এমন কোথাও, যেখানে খুনীরা আমাকে নাগালে পাবে না...দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারবে না। ব্রাইটন টেকনোলজি অনেকদিন থেকেই ঘুরছিল আমাকে ওদের রিসার্চ প্রজেক্টে নেয়ার জন্য। দু'বছরের চুক্তি...পুরো সময়টা বরফের রাজ্যে থাকতে হবে পরিচিত লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, এসব ভেবেই রাজি হচ্ছিলাম না। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে এই অফারটাই আমার জীবন বাঁচাবে বলে মনে হলো। নির্জন আইস শেলফ, কড়া নিরাপত্তা—চাইলেও বাইরের কারও পক্ষে ঢোকা সম্ভব নয়। চমৎকার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, তাই না? ব্রাইটনকে আমি শর্ত দিলাম, প্রজেক্টে আমার যোগ দেয়ার খবর গোপন রাখতে হবে; ওরা রাজি হলো। ব্যস, তারপর আর কী, ভার্সিটিতে ইস্তফা দিয়ে আমি এখানে চলে এলাম। অবশ্য এখানে এসেও মন থেকে ভয় দূর করতে পারছিলাম না, খুনীরা ছদ্মবেশে আমার কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা করতে পারে বলে মনে হচ্ছিল, তাই সিকিউরিটিকে বলে রেখেছিলাম—অপরিচিত কেউ আমাকে খুঁজলে যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হয়। আমার কথাতেই সবসময়ের জন্য একটা ফাঁদের প্ল্যান করে রাখে ওরা, সেটাতে আপনারা আটকা পড়েছেন।'

'মাইকেল আর ডেবি অ্যাকসিডেন্ট করেনি ভাবছেন কেন, সেটা কিন্তু বললেন

না,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'ওয়েল, মি. রানা, ছ'জন যেখানে দুর্ঘটনার মত করে খুন হয়েছে, সেখানে ওদেরটা স্বাভাবিক মৃত্যু ভাবি কী করে, বলুন? হোক না সেটা আঠারো বছর আগে!'

'ছ'জন? আপনি তো এখন পর্যন্ত শুধু পাঁচজনের কথা বলেছেন। আরেকটা কে খুন হয়েছে?'

'ডুইট গার্ডনার। গত মাসের মাঝামাঝি ও-ও গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে।'

'আর এলিসা ভ্যান বুরেন?'

'মরেছে কি বেঁচে আছে—ঠিক বলতে পারব না। ভ্যাল আর ডুইটের খবর আমি পেয়েছি এখানে আসবার পর, ইন্টারনেটে... পত্রিকার অনলাইন এডিশন পড়ে। এলিসার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি কিছু। তবে তাতে খুশি হবার কিছু দেখছি না, হার্বার্ট আর ট্রিসিয়ার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এলিসাও হয়তো এমনভাবে মরেছে যে, সাংবাদিকরা সেটাকে খবর বলে মনেই করেনি।'

'শিয়োর হতে পারলে ভাল হত। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না?'

ডোনেন মাথা নাড়লেন। 'না। পালিয়ে আসার সময় ওদেরকে গা-ঢাকা দিতে আর অনির্দিষ্টকালের জন্য যোগাযোগ বন্ধ রাখতে বলে এসেছিলাম আমি।'

'হুম!' আনমনে মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হচ্ছে রহস্যটার সঙ্গে আমরা যে ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছি, তার সম্পর্ক আছে।'

'কী এক ভাইরাসের কথা বলছিলেন, ওটার সঙ্গে?' জানতে চাইলেন ডোনেন।

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ভাইরাসের সঙ্গে ইউনোদের খুন হবার সম্পর্ক কী?' ভুরু কোঁচকালেন ডোনেন।

'ওটা ইউনোকোডের তৈরি, স্যর,' রায়হান বলল। 'আগামী তিনদিনের মধ্যে ভাইরাসটা দুনিয়ার সব কম্পিউটার ধ্বংস করে দেবে।'

'হোয়াট!' চমকে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'কী বলছ তুমি?'

'শুনতে ভুল হয়নি আপনার,' রানা বলল। 'শুধুমাত্র ইউনোকোডের তৈরি অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে ওটাকে প্রতিহত করা সম্ভব। আমার ধারণা, এই অ্যান্টিভাইরাস যাতে তৈরি না হয়, সেজন্যেই ইউনোদের একে একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।'

ভুরু কুঁচকে গেল বিজ্ঞানীর। 'শুধু অ্যান্টিভাইরাস কেন... ভাইরাসটাও তো একজন ইউনো ছাড়া কারও পক্ষে বানানো সম্ভব নয়।'

'*"জীবিত"* ইউনো,' শুধরে দিল রানা।

ঝট করে ওর দিকে তাকালেন ডোনেন। 'আপনি কি বলতে চাইছেন...'

'দুঃখিত স্যর, কিন্তু নিজের মুখেই তো বলেছেন—আপনি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।'

'না-আ!' তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করলেন ডোনেন। 'আমি কেন শুধু শুধু একটা ভাইরাস ছড়াতে যাব? আর প্রিয় বন্ধুদের একে একে খুন করব...আমাকে কি মানুষ, না পিশাচ ভাবছেন আপনি?'

'মাসুদ ভাই, আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি—স্যর এ-ধরনের কিছু করতে

boighar.com

পারেন না,' রায়হান তার প্রিয় শিক্ষকের পক্ষ নিল।

'সেক্ষেত্রে বাকি থাকছেন শুধু এলিসা ভ্যান বুরেন,' বলল রানা। 'যদি ধরে নিই, তিনি বেঁচে আছেন আরকী!'

'এলিসা?' ডোনেন মাথা নাড়লেন। 'ও-ই বা ভাইরাস বানাবে কেন? মি. রানা, প্রায় বিশ বছর ধরে মহৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমরা। ইউনোকোডকে যদি অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করতে চাইতাম কেউ, শুরুতেই করতে পারতাম না?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই, ডক্টর,' রানা কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিন্তু আপনারাই স্বীকার করছেন, একজন ইউনো ছাড়া আর কারও পক্ষে ভাইরাসটা বানানো সম্ভব নয়। দশজনের মধ্যে আটজনের মারা যাবার ব্যাপারে নিশ্চিত আপনি, এখন যদি এলিসা ভ্যান বুরেন বা আপনার মধ্যে কেউ কাজটা না করে থাকেন, তা হলে করল-টা কে?'

'সবাই যদি মারা না গিয়ে থাকে, মাসুদ ভাই?' বলে উঠল রায়হান।

রানার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'মানে?'

'এতগুলো দুর্ঘটনা...এর মধ্যে যে-কোনও একটা তো ভুয়াও হতে পারে। হয়তো নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরাতে মারা যাবার মিথ্যে নাটক সাজিয়েছে কেউ।'

চুপ হয়ে গেল রানা—সম্ভাবনাটা সত্যিই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছিলেন ড. ডোনেন, হঠাৎ ঝট করে সোজা হলেন তিনি—চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'আমাদের কেউই এ-কাজ করেনি, মি. রানা। একটা কথা আপনাদের বলতে ভুলে গেছি আমি। অনেকদিন আগের কথা তো...মনেই ছিল না।'

'কী কথা?'

'আমাদের দশজনের বাইরে আরও একজন ইউনো আছে—এগারো নম্বর ইউনো!'

চমকে গেল রানা আর রায়হান। 'কী বলছেন আপনি? এগারো নম্বর ইউনো মানে? কে এই এগারো নম্বর?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী। 'কী আর বলব... ওটাই সবচেয়ে বড় রহস্য।'

ষোলো

বিমূঢ় হয়ে গেছে রানা আর রায়হান, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না, তাকিয়ে আছে ড. ডোনেনের দিকে, যাতে নিজ থেকেই রহস্যটা খোলাসা করেন তিনি।

'আই অ্যাম সরি, ইয়াং মেন,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'একাদশ ইউনো সম্পর্কে কিচ্ছু বলতে পারব না। জানিই না কিছু, বলব কেমন

করে?'

'কিছুই যদি না জানেন,' রানা বলল, 'তা হলে এগারো নম্বর একজন যে আছে, সেটাই বা বলছেন কেমন করে?'

'আছে, মি. রানা। আমাদের দশজনের বাইরে আরেকজন যে আছে, এ-ব্যাপারে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও আর কাউকে সেটা বিশ্বাস করাতে পারিনি।'

'কেউ বিশ্বাস করেনি যখন, আপনিই বা করছেন কেন?'

'কারণ আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।'

'সেই প্রমাণ বাকিদের দেখাননি?'

'ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাতে পারিনি, মি. রানা। আমি যখন দেখেছি, তখন প্রমাণ ছিল। কিন্তু বাকিদের দেখাতে গেলাম যখন, তখন প্রমাণ গায়েব হয়ে গেছে।'

বিরক্ত হলো রানা। 'কথাবার্তা পরিষ্কার করে বলুন, ডক্টর। প্রমাণটা কী, আর সেটা গায়েবই বা হলো কীভাবে?'

'টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে কষ্ট হবে আপনার, তাই সহজ করে বলি,' ডোনেন বললেন। 'আজ থেকে চার বছর আগে, সাইবারস্পেসে আমাদের মিটিঙে বাইরের একজন ইউযারের উপস্থিতির প্রমাণ পাই আমি—সে ইউনোকোড ব্যবহার করছিল।'

'ব্যাপারটা আর কেউ টের পায়নি?' রায়হান জানতে চাইল।

'না,' মাথা নাড়লেন ডোনেন। 'আমিও পেতাম না, নেহায়েত মিটিং শেষে আমাদের ইন্টারনেট কানেকশনের সিকিউরিটি চেকআপ করতে গিয়ে ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেলি। ডিজিটাল লগে আমাদের আটজনের বাইরে নয় নম্বর একটা এন্ট্রি ছিল।'

'সেটা বাকিদের দেখাননি?'

'দেখাতে গিয়েছিলাম, তার আগেই সমস্ত রেকর্ড মুছে ফেলে লোকটা।'

'হুম! তারপর?'

'পরের মিটিঙের সময় ইউনোকোডে একটা ট্রেসার ওয়ার্ম তৈরি করি আমি, রহস্যময় মানুষটার লোকেশন বের করবার জন্য। ওয়ার্মটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় লোকটা।'

'ইউনোকোড দিয়ে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন ডোনেন।

'এরপরও বাকি ইউনোরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করেনি?'

'না। ওদের ধারণা, ওয়ার্মটা নিজে থেকেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল...সম্ভবত আমার প্রোগ্রামিঙে গলদ থাকার কারণেই।'

'কিন্তু এত অবিশ্বাসের কারণ কী ছিল?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'ওটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, ওদের জায়গায় নিজে থাকলে আমিও বিশ্বাস করতাম না,' বললেন ডোনেন। 'এগারো নম্বর একজন ইউনো থাকাটা তো আসলেই অসম্ভব, তাই না? কোডটার স্রষ্টা, ডেভেলপার—সবকিছু আমরা। আমাদের কাছ থেকে শেখা ছাড়া তো কারও পক্ষে ইউনো হওয়া সম্ভব নয়। অথচ

boighar.com

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম আমরা, কাউকে কোডটা শেখাইনি। তা হলে নতুন একজন উদয় হবে কোত্থেকে?'

'তা তো ঠিকই,' রায়হান বলল। 'তারপরও তর্কের খাতিরে যদি লোকটাকে সেকেণ্ড-জেনারেশন ইউনো বলে ধরে নিই, তা হলেও একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে, স্যর। তার পক্ষে কীভাবে মূল ইউনোদের টেক্কা দেয়া সম্ভব? আপনার বানানো ট্রেসার ওয়ার্ম ধ্বংস করে দিল, ডিজিটাল লগ থেকে ডেটা মুছে দিল...অথচ আপনি ইউনোকোডের একজন স্রষ্টা হয়েও লোকটার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কাউকে দেখাতে পারলেন না!'

'ব্যাপারটাকে বিরাট রহস্য বলছি কি আর এমনি এমনিই?' তিক্ত হাসি হাসলেন ড. ডোনেন। 'এগারো নম্বর একজন ইউনো যে আছে, শুধু তা-ই নয়; আমার বিশ্বাস, সে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ইউনো!'

অপারেশন সেন্টারের দেয়ালে বসানো ক্লোজ-সার্কিট টিভি ক্যামেরার মনিটরগুলোয় আঠার মত সেঁটে আছে দুই আততায়ীর দৃষ্টি। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল আলফা-ওয়ান—কোনার একটা স্ক্রিনে তিনজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে, আলাপে মগ্ন। বয়স্ক মানুষটার চেহারা ভাল করে দেখল সে, তারপরই উত্তেজিত গলায় বলল, 'পেয়েছি! ওই তো ব্যাটা!'

মাথা ঘুরিয়ে আলফা-টু-ও দেখল ছবিটা। বলল, 'ঠিক বলেছ। ওটাই আমাদের টার্গেট।'

স্ক্রিনের কোনার লেখাটা পড়ল আলফা-ওয়ান। 'নাইন-ডি। কোথায় ওটা, তাড়াতাড়ি বের করো।'

কনসোলের পাশ থেকে একটা নির্দেশিকা তুলে পাতা উল্টাল দ্বিতীয় খুনী। 'ওটা ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি চিফের অফিস।'

'ল্যাব-ট্যাব বাদ দিয়ে ব্যাটা ওখানে করছেটা কী?' বিড়বিড় করল আলফা-ওয়ান, ম্যাপ তুলে অফিসটার লোকেশন দেখে নিল। তারপর ফিরল সঙ্গীর দিকে। 'ফেয-টু শুরু করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল আলফা-টু। পোশাকের তলায় বিশেষভাবে তৈরি একটা হ্যাভারস্যাক আছে তার, কাপড়ের উপর থেকে বোঝা যায় না। ওটা থেকে দুটো গ্যাস-মাস্ক বের করল সে—একটা দিল নেতাকে, অন্যটা নিজে রাখল। এরপর বের করল তিনটে সরু টিউব—একেকটা একফুট লম্বা, দেখতে কম্প্রেসড় এয়ার রাখার মিনি সিলিন্ডারের মত। মাথার ঠিক উপরে সিলিঙে এয়ার সার্কুলেশনের জন্য লাগানো ছাকনি দেখা যাচ্ছে, চেয়ারে দাঁড়িয়ে ওটার নাগাল পেল আলফা-টু, পকেট থেকে ছোট্ট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে খুলে ফেলল ছাকনিটা।

'তিনটা টিউবে কাজ হবে তো?' জানতে চাইল আলফা-ওয়ান, সে পাওয়ার-কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'অবশ্যই,' জবাব দিল আলফা-টু। 'ডোমের ভিতরকার এয়ার ভলিউম হিসেব করা আছে—প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই এনেছি।'

'গুড।'

'তুমি আবার ইমার্জেন্সি লাইটিং অফলাইন করার কথা ভুলে যেয়ো না।'

'ভুলিনি,' হাসল আলফা-ওয়ান। পাওয়ার কনসোলের কয়েকটা বাটন চাপল সে। তারপর বলল, 'তুমি রেডি?'

'পুরোপুরি।' মুখে গ্যাস-মাস্ক পরল আলফা-টু।

আলফা-ওয়ানও পরল মাস্ক, মাউথপিসটা সামান্য ফাঁকা করে বলল, 'অন মাই মার্ক...থ্রি, টু, ওয়ান—এখন!'

এক ঝটকায় টিউব তিনটের মুখ খুলে ফেলল দ্বিতীয় খুনী—হিসহিস শব্দে হালকা সবুজ রঙের গ্যাস বেরুতে শুরু করল ওগুলো থেকে, টিউবগুলো ভেন্টিলেশন ডাক্টের ভিতর ছুঁড়ে দিল সে। শাফটের বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে মিশে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যাসটা পুরো ডোমে ছড়িয়ে যাবে। নেতার দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল তুলল আলফা-টু।

মাথা ঝাঁকাল আলফা-ওয়ান, তারপর কনসোলের একটা বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে গেল গোটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি, ইমার্জেন্সি লাইটগুলোও জ্বলছে না।

জ্যাকেটের তলায় লুকানো দুটো উজি সাবমেশিনগান হাতে নিল খুনীরা, হ্যাভারস্যাক থেকে বের করা নাইট-ভিশন গগলস্ লাগাল চোখে।

শান্ত গলায় আলফা-ওয়ান বলল, 'টাইম মার্ক করো। ঠিক তিন মিনিট পর বেরুব আমরা।'

সতেরো

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে সিকিউরিটি চিফের অফিসে। ড. ডোনেনের অবিশ্বাস্য গল্পটা শুনে স্থবির হয়ে আছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুই এজেন্ট, আর কম্পিউটার-বিজ্ঞানী চুপ করে আছেন ওদেরকে পুরো ব্যাপারটা হজম করার সময় দিতে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে মুখ খুলল রানা। 'যা বললেন... তাতে সন্দেহের অবকাশ কতটুকু, ডক্টর?'

'একদমই নেই, মি. রানা,' জবাব দিলেন ডোনেন। 'কেউ মানুক আর না মানুক, আমাদের দশজনের বাইরে আরও একজন ইউনো আছে, এটা একটা তিক্ত সত্য। কিন্তু কে সে, কীভাবেই বা সৃষ্টি হলো—তা কেউ বলতে পারে না।'

'আমার ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না, স্যর,' অকপটে বলল রায়হান। 'আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? যে-ঘটনাটার কথা বললেন, সেটা ছাড়া আর কখনও এই ইউনোর চিহ্ন দেখেছেন কোথাও?'

'না,' মাথা নাড়লেন ডোনেন। 'তবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। লোকটা আমাদের চেয়ে দক্ষ, ওই ঘটনার পর থেকে হয়তো আরও সতর্ক হয়ে গেছে। কোথাও তার চিহ্ন দেখা না গেলে অবাক হবার কিছু নেই। হতে পারে আমাদের

boighar.com

চোখ ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুদিন মাথা ঘামিয়েছি আমি, কোনও সমাধান না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম...একসময় মন থেকে মুছেও গিয়েছিল ওটার কথা। আজ তোমরা আবার ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করায় মনে পড়ল।'

'কিন্তু...কিন্তু যেখানে আপনাদের দশজনের বাইরে কারও ইউনো কোড জানারই কথা নয়, সেখানে আপনাদের চেয়ে দক্ষ একজন আসে কোত্থেকে?'

'সেটা জানতে পারলে তো রহস্যটা আর রহস্য থাকত না। তবে তোমরা যে-ভাইরাসের কথা বলছ, সেটা এই ইউনো ছাড়া আর কেউ ছড়িয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তার সে-ধরনের দক্ষতা আছে।'

'ডক্টর, কে হতে পারে এই রহস্যময় ইউনো—আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন ডোনেন। 'দুঃখিত, এ-ব্যাপারে আমার একদমই আইডিয়া নেই। যদি কোনও সূত্র থাকত, তা হলে তো চার বছর আগেই তাকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারতাম।'

'তখনকার আর এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তখন সে আপনার বন্ধুদের খুন করেনি, সারা পৃথিবীর জন্য বিপদ হয়ে দেখা দেয়নি... কিন্তু এখন দিচ্ছে। লোকটাকে খুঁজে বের করা কতটা জরুরি, তা আশা করি বুঝতে পারছেন?'

'পারছি, মি. রানা। আমিও চাই আমার বন্ধুদের খুনীকে ধরতে, কিন্তু বললামই তো—আমার কাছে কোনও সূত্র নেই।'

'আছে, স্যর। থাকতেই হবে—হোক সেটা সচেতন বা অবচেতন মনে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'কোডটার স্রষ্টা আপনারা, এটা তো ঠিক। কাজেই এগারো নম্বর হোক, কিংবা এক হাজার নম্বর হোক, যে-কোনও ব্যবহারকারীকে ওটা আপনাদের কাছ থেকেই শিখতে হবে। আমি শিওর, এই ইউনো-র সঙ্গে আপনাদের দশজনের কারও না কারও লিঙ্ক আছে।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করলেন ডোনেন। 'কোডটা বাইরের কারও হাতে পড়তে না দেবার ব্যাপারে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা, সেটা কেউ ভঙ্গ করেনি—এই গ্যারান্টি দিতে পারি আমি।'

'এ-ধরনের গ্যারান্টি দেয়া উচিত হচ্ছে না আপনার,' রানা বিদ্রূপ করল। 'আপনি নিজেই মানেননি প্রতিজ্ঞাটা—রায়হানকে ইউনোকোড শিখিয়েছেন।'

'গড ড্যাম ইট, মি. রানা!' রেগে গেলেন বিজ্ঞানী। 'যা জানেন না, তা নিয়ে কথা বলতে আসবেন না। রায়হানেরটা শেখা বলে না, ও শুধু কয়েকটা সংখ্যা আর বর্ণ চেনে, আর কিছু না। ওটুকু বিদ্যে দিয়ে কারও পক্ষে ইউনোকোডে ভাইরাস তৈরি করা সম্ভব না। ধরুন আপনাকে আমি চিনা ভাষায় ঠিক ওভাবে কয়েকটা সংখ্যা আর দু-চারটে অক্ষর চিনিয়ে দিলাম, তারমানে কি এ-ই যে, আপনি চাইনিজে গড় গড় করে গোটা একটা গল্প-উপন্যাস বা কবিতা লিখে ফেলবেন?'

যুক্তিটা মেনে নিয়ে হার স্বীকার করল রানা। বলল, 'দুঃখিত, স্যর। আমি আসলে আপনাকে অপমান করবার জন্য কথাটা বলিনি। আমি বলতে চাইছিলাম যে, আপনার মত অন্য কোনও ইউনোও তো বাইরের কাউকে কোডটা শিখিয়ে

থাকতে পারেন। তাঁর শেখানোটা হয়তো এত অল্পে সীমাবদ্ধ ছিল না।'

শান্ত হয়ে এসেছেন ড. ডোনেন। বললেন, 'তেমন কিছু ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না, মি. রানা। রায়হানের ব্যাপারটা আলাদা। ও কেমন ছোঁকছোঁকে স্বভাবের, তা হয়তো জানেন না...'

তিন বছর আগের ডাবল আর অপারেশনের কথা মনে পড়ল রানার। বলল, 'জী, খুব ভাল করেই জানি।'

রায়হানও লজ্জার হাসি হাসল।

'এনিওয়ে,' ডোনেন বললেন, 'একদিন আমি অফিসে বসে ইউনোকোড নিয়ে কাজ করছিলাম, এমন সময় উঁকি দিয়ে সব দেখে ফেলে ও। তারপর থেকে যে কীভাবে আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করল, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। ওকে স্নেহ করতাম খুব, রাগ করতে পারছিলাম না তাই। শেষ পর্যন্ত চাপাচাপির হাত থেকে বাঁচার জন্য মৌলিক দুয়েকটা জিনিস দেখিয়ে দিয়েছি। আমার বন্ধুরাও যদি কাউকে ওটুকু শিখিয়ে থাকে তো অসুবিধে নেই। বললাম তো, ওটুকু জ্ঞান নিয়ে ইউনো হওয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। তারপরও চার বছর আগের সেই ঘটনার পর বাকি সাতজনের সবার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছিলাম আমি, ওরা হলপ করে বলেছে—কাউকেই কোডটা শেখায়নি ওরা। আমি ওদের কথা অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু দুজনের সঙ্গে কথা হয়নি আপনার,' রানা বলল। 'মাইকেল আর ডেবি ওয়ালডেন...যারা মারা গেছে। আপনার সন্দেহই যদি ঠিক হয়, যদি ওঁরা খুনই হয়ে থাকেন, তা হলে ধরে নিতে হয়—সমস্যাটার সূত্রপাত আজ থেকে আঠারো বছর আগেই হয়েছে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না—ওয়ালডেন দম্পতি ওই রহস্যময় লোকটাকে ইউনোকোড শিখিয়েছেন, আর সেটা যাতে ফাঁস না হয়, সে-কারণেই তাঁদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে?'

'সম্ভাবনাটা একেবারে নাকচ করার মত নয়, তা আমি স্বীকার করি,' ডোনেন বললেন। 'তবে আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। মাইকেল আর ডেবিই ইউনোকোডের খারাপ দিকগুলো সবার আগে ডিটেক্ট করতে সমর্থ হয়...ওদেরই আইডিয়া ছিল পুরো ব্যাপারটা পৃথিবীর কাছ থেকে গোপন রাখবার। এসব নিয়ে যে-রকম সিরিয়াস দেখেছিলাম দুজনকে, তাতে মনে হয় না, কাউকে কোডটা শেখাবে ওরা।'

'থাক, এ নিয়ে আপাতত ভেবে লাভ নেই,' রানা শ্রাগ করল। 'প্রথমে আমাদেরকে সামনের বিপর্যয়টা ঠেকাতে হবে। ইউনো-ভাইরাসটার কপি আমাদের কাছে আছে, ডক্টর। আপনি ওটার প্রতিষেধক বানাতে পারবেন?'

'পারা তো উচিত, তবে না দেখা পর্যন্ত কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। আমাদের হাতে কতটা সময় আছে?'

'তিনদিনের মত।'

'হুম। সময় তো মোটামুটি আছে, সাহায্য করতে পারি। তবে একটাই শর্ত আমার—আমাকে এখানে থেকেই কাজ করতে দিতে হবে। অন্য কোথাও গিয়ে হিউম্যান-টার্গেটে পরিণত হবার ইচ্ছে নেই আমার।'

boighar.com

'এখানে আপনি চাইলেও থাকতে পারবেন না, ডক্টর। সিআইএ যে-কোনও মূল্যে আপনাকে পাকড়াও করবে। ওরা ভাইরাসটাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়, তাতে বাকি দুনিয়া রসাতলে গেলেও ওদের কিছু যায় আসে না। আপনি যে-অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করবেন, সেটা অ্যামেরিকা ছাড়া আর কারও হাতে পৌঁছুতে দেবে না ওরা। বলুন, আপনি কি তা-ই চান?'

চিন্তায় পড়ে গেলেন ডোনেন। 'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে গেলে আমার নিরাপত্তার কী হবে?'

'সে-ভারটা নাহয় মাসুদ ভাইয়ের উপর ছেড়ে দিন, স্যর,' রায়হান বলল। 'এসব ব্যাপারে ওঁর ভাল অভিজ্ঞতা আছে।'

'তা-ই?' মনে হলো কনভিন্স হয়েছেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী। 'তা হলে তো এলিসারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। ও যদি বেঁচে থাকে, খুনীরা ওর নাগাল পেতে চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই।'

'ওঁর জন্যও সব ধরনের চেষ্টা করব আমরা,' রানা কথা দিল। 'ভদ্রমহিলা থাকেন কোথায়, বলতে পারেন?'

জবাব দেয়ার সুযোগ পেলেন না ড. ডোনেন, তার আগেই ঝট করে নিভে গেল সমস্ত বাতি, নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে গেল রুমটা। পুরো ডোম জুড়েই একই অবস্থা বোধহয়—দরজার বাইরে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল, গালাগাল করছে কেউ।

অন্ধকারে রায়হানের গলা শোনা গেল। 'হলোটা কী?'

'কমপ্লিট পাওয়ার ফেইলিওর মনে হচ্ছে,' বললেন ডোনেন। 'ইমার্জেন্সি লাইটগুলোও জ্বলছে না দেখি!'

গালে বাতাসের স্পর্শ অনুভব করল রানা। বলল, 'পাওয়ার ফেইলিওর না। এয়ার সার্কুলেশন হচ্ছে...তারমানে সেন্ট্রাল এ.সি.-টা চলছে এখনও।'

'কী বলছেন আপনি!' ড. ডোনেন বিস্মিত। 'এসি চললে বাতি জ্বলবে না কেন?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন...' বলতে বলতে থমকে গেল রানা—নাকে একটা পরিচিত মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে—এয়ার ডাক্ট থেকে আসছে। গন্ধটা কীসের, মনে করতে পারল না প্রথমে, কিন্তু মাথাটা হালকা চক্কর দিয়ে উঠতেই ধরে ফেলল ব্যাপারটা। 'শিট! এটা একটা কমাণ্ডো অ্যাটাক!'

ড. ডোনেনেরও মাথা ঘুরছে, ওই অবস্থাতেই হতভম্ব গলায় বললেন, 'কমাণ্ডো অ্যাটাক মানে! কী বলছেন এসব?'

'এগুলো কমাণ্ডো অ্যাসল্টের ক্লাসিক সিম্পটম, ডক্টর। সবকিছু অন্ধকার করে দেয়া, তারপর নক-আউট গ্যাস ছড়ানো—হোস্টেজ সিচুয়েশনে এভাবেই চূড়ান্ত আক্রমণ চালায় স্পেশাল ফোর্স।'

'হোস্টেজ সিচুয়েশনে নেই আমরা, তা ছাড়া ফ্যাসিলিটিতে স্পেশাল ফোর্সই বা আসবে কোত্থেকে?'

জবাব দিল না রানা, ঝট করে খুলে গেছে দরজা, টর্চলাইট হাতে ভিতরে ঢুকেছে অস্ত্রধারী তিন গার্ড, টলতে টলতে তাদের চিফকে খুঁজছে। দুর্বল গলায় ওদের একজন বলল, 'স্যর, কী যেন হয়েছে...' ব্লিকম্যানকে দেখতে না পেয়ে

পরমুহূর্তেই চোখে সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল তার। বন্দিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যর কোথায়?'

দেরি করল না রানা এক সেকেন্ডও, চেঁচিয়ে উঠল, 'রায়হান!'

আক্রমণ চালাল দুই বিসিআই এজেন্ট। আনআর্মড কমব্যাটে দক্ষ দুজনেই, সাধারণ সিকিউরিটি গার্ডরা কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারল না। প্রথমজনের অস্ত্রধরা হাতদুটো খপ করে চেপে ধরে নীচে নামিয়ে দিল রানা, নিজের কপাল দিয়ে সজোরে আঘাত করল লোকটার নাক-মুখে, একই সঙ্গে একটা লাথি ছুঁড়ে দ্বিতীয় গার্ডকেও বেসামাল করে দিয়েছে। থ্যাচ্ করে বিশ্রী শব্দ হলো, প্রথম গার্ডের নাক আর ঠোঁট থেঁতলে গেছে—আর্তনাদ করে বসে পড়ল বেচারা। লোকটার থুতনির নীচে মাপা ওজনে হাঁটু চালাল রানা—দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার ভয়ঙ্কর শব্দ হলো, লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়জনের দিকে এবার মনোযোগ দিল ও, লাথি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেছে সে, উন্মুক্ত ঘাড়ে কারাতে চপ বসাতেই লুটিয়ে পড়ল এ-ও। রায়হানের দিকে তাকাল রানা—তৃতীয় গার্ডকে ইতিমধ্যেই কুপোকাত করেছে তরুণ হ্যাকার। পুরো আক্রমণটায় সময় ব্যয় হয়েছে মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড!

'গুড জব!' প্রশংসার সুরে বলল রানা।

ড. ডোনেনের মাথা ধরেছে খুব, চেয়ারে বসে দুলছেন ভীষণভাবে, রানা আর রায়হানও পায়ে শক্তি পাচ্ছে না।

'পরিষ্কার বাতাস দরকার আমাদের,' বলল রানা। 'ডক্টর, ফ্যাসিলিটিতে কোনও ব্রিদিং অ্যাপারেটাস আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'ফায়ার-ফাইটিং স্টোরে।'

'কতদূরে ওটা?'

'দু'তিন মিনিটের পথ।'

হতাশায় ঠোঁট কামড়াল রানা, নকআউট গ্যাসটা সম্পর্কে জানা আছে ওর—এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে সুস্থ-সবল একজন মানুষকে অজ্ঞান করে ফেলে। এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশি, তারমানে ফায়ার-ফাইটিং স্টোরে পৌঁছুবার আগেই সংজ্ঞা হারাবে ওরা। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎচমকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। পকেট থেকে নিজের রুমালটা বের করে নিল ও, রায়হান আর ড. ডোনেনের কাছ থেকে নিয়ে নিল ওদেরগুলোও। টেবিলে এখনও পড়ে আছে ওদের জন্য আনা পানির গ্লাসদুটো—সেখান থেকে ভিজিয়ে নিল রুমালগুলো, তারপর ওগুলো দিয়ে বেঁধে ফেলল নাকমুখ।

উদ্দেশ্য সফল হয়েছে রানার—ভেজা রুমাল ফিল্টার হিসেবে কাজ করছে, গ্যাসমেশা বাতাস এখন সরাসরি নাগাল পাচ্ছে না ফুসফুসের। চেতনা থাকার মেয়াদ বাড়ল একটু।

'দৌড়াতে হবে আমাদের, জ্ঞান থাকতেই ওই স্টোরে পৌঁছুতে হবে,' বলল রানা। 'ডক্টর, পারবেন আপনি?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডোনেন। 'চেষ্টা করব, চলুন।'

অজ্ঞান গার্ডদের কোমর থেকে দুটো নাইন-মিলিমিটার পিস্তল আর স্পেয়ার ক্লিপ জোগাড় করল রানা—একটা নিজে রাখল, অন্যটা দিল রায়হানকে। রাইফেল

boighar.com

পড়ে থাকলেও তাতে হাত দিল না, ডোমের ভিতরের শর্ট রেঞ্জে পিস্তলই বেশি কার্যকর হবে। ফ্লোরে গার্ডদের টর্চলাইটও গড়াচ্ছে, সেগুলোও তুলে নিল ওরা।

'চলো,' রানা বলল।

দরজা খুলে রুম থেকে বেরুল তিনজনে, তারপর ড. ডোনেনের দেখানো পথ ধরে ছুটতে শুরু করল। গ্যাসটা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে, করিডর আর দরজা-খোলা রুমগুলোর ভিতরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল প্রজেক্টের প্রচুর স্টাফকে। মোড় ঘোরার সময় দুজন সিকিউরিটি গার্ডের সামনে পড়ে গেল ওরা—তবে লোকদুটো জ্ঞান হারাবার পূর্বমুহূর্তে পৌঁছে গেছে, ওদেরকে বাধা দেয়ার অবস্থায় নেই।

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে রানারা, করিডরে পড়ে থাকা সংজ্ঞাহীন মানবদেহগুলোকে লাফিয়ে লাফিয়ে পেরুচ্ছে। নাক-মুখে ভেজা রুমাল থাকলেও একেবারে বন্ধ হয়নি শ্বাস নেয়ার সঙ্গে গ্যাস টানা, মাথা দপদপ করছে রানা আর রায়হানের—টর্চের আলোয় আলোকিত সামনের প্যাসেজটাকে মনে হচ্ছে নৃত্য জুড়েছে এপাশ-ওপাশ করে। ড. ডোনেনের অবস্থা আরও খারাপ, প্রাণশক্তিতে ভরা দুই যুবকের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না একদমই, হাত ধরে তাঁকে দুপাশ থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানা ও রায়হান।

মনে হলো অনন্তকাল ধরে ছুটছে, তারপর হঠাৎই সামনে দেখতে পেল ওরা দরজাটা। বন্ধ পাল্লার ওপর টকটকে লাল রঙে লেখা:

"ফায়ার ফাইটিং স্টোর"

এগিয়ে গিয়ে হাতল ঘোরাল রানা, খুলল না দরজা—ওটা তালা দেয়া। দু'পা পিছিয়ে পিস্তল তাক করল ও, কাজটা সহজ হলো না মোটেই—হাত কাঁপছে ভীষণ, চোখের সামনে সারা দুনিয়া টলমল করছে।

দাঁতে দাঁত পিষে নিজেকে স্থির রাখল রানা, গুলি করে উড়িয়ে দিল হাতলটা।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তিনজনে। রায়হানের শরীরে ভর দিয়ে এলিয়ে পড়েছেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী, ও কাতর গলায় বলল, 'হারি আপ, মাসুদ ভাই! স্যর অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।'

তাড়াতাড়ি পাশের র‍্যাক থেকে একটা এয়ার বটল্ নামাল রানা, মাস্কটা ড. ডোনেনের মুখে পরিয়ে ভালভ খুলে দিল। বিজ্ঞানীকে সাবধানে মেঝেতে বসিয়ে আরও দুটো সিলিণ্ডার নামাল ওরা—নিজেদের জন্য।

হিসহিস শব্দে নল বেয়ে বেরুচ্ছে বিশুদ্ধ বাতাস, সেটার স্পর্শ পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ বোধ করতে শুরু করল রানা আর রায়হান। মাথার দপদপানি আর ফুসফুসের জ্বালাপোড়া মিলিয়ে যাচ্ছে। ড. ডোনেনকেও চোখ মেলতে দেখা গেল।

'নড়বেন না,' মাস্ক সরিয়ে বলল রানা। 'সুস্থ হয়ে নিন পুরোপুরি।'

'থ্যাঙ্ক গড যে আপনি সঙ্গে ছিলেন,' দুর্বল গলায় বললেন বিজ্ঞানী। 'নইলে কী যে হত! বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে হত।'

'হুঁশটা আর ফিরতও না। সোজা পরপারে পাড়ি জমিয়ে ফেলতেন।'

'কী!'

'হ্যাঁ, ডক্টর। এই আক্রমণটা আপনাকে খতম করবার জন্য চালানো হচ্ছে।

ইউনোদের পিছনে প্রফেশনাল লোক লেলিয়ে দেয়া হয়েছে বলছিলেন না? কড়া সিকিউরিটির একটা ফ্যাসিলিটিতে এরচেয়ে প্রফেশনাল অ্যাটাক আর হতে পারে না।'

'কিন্তু আপনি না বললেন, এটা স্পেশাল ফোর্সের টেকনিক? ওরা আমাদের কেন খুন করতে চাইবে?'

'টেকনিকটা স্পেশাল ফোর্সের, লোকগুলোকেও হতে হবে—এমন কোনও কথা নেই। স্পেশাল ফোর্সের প্রাক্তন সদস্য হবার সম্ভাবনাই বেশি—টাকা খরচ করলে এ-ধরনের ভাড়াটে সৈনিক ম্যানেজ করা কঠিন কিছু নয়।'

'হায় যিশু! এরা কতটা ডেনজারাস?'

জবাবটা রায়হান দিল। 'সবচেয়ে খারাপ টাইপের, স্যর। পৃথিবীতে এদের চেয়ে দক্ষ কিলিং মেশিন আর নেই।' রানার দিকে তাকাল তরুণ হ্যাকার। 'ওরা সহজে হাল ছাড়বে না, মাসুদ ভাই।'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'সমস্যা হলো, লোকগুলো কোথায় আর কতজন—এটা জানার কোনও উপায় নেই।'

'বড় কোনও টিম হবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে চুপিসারে ঢুকে আচমকা হামলা চালাতে পারত না।'

'ঠিক বলেছ,' রানা একমত হলো। 'ওরা যদি সংখ্যায় কম হয়, তা হলে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধ করে হলেও ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে যাবার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'কী বলছেন আপনি!' আতঙ্কের সুরে বললেন ডোনেন। 'পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কিলিং মেশিনদের সঙ্গে যুদ্ধে নামবেন? পাগল হয়ে যাননি তো? এরচেয়ে লুকিয়ে থাকাটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।'

'ইয়ে...স্যর...' ইতস্তত করে বলল রায়হান। 'আপনি সম্ভবত বুঝতে পারেননি—দুনিয়াতে এই কিলিং মেশিনদের সঙ্গেও টক্কর দেয়ার মত লোক আছে।'

ভুরু কোঁচকালেন বিজ্ঞানী। 'কারা?'

'আজ্ঞে, আমরা।' চওড়া হাসি হাসল রানা।

আঠারো

তিন মিনিট পর বের হবার কথা থাকলেও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে আরও দু'মিনিট দেরি করল দুই খুনী—সুপরিসর ডোমটার সবখানে গ্যাসটা পৌঁছুতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে, এই ভেবে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সজ্ঞান কারও চোখে পড়ে যেতে চায় না ওরা, তারচেয়ে একটু দেরি হলে ক্ষতি নেই।

হাতঘড়িতে পাঁচ মিনিট পুরো হতেই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল আলফা-ওয়ান, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল অপারেশন সেন্টার থেকে। গ্যাস-মাস্ক থাকায় বিষাক্ত বায়ুটা কোনও ক্ষতি করতে পারছে না ওদের, অন্ধকারেও

boighar.com

সবুজ রঙের প্রলেপে ঢাকা অবস্থায় সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নাইট-ভিশন গগলসের কল্যাণে। দ্রুত পা চালাল দুই খুনী—গ্যাসের প্রভাবে আধঘণ্টার মত অজ্ঞান থাকবে এখানকার প্রতিটা মানুষ, তার ভিতরেই কাজ সেরে আইস শেলফ থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে ওদের।

সঙ্গে ডোমের ব্লু-প্রিন্ট আছে, সিকিউরিটি চিফের অফিস পর্যন্ত পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না, খোলা দরজা দিয়ে খুশিমনে ভিতরে ঢুকল খুনীরা। কিন্তু ওখানকার দৃশ্য দেখে খুশিটা পরিণত হলো বিস্ময়ে। মেঝে আর অ্যাটাচড্ বাথরুম মিলে চারটে দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেগুলো তিন সিকিউরিটি গার্ড আর তাদের বসের...অথচ আসল মানুষটাই নেই।

www.boighar.com

'হোয়াট দ্য হেল!' বলে উঠল আলফা-টু। 'গেল কোথায় বিজ্ঞানীর বাচ্চা? ক্যামেরায় অন্য যে-দুজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম, ওরাও তো দেখছি নেই।'

'নিশ্চয়ই এখান থেকে বেরিয়ে গেছে,' আন্দাজ করল আলফা-ওয়ান। 'তবে বেশিদূর যেতে পারবে না, করিডরের কোথাও পড়ে আছে হয়তো। চলো দেখি।'

রুম থেকে বেরিয়ে করিডরের অজ্ঞান দেহগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল দুই খুনী। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদের বিস্ময় কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

'নেই ওরা এখানে!' আলফা-টু বলল, ব্যাপারটা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'এটা কীভাবে সম্ভব?'

আলফা-ওয়ানেরও চেহারা থমথম করছে। 'যেভাবেই হোক, গ্যাসটাকে ফাঁকি দিয়েছে ওরা। তারমানে এই নয় যে, আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাবে।'

'কিন্তু গেল কোথায়?'

'নিশ্চয়ই কোনও একটা একজিট ধরে পালাবার চেষ্টা করছে।'

ট্রান্সপোর্ট!' একটু ভেবে বলে উঠল আলফা-টু। 'পালাতে হলে ট্রান্সপোর্ট দরকার ওদের। তারমানে গ্যারাজে যাচ্ছে!'

'হুঁ,' নিষ্ঠুর হয়ে উঠল আলফা-ওয়ানের চেহারা। 'তা হলে চলো গাড়িই ধরাই ওদের...পরপারের গাড়ি!'

এয়ার বটল্ থেকে বিশুদ্ধ বাতাস নিয়ে সবাই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা—কঠিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে সামান্যতম ফিটনেসের অভাবও রাখা যাবে না। সন্তুষ্ট হবার পর উঠে দাঁড়াল ও, দেখাদেখি বাকি দুজনও। নক-আউট গ্যাসটা দশ মিনিট পর বাতাসে মিলিয়ে যাবার কথা, তারপরও ঝুঁকি নিল না ও; হার্নেস দিয়ে এয়ার বটল্গুলো পিঠে ঝোলাল, মাস্কও মুখ থেকে সরালো না। সবার গিয়ার ঠিক আছে কি না চেক করে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল ফায়ার-ফাইটিং স্টোর থেকে।

রানা-রায়হান দুজনের হাতেই টর্চ আছে, কিন্তু অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে জ্বালাতে পারছে না। দেয়াল হাতড়ে আস্তে আস্তে এগোতে হলো ওদের—সামনে রানা, তারপর রায়হান, সবার পেছন থেকে ড. ডোনেন গ্যারাজে যাবার পথ বলে দিচ্ছেন। পা টিপে টিপে হাঁটছে, যাতে শব্দ না হয়; সেই সঙ্গে করিডরে পড়ে থাকা অজ্ঞান দেহগুলোর সঙ্গেও যেন হোঁচট না খায়, সেটাও খেয়াল রাখতে হচ্ছে। মাঝে

মাঝে থেমে গিয়ে কান পাতছে ওরা—হামলাকারীদের সাড়াশব্দ পাবার আশায়, তবে শুনতে পাচ্ছে না কিছু। লোকগুলো অত্যন্ত উঁচু মানের ট্রেনিং পাওয়া—বেড়ালের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে জানে।

নিরাপদেই প্রায় পুরো দূরত্বটুকু পেরিয়ে এল তিন সঙ্গী। সামনে প্যাসেজের একটা টি-জাংশান, ওটা পেরিয়ে ডানদিকে ষাট গজের মত এগোলেই গ্যারাজে ঢোকার দরজা—ফিসফিস করে জানালেন ড. ডোনেন। মাথা ঝাঁকিয়ে আগে বাড়ল রানা, দেয়াল ধরে টি-জাংশানটা পেরিয়ে ডানে মোড় নিল। কিন্তু কয়েক কদম গিয়েই থমকে দাঁড়াল ও, মাথার ভিতরে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—*বিপদ! বিপদ!!*

শব্দের চেয়ে আলোর গতি বেশি, এ-কারণে প্রথমে মাজল ফ্ল্যাশ দেখতে পেল রানা—করিডরের শেষ মাথা থেকে আসছে। পরমুহূর্তে উজি সাব-মেশিনগানের গুরুগম্ভীর আওয়াজে প্রকম্পিত হলো সংকীর্ণ প্যাসেজটা। চেঁচিয়ে উঠল ও—সঙ্গীদের সাবধান করছে...কিন্তু মুখে ব্রিদারের মাস্ক থাকায় চাপা শব্দ বেরুল শুধু। নিখুঁত রিফ্লেক্সের বশে ডাইভ দিল রানা, পড়তে পড়তেই জ্বালা অনুভব করল কনুইয়ের উপরে—একটা বুলেট মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। উষ্ণ রক্ত গড়াতে শুরু করল ক্ষতটা থেকে। রায়হান আর ড. ডোনেন অবশ্য বেঁচে গেছে, মোড়টা ঠিকমত ঘোরার আগেই গুলির শব্দে প্রিয় শিক্ষককে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়েছে তরুণ হ্যাকার।

রানার এতদিকে খেয়াল নেই, মেঝের স্পর্শ পাওয়ামাত্র প্রসারিত হাতের নাইন মিলিমিটার থেকে পাল্টা গুলি করতে শুরু করল ও। লক্ষ্য করিডরের অপরপ্রান্ত, নিশানা ঠিক করার জন্য সময় নষ্ট করল না। ফলাফলে বুলেটগুলো ব্যর্থ হলেও একটা কাজ হলো—প্রতিপক্ষ সশস্ত্র বুঝতে পেরে গ্যারাজের ডোরওয়ের আড়ালে কাভার নিল দুই খুনী, কয়েক মুহূর্তের জন্য বাধ্য হলো গুলিবর্ষণে বিরতি দিতে।

ব্রিদিং অ্যাপারেটাসটা সমস্যা করছে ভীষণ। মাস্কের স্বচ্ছ অংশটায় প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে মাজল-ফ্ল্যাশ, উপুড় হয়ে থাকায় সিলিণ্ডারটা পিঠে চেপে আছে জগদ্দল পাথরের মত। টান দিয়ে মাস্কটা খুলে ফেলল রানা; সময় যা পেরিয়েছে, তাতে নক-আউট গ্যাসটা অনেকটাই মিলিয়ে যাবার কথা, কৃত্রিমভাবে বাতাস না টানলেও চলবে। হার্নেস খুলে ফেলে দিল সিলিণ্ডারটাও। ঠং করে ধাতব শব্দ হলো জিনিসটা মেঝেতে পড়ার, সঙ্গে সঙ্গে প্রমাদ গুণল রানা।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এল আততায়ীদের উজির বুলেট, বিস্ফারিত চোখে সেগুলোকে সামনের মেঝেতে বিঁধতে দেখল রানা—সারি ধরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে...ধরে ফেলবে এক্ষুণি। ঠিক তখনই মোড়ের দেয়ালের আড়াল থেকে শরীরের একাংশ বের করে গুলি করতে শুরু করল রায়হান, রানার মত ও-ও ব্রিদিং অ্যাপারেটাসের ভারমুক্ত হয়েছে। পাল্টা আক্রমণে আবারও থেমে যেতে বাধ্য হলো আততায়ীরা, এই সুযোগটা কাজে লাগাল রানা, রায়হানের কাভারিং ফায়ারের আড়াল নিয়ে ক্রল করে পিছিয়ে চলে এল মোড়ে।

খট্ আওয়াজ উঠল তরুণ হ্যাকারের পিস্তলে—ক্লিপ শেষ হয়ে গেছে। পিছিয়ে এল ও, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় দফায় গর্জে উঠল আলফা টিমের মেশিনগানদুটো। ঠ্যাক্

boighar.com

ঠ্যাক্ শব্দ করে গুলিগুলো বিঁধছে দেয়ালে।

ভয়ে কাঁপছেন ড. ডোনেন। রানার ইশারায় মাস্ক আর এয়ার বটল্ খুলে রেখে বললেন, 'হায় যিশু! অন্ধকারে ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে কীভাবে?'

'নিশ্চয়ই নাইট-ভিশন আছে,' রায়হান বলল। 'ব্যাটারা পুরোপুরি রেডি হয়েই এসেছে।'

'হুঁ,' রানা একমত হলো। 'তবে লোক মনে হচ্ছে ওই দুজনই। সংখ্যায় ভারি হলে দুপাশ থেকে হামলা চালাত।'

'দুজন হলে কী হবে, মাসুদ ভাই! ওদের ফায়ারপাওয়ার বেশি।'

'ওটুকু ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়া যাবে,' হালকা গলায় বলল রানা।

'কোনও প্ল্যান এঁটেছেন মনে হয়?'

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা, 'ফ্যাসিলিটিতে কোনও কেমিক্যাল ল্যাব আছে, ডক্টর?'

'বেশ কয়েকটা,' উত্তর দিলেন ডোনেন। 'কেন?'

'শীঘ্রি জানতে পারবেন। সবচেয়ে কাছেরটা কোথায়?'

'এই প্যাসেজেই,' ফেলে আসা পথটার দিকে ইঙ্গিত করলেন বিজ্ঞানী। 'ছয়-সাতটা রুম পিছনে।'

'আমি আর রায়হান কাভার দিচ্ছি, চলুন ওখানে।'

লুকোচুরির পালা শেষ হয়েছে, টর্চ জ্বেলে হাঁটতে শুরু করলেন ড. ডোনেন। তাঁর দিকে পিঠ দিয়ে পেছাতে শুরু করল রানা আর রায়হান, পিস্তল রিলোড করে তাক করে রেখেছে টি-জাংশানের দিকে। গুলিবৃষ্টি বন্ধ করেছে শত্রুরা, যে-কোনও মুহূর্তে উদয় হতে পারে ওখান দিয়ে।

আশঙ্কাটা সত্যি প্রমাণের জন্যই যেন দুটো কালো ছায়াকে মোড়ের কাছে নড়ে উঠতে দেখা গেল, মেঝেতে ডাইভ দিচ্ছে। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল উজিদুটো। আলোর ঝলকানিকে অনুসরণ করল এক ঝাঁক বুলেট—মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল সেগুলো। নাইট-ভিশন পরে আর যা-ই করা যাক, লক্ষ্যভেদ করা সহজ নয়। পাল্টা গুলি করল রানা, ধাক্কা দিয়ে রায়হান আর ড. ডোনেনকে ঢুকিয়ে দিল ল্যাবের ভিতরে, পিছু পিছু নিজেও ঢুকল।

নতুন উদ্যমে গুলি করছে আলফা টিমের দুই সদস্য, চেষ্টা করছে এগিয়ে আসার। পাল্লা ফাঁকা করল রানা, ঝুঁকি নিয়ে শরীর বের করল একটু, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে খালি করল ক্লিপটা। ওর প্ল্যানটা সফল করতে হলে লোকগুলোকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ।

'রায়হান! ফায়ার করো! ওদেরকে কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না!' বলে পিস্তল রিলোড করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

'আমি কী করব?' জিজ্ঞেস করলেন ডোনেন। 'এই ল্যাবেই বা এসেছেন কেন?'

'এক্ষুণি দেখতে পাবেন,' রানা বলল। 'ফসফরাস দরকার আমাদের...জলদি খুঁজে বের করুন।'

'ফসফরাস!' ডোনেন বিস্মিত হলেন। 'কী করবেন?'

'আনুন না আগে!' রানা তাড়া দিল। 'আর হ্যাঁ, কাঁচের বোতলে ভরে আনবেন।'

অদ্ভুত নির্দেশটা শুনে শ্রাগ করলেন বিজ্ঞানী, তবে খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ল্যাবের একটা আলমারিতে পাওয়া গেল ফসফরাস—প্লাস্টিকের একটা জারে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা খণ্ড। ল্যাব টেবিল থেকে একটা খালি কাঁচের বোতল সংগ্রহ করলেন তিনি, প্লাস্টিকের জার থেকে পানিসহ সবগুলো খণ্ড ভরে ফেললেন তাতে। তারপর মুখ আটকে নিয়ে এলেন রানার কাছে।

'এই যে এনেছি। চলবে?'

লড়াই থামিয়ে বোতলটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখল রানা। মুখে হাসি ফুটল ওর। 'একদম পারফেক্ট।' রায়হানের দিকে তাকাল ও। 'গুলি থামাও, আমাদের বন্ধুরা কাছে আসুক। নইলে আপ্যায়নটা জুতসই হবে না।'

বোতলটার দিকে তাকিয়ে ওর মতলবটা বুঝে ফেলল তরুণ হ্যাকার। 'অন্ধ করে দেবেন ওদের, তাই না?'

'উঁহুঁ,' মুচকি হাসল রানা। 'জীবনটা আলোয় ভরিয়ে দেব। তাতে ওদের চোখগুলো যদি কানা হয়ে যায় তো আমাদের কী করার আছে?'

প্রতিপক্ষের গুলি থেমে গেছে দেখে ঝট করে উঠে দাঁড়াল আলফা ওয়ান আর টু, উজি থেকে অঝোর ধারায় গুলিবর্ষণ শুরু করল—ব্রাশফায়ার করছে। টার্গেটের দিকে ছুটতে শুরু করেছে একই সঙ্গে—ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে লড়াইটার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে চায়। ওদেরকে নাগালে আসতে দিল রানা, তারপরই দরজার আড়াল থেকে অর্ধেক শরীর বের করে ছুঁড়ে দিল বোতলটা—ধনুকের মত একটা পথে উড়ে গেল ওটা।

থমকে গেল দুই খুনী। নাইট ভিশনের ইমেজে কাঁচের জিনিস ভাল দেখা যায় না, তবে এটুকু বুঝল—শত্রুপক্ষ কিছু একটা ছুঁড়ে দিয়েছে। বস্তুটার পরিচয় জানতে তির্যক পথটা ধরে চুম্বকের মত সেঁটে রইল তাদের দৃষ্টি, মাত্র ছ'ফুট দূরে যখন ওটা ভূপাতিত হলো, তখনও তাকিয়েই আছে।

ঠকাস করে প্রচণ্ড শব্দে ভাঙল বোতলটা, কাঁচের টুকরোর পাশাপাশি ভিতরের পানিটা ছিটকে গেল চারপাশে—বাতাসে উন্মুক্ত করে দিল ফসফরাসের টুকরোগুলোকে। ফলে যা ঘটবার তা-ই ঘটল।

রাসায়নিক ধর্মের কারণে ফসফরাস একটা আনস্টেবল এলিমেন্ট—অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই তীব্র বিক্রিয়া ঘটায়। এ-কারণেই পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয় জিনিসটাকে। এখন পানি সরে যেতেই বাতাসের অক্সিজেনের নাগাল পেয়ে গেল পদার্থটা, চোখ-ধাঁধানো আলো বিকিরণ করে পুড়তে শুরু করল নিমেষে—যেন একটা ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ফেটেছে। আর এই তীব্র আলোকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে খুনীদের চোখে পৌঁছে দিল নাইট-ভিশন গগলস্।

'আহ্-হ্-হ্!' চেঁচিয়ে উঠল আলফা ওয়ান আর টু। আক্ষরিক অর্থেই এই মুহূর্তে অন্ধ তারা, কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

এক গড়ান দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা, পিস্তল তুলে এইমাত্র-ভরা ম্যাগাজিনটা খালি করল দুই খুনীর বুক লক্ষ্য করে... সমান ভাগে।

boighar.com

নাইন-মিলিমিটারের ভারি বুলেটের ধাক্কায় মাটিছাড়া হলো আলফা ওয়ান আর টু, উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। নড়াচড়া করছে না আর।

'রায়হান! ড. ডোনেন! কুইক!' চেঁচাল রানা।

ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল ওরা, পড়ে থাকা দুই খুনীকে টপকে ছুটতে শুরু করল গ্যারাজের দিকে।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই নড়ে উঠল আলফা ওয়ান আর টু—শকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে। পোশাকের তলায় বুলেটপ্রুফ ভেস্ট আছে দুজনেরই, সেজন্যই বেঁচে গেছে। তারপরও নাইন-মিলিমিটার বুলেটের আঘাত যেমন-তেমন ব্যাপার নয়, মনে হচ্ছে যেন ভেস্টের উপর দিয়েই বুকের খাঁচায় হামানদিস্তা চালিয়েছে কেউ। কাতরানোর মত আওয়াজ করে উঠে বসল দুজনে, খুলে ফেলে দিল নাইট-ভিশন। চোখ পিট পিট করে দৃষ্টি স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করছে।

'গড ড্যাম ইট!' সখেদে বলে উঠল আলফা-টু। 'কে ছিল লোকটা? কীভাবে এ-কাজ করল?'

'হাইলি-ট্রেইনড্ মাল,' বলল আলফা-ওয়ান। 'আমাদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, বেটারও হতে পারে—ইম্প্রোভাইজেশনের ওস্তাদ।' সপ্রশংস দৃষ্টিতে নিভু নিভু হয়ে আসা খণ্ডগুলোর দিকে তাকাল সে। 'ফসফরাস...এই জিনিস আমার মাথাতেও আসত না।'

'কিন্তু কে সে?' আলফা-টু বিভ্রান্ত। 'ফ্যাসিলিটির সবার ডোশিয়ে চেক করে এসেছি আমরা, বিজ্ঞানী বা স্টাফরা তো দূরের কথা, সিকিউরিটিতেও এমন চালু হবার মত ব্যাকগ্রাউণ্ড কারও নেই।'

'বাইরের কেউ তো বটেই, কিন্তু এখানে এল কোত্থেকে; সেটা বুঝতে পারছি না।'

'ভাবাভাবিটা বন্ধ করো এখন। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু!' মনে করিয়ে দিল আলফা-টু।

'এত দুশ্চিন্তা করো কেন?' হাসল আলফা-ওয়ান। 'ব্যাকআপ রেখেছি কি এমনি এমনি?' কোমর থেকে ওয়াকিটকি খুলে ট্রান্সমিট বাটন চাপল সে। 'আলফা-ওয়ান কলিং আলফা-থ্রি...কাম ইন, আলফা-থ্রি।'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল তৃতীয় খুনী। 'দিস ইজ আলফা-থ্রি। ব্যাপার কী, তোমাদের এত দেরি হচ্ছে কেন?'

'একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়েছি।'

'কীসের প্রতিরোধ! গ্যাসটাতে কাজ হয়নি?'

'পরে সব খুলে বলব। এখন আমাদের সাহায্য দরকার।'

'কী চাইছ—নীচে এসে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিই?'

'না, পিছনের দরজাটা সামলাও তুমি—টার্গেট গ্যারাজ হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। সঙ্গে দুজন বডিগার্ড আছে—অত্যন্ত যোগ্য লোক। আমরা এদিক থেকে আক্রমণ করছি ওদের।'

'ওকে। আর কিছু?'

'উঁহুঁ। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে দুই খুনীর। মেঝে থেকে উজিট কুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল আলফা-ওয়ান। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো যাই অচেনা বন্ধুদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ বাকি আছে এখনও।'

উনিশ

গ্যারাজের একজিট ডোরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রানা আর রায়হান, নিষ্ফলভাবে টেপাটেপি করছে সুইচ, কিন্তু খুলছে না পাল্লাদুটো।

'হলোটা কী?' বিরক্ত গলায় বলল তরুণ হ্যাকার। 'খুলছে না কেন?'

'মনে হচ্ছে ওরা দরজার পাওয়ার সাপ্লাই কাট-অফ করে দিয়েছে,' কারণটা আন্দাজ করতে পেরে বলল রানা।

'হুঁ, ব্যাটাদের দেখছি কিছুই চোখ এড়ায়নি। আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্য সব ধরনের আয়োজন করে রেখেছিল।'

'প্রফেশনাল খুনীদের বৈশিষ্ট্যই ওটা।'

'কিন্তু এখন আমরা বের হব কী করে?'

গ্যারাজে পার্ক করে রাখা যানবাহনগুলোর উপর চোখ বোলাল রানা, পরক্ষণেই মুখে হাসি ফুটল ওর। 'হাতের কাছে লৌহদানব থাকতে চিন্তা কী?'

'কীসের কথা বলছেন?' রায়হান বিস্মিত।

আঙুল তুলে একটা স্নো-প্লাউ দেখাল রানা—বুলডোজারেরই আরেকটা সংস্করণ ওটা, অত্যন্ত শক্তিশালী, বরফের চাঁই ভাঙা এবং সমান করার কাজে ব্যবহার করা হয়। একজিট ডোরের পুরু পাল্লা আর যন্ত্রদানবটাকে পালা করে দেখল রায়হান।

'এই মোটা দরজা ভাঙতে পারবে ওটা?' ওর গলায় দ্বিধা।

'জানার উপায় তো একটাই, তাই না?' স্নো-প্লাউয়ের দিকে এগোতে শুরু করল রানা। ঠিক তখুনি ডেকে উঠলেন ড. ডোনেন—বাড়তি সতর্কতা হিসেবে পিছন দিকে নজর রাখার জন্য তাঁকে ডোমের প্যাসেজ আর গ্যারাজের মধ্যকার অ্যাকসেস ডোরে পাহারায় রেখেছে ওরা।

'মি. রানা...মি. রানা! কে যেন আসছে, আমি পায়ের শব্দ পাচ্ছি।'

চট করে ঘড়ি দেখল রানা—নাহ্, এত তাড়াতাড়ি তো ডোমের অজ্ঞান মানুষগুলোর জেগে ওঠার কথা নয়! গ্যারাজে যারা এলোমেলোভাবে পড়ে ছিল, তাদের একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা—জ্ঞান ফেরার সময় হলে ওদের দু-একজন নিশ্চয়ই উঠে বসত। তা হলে কে হতে পারে?

'কী করব আমি...' বলতে বলতে চৌকাঠের আড়ালে মাথা টেনে নিলেন ডোনেন, আর তক্ষুণি গর্জে উঠল জোড়া সাবমেশিনগান, খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল এক ঝাঁক তপ্ত সীসা। ভয়ে কেঁপে উঠলেন বিজ্ঞানী, মাথাটা সময়মত না সরালে এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতেন।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। 'ডক্টর! সরে যান...সরে যান ওখান থেকে!'

boighar.com

'গুলি করছে কে?' হতভম্ব গলায় বলল রায়হান। 'ওই দুজনের সঙ্গে আরও লোক ছিল নাকি?'

'লোক না,' বলল রানা, ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। 'বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ছিল।'

ছুটতে শুরু করল ও, কাছেই একটা ল্যান্ড রোভারের রিয়ার ব্র্যাকেটে ঝুলছে ফুয়েলভর্তি একটা জেরিক্যান—ছোঁ মেরে তুলে নিল ওটা।

ড. ডোনেন দরজার কাছ থেকে সরে গেছেন, জেরিক্যান হাতে ওখানে পৌঁছেছে মাত্র রানা, এমন সময় আবার হলো গুলি। রায়হান এগিয়ে আসছে দেখে হাত তুলে থামাল ও। বলল, 'আমি এদিকটা দেখছি, তুমি দরজাটা ভাঙো—ওটাই আসল কাজ। আমাদের অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে এসেছে, যুদ্ধ করে কুলিয়ে উঠতে পারব না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্নো-প্লাউয়ের দিকে ছুটে গেল রায়হান। ড. ডোনেন কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আ...আমাকে কিছু করতে হবে?'

পিছন ফিরে তাকাল রানা—গ্যারাজের একটা পাশে দুই ট্র্যাকের মোটর-সাইকেল জাতীয় ছ'টা বাহন পার্ক করা আছে। সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'স্নো-মোবিল চালাতে জানেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গি করলেন বিজ্ঞানী।

'গুড,' রানা বলল। 'চাবি জোগাড় করুন দুটোর—পালানোর জন্য ওগুলোই ব্যবহার করতে হবে আমাদের, প্লাউ আর ট্র্যাক্টরের স্পিড খুব কম কি না! চাবি এনে স্টার্ট দিয়ে বসুন একটায়, অন্যটা আমার আর রায়হানের জন্য থাক। ও দরজাটা ভাঙলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

নির্দেশটা পেয়ে আর দেরি করলেন না ডোনেন, চাবির জন্য দৌড়ে চলে গেলেন গ্যারাজের একপাশে বুথটার দিকে।

'গ্যারাজে যারা আছ, শোনো!' প্যাসেজ থেকে গমগম করে উঠল আলফা-ওয়ানের গলা। 'বোকামি কোরো না, পালাবার কোনও পথ নেই তোমাদের। বিজ্ঞানীটাকে তুলে দাও আমাদের হাতে, তা হলে প্রাণে মারব না। কী, রাজি আছ?'

চুপ করে রইল রানা।

'কথা বলছ না কেন?' ধমক ভেসে এল।

চৌকাঠ দিয়ে একটু শরীর বের করে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ধাঁই ধাঁই করে তিনটা গুলি ছুঁড়ল রানা। ওপাশ থেকে গালাগাল ভেসে এল।

ও বলল, 'ওটাই আমাদের জবাব। পছন্দ হয়েছে?'

খানিক নীরবতা। তারপর আবার কথা বলল কঠিন চেহারার যুবক।

'বিরাট ভুল করছ, স্ট্রেঞ্জার। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।'

'তাই নাকি?' সকৌতুকে বলল রানা, হাত কাজে ব্যস্ত। জ্যাকেটের তলা থেকে শার্টের একটা অংশ ছিঁড়ে আনছে। 'কী আর করা যাবে, বলো? মানুষ মাত্রই ভুল করে—এটা জানো তো? ও-নিয়ে মায়াকান্না জুড়ে লাভটা কী?'

'কে তুমি, স্ট্রেঞ্জার? ফ্যাসিলিটির কেউ নও—তা তো বুঝতেই পারছি। কী

তোমার পরিচয়?'

'তোমরা দেখি একদম অভদ্র,' কাজ করতে করতে বলল রানা। ছেঁড়া কাপড়টা জেরিক্যানের মুখ খুলে তেলে ভেজাচ্ছে। 'কারও নাম-ধাম জিজ্ঞেস করার আগে নিজেরটা বলতে হয়, এটা জানো না?'

'আমাদের নাম-পরিচয় তোমার কোনও কাজে আসবে না। ইউ আর আ ডেড ম্যান!'

তেলে ভেজা কাপড়টা পাকিয়ে সলতের মত জেরিক্যানের মুখে লাগাল রানা, আলগা করে আটকাল ঢাকনাটা। প্রতিপক্ষকে বলল, 'কথাটা আমি তোমাদেরও বলতে পারি...তবে ম্যানের জায়গায় হিজড়া শব্দটা বসাতে হবে। যারা অসহায় এবং নিরীহ মানুষকে খুন করতে চায়, তাদের আমি অন্য কিছু ভাবি না কি না! ভাল কথা, হিজড়া শব্দের বহুবচনটা কী?'

গালাগালের তুবড়ি ছোটাল আলফা-টু। 'ওই বানচোতের চামড়া খুলে যদি আমি লবণ না মাখিয়েছি তো আমার নাম...'

কথাটা ঢাকা পড়ে গেল স্নো-প্লাউয়ের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জনে। এগিয়ে গিয়ে একজিট ডোরের লোহার পাল্লায় নাক ঠেকিয়েছে ওটা, ঠেলতে শুরু করেছে সর্বশক্তি দিয়ে। ইস্পাত তোবড়ানোর গগনবিদারী আর্তনাদ ভেসে এল, মড়মড় করে গোটা ডোমটাই যেন প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

'গড ড্যাম ইট!' চেঁচিয়ে উঠল আলফা-ওয়ান। 'ওরা দরজাটা ভেঙে ফেলছে!'

ঝট করে সোজা হলো দুই খুনী, ব্রাশফায়ার করতে করতে ছুটল গ্যারাজের দরজার দিকে।

তাড়াহুড়ো করল না রানা, পকেট থেকে একটা লাইটার বের করল—গ্যারাজে আসার পথে অ্যামিউনিশনের জন্য অজ্ঞান এক গার্ডের শরীর তল্লাশি করতে গিয়ে পেয়েছে ওটা, সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল। সলতেটায় আগুন ধরিয়ে শুয়ে পড়ল ও, উড়ে আসা বুলেটের ধারা আর ফ্লোরের মাঝখানে যে-ফাঁকাটা আছে, সেখান দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করল। প্যাসেজটা অন্ধকার হওয়ায় ওগুলো হিট করল কি না বোঝা গেল না, তবে গুলিবর্ষণ থামিয়ে দুটো পিলারের আড়ালে কাভার নিতে বাধ্য হলো হামলাকারীরা।

সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা, জেরিক্যানটা হাতে ঝুলিয়ে খোলা দরজায় চলে এল ও, তারপর সর্বশক্তিতে জিনিসটা প্যাসেজের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আটকে ফেলল পাল্লা।

উড়ে এসে দুই খুনীর পাঁচ গজ দূরে ধপ করে আছড়ে পড়ল ফুয়েল ভর্তি জেরিক্যানটা। জ্বলতে থাকা সলতের আলোয় দৃশ্যটা দেখে আশু বিপদ আঁচ করতে পারল ওরা সঙ্গে সঙ্গে।

'হায় যিশু! আবার?' হাহাকার করে উঠল আলফা-টু!

উল্টো ঘুরে দৌড় দিল খুনীরা, পিছনে গুমগুম করে ঘটল বিস্ফোরণ—বিকট আওয়াজের পাশাপাশি কমলা রঙের একটা আগুনের গোলা বড় হলো চোখের পলকে, গ্রাস করে ফেলল অনেকটা জায়গা। নিরাপদ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেনি তখনও দুই আততায়ী, পিঠে শকওয়েভের ধাক্কা অনুভব করল ওরা—মাটিছাড়া হয়ে

boighar.com

কয়েক হাত সামনে আছড়ে পড়ল, পতনের আঘাতে বুক থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস।

কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড় পড়ে থেকে উহ্-আহ্ করে সোজা হলো দুই ঘাতক। মাথা ঝাঁকিয়ে কানের ভিতর বোঁ বোঁ করতে থাকা অদৃশ্য বোলতাগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করল।

'শালার ইসের বাচ্চাকে আমি খুন করে ফেলব,' খেপাটে গলায় বলল আলফা-টু।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আলফা-ওয়ান। 'কুইক! ওরা পালিয়ে যাচ্ছে...আলফা-থ্রি একা তিনজনকে সামলাতে পারবে না।'

তাড়াহুড়ো করে ফেরার চেষ্টা করল দুই খুনী, তবে প্যাসেজে ছড়িয়ে পড়া আগুনটা বাধা হয়ে দাঁড়াল ওদের পথে। ওটা ভেদ করে অন্যপাশে যাবার আগেই একজিট ডোর পরাস্ত হলো। ইস্পাত ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল স্নো-প্লাউ, র‍্যাম্পের উপর দিয়ে ভাঙাচোরা টুকরোগুলো ঠেলতে ঠেলতে এসে নামল শেলফের সারফেসে। ফোকরটা দিয়ে পিছু পিছু ছিটকে বেরুল দুটো স্নো-মোবিল—সামনেরটায় রানা, পিছনে ড. ভোনেন। প্লাউয়ের পাশে এক মুহূর্তের জন্য থামল রানা, রায়হান লাফ দিয়ে পিছনে চড়ে বসতেই আবার প্রবল গতিতে সামনে বাড়ল।

পাহাড়ের ঢাল থেকে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল আলফা-থ্রি। একটা রেমিংটন এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ স্নাইপার রাইফেল সেট করে অপেক্ষা করছে সে, চোখ রাইফেলটার উপরে বসানো লিওপোল্ড স্কোপে। ওয়াকি-টকিতে বলল, 'আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি। কী করব?'

'টার্গেটকে খতম করো আগে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আলফা-ওয়ান। 'ওটাই ফার্স্ট-প্রায়োরিটি। বাকি হারামজাদা দুটোকে আমরা দেখছি।'

'এতক্ষণ ধরে তো দেখাদেখিই চলছে বোধহয়,' টিটকিরি মারল আলফা-থ্রি। 'ওদের গায়ে ফুলের টোকাও পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'শাট আপ!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল আলফা-টু। 'এখানে থাকলে বুঝতে শালারা কেমন পিচ্ছিল। আমাদের নাকে দম তুলে রেখেছে।'

'কথা না বাড়িয়ে যা বলছি, সেটাই করো,' হুকুম দিল নেতা।

'ঠিক আছে।'

অপটিক্যাল সাইটে দ্বিতীয় স্নো-মোবিলটা তুলে আনল আলফা-থ্রি, ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে লক্ষ্যস্থির করার জন্য অপেক্ষা করল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর টিপে দিল ট্রিগার।

বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজে প্রকম্পিত হলো আইস শীটের শুভ্র প্রান্তর, পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়ে গেল কয়েক গুণ, গুমগুম করতে থাকল দিগন্ত জুড়ে।

স্নো-মোবিলে বসা অবস্থায় আঁতকে উঠল রায়হান। 'ইয়াল্লা! মাসুদ ভাই...'

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। 'হ্যাঁ, বাইরে একজন স্নাইপার রেখেছে ওরা।'

পিছনটা এক ঝলক দেখে নিল রায়হান। 'গুলিটা মিস হয়েছে, তবে স্যারকে সাবধান করা দরকার।'

একসঙ্গে পিছনের স্নো-মোবিলের দিকে মাথা ঘোরাল দুই বিসিআই এজেন্ট, ঠিক তক্ষুণি দ্বিতীয়বারের মত গর্জে উঠল আততায়ীর রাইফেল। রানাদের চোখের সামনে ড. ডোনেন ঝাঁকি খেলেন—মাথার একটা পাশ উড়ে গেল গুলির আঘাতে; অবিশ্বাসের চোখে খুলির ভাঙা অংশ, মগজ আর রক্ত ছিটকাতে দেখল ওরা।

'স্য-আ-আ-র!' আর্তনাদের মত শোনাল রায়হানের গলাটা।

এখনও সিটে বসে আছেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী, দৃষ্টি বিস্ফারিত, হাতদুটো হ্যাণ্ডেল বারে। তবে স্নো-মোবিলটা দশ গজ যেতেই মুঠো আলগা হয়ে গেল তাঁর, উল্টেপাল্টে লাশটা পড়ে গেল বরফের উপর।

'মাসুদ ভাই...স্যর...' রায়হান যেন কেঁদে ফেলবে।

রিসার্চ ডোমের ভাঙা একজিট ডোরের ফোকর দিয়ে নতুন দুটো স্নো-মোবিলকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে চমকে উঠল রানা, প্রথম দুই খুনী আসছে ওদের ধাওয়া করতে। 'রায়হান!' ধমক দিয়ে উঠল ও। 'নিজেকে সামলাও!'

'কিন্তু...কিন্তু...স্যর...'

'ওঁর জন্য আর কিছু করার নেই আমাদের,' নির্দয় ভঙ্গিতে বলল রানা, স্নো-মোবিলের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। 'এখন নিজেদের বাঁচতে হবে।'

আবার গর্জে উঠল আলফা-থ্রি'র রাইফেল, ওদের বামপাশে বরফ ছিটকাল। স্নাইপার লোকটাকে ব্যর্থ করে দিতে আঁকাবাঁকা একটা পথে স্নো-মোবিল ছোটাচ্ছে রানা, স্থির থাকছে না এক রেখায়, দ্রুত রাইফেলের রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কাজটা খুব একটা কঠিন হত না, যদি না পিছু পিছু অন্য দুটো স্নো-মোবিল ছুটে আসত।

চতুর্থবারের মত গুলি করল তৃতীয় খুনী, এবার ডানদিকে বরফ উড়ল। সোজাপথে এসে ইতোমধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে আলফা-ওয়ান আর টু, মেশিনগান তুলে তারাও গুলি করল। পলাতকদের পিছনের বরফে দুই সারিতে নিষ্ফল কামড় বসাল বুলেট—লক্ষ্য খুঁজে পায়নি।

গাল দিয়ে উঠল রানা। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা—পাহাড়ের ঢালে বসা স্নাইপার আর ধেয়ে আসা অন্য দুই আততায়ী পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। চারপাশে ব্যস্ত নজর বুলিয়ে একটাই উপায় দেখতে পেল ও—শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দেয়া যাবে বটে, কিন্তু জীবনটা রক্ষা পাবে কি না, বলা মুশকিল। এক পলকের জন্য চোখ বুজে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকল ও, তারপর জুয়াটা খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

গোঁ গোঁ করে উঠল ছোট্ট বাহনটার ইঞ্জিন, ট্র্যাক ঘুরিয়ে দিক বদলাল রানা—ছুটে যাচ্ছে আইস শেলফের সবচেয়ে কাছের কিনারার দিকে। অসমতল সারফেসের উপর দিয়ে এখন রীতিমত পেন্টাথলনের ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে ওদের স্নো-মোবিল।

'করছেন কী, মাসুদ ভাই!' ওর উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে পেরে আতঙ্কিত গলায় বলল রায়হান।

'শেষ চেষ্টা,' এক কথায় জবাব দিল রানা।

পিছনে আবার গুলির কর্কশ আওয়াজ হলো, আশপাশ দিয়ে তপ্ত সীসা ছুটে যেতে দেখল রানা। পরক্ষণেই একটা যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ শোনা গেল...তরুণ

boighar.com

হ্যাকার নেতিয়ে পড়ল ওর পিঠের উপরে।

'রায়হান! রায়হান!! লাগেনি তো?'

জবাব পাওয়া গেল না কোনও। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার, এই পরিস্থিতি থেকে শুধু প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেই হয়, খুনীগুলোর সবকটাকে নিজ হাতে শায়েস্তা করবে ও।

এসে গেছে শেলফের কিনারা, গতি না কমিয়ে ছুটে গেল রানা, শেষ মুহূর্তে বন্ধ করে ফেলল চোখ। প্রবল বেগে ক্লিফের কিনারা অতিক্রম করল ছোট্ট স্নো-মোবিল, খালি বাতাসেই চলে গেল কিছুটা, তারপর খসে পড়তে থাকল নীচের দিকে। বেঢপ আকৃতির ভারি বাহনটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দড়ি ছেঁড়া পুতুলের মত পড়ে যাচ্ছে দুটো মানবদেহও। রায়হানকে জড়িয়ে ধরে আছে রানা, বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে লাথি মারল স্নো-মোবিলের গায়ে।

ঠিকই আন্দাজ করেছিল ও: বিশফুট নীচে সত্যিই একটা বরফের তাক রয়েছে। সেটার উপরেই আছাড় খেয়ে পড়ল দুজন। কিন্তু স্নো-মোবিলটাও দড়াম করে পড়ল ওদের থেকে তিন হাত তফাতে। তারপর গড়িয়ে কিনারা টপকে চলে গেল আরও একশ' ত্রিশ ফুট নীচে। ঝপাৎ শব্দে পড়ল ওটা পানিতে। অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে উঠল সাগরের পানি।

কিন্তু এ কী! দুলছে কেন শেলফ থেকে বেরিয়ে আসা বরফের চাঁই! কয়েক সেকেণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না রানা...তারপর যখন বুঝল, তখন আর কিচ্ছু করার উপায় নেই। ভারী স্নো-মোবিল তাকটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে, নড়ে যাওয়া দাঁতের মত নড়বড় করছে ওটা এখন—যে-কোনও মুহূর্তে...

চিন্তাটা সম্পূর্ণ করার সময় পেল না রানা। খসে এল চাঁইটা আইস শেলফের গা থেকে, সোজা নেমে যাচ্ছে এখন ওদের দুজনকে নিয়ে সাগরের দিকে। ঝপাস শব্দে পড়ল গিয়ে আর্কটিকের হিম-শীতল পানিতে।

মৃত্যু এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

কিনারায় এসে নিজেদের স্নো-মোবিল থামাল আলফা-ওয়ান আর টু, সামনে এগিয়ে যখন উঁকি দিল, তখন অথই জলের মাঝখানে মানুষদুজনের কোনও চিহ্নই দেখতে পেল না।

ইয়াহু জাতীয় একটা উল্লাসধ্বনি করল আলফা-টু। 'ওখান থেকে কারও বেঁচে ফেরা অসম্ভব। পানিতে আছাড় খেয়ে যদি না-ও মরে, ওদের খতম করে দেবে ঠাণ্ডাটা।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো আলফা-ওয়ান।

খড়খড় করে উঠল ওয়াকি-টকি। 'কী হলো, কাজ হয়েছে?' আলফা-থ্রি'র গলা।

'হ্যাঁ,' খুশি খুশি গলায় বলল আলফা-টু। 'ব্যাটারা সোজা পানিতে গিয়ে পড়েছে।'

'দ্যাটস্ গ্রেট! আপদ বিদায় হয়েছে। তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, হেলিকপ্টারটা অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ থেকে।'

‘এক্ষুণি আসছি।’ বলে নেতার দিকে তাকাল দ্বিতীয় খুনী। ‘চলো যাই।’

স্লো-মোবিলে ওঠার আগে শেষবারের মত পানির দিকে তাকাল কঠিন চেহারার যুবক, শত্রু হলেও প্রতিপক্ষের সদ্যপ্রয়াত লোকটার জন্য শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। বিড়বিড় করে বলল, ‘রেস্ট ইন পিস, স্ট্রেঞ্জার। সত্যি, তুমি ভুগিয়েছ বটে!’

***

boighar.com

হ্যাকার-২

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এক

ইউ.এস. কোস্ট গার্ডের ডিপ সি প্যাট্রোল শিপ *নিউবার্গ*-এর অধিনায়ক কমাণ্ডার ইউজিন ডেকার লোকটা হাসিখুশি ধরনের। কখনও কারও সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেন না তিনি, শত সমস্যাতেও মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখেন। এই আচরণে কোনও কৃত্রিমতা নেই, আসলেই তিনি সদাহাস্য চরিত্রের মানুষ। সমুদ্রগামী জাহাজের... হোক সেটা সরকারী বা ব্যক্তি-মালিকানাধীন... ক্যাপ্টেনদের এত অমায়িক হলে চলে না। নাবিক মানেই অস্থির আর বিশৃঙ্খল প্রকৃতির একদল মানুষ, তাদেরকে বশে রাখতে হলে নেতাকে হতে হয় কঠোর স্বভাবের। অবশ্য নরম প্রকৃতির এবং নিপাট ভালমানুষ হওয়ার পরও কমাণ্ডার ডেকার যে আজ পর্যন্ত লোক সামলানো নিয়ে কখনও ঝামেলায় পড়েননি, সেটার কৃতিত্ব প্রায় পুরোপুরিই তাঁর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড বা এক্সিকিউটিভ অফিসারদের দিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে সবসময় দক্ষ ও যোগ্য লোকদের এক্স.ও. হিসেবে পেয়েছেন তিনি, যারা অধিনায়কের কোমলতাকে নিজেদের কড়া শাসনের মাধ্যমে অধীনস্থদের ভুলিয়ে দিতে পারে। এ-কারণে নাবিকদের নিয়ে কখনও ঝামেলা পোহাতে হয় না ডেকারকে, মুখের হাসিটা স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে রাখতে পারেন।

আজ বহুদিন পর হাসিটা নিভেছে, কমাণ্ডার ডেকারের কপালে পড়েছে দুশ্চিন্তার রেখা। ঘটনাটা এতই অস্বাভাবিক যে, পুরো জাহাজের উপরই প্রভাব পড়েছে ক্যাপ্টেনের এই আচরণের। বিস্মিত হয়ে সবাই শুধু ভাবছে, হলোটা কী? হাসিখুশি মানুষটা হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন?

কমাণ্ডার ডেকারের এই পরিবর্তনটা সোয়া দুই ঘণ্টা আগে হয়েছে, যখন কোস্টগার্ডের লস অ্যাঞ্জেলেস বেস থেকে তাঁর কাছে প্রায়োরিটি মেসেজটা এসেছে। নির্দেশের প্রথম অংশটা খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না—কোর্স বদলে মণ্টেগো আইস শেলফে যেতে বলা হয়েছে নিউবার্গকে। সেখানে একটা প্রাইভেট রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে ড. স্ট্যানলি ডোনেন নামে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী আছেন, তাঁকে জাহাজে তুলে নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল, পুনশ্চ দিয়ে এরপর যেটা বলা হয়েছে, সেটাই ডেকারের উদ্বেগের কারণ। ওখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফ্যাসিলিটির কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় বিজ্ঞানীকে হস্তান্তর না-ও করতে পারে; তবে তাদের কোনও ধরনের আপত্তি মেনে নেয়া যাবে না, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে হলেও ড. ডোনেনকে কবজা করতে হবে। এই শেষের বাক্যটাই তাঁর শান্তি কেড়ে নিয়েছে। নির্বিবাদী-শান্তিপ্রিয় মানুষ তিনি, সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলেন। আর তাঁকেই কিনা বলা হচ্ছে একটা প্রাইভেট ফ্যাসিলিটিতে জোর করে ঢুকে একজন মানুষকে কিডন্যাপ করে আনতে! ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে

নির্দেশটার ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন ডেকার, জবাবে কাঠখোট্টাভাবে বলা হয়েছে—কোনও প্রশ্ন কোরো না, চুপচাপ অর্ডার ফলো করো। সেই সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে একটা বহুলব্যবহৃত বাক্য—*এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয় জড়িত।*

ক্যাপ্টেনের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মেসেজের সঙ্গে আসা দুটো সাদাকালো ফটোগ্রাফ—বিদেশি দুই যুবকের ছবি ওগুলো। মাসুদ রানা এবং রায়হান রশিদ। এরা কে, জানা নেই ডেকারের। মেসেজে এদেরকে বিপজ্জনক চরিত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইস শেলফে নিজ অথবা ছদ্মপরিচয়ে এরা উপস্থিত থাকতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে, এবং এদেরকে দেখামাত্র গ্রেফতার করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

মেসেজ বলতে এতটুকুই। কোনও কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি, এমন উদ্ভট আদেশের পিছনে কোনও যৌক্তিকতাও দেখা যাচ্ছে না। গূঢ় একটা রহস্য যে আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু সেটা তাঁকে জানাতে অসুবিধেটা কোথায়? চাকরিজীবনের আটাশ বছর পেরিয়ে গেছে কমাণ্ডার ডেকারের, এখনও তাঁকে জুনিয়র ছেলে-ছোকরাদের মত বিনা প্রশ্নে লেজ নেড়ে অর্ডার ফলো করতে বলাটা রীতিমত অপমানের শামিল। স্বভাবতঃই মেজাজ খিঁচড়ে গেছে ডেকারের। তা ছাড়া নির্দেশটা আসবার পর পরই রিসার্চ ফ্যাসিলিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল—ওখান থেকে ওরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে কোনও অবস্থাতেই ছাড়া সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। ওপর থেকে পাওয়া অর্ডারটার কারণে এই মুহূর্তে কমাণ্ডার ডেকারও নাচার। সামনে যে বড় ধরনের একটা ফাঁড়া অপেক্ষা করছে, সেটা অনুমান করতে জ্যোতিষী হবার প্রয়োজন নেই।

ব্রিজে ক্যাপ্টেনস্ চেয়ারে বসে আছেন ডেকার, গভীর চিন্তায় মগ্ন—কী করবেন, কীভাবে বিনা সংঘাতে ডক্টরকে বের করে আনা যাবে, এসব ভেবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন। গন্তব্য থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে আছে নিউবার্গ, খুব একটা সময়ও নেই হাতে, করণীয় সম্পর্কে খুব দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে তাঁকে। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা আবছা শব্দে চমকে উঠলেন প্রবীণ কমাণ্ডার, পাশ ফিরে তাকালেন লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সিসিল ফ্লিনের দিকে।

'কিছু শুনতে পেলে, এক্স.ও.?'

'কীসের কথা বলছেন, স্যর?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ফ্লিন।

'পটকা ফাটার মত আওয়াজ হলো, শোনোনি?'

'আওয়াজ তো কত কিছুরই হতে পারে, স্যর। হয়তো গ্লেসিয়ার থেকে বরফ ভেঙে পানিতে পড়ছে।'

বিরক্ত চোখে উপ-অধিনায়কের দিকে তাকালেন ডেকার, তাঁর অভিজ্ঞ কান এত সহজে ধোঁকা খায় না। 'বরফ ভাঙার শব্দ নয় মোটেই। গুলির আওয়াজ! গোলাগুলি চলছে কাছেই কোথাও।'

'এখানে আবার গোলাগুলি করবে কে?'

'সেটাই তো জানার চেষ্টা করা উচিত তোমার!' কমাণ্ডারের তেতে থাকা

boighar.com

মেজাজটা আরও গরম করে দিচ্ছে লোকটা। কড়া গলায় তিনি বললেন, 'লুকআউটদের বলো ভাল করে চারপাশটা দেখতে। মন্টেগোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা... গোলমালটা ওখানেও হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রিজের বাইরে দাঁড়ানো লুকআউটদের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্লিন।

এই মুহূর্তে একটা আইসবার্গের আড়ালে আছে নিউবার্গ, ওটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোচ্ছে। দৃষ্টিসীমা থেকে আইসশেলফটা অদৃশ্য, নইলে মন্টেগোর ক্লিফ থেকে দুজন মানুষসহ একটা স্নো-মোবিলকে সাগরে লাফ দিতে দেখতে পেত ওরা। অবশ্য একই কথা লাফ দেয়া স্নো-মোবিলের পিছু পিছু কিনার পর্যন্ত ছুটে আসা দুই খুনীর বেলাতেও খাটে—বাধাটুকুর জন্য আইস শেলফের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া কোস্ট গার্ডের জাহাজটাকে ওরাও দেখতে পায়নি।

দুই মিনিট পর নিউবার্গ যখন আইসবার্গের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, তখন খুনীরা আইস শেলফের কিনার থেকে সরে গেছে। বরফ-দ্বীপটার মাঝামাঝি মাথা উঁচু করে থাকা পাহাড়গুলোর দিকে ছুটছে—ওগুলোর আড়াল থেকে এস্কেপ চপারে উঠবে। নাক সোজা করে এবার মন্টেগোর দিকে ছুটতে শুরু করল জাহাজটা। ব্রিজের দুপাশের উইংগে দাঁড়ানো লুকআউটরা এক্স.ও.-র ধমক খেয়ে সিধে হয়ে গেছে, চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে আইস শেলফ আর তার আশপাশের সাগরের উপর। হঠাৎ ডানদিকে দাঁড়ানো নাবিকের চোখে ধরা পড়ল নড়াচড়া।

'স্টারবোর্ড লুকআউট বলছি, স্যর।' ম্যান ওভারবোর্ড! মানুষ...পানিতে মানুষ দেখতে পাচ্ছি আমি!'

রিসার্চ ফ্যাসিলিটির সঙ্গে কথা বলার জন্য কমিউনিকেটরের দিকে যাচ্ছিলেন কমাণ্ডার ডেকার, চিৎকারটা শুনে চমকে গেলেন। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে স্টারবোর্ড উইংগে বেরিয়ে এলেন তিনি।

'কী সব আবোল-তাবোল বকছ?' ধমকে উঠলেন কমাণ্ডার। 'কোথায় মানুষ?'

গলা থেকে বিনকিউলারটা খুলে অধিনায়কের হাতে দিল নাবিক। 'ঠিকই বলছি, স্যর। ওই যে, টু-ও'ক্লকে দেখুন। সত্যি সত্যি মানুষ ভাসছে ওখানে।'

দূরবীনটা চোখে লাগাতেই খাবি খাওয়ার অবস্থা হলো ডেকারের। ভুল দেখেনি দায়িত্বরত নাবিক। সত্যিই দুটো মাথা দেখা যাচ্ছে পানিতে, একটু একটু নড়ছেও। কারা এরা? পানিতে পড়ল কী করে? একটু আগে যে গুলির শব্দ শুনলেন, তার সঙ্গে ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে কি? থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে হলো তাঁর।

দ্রুত হিসেব কষলেন প্রবীণ কমাণ্ডার—আর্কটিকের ঠাণ্ডা পানিতে তিন-চার মিনিটের বেশি বাঁচতে পারে না মানুষ। লোকদুটো যদি গুলির শব্দ হবার পরে পানিতে পড়ে থাকে, তারমানে অন্তত দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে। খুব বেশি হলে আর দু'মিনিট সময় আছে হাতে, অথচ আরও পাঁচ মিনিটের আগে ওদের উদ্ধার

করার মত পজিশনে পৌঁছুতে পারবে না নিউবার্গ। মানুষদুটোকে বাঁচাবার উপায় একটাই। ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকলেন তিনি।

'এক্স.ও! রেসকিউ টিম আর জোডিয়াক বোট পানিতে নামাও, এক্ষুণি! আর মেডিক্যাল অফিসারকে সিক-বে'তে রেডি হতে বলো—আমরা দুজন মৃতপ্রায় মানুষ অথবা তাদের লাশ আনতে যাচ্ছি!'

প্রথম ধাপে বিশ ফুট নীচে আছড়ে পড়েছে রায়হানকে নিয়ে রানা, শক্ত বরফের উপর বারো ইঞ্চি তুষার থাকায় মারাত্মক আঘাত লাগেনি, তারপর একশ' ত্রিশ ফুট উপর থেকে সাগরে পড়েও তেমন একটা লাগেনি বরফের উপর শুয়ে থাকায়। কিন্তু বরফখণ্ড সহ যেই পানির তলায় চলে গেল, তখনই প্রমাদ গুনল রানা। আহত রায়হানকে এতক্ষণ ছাড়েনি রানা, কিন্তু হিম-শীতল পানি আচমকা এমনই শক দিল যে ওর হাত থেকে ছুটে গেল তরুণ হ্যাকারের অজ্ঞান দেহটা। মুচকি হেসে ভাবল, তা হলে এই রকম মৃত্যুই লেখা ছিল ওর কপালে!

অনেকদূর তলিয়ে যাওয়ার পর ধীরেসুস্থে, হেলেদুলে আবার ভেসে উঠতে শুরু করল বিশাল বরফখণ্ড, সেই সঙ্গে ঠেলে তুলে নিয়ে আসছে রানাকে সারফেসে। পানির নীচে চোখ মেলে দেখল ও, রায়হানের অবশ শরীরটা নেমে যাচ্ছে নীচে। পাশ কাটাবার সময় হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল রানা আহত সঙ্গীর কলার, টেনে তুলে নিল বরফের উপর।

এইটুকু করতে গিয়েই বুঝতে পারল, অবশ হয়ে যাচ্ছে ওর নিজের শরীরও; মগজের হুকুম মানতে চাইছে না পেশিগুলো। এখনও মরেনি যে এটাই আশ্চর্য! অবশ্য ইতোমধ্যে যে নরকযন্ত্রণা শুরু হয়েছে, তারচেয়ে মরে যাওয়াটাই বুঝি অনেক ভাল ছিল। আর্কটিকের বরফগলা শীতল পানি যে কেমন কষ্টদায়ক, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

পতনের ধাক্কায় বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গিয়েছিল আগেই, হাঁসফাঁস করছে ফুসফুসটা। তবে চরম শীতল পানি যে অত্যাচারটা শুরু করল, তার যন্ত্রণার কাছে ফুসফুসের আকুতি হারিয়ে গেল। মাথার ভিতর অজস্র সুঁই যেন বিঁধতে শুরু করল হঠাৎ করে—মগজটাকে মোরব্বার মত কেচে ফেলছে। একই সঙ্গে শরীরের প্রতিটা অস্থিসংযোগে যেন ছুরি চালাচ্ছে কেউ, স্নায়ুগুলো চিৎকার করে উঠছে ব্যথায়। এদিকে হাড়-মাংস পরিণত হয়েছে নিরেট পাথরে, কোনও কথাই শুনছে না পেশিগুলো।

জীবনে এই প্রথম মেরু সাগরের পানিতে পড়েনি রানা, অতীতেও একই অভিজ্ঞতা একাধিকবার হয়েছে ওর। কষ্টটুকু সহ্য করে জীবন বাঁচাতে হয়েছে প্রতিবারই। তাই প্রবল শারীরিক বিদ্রোহের মাঝেও হতবুদ্ধি হলো না ও, মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরের কাজগুলো করল। এখন সবার আগে দরকার এক বুক খোলা বাতাস। বরফখণ্ডের গদাইলস্করি চালে উপরে ওঠা পছন্দ হলো না ওর, ফেটে যাচ্ছে বুক, একটু আগে পৌঁছুতে হবে; উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিল ও বরফের গায়ে পা বাধিয়ে—এক হাতে ধরে রেখেছে রায়হানের কলার।

কাজটা সহজ হলো না মোটেই—শরীরের কোষগুলো সাড়া দিতে চাইছে

boighar.com

না। হাইপোথারমিয়া আক্রমণের প্রথম লক্ষণ এটা—মাংসপেশি আর অস্থিসংযোগ অসাড় হয়ে পড়া। মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়ায় একটু পর শুরু হবে দৃষ্টিবিভ্রম বা হ্যালুসিনেশন, তারপর... অবশিষ্ট তাপটুকু দিয়ে শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস আর হৃৎপিণ্ডকে চালু রাখবে শরীর, অন্যান্য সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেবে। সবশেষে জমে যাবে মগজ—করাল মৃত্যু এসে গ্রাস করবে ওদের।

রানার চোখের সামনে পরিচিত প্রিয় মুখগুলো ভিড় করল—আর কখনও কি দেখতে পাবে ওদের? সবশেষে মনে পড়ল কঠিন দায়িত্বটার কথা—মানবসভ্যতার জন্য এক কঠিন দুর্যোগ অপেক্ষা করছে সামনে, একমাত্র ও-ই পারে সেটা ঠেকাতে। সচকিত হয়ে উঠল ও—না! ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভর লড়াইয়ে কিছুতেই ওর হেরে গেলে চলবে না!

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে হাত-পা ছুঁড়ল রানা—রায়হানকে টেনে ধরে ভুস করে একটু পরেই মাথা তুলল সারফেসে। অজ্ঞান হ্যাকারকে দেখল ও, ছেলেটা গুলি খেয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে সেটা মাথায় বা কতটা গুরুতর, তা বোঝার উপায় নেই এই মুহূর্তে। আইস শেলফের দিকে চোখ ফেরাল ও। মাত্র পঁচিশ থেকে ত্রিশ গজ দূরে ক্লিফের খাড়া দেয়াল, সোজা এসে মিশে গেছে সাগরে—ওঠার কোনও উপায় নেই। সত্যিই কি নেই? আশপাশে এক টুকরো সমতল জায়গাও কি পাওয়া যাবে না, যেটায় উঠে আশ্রয় নিতে পারে?

যাবে... নিশ্চয়ই যাবে। আশায় বুক বেঁধে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা, রায়হানকে ধরে রেখেছে এক হাতে। যেভাবেই হোক শুকনোয় উঠতে হবে, তা হলে বাঁচার একটা উপায় বেরিয়ে যেতেও পারে। কিন্তু নির্মম মেরু সাগর তার দুই শিকারকে হাতছাড়া করতে রাজি নয়—মাত্র দশ গজ এগিয়েই রানা বুঝতে পারল, ওর হার হতে চলেছে। দয়া দেখাতে রাজি নয় প্রকৃতি, সলিল সমাধিই ওদের ভাগ্যে লেখা আছে। যতক্ষণ পারে যুদ্ধ চালিয়ে গেল রানা, কিন্তু খানিক পর আপনাআপনিই থেমে গেল হাত-পায়ের নড়াচড়া, মুদে এল চোখের পাতা।

তবে আর একটু জেগে থাকলেই রাবারের তৈরি ইনফ্লেইটেবল জোডিয়াক বোটটাকে দেখতে পেত ও—শক্তিশালী আউটবোর্ড ইঞ্জিনের কল্যাণে তীরের মত ছুটে আসছে সেটা।

দুই

টানা চার ঘণ্টার জার্নি শেষে মন্টেগো আইস শেলফে পৌঁছুল ইউ.এস. এয়ারফোর্সের এফ-১৪ জেট ফাইটারটা। ভাসমান দ্বীপটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল ওটা, তারপর রেডিওতে কো-অর্ডিনেট জেনে নিয়ে ল্যাণ্ড করতে শুরু করল।

www.boighar.com

আইস শিটের উপর এখনও রয়ে গেছে সকালে আসা ভিসি-থ্রি বিমানটা, যেতে দেয়া হয়নি। ওটার একশো গজ বাঁয়ে নতুন করে আরেকটা মেক-শিফট

রানওয়ে বানানো হয়েছে; ওখানেই নামল এফ-১৪। ট্যাক্সিইং শেষে স্থির হবার পর ইঞ্জিন কাটঅফ করল পাইলট, তারপর খুলে দিল ফাইবারগ্লাসের ক্যানোপিটা। সঙ্গে সঙ্গে আর্কটিকের শীতল বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল খোলা ককপিটে।

'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যর?' পিছন ফিরে আরোহীকে জিজ্ঞেস করল পাইলট।

জবাব না দিয়ে অস্ফুট স্বরে গাল দিয়ে উঠল ডগলাস বুলক ওরফে বুলডগ। বৈমানিক নয় সে, মাক-থ্রি বেগে ছুটে চলা ফাইটারটায় বসে থাকতে থাকতে তার মাথা ধরে গেছে, আক্রান্ত হয়েছে মোশন সিকনেসে। উদ্গত বমিটা রীতিমত কসরত করে ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছে তাকে। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে সুস্থির হবার চেষ্টা করল সে, তারপর নেমে এল ককপিট থেকে। পা টলমল করছে, শরীর পুরোপুরি ভারসাম্য ফিরে পায়নি এখনও। আরেকটু হলেই পড়ে যেত, কোত্থেকে যেন একজন লোক এসে ধরে ফেলল তাকে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল বুলডগ। কড়া গলায় বলল, 'হয়েছে, সাহায্য করতে হবে না আমাকে!' দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে তার, কথা বলার সময় কাঁপুনি ঠেকাতে মুখ খিঁচিয়ে রাখতে হলো।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা। হাতে ধরা ভারি পশমি জ্যাকেট আর প্যান্ট বাড়িয়ে ধরল। 'এগুলো পরে নিন, স্যর।'

ছোঁ মেরে কাপড়গুলো নিয়ে সামনে তাকাল বুলডগ। দুটো ট্র্যাক্টর এসে থেমেছে ল্যাণ্ড করা ফাইটারের পাশে, সেগুলো থেকে নেমে এসেছে ছ'জন মানুষ। প্রবীণ এক অফিসার সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'গুড আফটারনুন, মি. বুলক। মন্টেগোতে স্বাগতম।'

প্যান্টে পা গলাতে গলাতে বুলডগ জানতে চাইল, 'কে আপনি?'

'কমাণ্ডার ইউজিন ডেকার—কোস্ট গার্ড শিপ নিউবার্গের কমাণ্ডিং অফিসার।'

'আপনার জাহাজ কোথায়?'

'আইস শেলফের পাশেই আছে। নোঙর করে অপেক্ষা করছে।'

'কীসের অপেক্ষা? ব্রাইটনের বানচোতেরা এখনও ওই বিজ্ঞানীটাকে হ্যাণ্ডওভার করেনি?'

ইতস্তত করলেন ডেকার। 'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আপনি এনরুটে ছিলেন বলে রেডিওতে জানানো হয়নি কিছু। ইয়ে... এখানে একটা মিস-হ্যাপ ঘটে গেছে।'

'মিস-হ্যাপ! কী হয়েছে?'

'বিজ্ঞানী ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

জ্যাকেটের চেন বন্ধ করতে গিয়ে থমকে গেল বুলডগ। 'কী বললেন?'

'ঠিকই শুনেছেন। ড. স্ট্যানলি ডোনেন ইজ ডেড।'

'হোয়াট! কীভাবে?'

'গুলি খেয়ে। লাশটা ফ্যাসিলিটির বাইরে... বরফের উপর পেয়েছি আমরা,

boighar.com

মাথার একটা পাশ উড়ে গেছে। আমার ধারণা, স্নাইপার শট।'

চকিতে রানার স্নাইপিং দক্ষতার কথা মনে পড়ে গেল বুলডগের। 'এর সঙ্গে মাসুদ রানার কোনও কানেকশন নেই তো?'

'ঘটনার সময় আইস শেলফে উপস্থিত ছিল সে, ড. ডোনেনের সঙ্গেও ছিল—এটুকু শিয়োর হওয়া গেছে। তবে তারপর কীভাবে কী ঘটেছে, তা বলতে পারছে না কেউ।'

'কেউ কিছু বলতে পারছে না মানে?' খেঁকিয়ে উঠল বুলডগ।

হাত তুলে আইস-ট্র্যাক্টরের দিকে ইশারা করলেন ডেকার। 'চলুন, যেতে যেতে বলছি। আমার ধারণা, ফ্যাসিলিটিটা দেখতে চাইবেন আপনি—ওখানে ছোটখাট একটা যুদ্ধ ঘটে গেছে। ভিতরের লোকজনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। গ্যাসের সাইড-এফেক্টে ভুগছে সবাই এখনও। আমার মেডিক্যাল টিম শুশ্রূষা চালিয়ে যাচ্ছে।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কীসের গ্যাস, কীসের যুদ্ধ? কে যুদ্ধ করেছে—আপনারা?'

'না, মি. বুলক। দুঃখের বিষয়, শো'টা আমরা পৌঁছুনোর আগেই শেষ হয়ে গেছে,' হাসলেন ডেকার। 'দাঁড়িয়ে না থেকে চলুন রওনা হয়ে যাই। পথেই শোনাব সব। কোনও কিছু অস্পষ্ট মনে হলে ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি চিফ ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। চকিতের জন্য মাথার ভিতরটা শূন্য মনে হলো, কিছু নেই যেন ওখানে। তারপরই মনে পড়ে গেল সব—ইউনোকোড, ভাইরাস, ড. ডোনেন, রিসার্চ ফ্যাসিলিটি, আততায়ীর আক্রমণ, আর সব শেষে ক্লিফ থেকে লাফিয়ে পড়া। একটু নড়েচড়ে চারপাশটা দেখল ও—সবখানে সাদা রঙের আধিক্য, ঠিক যেন হাসপাতাল; দেয়ালগুলো বাল্কহেডের মত—রেড ক্রস চিহ্ন দেখা গেল দু'জায়গায়। বুঝতে অসুবিধে হলো না, কোনও একটা শিপের সিক বে'তে আছে। নিজের দিকে নজর দিল রানা—দুধসাদা একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও, শরীর মোটা কম্বলে ঢাকা, পরনে কিছু নেই।

ওকে নড়তে দেখে বিছানার পাশে দাঁড়ানো একজন মেডিক্যাল অ্যাসিসটেন্টকে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেল। 'স্যর! এই ভদ্রলোকের জ্ঞান ফিরেছে।'

গলায় স্টেথস্কোপ ঝুলিয়ে ইউনিফর্ম পরা এক অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল—কাঁধের অ্যাপিউলেটে লাল স্ট্রাইপ... তারমানে ডাক্তার। বয়স চল্লিশের কোঠায়, চেহারাটা হাসিখুশি। কাছে এসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক গড যে জেগে উঠেছেন।' কণ্ঠে আন্তরিকতা টের পাওয়া গেল। 'ভয় পাচ্ছিলাম কোমাতে চলে গেলেন কি না।'

'কে আপনি?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল রানা।

'লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার ব্রায়ান ডারমট, আমি এখানকার... মানে সিজিএস নিউবার্গের মেডিক্যাল অফিসার। অবশ্য আপনি আমাকে আপনার

দ্বিতীয়-জীবনদানকারীও বলতে পারেন।'

সিজিএস, মানে কোস্ট গার্ড শিপ। রানা বুঝতে পারল, এটা ওই জাহাজটাই, যেটা ড. ডোনেনকে নিয়ে যেতে আসছিল। ওদেরকে সাগর থেকে উদ্ধার করে এনেছে নিশ্চয়ই।

'দুঃখিত, ডাক্তার সাহেব,' হালকা গলায় বলল রানা। 'দ্বিতীয়-জীবনদানকারীর উপাধিটা বহু আগেই একজন নিয়ে নিয়েছেন। এমনকী তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, কোনওটাই খালি নেই। আসলে জীবনদানকারীদের লিস্টে আপনি যে কত নম্বর, সেটা জানতে হলে আমাকে কাগজ-কলম নিয়ে হিসেবে বসতে হবে।'

হেসে ফেললেন ডা. ডারমট। 'আপনি বেশ রসিক লোক, মি. রানা। অবশ্য আপনার গায়ের পুরনো ক্ষতচিহ্নগুলো দেখেই আমার মনে হচ্ছিল, আমরা ডাক্তাররা না থাকলে বহু আগেই আপনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতেন।'

উঠে বসতে বসতে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?'

'ওমা, ছবিসহ আপনার আর মি. রায়হান রশিদের অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট এসেছে না?'

সঙ্গীর নামটা শুনেই একটু চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। 'কোথায় রায়হান?'

'ওই তো,' আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন ডারমট—পাশের একটা বেডে শুয়ে আছে তরুণ হ্যাকার, গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, চোখ বন্ধ। চাদরের তলা থেকে বাম কাঁধের যেটুকু বেরিয়ে আছে, সেটা সম্পূর্ণ ব্যাণ্ডেজে মোড়া।

রানার চেহারায় উদ্বেগ লক্ষ করে ডাক্তার বললেন, 'চিন্তা করবেন না, মি. রশিদ সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত।'

'গুলি লেগেছিল ওর...'

'কাঁধে,' জানালেন ডারমট। 'তবে সিরিয়াস ছিল না আঘাতটা—মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট, ক্রিটিকাল কোনও আর্টারিও ছেঁড়েনি। মূল সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল আপনারা দুজনই সাব-যিরো পানিতে এক্সপোজড্ হওয়ায়। হার্ট থেমে যেতে বসেছিল, ডিফিব্রিলেটরের শক দিয়ে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে।'

'তারমানে এখন আর কোনও সমস্যা নেই?'

'আমার তো মনে হয় না,' বললেন ডারমট। 'আপনারা ইয়াং মেন... দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ ফিট হয়ে যাবেন বলে আশা করছি। মি. রশিদের কাঁধটা দু'চারদিন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে পারে, আর কিছু নয়।'

'থ্যাঙ্কস্, ডক্টর,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা। 'আপনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই,' হাসলেন ডারমট। 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি, আর কিছু নয়।'

'সেটাই বা ক'জন করে, বলুন? বিশেষ করে রোগী যখন এমন দুজন মানুষ, যাদের অ্যারেস্ট করার অর্ডার পেয়েছেন আপনারা?'

'রোগীর পরিচয় আমার কাছে রোগী হিসেবেই, মি. রানা। অন্য কিছু না।

boighar.com

আপনারা ক্রিমিনাল, নাকি ভাল মানুষ—সেটা ভাবার জন্য ক্যাপ্টেন আর অন্যেরা আছে।'

'হুম, সেটাই তো দেখছি,' সিক-বে'র দরজায় সশস্ত্র সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে দেখে মন্তব্য করল রানা।

'বিশ্রাম নিন,' বলে চলে গেলেন ডারমট।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলল রায়হান, পাতাদুটো পিট পিট করল—বোঝার চেষ্টা করছে কোথায় আছে।

'ওয়েলকাম ব্যাক!' বলল রানা।

'উহ্‌!' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে কাঁধের ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রায়হান। বলল, 'ব্যথা পাচ্ছি যখন, বুঝতে পারছি, বেহেশতে চলে আসিনি।'

'বেহেশত হলে মন্দ হতো না,' রানা বলল। 'আসলে ছোটখাট একটা দোজখে আছি আমরা এ-মুহূর্তে।'

'কেন? কোথায় আমরা?'

'কোস্ট গার্ডের শিপটায়। ওরা আমাদের তুলে এনেছে পানি থেকে। আর হ্যাঁ, বন্দি আমরা... বুলডগ ওদের কাছে হুলিয়া পাঠিয়েছে।'

'কপালটা দেখছি সব দিক থেকেই বিট্রে করছে, মাসুদ ভাই। ডোনেন স্যরকে হারালাম, কোস্ট গার্ডের হাতে বন্দি হয়ে গেলাম... অ্যাসাইনমেন্টটা বোধহয় আর কমপ্লিট করা সম্ভব হচ্ছে না।'

'এখুনি হতাশ হয়ো না,' রানা বলল। 'তোমার অবস্থা কী, সেটা বলো। কাজকর্ম করতে পারবে? পালাতে গেলে তোমার সাহায্য দরকার।'

'কাঁধে বোঝা ওঠাতে না বললে অসুবিধে নেই,' রায়হান বলল। 'কিন্তু সুস্থ হওয়া না হওয়াতে কী এসে-যায়? সাগরের মাঝখানে রয়েছি আমরা, এখান থেকে পালাবেন কীভাবে?'

'ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।'

'নাহয় পালালামই, তারপর? ডোনেন স্যর মারা যাওয়ায় আর কেউ ইউনোকোডের ভাইরাসটার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে না আমাদের।'

'আছে, রায়হান। শেষ ইউনো... ড. এলিসা ভ্যান বুরেন। তাঁর কাছে যাবো আমরা।'

'ভদ্রমহিলা কোথায় আছেন... আদৌ বেঁচে আছেন কি না—জানি না আমরা। তা ছাড়া তিনি যে আমাদের সাহায্য করবেন, সেটারই বা গ্যারান্টি কী?'

জবাব দেয়ার সুযোগ পেল না রানা, দরজা দিয়ে সিক-বে'তে নতুন একজন মানুষকে ঢুকতে দেখা গেল—লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সিসিল ফ্লিন, এক্সিকিউটিভ অফিসার।

'গুড আফটারনুন, ডক্টর,' ডারমটের দিকে তাকিয়ে অভিবাদন বলল ফ্লিন। 'শুনলাম ওদের জ্ঞান ফিরেছে, তাই দেখতে এলাম।'

'শুধু দেখতে?' ডারমট ভুরু কোঁচকালেন। 'আমার তো মনে হয়, তোমার অন্য কোনও মতলব আছে, এক্স.ও।'

'মতলব-টতলব কিছু না, এদেরকে আইস শেলফে পাঠাতে হবে। ওখানে সিআইএ-র এক অফিসার এসেছেন। ওদের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা আর রায়হান—নিশ্চয়ই বুলডগ পৌঁছে গেছে মণ্টেগোতে।

মেডিক্যাল অফিসার বললেন, 'তাকে বলে দাও, পেশেণ্টরা পুরোপুরি সুস্থ নয়। কথা বলতে হলে যেন এখানে এসেই বলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্লিন। 'সরি, ডক্টর। ওই ভদ্রলোককে অর্ডার দেয়ার মত ক্ষমতা আমাদের কারও নেই।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' রাগী গলায় বললেন ডারমট। 'রোগীর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব আমার, সেজন্য যে-কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমি। ওই ব্যাটাকে বলে দাও, আমি পেশেণ্টদের ছাড়তে রাজি হইনি।'

'শুধু শুধু ঝামেলা করবেন না তো,' বিরক্ত গলায় বলল ফ্লিন। 'এদের প্রতি এত দরদ দেখানোর কিছু নেই। রেডিওতে ক্যাপ্টেন জানালেন—আইস শেলফে আট-নয়টা লাশ পাওয়া গেছে... খুন হওয়া। আমার মন বলছে, কাণ্ডটা এদেরই।'

'কী!'

'ঠিকই বলছি। এদের ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা গেছে—দুজনই বাংলাদেশি স্পাই। বিশেষ করে ওই মাসুদ রানা একটা জাত-খুনী।'

রানার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন ডারমট। 'কথাটা কি সত্যি, মি. রানা?'

'কী কথা?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'আপনারা আইস শেলফে আট-ন'জন মানুষ খুন করে এসেছেন?'

'না,' শান্ত গলায় উত্তর দিল রানা। 'আমরা কাউকে খুন করিনি।'

'তা হলে কে করেছে?'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন, জবাবটা আমরাও জানতে চাই।'

'মানে!'

'খুনগুলো কে করেছে, তা জানা নেই আমাদের।'

'কথা ঘোরাবেন না, মি. রানা,' ধমকের সুরে বলল ফ্লিন। 'রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে সবাইকে বেহুঁশ অবস্থায় পাওয়া গেছে, শুধু আপনারা দুজনই সজ্ঞান ছিলেন... নইলে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পানিতে লাফ দিতে পারতেন না। খুন আপনারা করেননি তো করেছেটা কে?'

'সবাই যদি বেহুঁশই থাকে, তা হলে আমরা তো দিব্যি ঘুরেফিরে বেড়াতে পারতাম, তাই না?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'পানিতে কেন লাফ দিয়েছিলাম বলে মনে হয় আপনার—গরম লাগছিল বলে?'

'হয়েছিলটা কী, বলুন তো?' জানতে চাইলেন ডারমট।

'খুনীরা আমাদেরও মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল, ওদের হাত থেকে বাঁচতে স্নো-মোবিল নিয়ে আইস শেলফ থেকে সাগরে ঝাঁপ দিই আমরা।'

'এইমাত্র না বললেন, খুন কে করেছে, তা দেখেননি?'

boighar.com

'আমার কথার অর্থ বুঝতে ভুল হয়েছে আপনাদের,' রানা বলল। 'খুনীদের দেখেছি আমরা, ওদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছি, কিন্তু ওদের পরিচয় সম্পর্কে কিচ্ছু জানা নেই আমাদের।'

'এরা এটা-সেটা বলে আমাদের বিভ্রান্ত করছে, ডক্টর,' বলল ফ্লিন। 'কিচ্ছু বিশ্বাস করবেন না। এরা স্পাই, মানুষকে বোকা বানাতে ওস্তাদ। কেসটা সিআইএ-র, ওদেরকেই ডিল করতে দিন।'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনওটাই করছি না আমি,' শান্ত গলায় বললেন ডারমট। 'তবে এটা তো সত্যি—ওরা পুরোপুরি সুস্থ নয়। এই মুহূর্তে ওদেরকে কোথাও মুভ করবার অনুমতি দেব না আমি।'

'ব্যাপারটা এখন আর আপনার-আমার লেভেলে নেই। অনুমতি দেবেন কি দেবেন না, সেটায় কিচ্ছু যায়-আসে না। এদেরকে আমি রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কী আশ্চর্য! তুমি অন্তত ক্যাপ্টেনকে জানাও ব্যাপারটা। তিনি আমার কথা এক ফুঁ'তে উড়িয়ে দেবেন বলে বিশ্বাস করি না আমি। এরা অসুস্থ... দুর্বল। এই অবস্থায় ইন্টারোগেট করা হলে মারাও যেতে পারে।'

'মরলই বা! এরা অ্যামেরিকার শত্রু, মরলে দেশেরই উপকার হয়।'

'কী বলছ যা-তা!' রেগে গেলেন ডারমট। 'বিনা বিচারে দুজন মানুষকে মরতে দেব আমি? কক্ষনো না। তুমি কথা বলতে না চাইলে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমিই কথা বলতে যাচ্ছি। ততক্ষণ তুমি কিচ্ছু করবে না!'

'স্ট্যাণ্ড ব্যাক, ডক্টর,' আদেশের সুরে বলল ফ্লিন। 'দিস ইয মাই অর্ডার!'

'তুমি... তুমি আমাকে অর্ডার দেওয়ার কে?' রেগে গিয়ে বললেন ডারমট। 'মেডিক্যাল অফিসার সরাসরি ক্যাপ্টেনের আণ্ডারে কাজ করে, তোমার আণ্ডারে নয়। তা ছাড়া চাকরির দিক থেকেও তুমি আমার অনেক জুনিয়র। কোন্ সাহসে আমাকে অর্ডার দিচ্ছ?'

'ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে এক্স.ও. হিসেবে এই জাহাজে আমিই এখন কমাণ্ডে আছি, স্যর,' বলল ফ্লিন। ইশারায় দরজায় দাঁড়ানো অস্ত্রধারী সেন্ট্রিদের ভিতরে নিয়ে এল সে। ওদের দেখিয়ে বলল, 'প্লিজ, সিন ক্রিয়েট করবেন না, আপনারই ক্ষতি হবে।'

'তুমি এত খেপেছ কেন, বলো তো?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

জবাব দিল না ফ্লিন, গরম চোখে তাকিয়ে রইল মেডিক্যাল অফিসারের দিকে। লোকটা গোঁয়ার টাইপের, বুঝতে পারছে রানা, সেই সঙ্গে সম্ভবত উচ্চাভিলাষীও। সিআইএ-র নাম শুনে তাই লাফিয়ে উঠেছে, নিজের কর্মদক্ষতা দেখানোর মওকা খুঁজছে। মনে মনে নিশ্চয়ই গোপন একটা আশা আছে তার—সিআইএ-র উঁচু পদের একজনের চোখে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারলে ভবিষ্যতে প্রমোশন-টমোশনের ক্ষেত্রে তদবির করতে সুবিধে হবে। এ কোনও গোপন কথা নয় যে, অ্যামেরিকার যে-কোনও বাহিনীর উঁচু পদে পৌঁছুতে গেলেই ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির... বিশেষ করে সিআইএ থেকে ক্লিয়ারেন্স পেতে হয়। রানার অনুমানটা যে ভুল নয়, তা একটু পরেই বোঝা

গেল।

একজন সেন্ট্রির দিকে তাকিয়ে ফ্লিন বলল, 'বন্দিদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করো। আর আমাদের হেলিকপ্টারটাকে বলো আইস শেলফ থেকে জাহাজে ফিরে আসতে। আমি নিজেই ওদের নিয়ে যাবো রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে।'

হাসি পেল রানার—লোকটা তা হলে সত্যিই ডগলাস বুলকের সামনে হিরো সাজতে চাইছে... ইমপ্রেস করতে চাইছে একজন হাই-র‍্যাঙ্কিং সিআইএ অফিসারকে; কিন্তু এই লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার বেচারা কি জানে, বুলডগ কখনও কারও নামে ভাল রিপোর্ট দেয় না!

তিন

'আপনারা সবাই একেকটা অপদার্থ ছাড়া আর কিছু না!' সরোষে বলল ডগলাস বুলক। মেজাজ খিঁচড়ে রয়েছে তার, মুখের ভাষায় সেটা গোপন করার কোনও চেষ্টাও করছে না। রিসার্চ ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টরের রুমে বসে আছে সে—ওখানে উপস্থিত স্বয়ং ডিরেক্টর আর ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি চিফকে বাক্যবাণে তুলোধুনো করছে।

'এভাবে আমাদের গালাগাল দেয়াটা উচিত হচ্ছে না আপনার,' আহত কণ্ঠে বললেন ডিরেক্টর লায়াল ফ্যানিং। 'যা ঘটে গেছে, তাতে আমাদের কিছু করার ছিল না।'

'তা হলে এই হাঁদারামদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিচ্ছেন কেন?' সিকিউরিটি চিফ ট্রেভর ব্লিকম্যানকে দেখাল বুলডগ।

'এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে,' অহমে আঘাত পেয়ে বলে উঠল সিকিউরিটি চিফ। 'হতে পারেন আপনি বিরাট কিছু, তাই বলে আমাদের যা খুশি গালাগাল করার অধিকার নেই আপনার।'

'গাল দিচ্ছি না, সত্যিই তুমি একটা হাঁদারাম,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বুলডগ। 'কেমনতরো সিকিউরিটি চিফ তুমি, অ্যাঁ? প্রথমে মাসুদ রানা ঢুকে পড়ল... তারপর আবার কে না কে ঢুকে কমাণ্ডো হামলা চালাল... এখানে আদৌ কোনও সিকিউরিটি ছিল বলে তো মনে হয় না। ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা তোমার, না? তা হলে রানা তোমাকে বেকুব বানাল কীভাবে, অজ্ঞান করে ফেলল কীভাবে?'

'জীবনে এই প্রথম এমন প্রফেশনালদের মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাকে,' মিন মিন করে বলল ব্লিকম্যান। 'দু-একটা ভুল-ত্রুটি হতেই পারে...'

'শাট আপ! সাফাই গেয়ো না। তোমাদের গাধামির জন্য কত বড় একটা সর্বনাশ ঘটে গেছে, তা কল্পনাও করতে পারবে না। ড. ডোনেন আমাদের জন্য একটা অমূল্য রত্ন ছিল, তার মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে—জানো? গড ড্যাম ইট! এখন তোমাদের সবক'টাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাটকে পোরা উচিত

boighar.com

আমার।'

'কী করার ছিল আমার...'

'কোস্ট গার্ডের মেসেজ পাবার পর আরও সতর্ক হওনি কেন? ড. ডোনেনকে দূরে কোথাও সরিয়ে নাওনি কেন?'

কথায় না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল ব্লিকম্যান। সখেদে বলল, 'সব ওই শালা মাসুদ রানার দোষ। ওকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলে এসবের কিছুই ঘটত না।'

'আমার ধারণা, ছেলেটাকে অকারণে দোষারোপ করছেন আপনারা,' শান্ত গলায় বলে উঠলেন কমাণ্ডার ডেকার, টেবিলের একপাশে এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন তিনি। 'আমার লোকজন যতটুকু আলামত পেয়েছে, তাতে তো মনে হয়—বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে বাঁচাবারই চেষ্টা করেছে রানা। ফ্যাসিলিটির ভিতরে লড়াইয়ের চিহ্ন পেয়েছি আমরা—হামলাকারীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তো ও আর রায়হান রশিদ ছাড়া আর কেউ ছিল না। রানা নিজে যদি ডোনেনকে খুন করেই থাকে, তা হলে ডোমের বাইরে নিয়ে করল কেন? স্নাইপ-শটেই বা মেরেছে কেন? এখানে একসঙ্গে ছিল, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করাটাই কি যুক্তিসঙ্গত ছিল না? তা ছাড়া সবকিছুর পর পানিতেই বা ঝাঁপ দিতে যাবে কেন?'

'আপনাকে ওখানে বসে থিয়োরি কপচাতে বলেনি কেউ,' ধমকের সুরে বলল বুলডগ। 'আপনার লোকজন কোথায়? রানা আর তার সাগরেদকে এখনও হাজির করেনি কেন?'

'চলে আসবে,' বললেন ডেকার। 'তবে আমি এখনও বলব, এ-মুহূর্তে ওদেরকে এখানে নিয়ে আসাটা ঠিক হচ্ছে না। পালিয়ে তো আর যাচ্ছে না, সুস্থ হয়ে উঠলে যত খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে।'

'ওকে আপনি চেনেন না, কমাণ্ডার। কৈ মাছের প্রাণ, ঠাণ্ডা পানির মত সামান্য জিনিসে কিচ্ছু হয় না ওর। এই মুহূর্তে হাজির করুন ওকে এখানে। আমি জানতে চাই, ফ্যাসিলিটিতে ঘটেছেটা কী? কে খুন করেছে ড. ডোনেনকে—ও, নাকি অন্য কেউ?'

দরজায় নক হলো এই সময়।

'কাম ইন,' বললেন ফ্যানিং।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল কোস্ট গার্ডের এক জেসিও। কমাণ্ডার ডেকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। জাহাজে একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে।'

'কী ক্রাইসিস?'

'ব্যাপারটা আমাদের দুই বন্দিকে নিয়ে...'

খুব একটা সময় দেয়া হয়নি রানা আর রায়হানকে, সশস্ত্র চারজন গার্ডের সামনে দ্রুত জামাকাপড় পরতে হয়েছে, এখন গরু-ছাগলের মত খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিউবার্গের হেলিকপ্টার ডেকে। এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয় ওরা—শরীর দুর্বল, হাত-পা একটু একটু কাঁপছে। তবে অসুস্থতার মাত্রাটা তারচেয়ে বেশি

করে দেখাচ্ছে রানা, কয়েকবার পড়ে যাবার ভান করল ও—দেখা গেল প্রতিবারই কেউ না কেউ এসে ধরে ফেলছে ওকে।

চলতে চলতে চারপাশে নজর বোলাচ্ছে রানা, মুক্তির কোনও উপায় আছে কি না, সেটা যাচাই করছে। কিন্তু আশার আলো জাগিয়ে তোলার মত তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও। লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার ফ্লিন তার কাজ ভালই জানে, ব্রাইটনের রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে ব্লিকম্যানকে কীভাবে ওরা বোকা বানিয়েছিল, তা-ও শুনেছে হয়তো; সে-কারণে কোনও ফাঁক রাখছে না নিরাপত্তায়। অসুস্থ এবং দুর্বল ভেবে ওদের হ্যাণ্ডকাফ পরানো হয়নি বটে, তবে ছোট-খাট একটা প্লাটুন নিয়োগ করা হয়েছে দুই বন্দিকে এসকর্ট করে নিয়ে যাবার জন্য। এসকর্টদের প্রত্যেকের সাজ দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তারা—পুরোদস্তুর ব্যাটল্ ফেটিগ পরেছে। মাথায় রয়েছে হেলমেট, হাতে লোডেড এমপি-ফাইভ মেশিনগান, কোমরের ওয়েববেল্টে স্পেয়ার অ্যামিউনিশন, বুকের উপর বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, তা থেকে ঝুলছে হ্যাণ্ড-গ্রেনেডের গোছা, পিঠে ঝোলানো হ্যাভারস্যাকে আরও কত কী আছে, কে জানে! বন্দিদের বুকে ভয় জাগানোই একমাত্র কারণ নয়, উচ্চাভিলাষী এক্স.ও. নিশ্চয়ই এই মহা-আয়োজন দেখিয়ে বুলডগকে মুগ্ধ করবার আশায় আছে। লোকটার এই বাড়াবাড়িটাকেই কীভাবে নিজেদের সুবিধায় পরিণত করা যায়, অসুস্থতার অভিনয় করতে করতে সেটা নিয়ে ভাবছে রানা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়েদার ডেকে পৌঁছে গেল দলটা। শিপের আফটে নিয়ে যাওয়া হলো রানা আর রায়হানকে। ওখানেই জাহাজের হেলিপ্যাড। অস্ত্রধারী আরও কিছু সেইলরকে নিয়ে সেখানে হিরোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার ফ্লিনকে—তার পরনেও এসকর্টদের মত যুদ্ধ-পোশাক। পার্থক্য শুধু এই যে, সেইলরদের মত সাবমেশিনগান বহন করছে না সে, সাইড আর্মস্ হিসেবে কোমরের হোলস্টারে শুধু পিস্তল রেখেছে একটা।

বন্দিরা পৌঁছে গেছে দেখে পাশে দাঁড়ানো কমিউনিকেটরের দিকে তাকাল এক্স.ও, ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কপ্টারটা এখনও আসছে না কেন?'

'চলে আসবে, স্যর,' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল কমিউনিকেটর। 'বলল তো এখুনি রওনা হচ্ছে।'

'আবার যোগাযোগ করো, আমরা এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াকিটকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কমিউনিকেটর। সেদিকে তাকিয়ে ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল রানা, দেখাদেখি রায়হানও। ভাব করছে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

'এ কী! বসে পড়লেন কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ফ্লিন। 'উঠুন বলছি!'

'সম্ভব নয়,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আমরা আর পারছি না।'

'ফাজলামি করবেন না আমার সঙ্গে,' হুমকি দিল ফ্লিন। 'নিজ থেকে দাঁড়ান, নইলে লাথি মেরে ওঠাব।'

'লাথি কেন, চাইলে গুলিও করে দিতে পারেন,' রায়হান বলল। 'তবে আমাদের জায়গায় থাকলে বুঝতেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে আর্কটিকের পানিতে

boighar.com

নাকানি-চোবানি খেলে শরীরে শক্তি থাকে কি না।'

রেগে গিয়ে আরও কিছু বলতে শুরু করল ফ্লিন, তবে তার গলার আওয়াজ চাপা পড়ে গেল রোটরের ভারি গর্জনে। চোখ তুলে আইস শেলফের উপর থেকে একটা *ডাবল এইচ-সিক্স যিরো* মডেলের সিকোরস্কি হেলিকপ্টারকে জাহাজের দিকে নেমে আসতে দেখল রানা। ইউ. এস. কোস্ট গার্ডের সনাতন সাদা-কমলায় রং করা যান্ত্রিক ফড়িংটাকে দেখে ঠোঁটের কোণে চকিতের জন্য একটা হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল ওর।

ডাবল এইচ-৬০ আসলে সিকোরস্কির বহুল-ব্যবহৃত এস-সেভেন্টি সিরিজেরই একটা পরিবর্তিত মডেল। আর্মি, নেভি আর এয়ারফোর্সও ব্যবহার করে এই একই হেলিকপ্টার—তবে একেক বাহিনীর প্রয়োজন অনুসারে ডিজাইনে পার্থক্য আছে। আর্মি যেটা ব্যবহার করে, সেটাকে বলা হয় *ব্ল্যাক হক*, নেভিরটা *সি-হক*, বিমান বাহিনী ব্যবহার করে *পেভ-হক;* আর সবশেষে হলো কোস্ট গার্ডের মডেলটা—নাম *জে-হক।*

লং-রেঞ্জ সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ-র জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে জে-হককে। পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ এই আকাশযানটা দশ হাজার কেজি ওজন বইতে পারে, ছুটতে পারে ঘণ্টায় দুইশ' মাইল বেগে—বিনা রিফুয়েলিঙে কাভার করতে পারে সাতশ' নটিক্যাল মাইল... মানে ডাঙার হিসেবে তেরোশ' কিলোমিটার দূরত্ব। সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ-র পাশাপাশি এই হেলিকপ্টার ড্রাগ-ট্রাফিক ইন্টারসেপশন, কার্গো লিফট এবং স্পেশাল অপারেশনে ব্যবহার করা হয়।

শিপের উপর এসে হোভার করে স্থির হলো জে-হক, তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। আরেকবার চেঁচাল ফ্লিন, রানা আর রায়হানকে উঠে দাঁড়াতে বলছে। কাঁধ ঝাঁকাল ওরা, যেন পারবে না। হেলিকপ্টারের চাকাগুলো ডেক ছুঁতেই এই অবাধ্যতা আর সহ্য হলো না এক্স.ও-র। এসকর্টদের ইশারা করল দুই বন্দিকে জোর করে ওঠাতে। অর্ডার পেয়েই এগোতে শুরু করল চারজন সশস্ত্র সেইলর।

রায়হানের দিকে তাকিয়ে কী করতে হবে, সে-ব্যাপারে নির্দেশ দিল রানা... বাংলায়, যাতে অন্যেরা বুঝতে না পারে। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'পারবে তো?'

'আশা করি,' সংক্ষেপে জবাব দিল তরুণ হ্যাকার।

'ঠিক আছে, তৈরি থাকো। আমার দিকে চোখ রেখো।'

বন্দিদের দুপাশে এসে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো। প্রথমে শুধু মুখে উঠতে বলল, রানারা শুনছে না দেখে দুজন করে দুপাশ থেকে চেপে ধরল ওদের—হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে ফেলল, তারপর টেনে নিয়ে যেতে থাকল ল্যাণ্ড করা হেলিকপ্টারের দিকে।

এভাবে টানাহেঁচড়ায় ব্যথা পাচ্ছে দুই বিসিআই এজেন্ট, তবু একবিন্দু সহযোগিতা করল না সেইলরদের। শরীরের ভার পুরোটাই চাপিয়ে দিল লোকগুলোর হাতে, যেন দু'পায়ে একটুও শক্তি নেই। এমনিতে হয়তো ওদেরকে এভাবে নিয়ে যেতে কষ্ট হতো না চার সেইলরের, কিন্তু এই মুহূর্তে পুরোদস্তুর ফাইটিং গিয়ার পরে থাকায় তাদের শরীরে অন্তত বিশ পাউণ্ড বাড়তি বোঝা

রয়েছে—স্বাভাবিক মুভমেন্টেই অসুবিধে হচ্ছে, তার ওপর জগদ্দল পাথরের মত আচরণ করতে থাকা দুজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে টানতে গিয়ে ঘাম বেরিয়ে গেল তাদের। মাত্র কয়েক গজ যেতেই হাত ফসকে গেল রানাকে ধরে থাকা একজনের, অন্যজনও পারল না একা ওকে আটকে রাখতে। ডেকের উপর ধড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ল রানা, ব্যথায় ককিয়ে উঠল। রায়হানকে টানতে থাকা অন্য দুজনও থেমে গেল শব্দ শুনে।

'হোয়াট দ্য হেল...' গাল দিয়ে উঠল ফ্লিন, ছুটে এল পড়ে থাকা মানুষটার দিকে, রানা তখন কাতরাচ্ছে। 'সারাদিন খাওনি কিছু? গায়ে শক্তি নেই কেন?' অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকা দুই সেইলরকে ধমকে উঠল এক্স.ও।

'সরি, স্যর,' বলে তাড়াতাড়ি রানাকে আবার তুলতে গেল ওরা।

'থামো,' বলল ফ্লিন। 'দেখি নিজে ওঠে কি না।' রানার দিকে তাকাল। 'কী, মি. রানা? পা চালাবেন একটু, নাকি এভাবে আরও দু'চারটে আছাড় খেতে চান?'

'একবারই যথেষ্ট,' কাতরানোর সুরে বলল রানা। 'ধরতে হবে না আর, আমি উঠছি।'

www.boighar.com

বিজয়ীর ভঙ্গিতে অধীনস্থদের দিকে তাকাল ফ্লিন, মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বোঝাতে চাইল—দেখেছ, কীভাবে ত্যাঁদোড় লোককে শায়েস্তা করতে হয়?

রানা তখন অস্কার পাবার মত অভিনয় করছে—ডেকের উপর পড়ে গিয়ে খুব একটা ব্যথা পায়নি ও, তারপরও ভাব দেখাল যেন এইমাত্র কোনও চ্যাম্পিয়ন রেসলার মাথার উপর তুলে আছাড় মেরেছে ওকে। দু'হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামা দেয়ার ভঙ্গিতে প্রথমে স্থির হলো ও, ওটুকুতেই জান বেরিয়ে যাবার চেহারা করল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শুরু করল ধীরে ধীরে।

আড়চোখে পরিস্থিতিটা দেখে নিল রানা, ওর অভিনয়ে সবার মধ্যে সামান্য হলেও ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। বিপদের আশঙ্কা করছে না কেউ—অসুস্থ একজন মানুষ... ঠিকমত যে দাঁড়াতেই পারছে না, সে আর কী ঘটাতে পারে? এসকর্টদের অস্ত্র ধরা হাতগুলো একটু নেমে গেছে নীচে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অলস একটা ভাব... এটাই চাইছিল ও। রায়হান তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মাথাটা খুব সামান্য ঝাঁকিয়ে ইশারা দিল রানা।

এক্সিকিউটিভ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে একদম কাছে, তার কাঁধ পর্যন্ত মাথা তুলল ও দুলতে দুলতে, তারপরই বদলে গেল সবকিছু। সবাই তাকিয়ে ছিল রানার দিকে, কিন্তু এক লহমায় ও যেটা ঘটাল, তা ঠিকমত দেখতে পেয়েছে—এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। প্রতিক্রিয়ার তো প্রশ্ন ওঠে না।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝট করে সোজা হলো রানা, অভিনয়ের ইতি ঘটিয়েছে। তলোয়ার চালানোর মত করে একসঙ্গে দু'হাত সমান্তরাল ভাবে ছুঁড়ল ও, অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। মুভমেন্টটা আসলে কারাতে চপ। দুপাশে দাঁড়ানো দুই এসকর্টের গলায় পড়ল আঘাত—শ্বাসনালী ভেঙে না গেলেও গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল লোকদুটোর, শ্বাস নিতে পারছে না... হাঁটু

boighar.com

মুড়ে বসে পড়ল ডেকে। তবে সেদিকে নজর নেই রানার, এসকর্টদের অচল করে দিয়েই বিদ্যুৎবেগে হাত বাড়িয়েছে ও লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার ফ্লিনের দিকে—নাগালের মধ্যেই রয়েছে সে। লোকটার ডান কাঁধ ধরে নিজের দিকে টান দিল রানা, তাল সামলাতে না পেরে আরও কাছে চলে এল এক্স.ও, ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি, লাটিমের মত পাক খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে একই সঙ্গে। শিকারের পিঠ নিজের দিকে চলে আসতেই আবার ছোবল দিল রানা—বাম হাতটা ফ্লিনের কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে পেঁচিয়ে ধরল গলা, ডান হাতে লোকটার কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল দু'সেকেণ্ডেরও কম!

রায়হানের দিকে তাকাল রানা—নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে তরুণ হ্যাকারও, একটা কাঁধ অবশ থাকলেও অসুবিধে হয়নি। একজন এসকর্টের থুতনিতে মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত করেছে ও, ভাল হাতটা দিয়ে অন্যজনের উরুসন্ধিতে ঘুসি মেরেছে—ওকে ছেড়ে দিয়ে আঘাত সামলাতে ব্যস্ত লোকদুটো।

ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা বনে গেছে হেলিপ্যাডে দাঁড়ানো সব লোক। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল তারা, হাতের অস্ত্র তুলে তাক করল দুই বন্দির দিকে।

'বোকামি কোরো না,' হুমকির সুরে বলল রানা, হাতের পিস্তলটা নাড়ল। 'কেউ স্মার্টনেস দেখাতে চেষ্টা করলে গুলি করে তোমাদের এক্স.ও-র খুলি উড়িয়ে দেব।'

নিজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অস্ত্রধারী লোকগুলো, কী করবে বুঝতে পারছে না। রানার কনুইয়ের ভাঁজে জুডো ফ্লিপে আটকা পড়েছে ফ্লিন, নড়াচড়া করার উপায় নেই। গলায় চাপ পড়ায় দম নিতে হাঁসফাঁস করছে, কথা বলা বা অর্ডার দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না—এই মুহূর্তে তাই লোকগুলো নেতৃত্বশূন্য।

'কাছে আসার চেষ্টা কোরো না,' যোগ করল রানা। 'আর্মস্ ফেলে দাও সবাই।'

দ্বিধা দেখা গেল এসকর্টদের চেহারায়, হুকুম তামিল করবে কি না—সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ফ্লিনের গলার উপর থেকে চাপ একটু কমাল রানা। বলল, 'ওদেরকে বলুন, আমার কথামত কাজ করতে। নইলে আপনিই ভুগবেন।'

'কিচ্ছু বলব না আমি!' সরোষে বলল ফ্লিন। 'কত বড় ভুল করছেন, তা জানেন না আপনি, মি. রানা। এখনও সময় আছে, আমাকে ছেড়ে দিন।'

'আর তা হলেই বুঝি বেকসুর খালাস পেয়ে যাবো?' বিদ্রূপ করল রানা। 'পরিস্থিতিটা কী ধরনের—সেটা আপনারই বরং জানা নেই, মিস্টার। সিআইএ থেকে যে ভদ্রলোক এসেছেন, তার হাতে পড়া চলবে না আমাদের কিছুতেই। আমরা এখন মরিয়া, দয়া করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না বাধা দিতে গিয়ে। কথা শুনুন—সেটাই আপনার জন্য মঙ্গল হবে।'

'মরিয়া হয়ে কোনও লাভ নেই, মি. রানা। যাবার কোনও জায়গা নেই আপনাদের। আত্মসমর্পণ করুন!'

'অ! কথা শুনবেন না তা হলে?' কঠিন হয়ে উঠল রানার গলা। একরোখা

লোকটাকে বশ করতে গেলে নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় নেই। এক্স.ও-র ডান হাতের মাংসপেশিতে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে গুলি করল ও।

চিৎকার করল ফ্লিন, বুলেটটা তার বাইসেপ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। হিসেব করে গুলিটা করেছে রানা, আঘাতটা সিরিয়াস নয়—একটু ট্রিটমেণ্ট পেলেই কয়েকদিনের মধ্যে সেরে যাবে। তবে এ-মুহূর্তে অসহ্য ব্যথায় চেঁচাচ্ছে ফ্লিন—জীবনে এই প্রথম গুলি খেয়েছে সে।

লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে রানা বলল, 'আমি যে সিরিয়াস, সেটা বুঝতে পেরেছেন এখন? সবাইকে বলুন আর্মস ফেলে দিতে। নইলে পরের গুলিটা মগজে ঢুকবে।'

কাতরাতে কাতরাতে মাথা ঝাঁকাল ফ্লিন। অধীনস্থদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ড্রপ আর্মস্... ড্রপ আর্মস্!'

ডেকের উপর ঝন ঝন আওয়াজ উঠল অস্ত্র ফেলার। রানা আদেশ দিল, 'বাড়তি অ্যামিউনিশন আর গ্রেনেডগুলোও ফেলো।'

নির্দ্বিধায় তা-ও মেনে নিল সেইলররা। তারপর রানার নির্দেশে চলে যেতে বাধ্য হলো হেলিপ্যাড থেকে।

রায়হান এগিয়ে গিয়ে ডেকের উপর থেকে গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে, সেদিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'গ্রেনেড নাও যে-ক'টা পারো।'

'যুদ্ধ করবেন ভাবছেন নাকি?' অবজ্ঞার ছাপ ফুটল ফ্লিনের গলায়। 'দিবাস্বপ্ন দেখে লাভ নেই। শুধু কোস্ট গার্ড নয়, যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স থেকে শুরু করে সমস্ত বাহিনী আপনাদের শিকার করতে বের হবে। ওই ক'টা অস্ত্র দিয়ে কিচ্ছু করতে পারবেন না, বেঘোরে মারা পড়বেন।'

'সেটা সময় হলেই দেখা যাবে,' রানা হাসল, জিম্মিসহ ল্যাণ্ড করা কপ্টারের দিকে ফিরল ও, পিস্তল তাক করল ককপিটের দিকে। প্লেক্সিগ্লাসের ওপাশে পাইলটের চোখে আতঙ্ক ফুটতে দেখা গেল, রানার ইশারায় তাড়াতাড়ি ডেকে নেমে এল সে।

'ভাগো,' সংক্ষেপে বলল রানা।

পড়িমরি করে ছুটে পালাল পাইলট।

রায়হানের কাজ শেষ হয়েছে। দুটো এমপি-ফাইভ জোগাড় করেছে ও, একটা হ্যাভারস্যাকে নিয়েছে বাড়তি অ্যামিউনিশন আর গ্রেনেড। পাশে এসে রিপোর্ট করার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি রেডি।'

'হেলিকপ্টারটা ওড়াতে পারবে? হাতের কারণে অসুবিধে হবে না তো?'

'পারব,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল রায়হান—বিসিআই এজেণ্ট হিসেবে সব ধরনের আকাশযান চালানোর ট্রেইনিং পেয়েছে ও। 'কিন্তু আপনি কী করবেন? এই ভদ্রলোককে জিম্মি হিসেবে সঙ্গে নিচ্ছি নাকি? ওঁকে পাহারা দেবেন?'

'উঁহুঁ, ওঁর সঙ্গে এখানেই আমাদের বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে,' রানা বলল।

হেলিকপ্টারে রায়হানের চড়ে বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর বলল, 'গুড বাই, লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার ফ্লিন!'

'যান,' খেপাটে গলায় বলল এক্স.ও। 'আর তো জ্যান্ত দেখব না আপনাকে,

boighar.com

তবে কবরে ফুল দিতে যাব নিশ্চয়ই!'

'খুব খুশি হব তা হলে,' হাসিমুখে বলল রানা, তারপর পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল লোকটার ঘাড়ে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ফ্লিন।

লাফ দিয়ে কপ্টারে উঠল রানা। 'লেটস্ গো, রায়হান!'

'কোন্দিকে যাব?' টেকঅফ করতে করতে প্রশ্ন করল তরুণ হ্যাকার।

'পরে বলছি। আগে জাহাজকে ঘিরে চক্কর দাও কয়েকটা। যাবার আগে কয়েকটা কাজ সেরে নিতে হবে আমাদের।'

ওয়াকিটকিতে নিউবার্গের ডিউটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন কমাণ্ডার ডেকার—তরুণ এক লেফটেন্যান্ট সে, নাম এড্রিয়ান কনর। চাকরিতে অভিজ্ঞতা খুব কম লেফটেন্যান্টের, রিপোর্ট দিচ্ছে কাঁপা কাঁপা গলায়। স্পিকারে তার গলায় কী ঘটেছে শুনতে পেয়ে স্থবির হয়ে গেছে রিসার্চ ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টরের অফিসে বসা প্রতিটা মানুষ। ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছে না কেউ—কোস্ট গার্ডের মত সুশৃঙ্খল একটা বাহিনীর হাত থেকে কেউ পালায় কীভাবে! তবে ঘটনার শেষ হয়নি এখনও। ওয়াকিটকিতে হঠাৎ করে গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল।

'স্যর!' স্পিকারে ডিউটি অফিসারের চিৎকার শোনা গেল। 'ওরা আমাদের দিকে গুলি করছে।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল বুলডগ। 'ওরা সব বসে বসে আঙুল চুষছে নাকি? পাল্টা গুলি করতে বলুন!'

মাথা ঝাঁকালেন ডেকার। রেডিওতে নির্দেশ দিলেন, 'চুপচাপ বসে থেকো না। রিটার্ন ফায়ার!'

'ইয়েস, স্যর!'

পরমুহূর্তেই বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। ওয়াকিটকিতে আর্তনাদের মত করে উঠল লেফটেন্যান্ট কনর। 'হা ঈশ্বর! ওরা গ্রেনেড ফাটাচ্ছে!'

চোখে বিস্ময় নিয়ে বুলডগের দিকে ফিরলেন কমাণ্ডার ডেকার। 'লোকগুলো কি পাগল নাকি? পালাচ্ছে পালাক, কিন্তু এভাবে যুদ্ধ বাধিয়েছে কেন?'

'নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে,' বুলডগ বলল। 'কারণ ছাড়া একটা আঙুলও নাড়ায় না মাসুদ রানা।'

'কী করা যায়, সে-ব্যাপারে কোনও পরামর্শ আছে আপনার?'

'পরামর্শ না, অ্যাকশনই নিচ্ছি আমি,' ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টরের দিকে তাকাল বুলডগ। 'আমার সঙ্গে যে ফাইটার পাইলট এসেছে, তাকে খবর দিন। এক্ষুণি টেকঅফ করতে হবে ওকে। দেখি, শালার মাসুদ রানা কীভাবে একটা জেট ফাইটারের সঙ্গে যুদ্ধ করে।'

'গুড আইডিয়া, মি. বুলক,' স্বীকার করলেন কমাণ্ডার ডেকার।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইন্টারকম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন লায়াল ফ্যানিং—পাইলটকে খবর পাঠাচ্ছেন, একই সঙ্গে একটা ট্র্যাক্টর রেডি করবার

নির্দেশ দিচ্ছেন লোকটাকে এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে দেয়ার জন্য।

'এক্স.ও. কোথায়?' ডিউটি অফিসারের কাছে জানতে চাইলেন ডেকার।

'সিক বে'তে, স্যর। ওঁর এখনও জ্ঞান ফেরেনি। তবে ইনজুরিটা সিরিয়াস নয় বলে শুনলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেন্স ফিরে আসবে বলে আশা করছেন ডক্টর।'

'তা হলে ততক্ষণ তোমাকেই সামলাতে হবে সব, কনর। ডিফেণ্ড দ্য শিপ! প্রয়োজনে যে-কোনও ধরনের ফোর্স ব্যবহার করতে অনুমতি দিচ্ছি তোমাকে।'

'গোলাগুলি আর গ্রেনেডের জন্য আমরা তো ডেকে বেরুতেই পারছি না, স্যর! কীভাবে ডিফেণ্ড করব?'

কথাটা শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল বুলডগ, 'গাধা নাকি? পোর্টহোল দিয়ে গুলি করতে পারছে না?'

'পোর্টহোল...' বললেন ডেকার। 'সেই সঙ্গে যত ওপেনিং আছে, সেগুলো দিয়ে গুলি করো।'

'ওভাবে ওদের আদৌ কোনও ক্ষতি করা যাবে বলে মনে হয় না।'

'তাতে অসুবিধে নেই। শুধু ব্যস্ত করে রাখো কিছুক্ষণ, আমাদের এখানে একটা এফ-১৪ ফাইটার আছে। ওটা যাচ্ছে তোমাদের সাহায্য করতে।'

'করছেনটা কী আপনি!' বিস্মিত গলায় বলল বুলডগ।

'কেন?' থতমত খেয়ে গেলেন ডেকার। 'কী হয়েছে?'

'ওপেন চ্যানেলে আমার প্ল্যান ফাঁস করে দিলেন?' রাগী গলায় বলল বুলডগ। 'হেলিকপ্টারের রেডিওতে সব কমিউনিকেশন মনিটর করছে নিশ্চয়ই মাসুদ রানা। এখন ও কী করবে, বুঝতে পারছেন?'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটলেন কমাণ্ডার, ভুলটা ধরতে পেরেছেন। বুলডগের আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যই যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লেফটেন্যান্ট কনর রিপোর্ট দিল, 'হামলা থেমে গেছে, স্যর। রোটরের আওয়াজও হালকা হয়ে যাচ্ছে... চলে যাচ্ছে কপ্টারটা।'

'কোথায় যাচ্ছে এক্ষুণি দেখো।'

'আইস শেলফ... আইস শেলফের দিকে যাচ্ছে...'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল বুলডগ, বসা থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

প্রবীণ কমাণ্ডার তাড়াতাড়ি রেডিওতে নির্দেশ দিলেন, 'আলাস্কায় আমাদের সিটকা আর কোডিয়াক এয়ার স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করো। উই নিড ব্যাকআপ।'

'ইয়েস স্যর।'

কথা শেষ করে করিডরে বেরিয়ে এলেন কমাণ্ডার ডেকার, বুলডগের পথ ধরে ছুটতে শুরু করলেন নিজেও। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন গ্যারাজে।

ফাইটারের পাইলট তখনও রওনা হতে পারেনি, ডগলাস বুলকের হাঁকডাকে পুরো জায়গাটা থর থর করে কাঁপছে। একটু পরেই রেডি হয়ে গেল একটা আইস-ট্র্যাক্টর, পাইলটকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডোম থেকে।

boighar.com

বিশাল আকারের যানটার পিছু পিছু র‍্যাম্প ধরে বেরুল বুলডগও—খোলা প্রান্তরে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখতে চায়। ডেকার তাঁকে অনুসরণ করলেন।

সারফেসে পা দিতে না দিতেই হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ শোনা গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আইস শেলফের একপাশ থেকে উঠে আসতে দেখা গেল জে-হককে... দূর থেকে বিশাল এক ফড়িঙের মত দেখাচ্ছে ওটাকে। একটু হোভার করল ওটা, তারপরই টার্গেট দেখতে পেয়ে টার্ন করল—ছুটছে এখন মেক-শিফট এয়ারস্ট্রিপটার দিকে। ওখানেই ল্যাণ্ড করে আছে এফ-১৪ আর সকালে আসা ডিসি-থ্রি'টা।

ট্র্যাক্টরে অস্ত্রসহ দুজন বাড়তি লোক দিয়েছে বুলডগ, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য একটা ওয়াকিটকি নিয়েছে সঙ্গে। সেটটা মুখের কাছে তুলে সে চেঁচাল, 'ট্র্যাক্টর টিম... ফায়ার করো! ফায়ার করো!! কপ্টারটাকে পৌঁছুতে দিয়ো না!!!'

'লাভ নেই, স্যর,' ওপাশ থেকে জবাব ভেসে এল। 'ওরা আমাদের এফেক্টিভ রেঞ্জের বাইরে আছে, স্পিডও অনেক বেশি। গুলি তো লাগবেই না, মাঝখান থেকে শুধু শুধু বুলেট নষ্ট হবে।'

'শাট আপ!' হুঙ্কার দিল বুলডগ। 'লেকচার দিতে পাঠাইনি তোমাদের... পাঠিয়েছি অর্ডার ফলো করতে। আমি বলছি—ফায়ার!'

ট্র্যাক্টরের জানালা দিয়ে গুলি করতে শুরু করল দুই অস্ত্রধারী, অস্ত্রের গর্জনে কেঁপে উঠল পুরো আইস শিট। তবে জে-হকের গায়ে একটা বুলেটও লাগেনি, আগের মতই ছুটতে থাকল এয়ারস্ট্রিপের দিকে।

'ফায়ার, গাধার বাচ্চারা! ফায়ার!!' ওয়াকিটকিতে চেঁচাচ্ছে বুলডগ। 'লাগাতে না পারিস, অন্তত ওদেরকে ব্যস্ত করে রাখ্ কিছুক্ষণ।'

সিআইএ কর্মকর্তার পাগলাটে আচরণ দেখে কিছু বলা থেকে বিরত থাকলেন কমাণ্ডার ডেকার—সেধে গালাগাল শোনার মানসিকতা নেই তাঁর। তবে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, খামোকাই হল্লা করছে লোকটা, এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুনো থেকে জে-হকটাকে ঠেকানোর কোনও উপায়ই নেই।

পোড় খাওয়া অধিনায়কের ধারণাই ঠিক প্রমাণিত হলো—কয়েক মিনিটের ভিতরেই ল্যাণ্ড করা দুই আকাশযানের উপরে পৌঁছে গেল রানাদের হেলিকপ্টারটা। এর পর শুরু হলো তাণ্ডব। শিপের উপর এতক্ষণের গোলাগুলি কিছুই ছিল না, এবার জে-হক থেকে এমপি-ফাইভ দিয়ে যা করা হলো, সেটাকে কেবল মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

অটোমেটিক মেশিনগানের গুরুগম্ভীর আওয়াজ চাপা দিয়ে ফেলল রোটরের শব্দকে, এর সঙ্গে যুক্ত হলো গ্রেনেড বিস্ফোরণের মুহুর্মুহু গর্জন—যেন প্রলয়ঙ্করী কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে যাচ্ছে মণ্টেগো আইস শেলফের উপর দিয়ে। এফ-১৪ আর ডিসি-থ্রি'র উপর এয়ার রেইড চালাচ্ছে জে-হক, অস্ত্র হিসেবে বিমানের বিরুদ্ধে এমপি-ফাইভ তেমন ভারি কিছু না হলেও ক্রমাগত গুলি করতে পারায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রেনেডগুলো।

টানা দশ মিনিট হামলাটা চালিয়ে গেল রানারা, তারপর ক্ষান্ত হলো।

বিস্মিত দৃষ্টিতে জে-হককে দিক পাল্টে ডোমের দিকে ছুটে আসতে দেখল বাইরে দাঁড়ানো দর্শকরা। ইতোমধ্যে দুই কর্তাব্যক্তির পিছু পিছু কোস্ট গার্ডের বেশ কিছু সেইলর আর ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি গার্ড বেরিয়ে এসেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে বুলডগ বলল, 'যার যার কাছে অস্ত্র আছে, তা নিয়ে পজিশন নাও। কপ্টারটা এদিকে আসছে যখন, ওটাকে ঘায়েল করব আমরা।'

'এদিকে আসছে কেন?' বোকা বোকা কণ্ঠে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন কমাণ্ডার ডেকার।

কথাটার জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না বুলডগ, কাছে দাঁড়ানো এক সেইলরের হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল একটা মেশিনগান, তারপর র‍্যাম্পের আড়ালে পজিশন নিয়ে অন্যদেরও তা-ই করতে নির্দেশ দিল।

'এলোমেলো গুলি ছুঁড়ো না কেউ,' হুঁশিয়ার করে দিল বুলডগ। 'আমি বলব কখন-কোথায় শুট করতে হবে।'

সেইলররা পজিশন নিয়ে ফেলেছে—র‍্যাম্পের পাশে চারজন, গ্যারাজের ভাঙা একজিট ডোরের ফোকরের পাশে আরও তিনজন। সবার হাতে অটোমেটিক মেশিনগান—রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে আসন্ন লড়াইটার জন্য, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে জে-হকের আকৃতি, ডোমের সঙ্গে দূরত্ব কমে আসছে ক্রমেই।

'এসো, মাসুদ রানা,' বিড়বিড় করল বুলডগ। 'আজ একটা বোঝাপড়া হবে তোমার সঙ্গে।'

মনের আশাটা পূর্ণ হলো না বেচারার—এতক্ষণ সরলরেখা ধরে গ্যারাজের দিকেই আসছিল হেলিকপ্টারটা, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছে আচমকা দিক বদলাল। এবার অর্ধবৃত্তাকার একটা পথ ধরে ডোমের অন্যদিকে চলে যাচ্ছে জে-হক, একই সঙ্গে বাড়াচ্ছে উচ্চতা। এক পলকের জন্য জানালায় রানার চেহারা দেখতে পেল বুলডগ—ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে! বোঝা গেল, লড়াইয়ে নামার কোনও ইচ্ছেই নেই বাঙালি ছোকরার, বিনা রক্তপাতে কার্যসিদ্ধি করতে চাইছে... সে-কারণেই অন্যপাশ হয়ে ডোমের উপরে যাচ্ছে। কিন্তু স্পাইয়ের বাচ্চার উদ্দেশ্যটা কী?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল জে-হক—ডোমের উপরে চলে গেছে, দেখা যাচ্ছে না আর। ওখানে কী করছে ওটা, ভেবে পেল না বুলডগ। একটু পরেই কানে ভেসে এল নতুন করে উপর্যুপরি গুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ... আবারও হামলা শুরু করা হয়েছে। আশপাশে কোথাও বরফ ছিটকাতে না দেখে বিস্মিত হলো ব্যুরো চিফ, আক্রমণটা ডোমের উপরের অংশে করা হচ্ছে! দৌড়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে, র‍্যাম্প ধরে ছুটে গিয়ে ঢুকল গ্যারাজে। সামনে পড়লেন লায়াল ফ্যানিং, হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

'উপরে কী আছে?' জিজ্ঞেস করল বুলডগ।

'অ্যাঁ!' যেন ঘোরের মধ্যে আছেন ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টর, প্রশ্নটা বুঝতেই পারছেন না।

boighar.com

‘গাধার মত দাঁড়িয়ে থাকবেন না!’ ধমকে উঠল বুলডগ। ‘জবাব দিন প্রশ্নের! ডোমের উপরে কী আছে?’

‘ক্… কিচ্ছু না,’ থতমত খেয়ে বললেন ফ্যানিং। ‘শুধু আমাদের কমিউকেশনের ডিশ অ্যান্টেনা ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে।’

‘ডিশ অ্যান্টেনা!’ আঁতকে উঠল বুলডগ। এতক্ষণে রানার মতলব বুঝতে পেরেছে সে—সব ধরনের কমিউনিকেশন-ব্যবস্থা নষ্ট করে দিচ্ছে ও।

কমাণ্ডার ডেকারও বুলডগের পিছে পিছে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকেছেন গ্যারাজে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তিনিও। তাড়াতাড়ি ওয়াকিটকি মুখের কাছে তুলে শিপের ডিউটি অফিসারকে ডাকলেন, ‘কনর, সিটকা বা কোডিয়াক স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছ?’

‘নেগেটিভ, স্যর,’ জবাব দিল তরুণ লেফটেন্যান্ট। ‘গুলি আর গ্রেনেড বিস্ফোরণে আমাদের সমস্ত কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা ড্যামেজ হয়ে গেছে… মনে হচ্ছে ওগুলোকেই টার্গেট করেছিল ওরা।’

‘কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, বলতে পারো?’

‘আমরা এখনও ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট করছি, স্যর। তবে এই মুহূর্তে ডিসট্রেস সিগনাল পাঠাবার অবস্থায়ও নেই আমরা।’

‘শিট!’ গাল দিয়ে উঠলেন ডেকার। ‘যত তাড়াতাড়ি পারো কমিউনিকেশন চালু করো, কনর। কুইক!’

‘আমরা চেষ্টা করছি, স্যর। তবে দু’ঘণ্টার আগে একটা সেটও চালু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।’

‘ততক্ষণে ওরা পগার পার হয়ে যাবে, কনর। রিপেয়ার কমপ্লিট হওয়া চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব…’

আর শোনার প্রয়োজন মনে করল না বুলডগ। নিজের ওয়াকিটকিতে ফাইটার পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগ করল। ‘তোমরা পৌঁছেছ?’

‘ইয়েস, মি. বুলক।’

‘রিপোর্ট দাও—ফাইটারটা নিয়ে টেকঅফ করতে পারবে?’

‘অসম্ভব, স্যর। গুলি করে ক্যানোপি ভেঙে ফেলেছে ওরা, তারপর ককপিটের ভিতরে গ্রেনেড ফেলেছে—কনসোল বলে কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই।’

‘আর ডিসি-থ্রি?’

‘ওটার টেইল ফিনের অ্যালেরন গুঁড়িয়ে দিয়েছে গুলিতে। টেকঅফ হয়তো করা যাবে, কিন্তু নাক বরাবর ছাড়া আর কোনও দিকে মুভ করতে পারবে না বিমানটা।’

শোকে পাথর হয়ে গেল বুলডগ, চেঁচাচ্ছে না আর। সর্বনাশটা বুঝতে আর বাকি নেই তার—ফাইটার আর ডিসি-থ্রি অচল, তারমানে জে-হকটাকে ধাওয়া করা সম্ভব নয় কোনওমতেই। দু’ঘণ্টার আগে কমিউনিকেশনও চালু হচ্ছে না, অথচ এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আলাস্কা বা কানাডার উত্তর উপকূলের যে-কোন জায়গায় পৌঁছানোর ক্ষমতা আছে হেলিকপ্টারটার। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে যে ওদের ইন্টারসেপ্ট করতে বলবে, সে উপায় নেই।

গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ থেমে গেছে লক্ষ করে র‍্যাম্পে বেরিয়ে এল বুলডগ। ডোমের উপর থেকে সরে গেছে হেলিকপ্টারটা, ওটাকে দক্ষিণ-পূর্বমুখী একটা কোর্স ধরে আইস শেলফ থেকে চলে যেতে দেখল। সঙ্গে থাকা লোকজনকে গুলি করতে আর বলল না সে, তাতে লাভ নেই কোনও; নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু অপসৃয়মাণ যান্ত্রিক ফড়িংটার দিকে। আরও একবার তাকে ঘোল খাইয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মাসুদ রানা, অসহায়ের মত চেয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই বুলডগের।

বুকের ভিতরে একটা চাপা ক্রোধ তড়পাচ্ছে, কিন্তু সেটাকে বেরিয়ে আসতে দিল না সে। বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'রানা, তোমার শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না!'

চার

০৫ মে। অ্যামস্টারড্যাম, হল্যাণ্ড।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ছোট্ট একটা জেলে-গ্রাম হিসেবে গোড়াপত্তন হওয়া জনপদটা কালের পরিক্রমায় এখন পরিণত হয়েছে গোটা একটা দেশের রাজধানীতে। অ্যামস্টারড্যাম আজ ইয়োরোপের সবচেয়ে বড় শহরগুলোর একটা—পুরো মহাদেশের শিল্প আর বাণিজ্যের একটা প্রধান প্রাণকেন্দ্র। নৈসর্গিক আর স্থাপত্য সৌন্দর্যের দিক থেকেও খুব একটা পিছিয়ে নেই এই মহানগরী, কাব্যিক পরিবেশের অপূর্ব শহর ভেনিসের সঙ্গে প্রায়ই তুলনা করা হয় অ্যামস্টারডামের প্রাচীন অংশটাকে।

সকাল সাড়ে আটটায় এই রাজধানীর বিশ্ববিখ্যাত *শিফল* এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল *কে.এল.এম*-এর একটা সুপরিসর বোয়িং—কানেক্টিং ফ্লাইট এটা, এসেছে ব্রাযিলের রিয়ো ডা জেনিরো থেকে পর্তুগালের লিসবান হয়ে। ট্যাক্সিং করে ধীরে ধীরে টার্মিনাল ভবনের পাশে এসে দাঁড়াল ওটা, এবার বিল্ডিঙের শরীর থেকে একটা ক্রোকোডাইল ডিসএম্বারকেশন টিউব প্রসারিত হয়ে এসে ঠেকল বিমানের ফ্রন্ট একজিটের চারপাশে।

একটু পরেই খুলে দেয়া হলো দরজা, পিল পিল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল যাত্রীরা—লম্বা জার্নির ক্লান্তি সবার চোখেমুখে, চলাফেরায় তাড়াহুড়ো দেখে বোঝা যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি যার যার গন্তব্যে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চায়। এসব যাত্রীর ভিড়ে রয়েছে প্রায় ছ'ফুট লম্বা এক অশ্বেতাঙ্গ যুবক, গায়ের চামড়া রোদে পোড়া তামাটে রঙের। এমনিতে কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে রাখে সে, তবে এ-মুহূর্তে এলোমেলো হয়ে আছে তার ঘন কেশরাজি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা রয়েছে তার, নাকের নীচে মাঝারি আকৃতির একটা গোঁফ। জুলফিটা বেশ লম্বা, নাকের গড়ন একটু বাঁকা, যেন কোনওকালে বেমক্কা ঘুসি খেয়ে চিরতরে স্বাভাবিক আকৃতি হারিয়েছে ওটা। অবশ্য এই চেহারা যে পুরোপুরিভাবেই

boighar.com

মেকাপ-আর্টিস্টের গড়া, তা কল্পনা করতে পারবে না কেউ। দীর্ঘ ষোলো ঘণ্টা একসঙ্গে জার্নি করলেও সহযাত্রীদের কারও জানা নেই, ছদ্মবেশের আড়ালে অভ্যন্ত সুপুরুষ এক বাঙালি যুবক লুকিয়ে আছে, যার দিকে একবার চোখ পড়লে পলক ফেলা কঠিন, তরুণীরা ওকে দেখে নিজের অজান্তেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

মাসুদ রানা!

দরজায় দাঁড়ানো ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের বিদায় সম্ভাষণের জবাবে ভদ্রতাসূচক একটা হাসি দিয়ে একজিট দিয়ে বেরিয়ে এল ও, ডিসএম্বারকেশন টিউব ধরে এগোতে শুরু করল সামনে, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সংকীর্ণ প্যাসেজটার বিভিন্ন জায়গায় নিয়মমাফিক দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'জন এয়ারপোর্ট অফিশিয়াল—যাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধা... সেই সঙ্গে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার দায়িত্ব তাদের কাঁধে। লোকগুলোর উপস্থিতি অস্বাভাবিক কিছু নয়, তারপরও সতর্ক দৃষ্টি বোলাল রানা—সন্দেহজনক কোনও আচরণ করে কি না কেউ, সেটা খেয়াল রাখছে।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে রানার মাথা। রায়হানের হিসেব অনুসারে হল্যাণ্ডের স্থানীয় সময় আগামীকাল রাত দুটোয় আঘাত হানবে ইউনো-ভাইরাস, শুরু হয়ে যাবে সাইবার জগতের প্রলয়কাণ্ড। সব মিলিয়ে হাতে সময় আছে ষোলো ঘণ্টার মত, অথচ অ্যাসাইনমেন্টে ওদের অগ্রগতি কিছু হয়নি বললেই চলে। আগে যেখানে ছিল, এখনও সেখানেই রয়ে গেছে। অ্যান্টি-ভাইরাসটা এখনও কাউকে দিয়ে তৈরিই করাতে পারেনি, বিলি করা তো অনেক পরের কথা। দশজনের মধ্যে আটজন ইউনো আগেই মারা পড়েছেন, নবম জন... ড. স্ট্যানলি ডোনেনের খোঁজ পেয়েছিল ও, কিন্তু তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে রানার, সেই সঙ্গে মনের ভিতরে একটা চাপা ক্রোধও অনুভব করছে—খুনীদের নিজ হাতে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত তা থামবে না। কিন্তু সেটা আদৌ সম্ভব কি না, বোঝা যাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটার পিছনে কে কলকাঠি নাড়ছে, সেটা জানা যায়নি এখনও... প্রতিশোধ নেয়া বা শায়েস্তা করার জন্য শত্রুর পরিচয় তো জানতে হবে প্রথমে! www.boighar.com

পুরো মিশনটা আরও কঠিন করে তুলেছে ডগলাস বুলক। মণ্টেগো আইস শেলফ থেকে পালাবার পর কেটে গেছে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা—এই সময়টা সক্রিয়ভাবে রহস্য-সমাধানের কাজে ব্যবহার করতে পারেনি রানা আর রায়হান... সেটা বুলডগের কারণে। ওদের কাছে ঘোল খাওয়ায় প্রচণ্ড ধাতানি দিয়েছে তাকে সিআইএ চিফ, আবার ডিমোশনের হুমকি দিয়েছে; এখন রানার ওপর আক্রোশ মেটাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা। আশ্চর্যের ব্যাপার, যা ঘটেছে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করছে সে নিজেকে নয়, মাসুদ রানাকে। এই খেপা কুকুরের চোখে ধুলো দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে ওদের, নষ্ট হয়েছে মূল্যবান অনেকটা সময়।

কোস্টগার্ডের হেলিকপ্টারটা নিয়ে আলাস্কার সীমান্তে একটা জনমানবহীন পাহাড়ী এলাকায় নেমেছিল ওরা—আকাশযানটাকে দুই পাহাড়ের মাঝখানে

একটা সংকীর্ণ গিরিখাতে ল্যাণ্ড করিয়েছে, তারপর গাছপালার ভাঙা ডাল আর পাতা দিয়ে ক্যামোফ্লাজে ঢেকেছে। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওরা ঢুকেছে কানাডায়। পুরোপুরি সুস্থ ছিল না দুজনের কেউ, পরিশ্রমে শারীরিক সহ্যশক্তির শেষসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে একটা ছোট্ট সীমান্ত-শহরে পৌঁছায় ওরা, সেখান থেকে টেলিফোনে রানা এজেন্সির মণ্ট্রিয়ল শাখার স্ক্র্যাম্বলড্ লাইনে যোগাযোগ করে রানা। শাখাপ্রধান আহসান হাবিব আগে থেকেই স্ট্যাণ্ডবাই ছিল ড. ডোনেনসহ ওদেরকে মণ্টেগো আইস শেলফ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবার জন্য, ফোন পাওয়ামাত্র বিমান পাঠিয়ে দেয় ছোট্ট শহরটার কাছাকাছি একটা এয়ারফিল্ডে। ওটায় চড়ে মণ্ট্রিয়লে পৌঁছায় রানা আর রায়হান, আশ্রয় নেয় এজেন্সির একটা সেফ হাউজে।

ওখান থেকেই পরবর্তী কাজগুলো করেছে ওরা। সুস্থতা ফিরে পেতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেয়ার পাশাপাশি খোঁজ নিতে শুরু করেছে শেষ ইউনো ড. এলিসা ভ্যান বুরেনের ব্যাপারে। এজেন্সির অপারেটররা চমৎকার কাজ দেখিয়েছে, বারো ঘণ্টার ভিতরেই ভদ্রমহিলার সমস্ত ডিটেইলস্ জোগাড় করে এনেছে। পারিবারিক সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে ওখান থেকে, সেই সঙ্গে জানা গেছে—লেখাপড়া শেষ করে তিনি তাঁর পিতৃভূমি হল্যাণ্ডে ফিরে গেছেন, অ্যামস্টারড্যামে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি খুলে গত দশ বছর ধরে ব্যবসা করছেন। পেশার প্রতি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ড. বুরেন, আজ পর্যন্ত বিয়ে করেননি, একার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটাকে ইয়োরোপের শীর্ষ-বিশটা কম্পিউটার-ভিত্তিক কোম্পানির একটায় পরিণত করেছেন। শুরুতে শুধু সফটওয়্যার তৈরি করত তাঁর *ক্রিয়েল-টেক* কোম্পানি, আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত একটা অ্যান্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার ওটার প্রধান প্রোডাক্ট, নাম *ক্রিয়েল-প্রোটেক্ট।* নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ায় সম্প্রতি হার্ডওয়্যার, মানে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশও তৈরি করতে শুরু করেছে কোম্পানিটা; সামনের বছর থেকে পুরো কম্পিউটারই বাজারে ছাড়া হবে বলে বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে।

তবে খবর বলতে এটুকুই, এ-মুহূর্তে ভদ্রমহিলা কোথায় আছেন, তা জানতে পারেনি রানা এজেন্সির অ্যামস্টারড্যাম শাখার অপারেটররা—কোম্পানির স্টাফরা মুখ খুলছে না। কখন খবর পাওয়া যাবে, সে অপেক্ষা করবার সময় ছিল না, ড. বুরেনকে নিজেই খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রানা চলে এসেছে হল্যাণ্ডে।

কানাডা থেকে কনকর্ড জেট ধরে মাত্র চার ঘণ্টায় অ্যামস্টারড্যামে আসা সম্ভব হলেও সময় ব্যয় করতে হয়েছে অনেক গুণ বেশি—সাধারণ ফ্লাইটে এসেছে, সেইসঙ্গে ঘুরপথ ব্যবহার করেছে ও। আমেরিকান সরকারের অনুরোধে কোস্ট গার্ডের জাহাজের উপর হামলাকারী দুজন বাংলাদেশি যুবককে ধরতে কানাডা সরকার দেশের বাইরে গমনকারী সব ধরনের বিমান এবং অন্যান্য ট্রান্সপোর্টের উপর নজরদারির ব্যবস্থা করেছে বলে খবর পেয়েছিল ওরা। তা ছাড়া নিজস্ব সিআইএ এজেন্টদেরও কানাডার ভিতরে তৎপর করে তুলেছিল বুলডগ ওদের খোঁজে। প্রয়াত ড. ডোনেনের সূত্র ধরে লোকটা ড. বুরেনের খবর

boighar.com

পেয়ে গেছে কি না, কে জানে! যদি পেয়ে থাকে, তা হলে রানারা যে কানাডা থেকে অ্যামস্টারড্যামে যাবে, এটা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। এই রুটের সব ফ্লাইটের উপর কড়া চোখ রাখবে সে। বাধ্য হয়ে বিকল্প পথ ধরেছে রানা আর রায়হান। ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করে একজন গেছে ব্রাযিলে, অন্যজন মরক্কোতে। সেখান থেকে আবারও পরিচয় বদল করে কানেক্টিং ফ্লাইটে এসেছে হল্যাণ্ডে।

ধীর পায়ে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মিশে কাস্টমস্ ডেস্কের দিকে এগোল রানা। এই মুহূর্তে ব্যস্ত এয়ারপোর্টের হাজারো সাধারণ যাত্রীর একজন ও, আলাদা কোনও বিশেষত্ব চোখে পড়বে না কারও। ফর্মালিটি সম্পন্ন করার জন্য লাইনে দাঁড়াল রানা, বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে আফ্রিকান এক দম্পতির পর ওর পালা এল। দুজন কাস্টমস্ অফিসার রয়েছে ডেস্কে, তাদের একজনের হাতে পাসপোর্ট আর কাগজপত্র তুলে দিয়ে এক পলকের জন্য চারপাশে নজর বোলাল রানা—অফিসারদের পিছনে দুজন সিকিউরিটির লোক দাঁড়িয়ে গল্প করছে সুটপরা তৃতীয় একজনের সঙ্গে... দেখে অ্যামেরিকান মনে হচ্ছে। বুলডগের লোক নয়তো!

অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করতে হলো না ওকে। ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ করা গেল লোক তিনটের মধ্যে। একবারের জন্য অলস ভঙ্গিতে তাকাল ওর দিকে, তারপর আবার গল্পে মগ্ন হয়ে পড়ল।

কনভেয়ার বেল্টে রানার লাগেজ এসে গেছে, টান দিয়ে সুটকেসটা তুলে নিল একজন কাস্টমস্ অফিসার, ডেস্কের উপর রেখে খুলে দেখল ভিতরটা। অন্যজন ওর পাসপোর্ট আর কাগজপত্র চেক করছে।

'মি. রিকার্ডো গোমেজ,' বলল অফিসার। 'আপনি দেখছি একজন ফ্রিকোয়েন্ট ট্র্যাভেলার, বহু দেশে গেছেন। কী করেন আপনি?'

খুক করে কাশল রানা। বলল, 'কেন, দেখতে পাচ্ছেন না? আমার কাগজেই তো লেখা আছে—আমি য্যানডার আয়রন কোম্পানির ইন্টারন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ।'

বিভিন্ন দেশে যাবার ব্যাপারটা সত্যি। রিকার্ডো গোমেজ চরিত্রটা বিসিআই এজেন্টদের একটা ইমার্জেন্সি কাভার হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেটাকে জিইয়ে রাখার জন্য গোমেজের ছদ্মবেশে সারা বছরই কেউ না কেউ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায়।

'হুঁ, কাজটা কী আপনার?' জিজ্ঞেস করল অফিসার।

'আমার কোম্পানি ব্রাযিলের বিভিন্ন খনি থেকে লোহা তুলে সারা পৃথিবীতে রপ্তানি করে। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার পাশাপাশি অর্ডার সংগ্রহ, বিল দেয়া... এসব আমাকে দেখতে হয়। সে-কারণেই এত ছোটাছুটি।'

'এখানেও কি...'

'হ্যাঁ, আপনাদের দেশের দুটো বড় বড় শিপইয়ার্ডের সঙ্গে কথা চলছে—চুক্তি হয়ে গেলে ওদের সারা বছরের ব্যবহার্য সব লোহা আমরা সাপ্লাই করব।'

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্ট হয়ে কাগজপত্র ফিরিয়ে দিল অফিসার। তাকে ধন্যবাদ

জানিয়ে সুটকেস নিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। এক ফাঁকে পিছন ফিরে অ্যামেরিকান লোকটাকে আরেকবার দেখে নিল। না, তাকাচ্ছে না সে এদিকে, এখনও আগের মতই গল্পে ব্যস্ত। ব্যাটা এখানে করছেটা কী!

প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল রানা, সুটকেসটা নামিয়ে রাখল পেভমেন্টে। বিশেষ একটা ভঙ্গিতে মাথার চুলে হাত বোলাতেই একশো গজ দূরে পার্ক করে থাকা একটা সেডান গাড়ি জ্যান্ত হয়ে উঠল, এগিয়ে এসে একেবারে ওর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল ওটা।

দরজা খুলে নেমে এল ড্রাইভার, আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল রানাকে, যেন বহুদিন পর দেখা হয়েছে দুই নিকটাত্মীয়ের। মুখে হাসি ফুটিয়ে পাল্টা আলিঙ্গন করল রানা, তারপর সুটকেসটা গাড়ির ট্রাঙ্কে রেখে ড্রাইভারসহ চড়ে বসল সেডানে।

এয়ারপোর্ট ছেড়ে এ-ফোর হাইওয়েতে উঠে এল গাড়িটা, দ্রুতবেগে ছুটছে অ্যামস্টারড্যামের শহরতলির দিকে। সতর্ক চোখে পিছনদিকে নজর রাখছিল রানা, মিনিট দশেক পেরিয়ে যাবার পরও সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—না, অনুসরণ করা হচ্ছে না ওদেরকে। একটু খটকা অবশ্য মনের ভিতর রয়েই গেল—এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির সঙ্গে অ্যামেরিকান লোকটা কী করছিল? কাস্টমস্ ডেস্কে তার উপস্থিতি কোনও স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না।

'কী ব্যাপার, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভারের ছদ্মবেশধারী রায়হান—মরক্কো থেকে দু'ঘণ্টা আগে পৌঁছেছে ও। রানার কথামত ছোটখাট কয়েকটা কাজ সেরেছে এখানে নেমে, তারপর নতুন ছদ্মবেশে একটা গাড়ি ভাড়া করে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল ওকে রিসিভ করতে। 'আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?'

'কাস্টমসের ওখানে একটা লোককে দেখলাম,' বলল রানা। 'এয়ারপোর্টের কেউ নয়, সিকিউরিটির দুজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, চেহারা-সুরতে অ্যামেরিকান মনে হলো...'

'আমিও দেখেছি তো!' বলে উঠল রায়হান।

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কখন?'

'দু'ঘণ্টা আগে... আমি যখন ল্যাণ্ড করলাম।'

'তখনও ছিল?' রানা বিস্মিত। 'কী করছিল?'

'কিচ্ছু না। ভয় হচ্ছিল আমাকে ধরার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে কি না, কিন্তু দেখলাম ফিরেও তাকাল না। হাব-ভাবে মনে হলো অপেক্ষা করছে অন্য কোনও কিছুর জন্য।'

'অবাক ব্যাপার তো!' রানা বলল। 'আমার উপরও নজর দেয়নি। তা হলে ওখানে খাম্বা হয়ে আছে কীসের জন্য?'

'ওই ব্যাটা কিন্তু একা না,' রায়হান বলল। 'অন্তত আরও তিনজন চোখে পড়েছে আমার।'

'কোথায়? আমি তো দেখিনি।'

boighar.com

'ওরা যেখানে আছে, সেদিকে যাননি বোধহয়। একজনকে দেখেছি ক্যাফেটেরিয়ায়, একজন ছিল ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জে, শেষজন ইমিগ্রেশন ডেস্কের ওখানে।'

'হুম। তুমি এত সব জায়গায় গিয়েছিলে কেন?'

'এয়ারপোর্টে খুব কড়া সিকিউরিটি দেখলাম, বাইরেও তখন পুলিশের একটা ভ্যান ছিল। তাই ভিতরেই কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে অবস্থাটা যাচাই করেছি।'

'ভাল করেছ,' রানা বলল। 'এদিকের খবরাখবর কী? নাঈমের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?' রানা এজেন্সির অ্যামস্টারড্যাম শাখার প্রধান নাঈম আযমের কথা বলছে ও।

মাথা ঝাঁকাল রায়হান। 'হোটেলে উঠেই ফোন করেছিলাম।'

'কী বলল ও?'

'অত বিস্তারিত আলোচনা তো করতে পারিনি, সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলতে হয়েছে, যাতে আড়ি পাতলেও কেউ কিছু বুঝতে না পারে। নাঈম ভাই শুধু এটুকু বললেন যে, এখনও ড. বুরেনের খোঁজ বের করতে পারেননি তিনি। ভদ্রমহিলা যে দেশের ভিতরেই আছেন, এটা শিয়োর হওয়া গেছে... তবে ওই পর্যন্তই। তিনি যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছেন, সেটা বলতে পারছে না কেউ।'

'হুঁ, তারমানে ড. ডোনেনের ওয়ার্নিংটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন তিনি,' বলল রানা। 'এখনও বেঁচে আছেন বলেই মনে হচ্ছে... মৃত্যুসংবাদ যেহেতু পাওয়া যায়নি।'

'কতক্ষণ থাকবেন সেটাই প্রশ্ন। খুনীরা ডোনেন স্যরকে তো আর্কটিকে গিয়ে পর্যন্ত খুন করে এল!'

'তারচেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে সময়,' রানা গম্ভীর। 'ডেডলাইনের মাত্র ষোল ঘণ্টা বাকি—এর মধ্যে ড. বুরেনকে খুঁজে বের করতে হবে, তাঁকে দিয়ে অ্যাণ্টিভাইরাসটাও তৈরি করিয়ে নিতে হবে।'

'এখন তা হলে কী করতে চান, মাসুদ ভাই?' রায়হান জিজ্ঞেস করল। 'ক্রিয়েল-টেকের হেড অফিসে যাবো? ওখানে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে, ওদের বস্ কোথায় আছে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে পেট থেকে কথা বের করবার একটা অ্যাটেম্পট্ নেয়া যেতে পারে।'

'তাতে লাভ হবে বলে মনে হয় না,' রানা মাথা নাড়ল। 'ওভাবে খোঁজ বের করা গেলে নাঈমই পারত। কে জানে, সত্যিই হয়তো কেউ জানে না, ভদ্রমহিলা কোথায় গেছেন।'

'তা হলে?'

একটু চিন্তা করল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ড. বুরেনের যেসব ইনফরমেশন দিয়েছে নাঈম, তাতে ওঁর বাড়ির ঠিকানা আছে?'

'এক মিনিট,' বলে স্টিয়ারিং হুইল থেকে একটা হাত সরিয়ে ড্যাশবোর্ডের উপর থেকে একটা নোটবুক তুলে নিল রায়হান। গাড়ির গতি কমিয়ে একটু সাইড করল, তারপর নোটবুকটার পাতা ওল্টাতে শুরু করল। একটু পরেই

বলল, 'এই যে... এই তো! আছে ঠিকানাটা—১০৮, গ্রুমবার্গ অ্যাভিনিউ, আলস্মির।'

'গাইড ম্যাপ আছে তোমার কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল রায়হান। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে চার ভাঁজ করা একটা ম্যাপ বের করে দিল। সেটা খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। বলল, 'হুঁ, অভিজাত এলাকা দেখছি! চলো ওখানে।'

'গিয়ে লাভটা কী? নাঈম ভাই বলেছেন, বাড়িটা খালি... তালা মারা। গত এক মাস ধরেই ওভাবে পড়ে আছে ওটা।'

'বাড়িটা একটু তল্লাশি করে দেখতে চাই। ভদ্রমহিলা কোথায় যেতে পারেন, তার কোনও সূত্র হয়তো পাওয়া যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার সেডানটাকে সামনে বাড়াল রায়হান।

আধঘণ্টা পর।

শিফল থেকে আলস্মিরের দূরত্ব মাত্র তেরো মাইল, চোখের পলকেই যেন পৌঁছে গেল রানা আর রায়হান। রোড-মার্কিং আর দোকানপাটের সাইনবোর্ড দেখে দেখে এরপর খুঁজে বের করল ড. এলিসা ভ্যান বুরেনের বাড়িটা। *ওয়েস্টেইনডারপ্লাসেন* লেকের পারে বেশ বড় সড় একটা জায়গা নিয়ে সেখানে ভদ্রমহিলার দোতলা বাড়ি। চমৎকার দেখতে, সীমানাটা সুন্দর করে ছাঁটা গুল্মের নিচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দূর্বা ঘাসে ঢাকা বিশাল লনের শোভা বর্ধন করছে চমৎকারভাবে বানানো বেশ ক'টা ফ্লাওয়ার বেড আর নিচু স্তম্ভে বসানো কিছু ভাস্কর্য। বৃত্তাকার ড্রাইভওয়েের মাঝখানটা বড় বড় পাতাঅলা কলাগাছ আর গোলাপঝাড় দিয়ে সাজানো। পিছনে একটা ছোট ডক রয়েছে, সেখানে নতুন মডেলের একটা ঝকঝকে স্পিডবোট বাঁধা—মনে হচ্ছে অবসরে কম্পিউটার বিজ্ঞানী নৌ-ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন।

সেডানটা মাইলখানেক দূরের একটা পার্কিং লটে রেখে বাড়িটার চারপাশ ঘুরে-ফিরে দেখল রানারা, কিন্তু ভিতরে ঢোকার কোনও পথ পেল না। সামনে-পিছনে সব দরজা-জানালা বন্ধ, তালাগুলোও যা-তা নয়, একেবারে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক লক। অবস্থা দেখে মনে হলো, অ্যালার্মও ফিট করা আছে, জোর করে বা ভেঙে ঢুকতে গেলে পুলিশকে সতর্ক করে দেবে।

কীভাবে ঢোকা যায়, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল রানা, কিন্তু রায়হানের হাসিতে ভাবনায় ছেদ পড়ল। 'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ও।

'ইলেকট্রনিক লক, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'ওটার কোড ভাঙাটা আমার জন্য কোনও ব্যাপারই না। বরং সাধারণ তালা হলেই কিছু করতে পারতাম না।'

'সেক্ষেত্রে তালার জাদুকর আমি সাজতাম,' রানা হাসল। 'তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়ো, সময় খুব মূল্যবান।'

দৌড়ে চলে গেল রায়হান, মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এল—গাড়ি থেকে নিজের ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে এসেছে। অ্যামস্টারড্যামে নেমেই নতুন এই

boighar.com

কম্পিউটারটা কিনেছে ও।

বাড়ির পিছনের দরজার ইলেকট্রনিক লকের কাভার খুলে ফেলল তরুণ হ্যাকার, কম্পিউটারের সঙ্গে ডেটা কেইবল্ দিয়ে সংযোগ ঘটাল ওটার, তারপর অ্যাকসেস কোড ব্রেক করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারায় থাকল রানা, কেউ এসে পড়ে কি না খেয়াল রাখছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ক্লিক করে শব্দ হলো, মাথা ঘুরিয়ে লকের গায়ে সবুজ আলো জ্বলতে দেখল ও—খুলে গেছে ওটা! রায়হানের মুখ হাসি হাসি, ভুরু নাচিয়ে ভাব করল—কী, বলেছিলাম না?

'গুড জব, রায়হান,' রানা বলল। তারপর ওকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর।

দরজার ওপাশে কিচেন, সেখানে দেখার কিছু নেই। করিডর ধরে বাড়ির মূল অংশে চলে এল ওরা দুজন। নিচতলায় বড় একটা হলঘরের মত আছে—বৃত্তাকার, চারপাশে বেশ ক'টা দরজা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রুমে যাবার জন্য। হলের ঠিক মাঝখান থেকে দোতলায় চলে গেছে একটা চওড়া সিঁড়ি। পুরো বাড়িটাই দামি কার্পেটে মোড়া। কাঠের প্যানেলিং করা দেয়ালে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের পেইন্টিং আর স্টাফ করা জন্তুর মাথা। হলঘরের একপাশে সাজিয়ে রাখা বেশ কিছু দুর্লভ অ্যান্টিকস্ও চোখে পড়ল। পুরো দৃশ্যটাতেই প্রাচুর্যের ছাপ।

'হুঁ, ভদ্রমহিলা বেশ ধনী মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল রানা।

'আঙুল ফুলে কলাগাছ হননি, খান্দানি বড়লোক,' বলল রায়হান। 'এত টাকা-পয়সা আর প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকার পরও ওঁর বাবা যে কোন্ দুঃখে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, আমি বুঝি না।'

ড. বুরেন সম্পর্কে পাওয়া তথ্যগুলো মনে পড়ছে ওর। এলিসার পূর্বপুরুষেরা এককালে ব্যারন ছিলেন, প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাঁদের। তবে তাঁর বাবা ব্যারনদের একঘেয়ে জীবনযাপন পছন্দ করতেন না একদম। ভদ্রলোক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় স্বভাবের ছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই সোজা গিয়ে নাম লেখালেন রয়্যাল এয়ারফোর্সে, পরিবারের কারও আপত্তি মানলেন না। রয়্যাল এয়ারফোর্সের আঠারো নম্বর ইস্ট ইণ্ডিজ স্কোয়াড্রনে বম্বার পাইলট হিসেবে যুদ্ধ করেছেন ১৯৪২ থেকে '৪৫ পর্যন্ত, কৃতিত্বও দেখিয়েছেন অনেক। ট্রেইনিঙের জন্য অ্যামেরিকায় গিয়ে ড. বুরেনের মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর, সেখান থেকে প্রেম আর প্রণয়। বছর দশেক আগে মারা গেছেন ভদ্রলোক। এলিসার মা মারা গেছেন আরও আগে, পরিবারটায় এখন তিনি আর তাঁর এক ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ নেই।

'শুধু বাপ-দাদার পরিচয় নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না অনেকে,' রানা বলল। 'তারা চায়, নিজের যোগ্যতায় কিছু করে দেখাতে।'

'ইস্স্, আমাদের দেশে যারা পরিবারতন্ত্র চালাচ্ছে, তারা যদি এই কথাটা বুঝত!'

হাসল রানা। 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। যে-কাজে এসেছি, সেটাই

করি চলো।'

'বাড়িটা তো অনেক বড়। কোথায় তল্লাশি করতে চান?'

'স্টাডি জাতীয় একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই। চলো ওটা খুঁজে বের করি। ওখানকার কাগজপত্র ঘাঁটলে ড. বুরেন কোথায় যেতে পারেন, সেটার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা আর রায়হান। নীচতলার সবগুলো দরজা খুলে খুলে উঁকি দিতে শুরু করল ভিতরে। একটু পরেই খোঁজ পাওয়া গেল স্টাডির—বাড়ির একপ্রান্তে ওটা। সঙ্গে ছোটখাট একটা লাইব্রেরিও আছে। রুমটা দেখে অফিসঘরের মত মনে হলো, ড. বুরেন সম্ভবত বাড়িতে থাকলে এখানেই অফিশিয়াল কাজকর্ম করেন।

স্টাডিতে কয়েকটা ফাইল কেবিনেট আছে, সেইসঙ্গে আছে একটা বড় ডেস্ক-টেবিল—সেটায় শোভা পাচ্ছে একটা আধুনিক কম্পিউটার। রায়হানকে ওটা অন করতে বলে নিজে কেবিনেটগুলোর দিকে এগিয়ে গেল রানা, ভিতরের কাগজপত্র দেখবে। একটু পরেই হতাশ হতে হলো ওকে, সবক'টা কেবিনেটই তালা মারা। রায়হানের গলা থেকেও একটা বিরক্তির শব্দ বেরুল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পাসওয়ার্ড দেয়া আছে কম্পিউটারটায়,' বলল রায়হান। 'ভিতরে ঢোকা যাচ্ছে না।'

'ক্র্যাক করার চেষ্টা করেছ?'

'তা আর বলতে! তবে একজন ইউনো তাঁর পার্সোনাল কম্পিউটার সহজে হ্যাক্ করতে দেবেন, তা কি হয়? ইউনোকোডে একটা ডিফেন্স সিস্টেম খাড়া করা আছে এটায়, কিছুতেই ঢোকা সম্ভব নয়।'

'হুঁ, কেবিনেটগুলোও তালা দেয়া।'

'কী করা যায় তা হলে?'

'আমি আশপাশের রুমগুলোয় একটা চক্কর দিয়ে আসি, দেখব তালা খোলার মত কিছু পাওয়া যায় কি না। তুমি ওপরতলায় যাও, ড. বুরেনের বেডরুমটা খুঁজে বের করো। ওখানে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা পাবে, সব নিয়ে এসো এখানে।'

'কী জিনিসপত্র আনব?'

'ফ্যামিলি অ্যালবাম, চিঠিপত্র... এসব আর কী! কপাল ভাল হলে ডায়েরি-টায়েরিও পেয়ে যেতে পারো।'

'তাতে লাভ?'

'ওসব দেখলে বোঝা যাবে, ড. বুরেন কোথায় কোথায় সাধারণত যান বা যেতে পারেন। যাও, দেরি কোরো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল রায়হান। রানাও বেরুল স্টাডি থেকে। পাশের দুটো রুম দেখা শেষ করেছে, হঠাৎ ইঞ্জিনের ভারি শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ও। ড্রাইভওয়েতে একটা গাড়ি এসে থেমেছে। খানিক পরে সদর দরজা খোলার শব্দ হলো, কয়েক সেকেণ্ড ব্যবধানে হলঘরে আবছাভাবে পায়ের আওয়াজ... রায়হান

boighar.com

না, অন্য কেউ! হাঁটার ভঙ্গি অন্যরকম, মনে হচ্ছে হিল পরে আছে। তারমানে নারী!

বিস্ময় বোধ করল রানা। কে হতে পারে? গত একমাস থেকে এই বাড়িটা তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে বলে জানিয়েছে নাঈম, কেউ নাকি থাকে না। তা হলে কে এল হঠাৎ করে? ড. বুরেন নিজেই নন তো!

দরজা ফাঁক করে সাবধানে উঁকি দিল ও। পরমুহূর্তেই দমে গেল। নাহ্, ভাগ্যদেবী এত সদয় হয়ে ওঠেননি। বয়স্কা কম্পিউটার-বিজ্ঞানী নয় নবাগতা, অন্য মানুষ। অল্প-বয়েসী একটা মেয়ে—বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হবে না। প্ল্যাডের তৈরি ধূসর রঙের স্কার্ট আর জ্যাকেট পরে আছে, পায়ে কনট্রাস্ট কালারের হাই হিল, কাঁধে ঝুলছে ব্যাগ। হলঘরে এসে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দেয়ালে লাগানো হুকে হাতে ধরা একটা ওভারকোট ঝুলিয়ে রাখল সে, ব্যাগটা নামিয়ে রাখল পাশের টেবিলে, তারপর করিডর ধরে চলে গেল কিচেনের দিকে।

প্রমাদ গুণল রানা, ওখানে পিছনের দরজাটা খোলা পাবে মেয়েটা! ভেজানো আছে বটে, কিন্তু তালা তো দেয়া নেই! ব্যাপারটা কি লক্ষ করবে সে?

জবাবটা কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল। হন্তদন্ত হয়ে করিডর ধরে মেয়েটাকে ছুটে আসতে দেখল ও, চেহারায় আতঙ্ক ফুটে রয়েছে। হলঘরে পৌঁছে এদিক-সেদিক তাকাল মেয়েটা, যেন বোঝার চেষ্টা করছে—অনুপ্রবেশকারী এখনও বাড়িতে রয়েছে কি না। কী বুঝল কে জানে, ইতস্তত করে সে এগিয়ে গেল একপাশের ছোট্ট টুলের উপর রাখা টেলিফোনটার দিকে, নিশ্চয়ই পুলিশে ফোন করতে যাচ্ছে।

আর বসে থাকা যায় না, পুলিশ এসে পড়লে মহাবিপদ দেখা দেবে। সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা, সন্তর্পণে এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে, ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে। ডায়াল শেষ করতেই পৌঁছে গেল নাগালের মধ্যে।

শেষ মুহূর্তে ঘাড়ের কাছে কারও উপস্থিতি অনুভব করতে পারল তরুণী, ঝট করে ঘোরার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই পিছন থেকে ছোবল হানল রানা—এক হাতে জাপটে ধরল মেয়েটাকে, অন্য হাতে চেপে ধরেছে মুখ, যাতে চেঁচাতে না পারে।

ছাড়া পাবার জন্য মোচড়ামুচড়ি শুরু করল তরুণী, কিন্তু শক্তিতে রানার সঙ্গে পারার কথা নয় বেচারির, শীঘ্রি হার মানল।

'রিসিভারটা নামিয়ে রাখো,' শান্ত গলায় বলল রানা, বাঁধন আলগা করেনি এক চুল।

কাঁপা কাঁপা হাতে আদেশটা পালন করল বন্দিনী, তার দু'চোখে রাজ্যের ভয় আর আতঙ্ক জমা হয়েছে। মুখ চেপে ধরে রাখা হাতটায় গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি এসে পড়তেই রানা বুঝতে পারল, কাঁদছে মেয়েটা। নরম সুরে ও বলল, 'ভয় পেয়ো না, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। মুখের ওপর থেকে হাত সরাতে পারি, যদি তুমি চিৎকার করবে না বলে কথা দাও। কী, চেঁচাবে?'

ভয়ার্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাবার চেষ্টা করল মেয়েটা।

'ঠিক আছে,' বলে হাত সরাল রানা, জাপটে ধরে থাকা অন্য হাতটায়ও আস্তে আস্তে ঢিল দিতে শুরু করল। শেষ মুহূর্তে ঘটল বিপত্তি।

'ইয়াল্লা! এটা আবার কে?'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল রায়হান, ওদেরকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলে উঠেছে কথাটা। হঠাৎ ওর কণ্ঠ শুনে একটুর জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিল ও, সেই সুযোগে কনুই চালাল মেয়েটা, একই সঙ্গে ডান পায়ের হিল সজোরে নামিয়ে আনল রানার পায়ের পাতায়।

পাঁজরের নীচে বেমক্কা আঘাত পেয়ে গুঙিয়ে উঠল রানা, পায়ের ব্যথাটা অনুভব করল তার চেয়েও বেশি। নিজের অজান্তেই বন্দিনীর শরীর থেকে হাত আলগা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তরুণী, ছুটল করিডর হয়ে কিচেনের দিকে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রায়হান।

'ধরো ওকে,' দম নেয়ার জন্য খাবি খেতে খেতে বলল রানা। 'পালাতে দিয়ো না!'

হাতে ধরা সমস্ত কাগজপত্র সিঁড়িতে ফেলে দিল রায়হান, রেলিং টপকে লাফ দিয়ে নামল মেঝেতে। করিডর ধরে ছুটতে শুরু করল ও-ও।

পাঁচ

কিচেনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে তরুণী। আগপাছ ভাবল না রায়হান, ওই পথে ঝড়ের বেগে ও-ও বেরুল। কিন্তু একটা ভীত-পলায়নপর মেয়েও যে উপস্থিতবুদ্ধি খাটাতে পারে, সেটা ওর মাথায় ছিল না। দরজা দিয়ে বেরুতেই মেয়েটার বাড়িয়ে দেয়া পায়ে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। জোরে দৌড়াচ্ছিল, ল্যাঙ খাওয়ার পর তাই ব্যালেন্স বলতে কিছু রইল না, জড় বস্তুর মত মুখ থুবড়ে পড়ল পাথর বিছানো ওয়াকওয়েতে, নাকমুখ ঠুকে গেল বিশ্রীভাবে। ওখানেই যাতনার শেষ হলো না, পাশ থেকে পেটে দমাদ্দম লাথি খেয়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো, নিজের অজান্তেই কাতরে উঠল তরুণ হ্যাকার।

ঝিমঝিম করছে মাথা, কষ্ট করে সামান্য একটু তুলতেই মেয়েটাকে দৌড়ে বাড়ির পিছনের ডকের দিকে চলে যেতে দেখল রায়হান। খানিক পর স্পিডবোট স্টার্ট হবার শব্দ শুনে মুখ কালো হয়ে গেল ওর। আনমনে মাথা নাড়ছে, এমন সময় কিচেনে পায়ের শব্দ হলো—রানা এসেছে। www.boighar.com

'এ কী অবস্থা!' দরজায় পৌঁছেই বিস্মিত কণ্ঠে বলল ও।

'মেয়ে তো নয়, জিনিস একটা!' তিক্ত গলায় বলল রায়হান। 'আমাকে ল্যাঙ মেরে ফেলে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে!' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'কোন্‌দিকে?'

boighar.com

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল তরুণ হ্যাকার। 'লেকে... ডক থেকে স্পিডবোটটা নিয়ে গেছে।'

'কী বলছ! তুমি না ঠিক পিছেই ছিলে? ফাঁকি দিল কীভাবে?'

'ওর বুদ্ধি আছে বলতে হবে—পাগলের মত ছোটাছুটি না করে আমার জন্য দরজার বাইরে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিল। বেরুনোর সময় পা ঠেকিয়ে দিয়েছে... তারপর লাথি!'

'ট্রেইনড় চিড়িয়া মনে হচ্ছে?'

'উঁহুঁ, লাথি মারা দেখে তো তেমনটা লাগল না। সাধারণ মানুষের মত এলোপাতাড়ি কিক। নাহ্... মাসুদ ভাই, ট্রেইনিং-ফ্রেইনিং কিছু না, স্রেফ সাহস আর উপস্থিতবুদ্ধির জোরে পার পেয়ে গেছে।'

'সাধারণ, না?' চিন্তিত গলায় বলল রানা। পালা করে চারপাশটা দেখল ও, তারপর তাকাল ডকের দিকে। 'তা হলে লেকের দিকে গেল কেন? সাধারণ মানুষ হলে তো রাস্তার দিকে যাবার কথা... ওর গাড়িটাও রয়েছে ড্রাইভওয়েতে, পালালে ওটা নিয়ে পালাবে।'

'বুদ্ধি ভাল, বললাম না?' রায়হান বলল। 'সামনে যাবার জন্য ওকে যেতে হতো বাড়ির বাইরে দিয়ে একটা পাশ ঘুরে। সময় যা লাগত, তাতে আপনি সামনের দরজা দিয়ে গিয়ে ওকে ইন্টারসেপ্ট করতে পারতেন। এজন্যেই ঝুঁকি নেয়নি, ডক দিয়ে পালিয়েছে।'

'হুম,' রানা মাথা নাড়ল। 'ব্যাপারটা তা-ও ঠিক মিলছে না। এত তাড়াতাড়ি স্পিডবোট স্টার্ট দিয়ে পালাল কেমন করে? আগে থেকে অভ্যস্ত না হলে পারার কথা নয়। বাড়ির লক খোলার কোড ছিল ওর কাছে, হাঁটাচলাও করছিল খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে... তার মানে হয় এ-বাড়িতেই থাকে, নয়তো প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। কে হতে পারে? ড. বুরেনের ফ্যামিলিতে তো এ-বয়সের কোনও মেয়ে আছে বলে রিপোর্ট পাইনি!'

'আমি তো চেহারাই দেখতে পাইনি, তা হলে ওঁর ফাইলে যাদের যাদের ছবি দেখেছি, তাদের কেউ কি না আন্দাজ করা যেত। আপনি দেখেছেন, মাসুদ ভাই?'

'দূর থেকে। কাছে যখন গেলাম, তখন তো পিছন থেকে জাপটে ধরেছিলাম... চেহারা দেখার উপায় ছিল না।'

'তা হলে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?' হতাশ গলায় বলল রায়হান। 'চলুন তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। বাজি ধরে বলতে পারি, ওই মেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ,' রানা একমত হলো। 'কপালটাই মন্দ—মেয়েটার আচার-আচরণে ড. বুরেনের খুব কাছের কেউ বলে মনে হলো, ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে নিশ্চয়ই কোনও তথ্য পাওয়া যেত। কী আর করা, চলো।'

বাড়ির ভিতরে কয়েক পা গিয়েই থমকে গেল ও।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল রায়হান।

'লেক... রায়হান! লেক!!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রানা। 'ওখান থেকে

সহজে কোথাও যেতে পারবে না মেয়েটা, দূর থেকেও দেখা যাবে কোথায় যাচ্ছে, বা ডাঙায় নামছে।'

'তো? ধাওয়া করবেন?'

জবাবটা সরাসরি দিল না রানা, মুখে একটু হাসি ফুটল শুধু। 'আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটাকে এখনও হারাইনি আমরা!'

মাটিতে গা মিশিয়ে ডক থেকে কয়েক গজ দূরে রডোডেনড্রনের একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে তরুণী। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল দুই অনুপ্রবেশকারীকে—দৌড়ে আসছে। ডকের একেবারে কিনারে গিয়ে থামল লোকদুটো, দূরে চলে যাওয়া স্পিডবোটটাকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছে।

বুদ্ধিটা মন্দ হয়নি—বোটে ওঠেইনি সে, বোলার্ড থেকে বাঁধন খোলার পর ওটাকে স্টার্ট দিয়ে সোজা ছেড়ে দিয়েছে লেকের মাঝখানটা লক্ষ্য করে। তারপর নিজে এসে লুকিয়েছে ঝোপের পিছে। ব্যাটারা এখন ওই বোটের পিছনে ছুটে মরুক গে, ওকে আর বাগে পাবে না। আইডিয়াটা যে কাজে লেগেছে, তা ওদের হাবভাব দেখেই বোঝা গেল।

'শিট! চলে গেছে তো অনেক দূর!' অল্পবয়েসী তরুণ বলল। শিট-টুকু বুঝল ও, বাকিটুকু কী ভাষা কে জানে!

'তাতে কী?' ইংরেজিতে বলল তারচেয়ে একটু বড়জন, হাবভাবে তাকেই নেতা মনে হচ্ছে। 'এত সহজে পার পেতে দিচ্ছি না। আশপাশের বেশিরভাগ প্রপার্টিতেই ডক আছে। আরেকটা স্পিডবোট ম্যানেজ করা কঠিন হবে না।'

'যদি ধার দিতে রাজি না হয়?' এবার তরুণটিও কথা বলছে ইংরেজিতে।

'তা হলে জোর করে নেব। চলো!'

উল্টো ঘুরে ডক থেকে ছুটে চলে গেল দুই যুবক। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তরুণীর বুক থেকে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। এবার পুলিশকে খবর দিয়ে বদমাশদুটোকে ধরাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

তাড়াহুড়ো করল না মেয়েটা, পুরো দশ মিনিট অপেক্ষা করল—প্রতিপক্ষের লোকদু'জনকে বাড়ি থেকে দূরে চলে যেতে সময় দিচ্ছে। যখন নিরাপদ বোধ করল, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, তারপর সাবধানে ফিরতে শুরু করল বাড়ির দিকে। খোলা জায়গায় থাকল না ও, লেক থেকে শত্রুরা ওকে দেখে ফেলুক—তা চায় না। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের প্রাচীরকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করে পিছনের দরজায় পৌঁছুল, তারপর ঢুকে পড়ল বাড়িতে।

পা টিপে টিপে হলঘরে পৌঁছুল ও, ভীত দৃষ্টিতে ইতি-উতি তাকাল। যখন মনে হলো ভয়ের কিছু নেই, ধীরে ধীরে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভারটা—পুলিশে ফোন করবে।

পরমুহূর্তেই ভুরু কুঁচকে গেল মেয়েটার, ফোনটায় কোনও ডায়াল টোন নেই। ব্যাপার কী, লাইনটা ডেড হয়ে গেল কীভাবে? সেটের পিছনে লাগানো লাইনটা পরীক্ষা করল সে, বাঁধন ছেঁড়া দড়ির মত হাতে উঠে এল ওটা—দেয়ালের সকেট থেকে জ্যাকটা খুলে রাখা হয়েছে। নিচু হয়ে ওটা আবার

boighar.com

লাগাতে যাবে, এমন সময় একটা কণ্ঠ শুনতে পেয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল।

'খামোকা কষ্ট কোরো না। লাইনটা কানেকশন দিয়ে লাভ নেই, ফোন তো আর করতে পারছ না!'

সোজা হয়ে ঝট্ করে ঘুরল তরুণী—কণ্ঠস্বরটা কার, তা দেখার জন্য। মাত্র দশ গজ দূরে রানাকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠল—সদর দরজার দিকে যাবার পথটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে ও, বেড়ালের মত নিঃশব্দে কখন যে এত কাছে চলে এল, টেরই পায়নি। উল্টো ঘুরতেই কিচেনে যাবার করিডরের সামনে রায়হানকে দেখতে পেল, ওদিকে যাবারও পথ বন্ধ। ফাঁদে পড়ে গেছে বেচারি।

'পালাবার চেষ্টা কোরো না,' বলল রানা। 'আর যা-ই হোক, পর পর দুবার ঘায়েল হবার মত কাঁচা লোক নই আমরা।'

স্পিডবোট নিয়ে পালাবার নাটক করতে গিয়েই ভুল করেছে মেয়েটা। তার মধ্যে যে-ধরনের বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পেয়েছে রানা, তাতে লেকে যাওয়াটা সাজে না। আড়াল না থাকায় খোলা পানিতে অনেক দূর থেকে ট্র্যাক করা যায় যে-কোনও জলযানকে, আরেকটা বোট নিয়ে সহজে ধাওয়া করা যায়, এমনকী পার ধরে সামনে কোথাও গিয়ে ফাঁদ পেতে অপেক্ষাও করা যায়। বুদ্ধিমতী একটা মেয়ের সেটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বোট নিয়ে লেকে না নেমে বরং কাছাকাছি কোথাও থেকে পুলিশে খবর দেয়ার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ। সেটা অনুমান করে রানা নিজেও একটু নাটক করেছে। ডকে গিয়ে ভাব দেখিয়েছে যেন আরেকটা বোট নিয়ে ধাওয়া করতে যাবে। তারপর বাড়ির ভিতরে এসে ঘাপটি মেরে ছিল।

পরিষ্কার আতঙ্ক ফুটল তরুণীর চেহারায়। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'প্... প্লিজ, আমাকে য্... যেতে দিন।' ভয়ের চোটে তোতলাচ্ছে সে। 'আ... আমি কাউকে ক্... কিছু বলব না...' জড়িয়ে যাওয়া কথার মধ্যেও ব্রিটিশ টানটা কানে বাজল রানার।

'থামো!' হালকা ধমক দিল ও। 'আগেই বলেছি, তোমার কোনও ক্ষতি করব না আমরা। শুধু কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'আ... আমি কিচ্ছু জানি না। আমি এ-বাড়ির কেউ নই।'

'তা হলে করছটা কী এখানে? কে তুমি?'

তরুণী জবাব দেয়ার আগেই কথা বলে উঠল রায়হান। 'জাস্ট আ মিনিট!' কাছে এসে ভাল করে দেখল তাকে। বলল, 'তুমি ইভা লরেন্স না?'

অবাক হয়ে গেল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, আপনি জানলেন কী করে?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তুমি একে চেনো?'

মাথা ঝাঁকাল রায়হান। 'হ্যাঁ।' ইভার দিকে তাকাল ও। 'তুমি এখানে কেন, ইভা? ড. ভ্যান বুরেনের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

'আমি ওঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি,' বিস্ময়টা চেপে রেখে জবাব দিল মেয়েটা। 'ম্যাডাম তো বেশ কিছুদিন থেকে নেই, তাই কয়েকদিন পর পর এসে ওঁর বাড়িঘরের অবস্থাটা দেখে যাই। আজও সেজন্যেই এসেছি। কিন্তু আপনারা

কারা? আমার নাম জানলেন কেমন করে?'

রানার দিকে তাকাল রায়হান। বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'বলব? বলে দেব, মাসুদ ভাই?'

'আগে বলো, কে এই মেয়ে? তুমি ওকে চেনো কীভাবে?'

'আমার একরকম সহপাঠী বলতে পারেন। কয়েক বছর আগে প্রিন্সটন ভার্সিটিতে এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট হিসেবে একটা সিমেস্টার আমার সঙ্গে পড়েছে। বেসিক্যালি ও অক্সফোর্ডের ছাত্রী।'

'হুম, আমাদের শত্রুপক্ষ হবার কোনও সম্ভাবনা নেই তো?'

'মনে হয় না, একদম সহজ-সরল টাইপের মেয়ে—ছ'মাস খুব কাছ থেকে দেখেছি তো!'

'খুব কাছ থেকে!'

'ইয়ে... কিছুদিন ডেটিং করেছি আমরা।'

হেসে ফেলল রানা। 'বেশ, বেশ, কম্পিউটার ছাড়া অন্যকিছুর প্রতিও মনোযোগ দাও তা হলে! শুনে খুশি হলাম।'

'না, মানে... জীবনে ওই প্রথম, ওই শেষ, মাসুদ ভাই। মেয়েদের সঙ্গে তো কথাই বলতে পারি না আমি। গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল ও, কেন যেন আমাকে কিছুটা পছন্দ করত, আমি যদিও ততটা আকৃষ্ট ছিলাম না। বিদেশি কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ব না বলে ঠিক করেছিলাম বহুদিন আগে, তাই ব্যাপারটা সিরিয়াস পর্যায়ে গড়াবার আগেই সাবধানে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।'

'ব্রেকআপটা তিক্ত কোনও পরিস্থিতিতে হয়নি তো? মানে... এখন নিজের পরিচয় দিলে ও আবার তোমাকে থাপ্পড়-টাপ্পড় মেরে বসবে না তো?'

'না, না। তা হবে কেন? ও ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার আগ পর্যন্ত ভাল বন্ধুত্ব ছিল আমাদের মধ্যে। কিন্তু আপনি হঠাৎ এসব ব্যাপার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছেন কেন?'

'মেয়েটা ড. বুরেনের সেক্রেটারি। ভদ্রমহিলা কোথায় আছেন, তা জানা থাকতে পারে ওর। এমনিতে তো বলবেই না, ভয় দেখালে দাঁতকপাটি লেগে যেতে পারে। তারচেয়ে...'

'ওহ্ নো! আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না...'

'হ্যাঁ, বৎস,' মুচকি হাসল রানা। 'যা ভাবছ, ঠিক তা-ই করতে বলছি। মেয়েটা তোমার প্রতি দুর্বল—এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে পেট থেকে কথা বের করো।'

'তখন দুর্বল ছিল,' প্রতিবাদ করল রায়হান। 'এখনও আছে, তার গ্যারাণ্টি কী? ওর সঙ্গে গত কয়েক বছরে আমার একটা কথাও হয়নি।'

'সম্পর্কটা ঝালাই করে নাও,' বলল রানা। 'কথা বাড়িয়ো না, যা বলছি—সেটা করো।'

দ্বিধা করতে থাকল তরুণ হ্যাকার। ইভা বলল, 'আপনারা কী নিয়ে কথা বলছেন এত, জানতে পারি?' ভয় কিছুটা কমেছে ওর, তোতলাচ্ছে না আর।

boighar.com

রানার দিকে করুণ চোখে একবার তাকাল রায়হান, তারপর ফিরল মেয়েটার দিকে। আস্তে আস্তে পরচুলা থেকে শুরু করে বাকি সব ছদ্মবেশ খুলে ফেলল। বলল, 'হাই, ইভা! চিনতে পারো?'

চমকে উঠল তরুণী। 'রায়হান রশিদ!'

'যাক, চিনতে পেরেছ তা হলে!' রানাকে দেখাল রায়হান। 'ইনি আমার বস্... বড় ভাইও বলতে পারো—মাসুদ রানা।'

'তুমি... মানে তোমরা এখানে কী করছ?' হতভম্ব ভাবটা কাটাতে পারছে না ইভা। 'চোরের মত এ-বাড়িতে ঢুকেছ কেন?'

'বিরাট লম্বা গল্প... এ-মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু জেনে রাখো—কিছু চুরি করতে আসিনি। এসেছি তোমার বস্... মানে, ড. এলিসা ভ্যান বুরেনের খোঁজে।'

'কিন্তু ম্যাডাম তো অনেকদিন হলো নেই। কোথায় গেছেন, কাউকে বলে যাননি।'

'যোগাযোগও করেন না?'

'নাহ্।'

'তা কী করে হয়? তা হলে ওঁর ব্যবসা চলছে কীভাবে?'

'বোর্ড অভ ডিরেক্টরস্ আছে, ওরাই চালাচ্ছে।'

নিজের ছদ্মবেশ খুলতে খুলতে গলা খাঁকারি দিল রানা, ইশারায় রায়হানকে বোঝাতে চাইছে—সরাসরি কাজের কথায় যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। প্রথমে পুরনো ঘনিষ্ঠতাটুকু জাগিয়ে তুলতে হবে, তারপর আসবে প্রশ্ন করবার পালা। ইঙ্গিতটা ধরতে পারল তরুণ হ্যাকার, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাল ও।

'যাক গে, ওসব বাদ দাও। নিজের কথা বলো। ড. বুরেনের সঙ্গে জুটলে কীভাবে?'

'কীসের সঙ্গে জোটা? কপাল মন্দ, বুঝেছ? ভাল একটা রেজাল্ট করেও এখন ফুট-ফরমাশ খেটে মরছি—পার্সোনাল সেক্রেটারির চাকরি কোনও চাকরি হলো? দেখতে পাচ্ছ না—হাউসমেইডের মত বাড়ি দেখাশোনা করছি?'

'তা হলে এই চাকরি নিয়েছ কেন?'

'সেক্রেটারি হবার জন্য কি আর নিয়েছি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইভা। জানা গেল, ভার্সিটি থেকে বের হবার পর কিছুদিন বেকার বসে ছিল সে, তারপর পত্রিকায় দেখল হল্যাণ্ডের *ক্রিয়েল-টেক*-এর বিজ্ঞাপন—জুনিয়র প্রোগ্রামার খোঁজা হচ্ছে। অ্যাপ্লাই করে যোগ দিল চাকরিতে। কিন্তু প্রথম দু'মাসের ইভ্যালিউয়েশন পিরিয়ডে ভাল পারফর্ম করতে পারেনি ও, প্রোগ্রামার হিসেবে ওকে আর রাখতে চায়নি কোম্পানি। অবশ্য ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়নি একেবারে, ড. বুরেনের সেক্রেটারির পোস্টটা খালি ছিল... তাতে জয়েন করবে কি না, জানতে চাওয়া হয়।

'একেবারে বেকার বসে থাকবার চেয়ে ওটা করা ভাল মনে হয়েছিল,' বলল ইভা। 'ভেবেছি, কিছুদিন কোম্পানিতে কাটাতে পারলে ওরা কীভাবে কী করে, কী ধরনের যোগ্যতা চায়—তা বুঝতে পারব। তাতে পরের বারে আবারও

প্রোগ্রামার হিসেবে যোগ দেয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। আফটার অল, এত নামকরা একটা প্রতিষ্ঠান—এখানে কাজ করতে পারাটাও তো বিরাট একটা ব্যাপার, তাই না?'

'তা তো বটেই,' স্বীকার করল রায়হান।

'সেজন্যেই আর আপত্তি করিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিরাট ভুল করেছি। চার মাসও পুরো হয়নি, অলরেডি দম আটকে আসছে...'

হেসে ফেলল রায়হান। ভয়-টয় সব কাটিয়ে উঠেছে ইভা, সেই আগের মত তার উচ্ছল-চঞ্চল রূপ ফিরে পেয়েছে। সহজ-সরল একটা মেয়ে, যে কোনও প্যাঁচঘোঁচ বোঝে না; সারাক্ষণ বকবক করে।

ওদের একটু একা হবার সুযোগ করে দিল রানা। 'তোমরা গল্প করো, আমি বাইরে থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

ধূমপায়ী রিকার্ডো গোমেজের ছদ্মবেশ নেয়ায় পকেটে লাইটার আর সিগারেট ছিল, বাড়ির পিছনে বেরিয়ে এসে একটা ডানহিল ধরাল রানা। অলস ভঙ্গিতে টান দিতে থাকল... সময় নষ্ট করছে আসলে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে যা হয়, মাথার ভিতরে আবারও পুরনো ভাবনাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

এলিসা ভ্যান বুরেন কোথায় গেছেন? সেক্রেটারি মেয়েটা কি তাঁর সন্ধান জানে? জানলেও ওর কাছ থেকে রায়হান কি সেটা জেনে নিতে পারবে? সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, শেষ ইউনোকে খুঁজে বের করা এবং তাঁর কাছ থেকে অ্যান্টিভাইরাস জোগাড়ের মাধ্যমেই শুধু সামাল দেয়া যেতে পারে আশু বিপর্যয়টাকে।

ধাঁধার মত মনে হচ্ছে একাদশ ইউনোর ব্যাপারটা। কে সে? কোত্থেকে উদয় হলো? কেনই বা ভাইরাস ছড়িয়ে পুরো পৃথিবীর কম্পিউটার ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চায়? এতে তার লাভটা কী? নাকি স্রেফ প্রতিহিংসার বশে এই কাজ করছে? যদি তা-ই হয়, তা হলে কার ওপর রাগ এই রহস্যময় ইউনোর?

যতই ভাবছে, ততই নিত্যনতুন প্রশ্ন উদয় হচ্ছে রানার মনে। জবাব পাওয়া যাচ্ছে না কোনওটার। শুধু এটুকু বুঝতে পারছে ও—নাটের গুরু যে-ই হয়ে থাকুক, সে অত্যন্ত ধুরন্ধর প্রকৃতির। সব দিক গুছিয়ে মাঠে নেমেছে মানুষটা, প্ল্যানিঙে বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি নেই। কৌতূহলী স্বভাবের রায়হান যদি নাসার কম্পিউটারে হ্যাক না করত, তা হলে ভয়ঙ্কর ভাইরাসটার বিষয়ে কেউ কিছুই জানতে পারত না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এক মহাবিপর্যয় ঘটে যেত। অবশ্য ব্যাপারটা জেনেই বা লাভটা কী হয়েছে? আটজন ইউনোকে আগেই নিখুঁতভাবে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে সে, কারও কিচ্ছু করার ছিল না। নবমজন, মানে ড. স্ট্যানলি ডোনেনের ওপর হামলার সময় রানা ওখানে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেনি ও।

মন্টেগো আইস শেলফে দেখা খুনীদের কথা মনে পড়ল রানার—সাধারণ কেউ ছিল না তারা, উঁচু দরের ট্রেইনিং পাওয়া পুরোপুরি প্রফেশনাল লোক। এরা কারও পিছনে লাগলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। এলিসা ভ্যান বুরেনের জন্য দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ও। রহস্যময় ইউনোর কূট-উদ্দেশ্য সফল হবার

boighar.com

পথে এই ভদ্রমহিলাই এখন একমাত্র বাধা, তাঁকে বাঁচতে দেয়া হবে না কিছুতেই। ভাইরাসের হামলার ডেডলাইন প্রায় এসে গেছে, ইতোমধ্যে বেচারি ইউনোর কপালে কিছু ঘটে গেছে কি না, কে জানে। যদি না ঘটে থাকে, তা হলে যেভাবেই হোক ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বের করে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। দায়িত্বটা রানাকেই নিতে হবে, লুকিয়ে থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না ড. বুরেন। স্পেশাল ফোর্সের প্রাক্তন কমাণ্ডো ভাড়া করবার মত অর্থ আর কানেকশন যার আছে, তার পক্ষে নিরীহ একজন বিজ্ঞানীকে খুঁজে বের করা কোনও ব্যাপারই না। মণ্টেগো আইস শেলফের মত একটা জায়গায় ড. স্ট্যানলি ডোনেনের খোঁজে খুনীদের পৌঁছে যাওয়াটা সেটাই প্রমাণ করে।

লেকের পারে একটা গাছের ছায়ায় বসে এসব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রানা, পিছনে পায়ের শব্দে সংবিৎ ফিরল। ঘাড় ফেরাতেই রায়হানকে দেখতে পেল—বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। ইভাও রয়েছে সঙ্গে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

'কী খবর? জানতে পেরেছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, মাসুদ ভাই। সরি।' চেহারায় হতাশ একটা ভাব তরুণ হ্যাকারের। 'ইভা সত্যিই জানে না, ড. বুরেন কোথায় আছেন।'

'মিথ্যে বলছে না তো?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'উঁহুঁ,' রায়হান মাথা নাড়ল। 'আমি যে খারাপ লোক নই, তা ভাল করেই জানে ও। আমাকে বিশ্বাসও করে। জেনেও না জানার ভান করবার কোনও কারণ নেই।'

'কী বলেছ ওকে? কেন ওর বস্‌কে খুঁজছি আমরা, সেটা জানতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই?'

'তা চেয়েছে।'

'সত্যি কথা বলে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, তবে গোপন কোনও কিছু ফাঁস করিনি। শুধু এটুকু বলেছি যে, কম্পিউটার সেক্টরের একটা বড় ক্রাইসিস সমাধানের জন্য ড. বুরেনকে প্রয়োজন। সমস্যাটা মিটে গেলে সব খুলে বলব বলে কথা দিয়েছি। সহজ-সরল মেয়ে... এতেই সন্তুষ্ট হয়েছে।'

'তা হলে আমাদের সাহায্য করছে না কেন? কিছু জানে না বলে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে কেন?'

'মুখে কুলুপ আঁটেনি তো!' রায়হান প্রতিবাদ করল। 'ড. বুরেন বিপদের মধ্যে আছেন শুনে আমাদেরকে সাহায্য করতে বরং উতলা হয়ে আছে। কিন্তু সমস্যা হলো, ভদ্রমহিলার খবর সত্যিই জানে না ও, জানা সম্ভবও নয়। তিনি নাকি কোথাও বেশিদিন থাকছেন না। দু'চারদিন পর পর জায়গা পাল্টে পুরো দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তিনি এমন যাযাবরের মত আচরণ করছেন কেন, সেটা ওর কাছেও একটা রহস্য।'

'স্মার্ট মুভ,' কারণটা ধরতে পেরে মন্তব্য করল রানা। ড. বুরেন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, খুনীরা দুর্ঘটনার আদলে মৃত্যু সাজায়। ওদের ফাঁকি দেয়ার

সবচেয়ে ভাল পন্থা হচ্ছে, নিজের জীবনযাত্রা পাল্টে ফেলা। কোনও রুটিন অনুসরণ না করলে কাউকে দুর্ঘটনার ফাঁদে ফেলা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

'বুঝতেই পারছেন, ইভা আমাদের কাছে কিছু লুকোচ্ছে না,' রায়হান বলল।

'হুঁ। কিন্তু আমাদের কাজে আসার মত কোনও ইনফরমেশনও তো দিতে পারছে না। ড. বুরেন আদৌ বেঁচে আছে কি না, সেটা বলতে পারবে?'

'পেরেছে,' রায়হান হাসল। 'বহাল তবিয়তেই আছেন এখনও তিনি। আজ ভোরেই ফোনে ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে ইভার।'

'ফোনে!'

'ওফ্‌ফো! বলতে ভুলেই গেছি—ডক্টরের সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন আছে—প্রাইভেট একটা নাম্বার, বিশ্বস্ত লোকজন ছাড়া আর কেউ জানে না ওটা। ওটার মাধ্যমেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন।'

'ওঁর সঙ্গে ফোন আছে?' রানার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ,' রায়হান বলল। 'কথা বলবেন?'

'বলতে তো হবেই। দেখি, সামনাসামনি দেখা করবার ব্যাপারে কনভিন্স করতে পারি কি না।' ইভার দিকে এগিয়ে গেল। 'ড. বুরেনের সঙ্গে আমাকে একটু যোগাযোগ করিয়ে দেবে?'

'ফোনে?'

'হ্যাঁ।'

একটু ইতস্তত করল ইভা। বলল, 'রেগে যেতে পারেন... ফোন-টোন করার ব্যাপারে কড়া নিষেধ করে দিয়েছেন তো!'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে রানা বলল, 'গ্যারান্টি দিচ্ছি—আমার সঙ্গে কথা বলার পর রাগ-টাগ সব ভুলে যাবেন উনি। বরং আমাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ দেবেন।'

সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় ব্যয় করল তরুণী সেক্রেটারি, শেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'রায়হানের জন্য খেলামই নাহয় একটু বকা!' জ্যাকেটের ভিতরের পকেট থেকে নিজের মোবাইল বের করল ও, বোতাম চেপে ফোনবুক থেকে নির্দিষ্ট নাম্বারটা স্ক্রিনে এনে ডায়াল করল।

কয়েক বার রিং হতেই ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

'হ্যালো?'

'গুড মর্নিং, ম্যা'ম। আমি ইভা বলছি।'

'কী ব্যাপার? হঠাৎ ফোন করেছ কেন? তোমাকে না বলেছি, একদম ইমার্জেন্সি না হলে আমাকে ফোন করবে না?' একটু রুষ্টই মনে হলো মহিলা-বিজ্ঞানীকে।

'ইয়ে... ব্যাপারটা ইমার্জেন্সিই। দুজন ভদ্রলোক এসেছেন আমার কাছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। বললেন আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন...'

'হোয়াট!' এত জোরে এলিসা চেঁচিয়ে উঠলেন যে, দূরে দাঁড়িয়েও সেটা শুনতে পেল রানা আর রায়হান। সরোষে তিনি বললেন, 'বোকা মেয়ে

boighar.com

কোথাকার! কোথাকার কে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল, আর তুমি তাদের সামনে আমার গোপন নাম্বারে ফোন করলে?'

'একেবারে অপরিচিত কেউ নয়, ম্যা'ম। ওদের একজন আমার পুরনো বন্ধু—ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়...'

'গড ড্যাম ইট! তুমি কাকে বিশ্বাস করো না করো, তাতে আমার কী এসে যায়? আশ্চর্য ব্যাপার, উল্টোপাল্টা কাজ করে এখন আবার সাফাই গাইছ? কত করে বললাম যে, কেউ আমার খোঁজ জানতে চাইলে কিচ্ছু বোলো না...'

ধমক খেয়ে ইভার চেহারা কালো হয়ে গেছে, চোখের কোণে চিকচিক করছে পানি... কেঁদেই ফেলবে বোধহয়। ওর এ-অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ফোনটা নিয়ে নিল রানা। বলল, 'এক্সকিউজ মি, ড. বুরেন। দয়া করে লাইনটা কেটে দেবেন না। আপনার সেক্রেটারির সঙ্গে রাগারাগি না করে আমার কথাগুলো শুনুন প্রথমে। তা হলেই বুঝতে পারবেন, ও অন্যায় করেছে কি না।'

'কে আপনি?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইলেন এলিসা।

'আমার নাম মাসুদ রানা। আপনি হয়তো রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নাম শুনে থাকবেন, আমি ওটার ডিরেক্টর।'

'রানা এজেন্সি?' একটু চিন্তা করলেন যেন এলিসা। 'অ্যামস্টারড্যামে আপনাদের একটা অফিস আছে বোধহয়, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'হুম! তো মি. রানা? হঠাৎ আমাকে আপনার দরকার পড়ল কেন?'

'একটা মাত্র শব্দেই ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাতে পারি আমি।' ইভার কাছ থেকে একটু দূরে সরে এল রানা, যাতে ওর কথা শুনতে না পায়। তারপর বলল, 'ইউনোকোড!'

অপর প্রান্তে চুপ হয়ে গেলেন এলিসা, চমকটা সামলানোর চেষ্টা করছেন। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা একজন মানুষ তাঁর আর ইউনোকোডের মধ্যে সম্পর্কটা আবিষ্কার করল কী করে, সেটাই ভাবছেন বোধহয়। কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটার পর আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'ইউনোকোড সম্পর্কে কী জানেন আপনি, মি. রানা?'

'মোটামুটি সবই, ডক্টর। আপনাদের দশজনের সবার পরিচয় জানি আমি। জানি, তাঁরা খুন হয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে এটাও জানি, বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি।'

'এত কিছু কীভাবে জেনেছেন আপনি?' থমথমে গলায় প্রশ্ন করলেন এলিসা।

'ড. স্ট্যানলি ডোনেন বলেছেন আমাকে।'

'স্ট্যানলি? কোথায় ও?'

'সরি, তিনি আর বেঁচে নেই।'

'না-আ! কী বলছেন এসব!'

'ব্যাপারটা সত্যি, ডক্টর। তাঁকে খুন করা হয়েছে, আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম সেখানে। ওঁর সন্দেহটাই সত্যি ছিল—আসলেই ইউনোদের টার্গেট করে

পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আপনিও নিরাপদ নন।'

'সেটা আমিও জানি, মি. রানা। কিন্তু যেটা আমার মাথায় ঢুকছে না, তা হলো—কেন এভাবে আমাদের খুন করছে কেউ। আমরা বিপজ্জনক নই, কখনও কারও ক্ষতিও করিনি।'

'এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে, ম্যা'ম। পুরো রহস্যটাই আমার জানা।'

'তা হলে খুলে বলুন সব।'

'ফোনে নয়,' রানা বলল। 'আপনার সঙ্গে সামনাসামনি কথা হওয়া প্রয়োজন আমার। তা ছাড়া বললামই তো, আপনি নিরাপদ নন। আমার ওপর যদি আস্থা রাখেন, তা হলে প্রোটেকশনের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারি আমি।' www.boighar.com

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলছেন?'

'দেখা আমিই করব, ম্যা'ম। শুধু ঠিকানাটা দিন।'

'আপনি নিজেই যে খুনীদের কেউ নন, সেটা জানব কেমন করে?'

'এ-মুহূর্তে জানার উপায় নেই, সেটা স্বীকার করি। আপাতত নিজের ইন্সটিঙ্কটের উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আপনাকে। শুধু এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, আমি আপনার ক্ষতি চাই না।'

'হুম,' গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন এলিসা। 'আমার ভালমন্দ নিয়ে আপনি এত চিন্তিত কেন, জানতে পারি?'

'চিন্তাটা করতেই হচ্ছে, ডক্টর,' রানা বলল। 'কারণ, সারা পৃথিবী জুড়ে একটা বিরাট বিপর্যয় দেখা দিতে যাচ্ছে আজ রাতের মধ্যে। একমাত্র আপনিই পারবেন সেটা ঠেকাতে। এ-কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন আমার।'

'বিপর্যয় মানে?'

'দেখা হলেই সব জানতে পারবেন।'

'আপনি দেখি আমাকে কৌতূহলী করে তুললেন,' বললেন এলিসা। তারপর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত জানালেন, 'আপনার কথাবার্তা পছন্দ হয়েছে আমার, মি. রানা। ঠিক আছে, দেখা করতে রাজি আছি আমি আপনার সঙ্গে।'

'দ্যাটস্ গ্রেট!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'কোথায় আসতে হবে?'

'এই মুহূর্তে *ফ্লেভোল্যাণ্ড* প্রভিন্সে আছি আমি, বিডিংহুইযেনের দক্ষিণে... আমাদের পারিবারিক পুরনো ম্যানরে। আপনি কোথায়?'

'আপনার আলস্মিরের বাড়িতে।'

'হুঁ, তা হলে তো পাঁচ ঘণ্টার মত লেগে যাবে পৌঁছুতে।'

'আমি চেষ্টা করব আরও তাড়াতাড়ি আসতে।'

'নো রাশ, আমি অপেক্ষা করব।'

'ম্যানরটার ঠিকানা যদি আরেকটু পরিষ্কার করে বলতেন...'

'মুখে বোঝানো কঠিন। তারচেয়ে ইভা আছে না আপনাদের সঙ্গে, ওকে নিয়ে আসুন। ও সব চেনে।'

boighar.com

'ঠিক আছে, এক্ষুণি রওনা হচ্ছি আমরা।'

'আই শ্যাল বি ওয়েইটিং।'

লাইন কেটে দিলেন বিজ্ঞানী। ইভার দিকে ফিরল া। বলল, 'দেখা করতে রাজি হয়েছেন ড. বুরেন। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কোথায়?'

'ওঁর পুরনো ফ্যামিলি ম্যানরে।'

'সে তো বহু দূরের পথ...'

'কেন, যেতে আপত্তি আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল রায়হান।

'না, না, আপত্তি ঠিক না। আসলে এদিকে অনেক কাজ...'

'কিন্তু তুমি না গেলে আমরা যে পথই চিনতে পারব না,' বলল রানা।

'আচ্ছা, আচ্ছা, যাব।' হাসল ইভা। 'রায়হানের সঙ্গে এতদিন পর দেখা... ওকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে ইচ্ছেও করছে না। কখন যেতে হবে?'

'এখুনি রওনা দিতে চাই,' বলল রানা।

'ঠিক আছে। গাড়ি কি আমারটা নেব, নাকি আপনাদের সঙ্গে আছে?'

'রাস্তাঘাটে নষ্ট করবার মত সময় নেই আমাদের হাতে,' রানা মাথা নাড়ল। 'আরও দ্রুতগামী কিছু দরকার।'

'দ্রুতগামী!'

'ইয়েস, ডিয়ার।' রানা একটু হাসল। 'আশপাশে কোনও ফ্লাইং ক্লাব আছে?'

আটলান্টিক মহাসাগরের বিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে চারশো আঠারোজন যাত্রী নিয়ে অ্যামস্টারড্যামের দিকে ছুটে চলেছে মেক্সিকান এয়ারলাইন্সের বোয়িং-৭৪৭ বিমানটা। আরোহীদের মধ্যে রয়েছে আলফা টিমের তিন সদস্য। মন্টেগো আইস শেলফে কাজ শেষ হবার পর হেলিকপ্টারসহ একটা গ্লেসিয়ারে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছে ওরা, তারপর চলে গিয়েছিল মেক্সিকোর ইউকাটানে। কাগজে কলমে গত একটা সপ্তাহ ওখানেই থাকার কথা ওদের। উপস্থিতিটা প্রমাণ করবার জন্য ওখানে কয়েক ঘণ্টা জনসমক্ষে ঘোরাফেরা করেছে তিনজনে, একটা সেমিনারেও অ্যাটেণ্ড করেছে। তারপর সরকারী এয়ারলাইনে রওনা হয়েছে অ্যামস্টারড্যামের দিকে। আলফা-যিরোর নির্দেশ এরকমই ছিল।

এক্সিকিউটিভ ক্লাসের গদিমোড়া সিটে বসে আয়েশ করে হাতের ড্রিঙ্কে চুমুক দিচ্ছিল আলফা-ওয়ান, দৃষ্টি নিবদ্ধ অন্য হাতে ধরা একটা ম্যাগাজিনে, এমন সময় একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট এগিয়ে এল। মেয়েটার হাতে ইন-ফ্লাইট সার্ভিসের একটা কর্ডলেস ফোন, কাছে এসে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। আপনার একটা কল আছে।'

'থ্যাঙ্কস,' বলে হাত বাড়িয়ে সেটটা নিল কঠিন চেহারার যুবক, ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ওটা ঠেকাল কানে। 'ইয়েস?'

'কোথায় তোমরা?' ওপাশ থেকে আলফা-যিরোর অতি-পরিচিত কণ্ঠ শোনা

গেল।

'বিমানে ফোন করে আবার জানতে চাইছ?' বিদ্রূপ ঝরল আলফা-ওয়ানের কণ্ঠে।

'বাঁকা কথা না বললে তোমার পেটের ভাত হজম হয় না, তাই না?' বিরক্ত শোনাল আলফা-যিরোর গলা। 'কখন পৌঁছুচ্ছ, সেটা বলো।'

হাতঘড়ি দেখল আলফা-ওয়ান। 'শেডিউল অনুসারে আরও আড়াই ঘণ্টা। তবে যে-রকম লক্কর-ঝক্করমার্কা বিমানে উঠেছি, তাতে আরও এক-আধ ঘণ্টা দেরি হলে অবাক হব না।'

'কিন্তু তোমাদেরকে যে এখুনি দরকার!'

'তা হলে লিয়ারজেটটা পাঠিয়ে দাওনি কেন? জার্নিটা আরামদায়কও হত, তাড়াতাড়িও পৌঁছুতে পারতাম।'

'কেন পাঠাইনি, তা তুমি ভাল করেই জানো। প্রাইভেট বিমানের আরোহীদের সবাই আলাদা চোখে দেখে। সাধারণ ফ্লাইটে ট্র্যাভেল করায় লোকের নজর এড়াতে পারছ।'

'সেক্ষেত্রে কখন পৌঁছুব-কখন পৌঁছুব বলে অস্থির হচ্ছ কেন?'

'কারণ, ফাইনাল একটা টার্গেট রয়েছে তোমাদের জন্যে। সময় কম, এখুনি ওখানকার ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'তাড়াটা কীসের?'

'সেটা ওপেন চ্যানেলে বলা যাবে না। শুধু এটুকু জেনে রাখো, যা করার এক্ষুণি করতে হবে।'

'হুম, ভালই সমস্যা দেখছি।'

'কী করা যায়, কোনও পরামর্শ দিতে পারো?'

'কাজটা গারফিল্ডকে দাও না কেন? আজকাল তো অ্যামস্টারড্যামেই অপারেট করছে সে। যোগ্য লোক, আগেও তোমার হয়ে কাজ করেছে।'

'সে তো বহুদিন আগে,' বলল আলফা-যিরো। 'তা ছাড়া আমাকে চেনে না সে, এখন যদি বুঝে ফেলে, আমি কে?'

'বুঝলই বা, প্রয়োজনে পরে ওকে সরিয়ে দিতে পারব।'

'বলছ?' একটু যেন চিন্তা করল আলফা-যিরো। 'ঠিক আছে, ওকেই দিই তা হলে কাজটা।'

অ্যামস্টারড্যামের একটা পাবে বসে মদ গিলছে ঝাঁটাগুফো গারফিল্ড। মাইকেল এবং ডেবি ওয়ালডেনকে খুন করবার পর আঠারো বছর কেটে গেলেও তার গোঁফটা সেই আগের মতই রয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে শুধু বয়সের—বেড়েছে ওটা। দক্ষতায়ও বিন্দুমাত্র মরচে ধরেনি আজও। আইনের চোখ ফাঁকি দেবার জন্য কিছুদিন পর পর কার্যক্ষেত্র বদলায় সে, ঘাঁটি গাড়ে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে। গত ছ'মাস থেকে অ্যামস্টারড্যাম তার প্লে-গ্রাউণ্ড।

ভাইব্রেশনে দেয়া মোবাইলটা বুক পকেটে নাচানাচি করছে দেখে কানে তুলল গারফিল্ড। চাঁছাছোলা ভঙ্গিতে বলল, 'কে এবং কী চাই—জলদি বলে

boighar.com

ফেলো।'

'হ্যালো, গারফিল্ড! তোমার জন্য একটা কাজের সন্ধান আছে আমার কাছে। বিনিময়ে সাধারণ রেটের দ্বিগুণ টাকা পাবে।'

'কে আপনি?' ভুরু কোঁচকাল পোড় খাওয়া খুনী।

'পুরনো মক্কেল,' বলল আলফা-যিরো। 'কটস্ওল্ডের পাহাড়ী এলাকায় বহুদিন আগে আমার একটা কাজ করে দিয়েছিলে তুমি।'

মনে পড়ে গেল গারফিল্ডের। মুচকি হেসে বলল, 'এতদিন পর আবার আমাকে স্মরণ করছেন দেখে খুশি হলাম। বলুন, কী খেদমত করতে পারি?'

'সচরাচর যা করো, তা-ই। সাফ-সুতরোর কাজ।'

'সংখ্যা?'

'মূল টার্গেট একজন, তবে সঙ্গে আরও মানুষ থাকতে পারে। আমি চাই না কোনও সাক্ষী থাকুক।'

'তা আমি রাখিও না,' বলল ঝাঁটাগুঁফো। 'টার্গেটের ডিটেইলস্ কখন দেবেন?'

'ডিটেইলস্ দেবার সময় নেই। আমি অল্প সময়ের জন্য তার লোকেশনটা জানতে পেরেছি, দেরি হলে সরে পড়তে পারে। কাজেই ডিটেইলসের চিন্তা বাদ দিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো, লোকেশনে গিয়ে খতম করে এসো।'

'এক্ষুণি!' গারফিল্ড অবাক।

'কেন, পারবে না?'

একটু ভাবল গারফিল্ড। 'লোক একটু বেশি করে নিতে হবে তো... কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। টাকা কিন্তু ডাবলের বেশি দিতে হবে!'

'ও নিয়ে ভেবো না।'

'ঠিক আছে, টার্গেট সম্পর্কে বলুন।'

সংক্ষেপে বলল আলফা-যিরো। শুনে মাথা ঝাঁকাল ঝাঁটাগুঁফো। 'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'ভ্যান বুরেন'স্ এস্টেট, ফ্লেভোল্যাণ্ডে।'

ছয়

সাড়ে সাতশ' বর্গকিলোমিটার আয়তনের *মার্কারমির* হ্রদের উপরে ছোট্ট একটা পাখির মত দেখাচ্ছে রানাদের চার সিটের সেসনা বিমানটাকে। অমনটা দেখানোই স্বাভাবিক, আকার-আয়তনে এই হ্রদ যে-কোনও উপসাগরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। হল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ড আর ফ্লেভোল্যাণ্ড নামের দ্বীপটার মাঝখানে এর অবস্থান। আয়নার মত স্বচ্ছ ও শান্ত পানিতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা নিয়ে, সেদিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে চায়। তাই একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে সামনে উদয় হওয়া হ্রদের তটরেখা

দৃষ্টিগোচর হলো না ওদের।

বিমানের পাইলটের সিটে রয়েছে রানা, পাশে বসেছে ইভা লরেন্স—গাইড করবার জন্য। রায়হান পিছনে। পর পর চারটে ফ্লাইং ক্লাবে চেষ্টা করতে হয়েছে ওদের, তারপর ভাড়া পাওয়া গেছে এই সেসনাটা। কোনও রকম বুকিং ছাড়া এত দ্রুত যে একটা বিমান পাওয়া গেছে, সেটাই বিরাট সৌভাগ্য। ঘোরাঘুরিতে যেটুকু সময় ব্যয় হয়েছে, সেটাকে অপচয় বলা যায় না কিছুতেই। মার্কারমির হ্রদটাকে আকাশপথে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করায় ওরা এখন সড়কপথের পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা মাত্র চল্লিশ মিনিটে পাড়ি দিতে পারছে।

সামনে তীরের দেখা পেয়ে ইভার কাঁধে টোকা দিল রানা। বলল, 'ফ্লেভোল্যাণ্ডে পৌঁছে গেছি। এবার কোন্‌দিকে যেতে হবে, দেখাও।'

'লেক থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে ভ্যান বুরেন'স্ এস্টেট,' বলল ইভা। 'সোজা পথে আরও দশ মিনিট যান। তারপর একটু চক্কর দিতে হতে পারে।'

'কেন, জায়গাটা তুমি চেনো না?'

'রাস্তা ধরে গেলে চোখ বন্ধ করে যেতে পারব, তবে উপর থেকে সবকিছু অন্যরকম দেখাচ্ছে। কী করব, আকাশে তো পথ চেনার মত কোনও ল্যাণ্ডমার্ক বা সাইনপোস্ট নেই!'

একমত হলো রানা। ব্যাপারটা ওর নিজেরই বোঝা উচিত ছিল। আসলে ড. বুরেনের কাছে পৌঁছুনোর চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে বলে অতটা গভীরভাবে ভাবেনি।

লেকের তীর অতিক্রম করে মাটির উপরে পৌঁছুতেই আলোর উৎপাত কমে গেল, এবার নীচের সবকিছু ঠিকমত দেখা যাচ্ছে। দশ মিনিট প্রয়োজন হলো না, তার আগেই ইভা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মি. রানা! ডানে... ওই যে হাইওয়ে-টা দেখতে পাচ্ছেন? ওটা বিডিংহুইযেন যাবার রাস্তা। ফলো করুন পথটাকে। শহর পর্যন্ত পৌঁছে গেলে বাকিটুকু চিনতে আর অসুবিধে হবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল কলাম ঘোরাল রানা। ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে হাইওয়ের উপরে সমান্তরালভাবে চলে এল সেসনা, এবার সোজাসুজি ছুটছে।

রায়হান বলল, 'যাচ্ছি তো বিমান নিয়ে, এস্টেটে ল্যাণ্ড করতে পারব তো?'

'পারব,' ইভা জবাব দিল। 'ওখানে একটা এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করিয়েছেন এলিসা ম্যাডাম, মাঝে মাঝে ছোট বিমান বা হেলিকপ্টার নিয়ে আসেন কি না! তা ছাড়া ওঁর কালেকশনের বিমানগুলো ওড়ানোর জন্যেও ব্যবহার হয় ওটা।'

'কালেকশন!'

'পুরনো বিমান সংগ্রহের ঝোঁক আছে ম্যাডামের। এয়ারস্ট্রিপের পাশে একটা হ্যাঙ্গারে রাখা হয় ওগুলো।'

'এয়ারক্র্যাফট হোক, বা গাড়ি... অ্যান্টিক হলে প্রচুর সময় দিতে হয় এসবের পিছনে,' রানা বলল। 'রেস্টোরেশন, মেইনটেন্যান্স—এসব অনেক ঝক্কি-ঝামেলার কাজ। ড. বুরেন ম্যানেজ করেন কীভাবে?'

'নিজে তো করেন না কিছু,' বলল ইভা। 'মাইনে বাঁধা লোক আছে, ওরাই সব সামলায়।'

boighar.com

রায়হান বিস্মিত গলায় বলল, 'নিজে যদি কিছু না-ই করবেন, তা হলে এসব কালেকশন রাখার মানেটা কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইভা। 'বড়লোকের খেয়াল... আর কী বলব একে?'

সেসনার সামনে বিডিংহুইযেন শহর উদয় হলো কিছুক্ষণের মধ্যে। এবার দ্বিধা কেটে গেল ইভার, রানাকে গাইড করতে শুরু করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভ্যান বুরেন'স্ এস্টেটে পৌঁছে গেল বিমানটা। দূর থেকে ম্যানরটা দেখতে পেল রানা, পিছনদিকে শ'খানেক গজ দূরে এয়ারস্ট্রিপটা, কিন্তু কোনও হ্যাঙ্গার চোখে পড়ল না। ব্যাপারটা ইভাকে বলতেই আঙুল তুলে স্ট্রিপের একপ্রান্তে ছোট একটা টিলা দেখাল ও। জানাল, ওটার শরীর কেটেই তৈরি করা হয়েছে হ্যাঙ্গারটা।

বৃত্তাকার একটা পথে ঘুরে এসে এয়ারস্ট্রিপের সঙ্গে সেসনাকে অ্যালাইন করল রানা, ধীরে ধীরে ল্যাণ্ড করতে শুরু করল। মাটিতে চাকার স্পর্শ হতেই প্রবল ঝাঁকিতে কাঁপতে শুরু করল ছোট্ট বিমানটা—স্ট্রিপটা খুব একটা ব্যবহার হয় না নিশ্চয়ই, এখানে-সেখানে ঘাস আর মাটির আস্তর পড়ে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে।

হ্যাঙ্গার থেকে ত্রিশ গজ দূরে, এয়ারস্ট্রিপের একপাশে সেসনাকে দাঁড় করাল রানা। সিটবেল্ট খুলতে খুলতে বলল, 'চলো নামি।'

উহ্ আহ্ শব্দ করে বিমান থেকে মাটিতে পা রাখল রায়হান। বলল, 'এত চমৎকার একটা আকাশভ্রমণের ফিনিশিং যে ঘোড়ার পিঠে চড়ার মত ঝাঁকুনিপূর্ণ হবে, কল্পনাও করিনি।'

কথাটা শুনে খিলখিল করে হেসে ফেলল ইভা। রানাও হাসছে। 'ঘোড়ায় চড়ার অভ্যেস থাকলে তো ঝাঁকুনিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। আবার এ-কথা বোলো না যে, মেরু অঞ্চলের সার্ভাইভাল ট্রেইনিঙের মত হর্স-রাইডিং-টাও ফাঁকি দিয়েছ।'

'হুঁহ্, বলে দিয়ে আবার বিপদে পড়ি আর কী!'

'কী বললে?' রানার কপালে ভ্রূকুটি।

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল রায়হান—মনে মনে বলতে চেয়েছিল কথাটা, অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। চেহারাটা করুণ করে বলল, 'সরি, মাসুদ ভাই। ঘোড়ার গায়ের বিটকেল দুর্গন্ধ একদমই সইতে পারি না আমি। ট্রেইনিঙের সময় খুব চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিন দিনের বেশি টিকতে পারলাম না!'

'তা-ই?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না, এ-রোগের মহৌষধ আছে আমার কাছে।'

'কী, মাসুদ ভাই?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল রায়হান।

'দেশে ফিরে ঘোড়ার আস্তাবলে সাতদিন থাকবে তুমি।'

'অ্যাঁ!'

কীসের ট্রেইনিং বা কীসের ঘোড়া নিয়ে কথা হচ্ছে, বুঝতে পারছে না ইভা। কিন্তু গুরু-শিষ্যের কথা বলার ভাবভঙ্গি দেখে ও হাসতে হাসতে প্রায় লুটোপুটি

খাচ্ছে। রাগী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রায়হান বলল, 'হয়েছে, অত হাসতে হবে না। থামো বলছি!'

'ও আসলেই একটা ফাঁকিবাজ, মি. রানা,' বলল ইভা। 'ভার্সিটিতে দেখেছি তো! নিজের পছন্দের বাইরে কোনও কাজই করতে চায় না।'

'কী আশ্চর্য!' গোমড়ামুখে বলল রায়হান। 'তুমি হঠাৎ আমার কুৎসা রটাতে শুরু করলে কেন?'

'কুৎসা কোথায়? সত্যি কথাই তো বলছি।'

'সত্যি কথা, না? তা হলে আমিও তোমার কীর্তি বলে দিই? মাসুদ ভাইকে বলব, কীভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে আমাকে প্রেমপত্র লিখেছিলে তুমি?'

'আমি ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেমপত্র লিখেছি?' রেগে যাবার ভান করল ইভা।

'অবশ্যই!'

'থামো এখন,' হাসি চাপা দিয়ে বলল রানা। 'এসব নিয়ে পরে ঝগড়াঝাঁটি করতে পারবে। আগে ড. বুরেনের সঙ্গে দেখা করে হাতের কাজটা তো সারি!'

দুই সঙ্গীকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও—হ্যাঙ্গারের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া নুড়ি বিছানো পথটা ধরে ম্যানরের দিকে যাচ্ছে। পিছনের দরজায় পৌঁছে টোকা দিল রানা, কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবারও নক করল রানা। এবারও সব চুপচাপ। হাতল ঘুরিয়ে পাল্লাটা খুলতে চাইল, কিন্তু ওটা তালাবদ্ধ।

'ব্যাপারটা কী?' একটু বিস্মিত হয়ে বলল ও। 'কেউ খুলতে আসছে না কেন?'

'শুনতে পায়নি হয়তো,' আন্দাজ করল রায়হান। 'এত বড় বাড়ি, না পাওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'তা-ই হবে,' ইভা একমত হলো। 'চাকরবাকর নেই এখানে। বহু বছর থেকে ম্যানরে কেউ থাকে না কি না, তাই কর্মচারী বলতে একজন মাত্র কেয়ারটেকার রাখা হয়েছে। ও হয়তো কোথাও কাজে ব্যস্ত।'

'তা হলে চলো সামনে দিয়ে গিয়ে চেষ্টা করি,' প্রস্তাব করল রানা। 'ওখানে কলিং বেল আছে তো?'

'তা আছে।'

www.boighar.com

ম্যানরের পাশ ঘুরে সামনের দিকে যেতে শুরু করল তিনজনে। পিছনদিকটা ঘুরে একটা পাশ শেষ করেছে, আর একটু এগিয়ে বাঁক নিলেই সামনে পৌঁছে যাবে... এমন সময় কানে ভেসে এল ইঞ্জিনের ভারী গর্জন।

'গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ না?' ভুরু কুঁচকে বলল রায়হান।

রানাও সেটা বুঝতে পেরেছে, আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শঙ্কা উদয় হলো মনে। কোনও কথা না বলে ছুটতে শুরু করল ও, দেখাদেখি রায়হান আর ইভাও। বাঁক ঘুরে সামনে পৌঁছুতেই ড্রাইভওয়েতে গাড়িটাকে দেখতে পেল ওরা—একটা ঝকঝকে ক্রাইসলার। চলতে শুরু করেছে গাড়িটা, চাকা গড়াচ্ছে রাস্তায়, বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভওয়ে থেকে। পলকের জন্য ড্রাইভিং সিটে বসা মাঝবয়েসী এক মহিলাকে দেখা গেল।

boighar.com

'ওই তো এলিসা ম্যাডাম!' বলে উঠল ইভা।
'আরে, আরে! চলে যাচ্ছেন কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রায়হান।
'ড. বুরেন! থামুন!!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।
ঘাড় ফিরিয়ে চিৎকারের উৎসের দিকে তাকালেন প্রৌঢ়া ইউনো, ছুটে আসতে থাকা মানুষ তিনজনকে দেখে আতঙ্ক ফুটল তাঁর চোখে। পরমুহূর্তে ওঁর হাতে একটা লুগার পিস্তল দেখতে পেল রানা, ওদের দিকে তাক করছেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অস্ত্রটার মুখে মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখতে পেল ও এবার, প্রচণ্ড আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে উঠল চারপাশ—এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছেন বিজ্ঞানী।
জীবন বাঁচানোর জন্য মাটিতে ডাইভ দিল রানা, মাথার উপর দিয়ে ছুটন্ত বুলেটের শিস শুনতে পেল। ইভাকে টান দিয়ে রায়হানও শুয়ে পড়েছে। হতভম্ব গলায় বলল, 'হোয়াট দ্য হেল! ভদ্রমহিলা গুলি করছেন কেন?'
এসব নিয়ে ভাবল না রানা, গুলির শব্দ থামতেই মাথা তুলে দেখে নিল অবস্থাটা। ক্লিপ বোধহয় খালি হয়ে গেছে এলিসার, সোজা হয়ে আবার ড্রাইভিঙে মন দিয়েছেন তিনি। ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে গেছে ক্রাইসলার, ধীরে ধীরে গতি বাড়ছে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ছুটতে শুরু করল গাড়িটার পিছু পিছু।
রিয়ারভিউ মিররে ধাবমান যুবককে দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠলেন বিজ্ঞানী। জানালা দিয়ে মাথা বের করে খালি পিস্তলটা নাচালেন—রানাকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা। তবে ভয় পেল না রানা, ভদ্রমহিলা যে এত দ্রুত অস্ত্রটা রিলোড করতে পারেননি—সেটা বুঝতে পারছে। প্রাণপণে দৌড়াতে থাকল ও, গাড়ি আর নিজের মাঝখানের ব্যবধানটা কমিয়ে আনছে দ্রুত।
নিরুপায় হয়ে স্পিড বাড়াতে শুরু করলেন এলিসা, তবে রানা তার আগেই নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে। এক লাফে ক্রাইসলারের পিছনদিকে উঠে পড়ল ও, সেখান থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ছাতে। যাতে পিছলে পড়ে না যায়, সেজন্যে উপুড় হয়ে ক্রসের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল, দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে ছাতের দু'পাশ।
'থামুন, ড. বুরেন!' চেঁচাল রানা। 'থামুন বলছি।'
কথা শুনলেন না বিজ্ঞানী, পাগল হয়ে গেছেন যেন, চেপে ধরলেন অ্যাকসেলারেটর। হু হু করে গতি বেড়ে গেল গাড়ির, রানার মুখে চাবুক হয়ে ঝাপটা মারছে বাতাস। বন বন করে এবার হুইল ঘোরাতে শুরু করলেন এলিসা—সাপের মত মোচড় দিতে শুরু করল ক্রাইসলার, একবার ডানে, একবার বামে—গা ঝাড়া দেয়ার ভঙ্গিতে অনাহূত আরোহীকে ফেলে দিতে চাইছে। প্রমাদ গুণল রানা, শরীরের টানে মুঠিতে শক্তি পাচ্ছে না, দুই পা এলোমেলোভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে ছাতের উপর থেকে—পড়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে। তারচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে ড. বুরেনকে নিয়ে—যেভাবে উন্মাদের মত ড্রাইভ করছেন, দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।
'ফর গডস্ সেক! স্পিড কমান, ম্যা'ম। আমার কথা শুনুন!'
না শোনার পণ করেছেন যেন এলিসা, দাঁতে দাঁত পিষে বাম দিকে প্রচণ্ড

বেগে ঘোরালেন গাড়ি, পরমুহূর্তে আবার ডানে। এবার আর টিকতে পারল না রানা, ছাতের কিনার থেকে হাত ছুটে গেল, উড়ে গিয়ে এস্টেটের রাস্তার পাশের ঘেসো জমিতে আছড়ে পড়ল ও। পতনের ধাক্কায় বুক থেকে বেরিয়ে গেল সব বাতাস।

বিজ্ঞানী নিজেও ব্যালেন্স হারিয়েছেন একই সঙ্গে। পাগলা ইঞ্জিনকে বশে রাখতে পারলেন না, রাস্তার অন্যপাশে নেমে গেল ক্রাইসলার, সোজা ছুটে যাচ্ছে একসারি ওক গাছের দিকে।

প্রচণ্ড শব্দে সংঘর্ষ ঘটল। মাথা তুলে গাড়িটাকে মোটা একটা গাছের গায়ে মুখ গুঁজে থাকতে দেখল রানা, সামনের দিকটা তুবড়ে গেছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওখান থেকে—আগুন ধরে গেছে বোধহয়। শারীরিক কষ্টটাকে অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াল রানা। দৌড়াতে শুরু করল দুর্ঘটনাস্থলের দিকে, প্রৌঢ়া বিজ্ঞানীকে তাড়াতাড়ি বের করে আনতে হবে, ফুয়েল লাইনে আগুন পৌঁছে গেলে সর্বনাশ!

ড্রাইভিং সিটে এলিয়ে পড়ে আছেন এলিসা ভ্যান বুরেন, কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড়ের পাশে আঙুল রাখল ও। নাহ্, নিয়মিতই হার্টবিট হচ্ছে—মারা যাননি ভদ্রমহিলা। তোবড়ানো চেসিসের চাপে দরজাটা আটকে গেছে, জানালা দিয়ে অজ্ঞান দেহটা বের করে আনল রানা। এবার চোখে পড়ল কপালের কালসিটে দাগটা—এয়ারব্যাগ ঠিকমত ডেপ্লয় হয়নি ক্রাইসলারের, স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে মাথা ঠুকে যাওয়ায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন বেচারি।

একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো রায়হান আর ইভা।

'হা যিশু!' ক্র্যাশ করা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল ইভা। 'ম্যাডামের কিছু হয়নি তো?'

'হালকা আঘাত,' বলল রানা। 'হাসপাতালে নেবার মত কিছু নয়।'

'তা হলে চলুন ম্যানরে নিয়ে যাই, ওখানে ফার্স্ট এইডের সরঞ্জাম আছে।'

'বাড়িটাতে ঢোকা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না,' রানা বলল। 'এলিসা ওভাবে পালাচ্ছিলেন কেন? খুনীদের ধাওয়া খেয়ে নয়তো! রায়হান, তোমরা তো পিছনে ছিলে... কাউকে দেখতে পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল তরুণ হ্যাকার। 'না, দেখিনি। কোনও শব্দও কানে আসেনি।'

'খুনী!' চোখ কপালে তুলল ইভা। 'এলিসা ম্যাডামকে আবার খুন করতে চাইবে কে?'

'সেসব পরে বলব,' রানা বলল। 'তোমরা দু'জন এখন এক কাজ করো, দৌড়ে ম্যানরে চলে যাও। ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি না, খুঁজে দেখো। ড. বুরেনকে আমি নিয়ে আসছি, বাড়িতে ঢুকে কোনও ফাঁদে পড়তে চাই না।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' ইভা বলল। 'ফাঁদ মানে? কীসের ফাঁদ?'

ওর হাত ধরে টান দিল রায়হান। 'সময়মত সবকিছু আমি ভেঙে বলব তোমাকে। এখন চলো তো!'

চলে গেল তরুণ-তরুণী। এলিসার অজ্ঞান দেহটা কাঁধে তুলে নিল রানা—খুব একটা ভারী নন বিজ্ঞানী। ছিপছিপে শরীর, স্বাস্থ্যের নিয়মিত যত্ন

boighar.com

নেন নিশ্চয়ই। আলতো করে তাঁকে ধরে রাখল ও, তারপর ছোট ছোট কদমে হাঁটতে শুরু করল ম্যানরের দিকে।

দু'ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরল এলিসা ভ্যান বুরেনের।

ম্যানরের দোতলায়, মাস্টার বেডরুমের বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে; দেয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রুষা। বাড়ির আনাচে-কানাচে, এমনকী বাইরে—আশপাশের বেশ কিছুটা জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে রানারা, কিন্তু কোনও অনুপ্রবেশকারীর দেখা পায়নি, কোনও ধরনের হামলারও চিহ্ন নেই কোথাও। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ম্যানরের কেয়ারটেকার লোকটাও নেই বাড়িতে। তা হলে কেন এত ভয় পেলেন ভদ্রমহিলা, কেন পাগলের মত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, কেনই বা রানাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন—এসব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে তাঁর মুখেই সব শোনার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু করার কিছুই নেই। ইভা অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিল, স্মেলিং সল্ট শুঁকিয়ে বা বিকল্প কোনও কায়দায় বিজ্ঞানীকে দ্রুত জাগিয়ে তুলবার একটা চেষ্টা করবে কি না, রানা রাজি হয়নি। ভয় পাবার পাশাপাশি অ্যাকসিডেন্টের ফলে শক্ পেয়েছেন তিনি, জোর করে জ্ঞান ফেরালে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাড়াহুড়োর ফল কখনও ভাল হয় না, তারচেয়ে শরীরকে তার নিজস্ব নিয়মে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দেয়াটাই মঙ্গল।

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন এলিসা, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন বুঝতে পারছেন না কিছু। কথা বললেন না, এদিক-সেদিক তাকাবার চেষ্টা করলেন শুধু।

'কেমন বোধ করছেন?' একটু ঝুঁকে আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

জবাব দিলেন না প্রৌঢ়া বিজ্ঞানী, এক হাত তুলে কপালটা পরখ করলেন। ব্যাণ্ডেজটা হাতড়ে দেখতে দেখতে দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল তাঁর; বোঝা গেল, সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

'অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল আপনার, মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন এলিসা। তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে দেখলেন একটু, পরক্ষণেই ভয়ার্ত একটা ভাব ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আ... আপনি আমাকে ধাওয়া করছিলেন...'

'রিল্যাক্স!' আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি মাসুদ রানা, আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম। ফোনে কথা হয়েছিল, ভুলে যাননি নিশ্চয়ই?'

'আপনার তো পাঁচ ঘণ্টা পরে আসবার কথা, আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছুলেন কী করে?'

'বিমানে এসেছি আমরা।'

'আমরা!'

ইঙ্গিতে দুই সঙ্গীকে দেখাল রানা। 'রায়হান রশিদ... আর ইভাকে তো

আপনি চেনেনই।'

'ও...ওটা আপনাদের বিমান ছিল?' বিস্মিত হয়ে বললেন এলিসা। 'আমি তো ওটার শব্দ শুনেই কেটে পড়তে যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম, বোধহয় আমাকে মারতে আসছে কেউ।'

'সে-কারণেই আমাদের দিকে গুলি করেছিলেন? পিস্তল পেয়েছেন কোথায়?'

'আত্মরক্ষার জন্য একটা রাখি আজকাল।' বিব্রত একটা ভাব ফুটল এলিসার চেহারায়। 'সরি, খুব ভুল হয়ে গেছে। আসলে আপনাকে আগে কখনও দেখিনি কি না! চিনব কী করে, বলুন?'

'আপনার সেক্রেটারি তো ছিল!' বলল রায়হান। 'ওকে দেখেও বুঝতে পারেননি, আমরা কারা?'

'ভয়ে মাথা কাজ করছিল না, ওকে লক্ষই করিনি,' বললেন এলিসা। 'দুঃখিত, আপনারা কেউ আহত হননি তো?'

'তা হইনি,' রানা বলল। 'পাগলামি করতে গিয়ে উল্টো আহত হয়েছেন তো আপনি! কেমন বোধ করছেন এখন... কোনও অসুবিধে?'

'মাথাটা ব্যথা করছে খুব...'

'আমি এক্ষুণি কফি নিয়ে আসছি।' বলে বেরিয়ে গেল ইভা।

'আপনার কেয়ারটেকারকে কোথাও খুঁজে পাইনি আমরা,' রায়হান বলল। 'সে কোথায়?'

'মা অসুস্থ, তাই গত দু'মাস থেকে ছুটিতে আছে,' বললেন এলিসা। 'এলাকায় সবাই জানে, ম্যানর এখন খালি, কেউ নেই। সেজন্যেই এখানে লুকোতে এসেছিলাম, মনে হচ্ছিল চুপচাপ কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেয়া যাবে। এস্টেটে এমনিতেই লোকজনের আনাগোনা কম, বাড়ি খালি হলে তো আসবারই কথা নয় কারও।'

'চোর-ছ্যাঁচোড় আসতে পারে না?'

'এ-বাড়িতে দামি জিনিসপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। চোরেরা জানে সে-কথা।'

'কিন্তু আপনার হ্যাঙ্গারে অ্যান্টিক বিমান আছে বলে শুনলাম, সেগুলো নিশ্চয়ই দামি?'

'বিমান চুরি করা কি চাট্টিখানি কথা?' একটু হাসলেন বিজ্ঞানী। 'নেবে কীভাবে, লুকাবে কোথায়? ধরা পড়ে যাবে না? তা ছাড়া হ্যাঙ্গারে অটোমেটিক অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। কালেকশনটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'আচ্ছা!' বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল রায়হান।

'ডক্টর,' কাজের কথায় এল রানা, 'যে-সমস্যাটার ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি, সেটা খুলে বলতে পারি এখন?'

ওর কথা যেন শুনতেই পাচ্ছেন না এলিসা, ডান হাতের কবজিতে বাঁধা হাতঘড়িটাতে টোকা দিচ্ছেন—অ্যাকসিডেন্টের সময় ঝাঁকি খেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ওটা। চালু হচ্ছে না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন ক'টা বাজে?'

নিজের ঘড়ি দেখল রায়হান। 'দুপুর হয়ে গেছে। একটা বাজে।'

boighar.com

কথাটা শুনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন যেন বিজ্ঞানী।

মনে মনে হিসেব করে রানা বলল, 'তার মানে আর মাত্র তেরো ঘণ্টা বাকি ডেডলাইনের।'

'ডেডলাইন!' অবাক হলেন এলিসা।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' রানা বলল। 'তেরো ঘণ্টা পর ভয়ঙ্কর একটা কম্পিউটার-ভাইরাস আঘাত হানতে যাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। কম্পিউটার-জগৎকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে ওটা।'

'সেটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?'

'ওটা ইউনোকোডে তৈরি, ম্যা'ম। আর আমাদের ধারণা, ভাইরাসটাকে প্রতিরোধ করবার মত কেউ যাতে বেঁচে না থাকে, সেটা নিশ্চিত করতেই ইউনোদের খুন করা হচ্ছে।'

'কী বলছেন!'

'ব্যাপারটা সত্যি। ভাইরাসটার কপি রয়েছে আমাদের কাছে।'

'এ... এটা অবিশ্বাস্য। ইউনোকোডের ভাইরাস তো একজন ইউনো ছাড়া আর কারও পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়!'

'ঠিক।'

তীক্ষ্ণ চোখে রানা আর রায়হানের দিকে তাকালেন এলিসা, চেহারায় কী যেন খুঁজছেন। থমথমে গলায় বললেন, 'আমার বন্ধুরা সবাই মারা গেছে—ইউনোদের মধ্যে একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। আপনাদের কি ধারণা, ভাইরাসটা আমার বানানো? সে-কারণেই এসেছেন এখানে?'

'তা ভাবছি না আমরা, ম্যা'ম,' রায়হান মাথা নাড়ল। 'ড. ডোনেন আমাদের বলেছেন, আপনাদের বাইরে একাদশ একজন ইউনো আছে। এসব সম্ভবত তারই কীর্তি।'

'ওটা স্ট্যানলির কল্পনাবিলাস, মি. রশিদ—আমিও শুনেছি। এগারো নম্বর ইউনো বলে কেউ নেই... থাকতে পারে না।'

'তা হলে এই ভাইরাসটা এল কোত্থেকে, বলতে পারেন?' একটা সিডি তুলে দেখাল তরুণ হ্যাকার। ওর রেখে আসা ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে ভাইরাসটার একটা কপি রানা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস শাখাপ্রধান নাফিজ ইমতিয়াজ পাঠিয়ে দিয়েছিল মরক্কোতে, অ্যামস্টারড্যামে আসবার পথে ওটা নিয়ে এসেছে রায়হান।

ওর প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়লেন এলিসা। বললেন, 'তা আমি বলতে পারব না। ওটা আসলে ইউনোকোডে তৈরি ভাইরাস কি না, সেটা আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমাকে।'

'শুধু পরীক্ষা করলেই হবে না, ডক্টর,' বলল রানা। 'ওটার একটা অ্যান্টিডোটও তৈরি করতে হবে আপনাকে... মানে একটা অ্যান্টিভাইরাস। সেজন্যেই আপনার কাছে এসেছি আমরা। পারবেন?'

'যদি ইউনোকোডেরই ব্যাপার হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই পারব,' জোর দিয়ে বললেন এলিসা। 'তবে এখানে বসে কিচ্ছু করার নেই আমার, আলস্মিরে

যেতে হবে... আমার বাড়িতে। ইউনোকোডে কাজ করবার মত আমার সমস্ত রিসোর্স রয়ে গেছে ওখানে।'

'অ্যান্টিভাইরাসটা তৈরি করতে কতটা সময় লাগবে?'

'ভাইরাসটা না দেখা পর্যন্ত বলি কী করে? কয়েক ঘণ্টা তো বটেই... কয়েক দিনও লেগে যেতে পারে।'

'তা হলে তো এক্ষুণি কাজটা শুরু করে দেয়া দরকার,' রানা বলল।

'আমিও তা-ই বলছি,' সায় দিলেন এলিসা। বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। 'আপনাদের সঙ্গে বিমান আছে না? চলুন... আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা আর রায়হান। ট্রে হাতে এই সময় দরজায় উদয় হলো ইভা—কফি নিয়ে এসেছে।

'ম্যাডাম, কফি।'

'রেখে দাও,' বললেন এলিসা। 'আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, এখুনি রওনা দিতে হবে।'

'খেয়েই নিন,' রানা বলল। 'মাথাব্যথাটা কেটে যাবে, সুস্থ বোধ করবেন। দেরি তো যা হবার এমনিতেও হয়েছে, আর দু-চার মিনিটে কিচ্ছু হবে না।'

অসহায়ভাবে ওর দিকে একবার তাকালেন প্রৌঢ়া বিজ্ঞানী, তারপর তুলে নিলেন কাপটা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খালি করলেন ওটা, চেহারা দেখেই বোঝা গেল—তাড়াহুড়োয় জিভ পুড়িয়ে ফেলেছেন।

'চলুন, চলুন, আর দেরি করাটা ঠিক হবে না,' খালি কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন এলিসা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল চারজনে। পিছনের নুড়ি বিছানো ওয়াকওয়ে ধরে দ্রুত হাঁটছে এয়ারস্ট্রিপের দিকে—সামনে রানা, ওর পিছনে ড. বুরেন, ইভা আর রায়হান।

হ্যাঙ্গারের দরজার সামনে পৌঁছেছে মাত্র, এমন সময় রোটরের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। চোখের পলকে একটা বেল হেলিকপ্টার উদয় হলো, মাথার উপরে চক্কর দিচ্ছে ওটা। থমকে দাঁড়াল রানারা, আকাশযানটার উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করছে। উড়ে গিয়ে ল্যাণ্ড করা সেসনাটার উপরে গিয়ে স্থির হলো হেলিকপ্টার, ওটা থেকে কিছু একটা ফেলা হলো নীচে। গড়িয়ে জিনিসটা চলে গেল বিমানের তলায়। জ্বলতে থাকা ফিউযটা দেখেই ওটা কী বুঝে ফেলল রানা।

ডিনামাইট!

'গেট ব্যাক!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'গেট ব্যাক এভরিবডি!'

পরমুহূর্তেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল—চার জোড়া বিস্ফারিত চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ছোট্ট সেসনাটা।

boighar.com

সাত

শকওয়েভের ধাক্কায় মাটিতে আছড়ে পড়ল রানা আর ওর সঙ্গীরা—মাথা ভোঁ ভোঁ করছে শব্দের প্রচণ্ডতায়।

কোনওমতে নিজেদের সামলে মাথা তুলল চারজনে। ব্যস্ত চোখে চারপাশটা জরিপ করল রানা, আড়াল খুঁজছে।

'হায়, হায়!' বলে উঠল ইভা। 'আমাদের বিমান... ওটা... ওটা...' ঘটনার আকস্মিকতায় ভাষা হারিয়েছে ও।

'গেছে... সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকাটা চিরতরে গেছে!' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কৌতুক করল রায়হান।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বিস্ফোরণে নিজেদের যেন কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্য একটু দূরে সরে গেছে হেলিকপ্টারটা, ফিরে আসবে এখুনি, তার আগেই গা-ঢাকা দিতে হবে।

'ড. বুরেন! আমাদের কাভার নিতে হবে। হ্যাঙ্গারে ঢোকা যাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রৌঢ়া ইউনো, ছুটতে শুরু করলেন হ্যাঙ্গারের বিশাল প্রবেশপথের দিকে, পিছু পিছু বাকিরা। ব্লাস্ট ডোরের পাশে একটা ছোট প্যানেল—সেটার সামনে পৌঁছে তাড়াতাড়ি অ্যাকসেস কোড পাঞ্চ করতে শুরু করলেন বিজ্ঞানী।

পিছনে গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনে মাথা ঘোরাল রানা, আঁতকে উঠল হেলিকপ্টারটাকে ছুটে আসতে দেখে। দুপাশের দরজা খোলা ওটার, মেশিনগান তাক করে সেখানে বসে আছে দুজন, রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছুলেই গুলি করতে শুরু করবে।

'ফর গডস্ সেক, ডক্টর!' তাড়া দিল রানা। 'তাড়াতাড়ি করুন।'

দু'হাত রীতিমত কাঁপছে এলিসার, প্যানেলের বাটনগুলো টিপতে পারছেন না ঠিকমত, একটার জায়গায় অন্যটায় চাপ পড়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা লক্ষ করে তাঁকে সরিয়ে আনল রায়হান। বলল, 'আমি দেখছি ব্যাপারটা। কোডটা বলুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করলেন বিজ্ঞানী, 'সিক্স... ওয়ান... টু... ওয়ান... ফোর... ওয়ান... টু... ফাইভ... যিরো... এইট!'

'ক্ল্যাং' জাতীয় একটা সঙ্কেত শুনে বোঝা গেল, নিষ্ক্রিয় হয়েছে সিকিউরিটি সিস্টেম। এবার হিস হিস শব্দে খুলতে শুরু করল হ্যাঙ্গারের যন্ত্রচালিত পাল্লা, দুপাশে সরে যাচ্ছে। রোটরের শব্দকে ছাপিয়ে পিছনে গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ হলো, হেলিকপ্টার থেকে ফায়ার করছে দুর্বৃত্তরা, শিকারকে হাতছাড়া করতে চায় না।

আর দেরি করল না রানা, দরজা যতটুকু ফাঁকা হয়েছে, তার মধ্য দিয়েই ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল তিন সঙ্গীকে; নিজেও সবার শেষে ডাইভ দিয়ে ঢুকে

পড়ল হ্যাঙ্গারে। ওর পিছু পিছু দুই সারিতে ছুটে এল বুলেটবৃষ্টি, ধুলো ওড়াচ্ছে, শেষ কয়েকটা ঠক্ ঠক্ করে বিঁধল হ্যাঙ্গারের দরজায়।

'বন্ধ করো!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'বন্ধ করো দরজা!'

একছুটে ভিতরদিককার প্যানেলের দিকে ছুটে গেল রায়হান, *ক্লোজ* বাটন টিপে দিল। আবার বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল ব্লাস্ট ডোর। শেষ মুহূর্তে ফাঁকা দিয়ে তাকাল রানা, হেলিকপ্টারটাকে ল্যাণ্ড করতে দেখল, সশস্ত্র ছ'জন খুনী নেমে আসছে ওটা থেকে। এরপরই আটকে গেল পাল্লা, নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে গেল হ্যাঙ্গারের ভিতরটা। খুটখাট শব্দ শোনা গেল, প্যানেলের পাশের একটা সুইচ টিপে আলো জ্বালল রায়হান।

'ক্... কে ওরা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ইভা। 'কেন আমাদের উপর হামলা করছে?'

জবাব দিতে পারল না রানা, এলিসা এগিয়ে এসেছেন ওর দিকে, থর থর করে কাঁপছেন প্রৌঢ়া ইউনো। ভীত গলায় বললেন, 'ওরা এসে পড়েছে, মি. রানা। এবার আমার পালা!'

'এত ভয় পাচ্ছেন কেন?' হালকা গলায় বলল রানা। 'আমরা আছি না?'

হ্যাঙ্গারের দরজায় ধাতব শব্দে কেঁপে উঠলেন এলিসা। ওপাশ থেকে গুলি করা হচ্ছে—পাল্লাটা কতটা শক্ত সেটাই পরীক্ষা করা হচ্ছে বোধহয়।

'কী-ই বা করবেন আপনারা!' আতঙ্কিত স্বরে বললেন বিজ্ঞানী। 'ওরা প্রফেশনাল খুনী, নিশ্চয়ই পুরো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। ভিতরে ঢুকে নির্বিচারে খুন করবে আমাদের।'

'চুপচাপ খুন হতে আপত্তি আছে আমার,' শান্ত গলায় বলল রানা, যদিও পরিস্থিতির প্রতিকূলতা ভাল করেই বুঝতে পারছে। প্রতিপক্ষ নিঃসন্দেহে সংখ্যায় ভারি, সেই সঙ্গে অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত। অথচ ওর আর রায়হানের কাছে শুধু দুটো অটোমেটিক পিস্তল ছাড়া আর কিছু নেই, অ্যামিউনিশনের পরিমাণও সীমিত। করণীয় ঠিক করতে চারপাশটা দেখল ও। শত্রুরা যাতে এখানে ঢুকতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে প্রথমে। তাই জিজ্ঞেস করল, 'ব্লাস্ট ডোর ছাড়া হ্যাঙ্গারে ঢোকার আর কোনও পথ আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন এলিসা। 'পিছনে... সার্ভিস এণ্ট্র্যান্স।'

'রায়হান...'

'আমি এক্ষুণি বন্ধ করছি ওটা।' বলে ছুটে চলে গেল তরুণ হ্যাকার।

'দরজা আটকে কোনও লাভ নেই, মি. রানা,' ইভা বলল। 'লোকগুলোর কাছে বোমা আছে, দরজা উড়িয়ে দিতে পারবে।'

শ্রাগ করল রানা, ব্যাপারটা ও-ও জানে। সামনের ব্লাস্ট ডোরের পাল্লা অবশ্য অনেক পুরু, ওটা সহজে হার মানবে না; কিন্তু সার্ভিস এণ্ট্র্যান্সে নিশ্চয়ই সাধারণ দরজাই ব্যবহার করা হয়েছে। ওটা সহজেই ভেঙে ফেলতে পারবে দুর্বৃত্তরা।

রায়হান ফিরে এসে ওর আশঙ্কাটাই সত্যি বলে প্রমাণ করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছে এসেছি, ইলেকট্রনিক লকও আছে—কিন্তু

boighar.com

জিনিসটা তেমন জুতসই নয়, মাসুদ ভাই। গুলি করেই তালা-ছিটকিনি সব ভেঙে ফেলা যাবে... ওদের কাছে তো ডিনামাইটও আছে।'

'সঙ্গে খুব বেশি ডিনামাইট আছে বলে মনে হয় না... এ-ধরনের ব্লাস্ট ডোর ভাঙতে হবে, ওরা সেটা নিশ্চয়ই আগে থেকে জানত না?' রানা মাথা নাড়ল। 'ওদের স্টক ওই সামনের দরজাতেই খরচ হয়ে যাবে।'

'সামনে ব্যবহার করবে কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ইভা। 'রায়হান কী বলল, শোনেননি? পিছনের দরজাটা দুর্বল, বোমা ফাটাতে হলে ওখানে ফাটাবে।'

'না,' রানা বলল। 'ওটা ছোট দরজা, একসঙ্গে একজন-দু'জনের বেশি ঢুকতে পারবে না ওরা। আমরা সহজেই গুলি করে ফেলে দিতে পারব। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে দ্বিমুখী আক্রমণ চালাতে হয়, তাই দুপাশ দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করবে ওরা। সামনে দিয়ে ঢুকতে হলে ওখানে ডিনামাইট ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। পিছনের দরজাটা ওরা সম্ভবত গুলি করেই ভাঙতে চেষ্টা করবে।'

'তা হলে?'

'সামনে আপাতত কিছু করার নেই, তা ছাড়া পাল্লাদুটো ভাঙতেও সময় নেবে। চলো, পিছনে ওদের কাজ বাড়াই।'

সঙ্গীদের নিয়ে সার্ভিস ডোরের দিকে ছুটল রানা। আশপাশে যত টুল চেস্ট, বেঞ্চ আর স্টোরেজ লকার পেল, সব নিয়ে ঠেস দিল দরজাটার গায়ে। ব্যারিকেডটা আক্রমণকারীদের কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ঠেকিয়ে রাখবে। কাজ শেষে হ্যাঙ্গারের মাঝখানে ফিরে এল সবাই।

এবার ভিতরে রাখা বিমানগুলোর উপর নজর দিল রানা—সব মিলিয়ে পাঁচটা আকাশযান আছে। দুটো ফ্লোট প্লেন, একটা পুরনো আমলের গ্লাইডার, একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইঞ্জিনের বাইপ্লেন, আর সব শেষ বিমানটা অতিকায়... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের একটা *বি-২৫ মিচেল* বম্বার—রেস্টোরেশনের জাদুতে নতুনের মত ঝকঝক করছে।

'ওটা আমার বাবার পুরনো বিমান,' রানার আগ্রহী দৃষ্টি লক্ষ করে বললেন এলিসা। 'যুদ্ধের সময় এটা নিয়েই অনেক অভিযানে গেছেন তিনি। কয়েক বছর আগে বাতিল অবস্থায় কিনে নিয়েছি আমি।'

'রেস্টোরেশন করা হয়েছে দেখছি,' রানা বলল। 'এটা ওড়ানো যায়?'

'যন্ত্রপাতি সবই মেরামত করা হয়েছে,' এলিসা বললেন, 'মাসদুয়েক আগে ইঞ্জিন টেস্ট করিয়েছিলাম, তাতেও কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি... তবে উড়বে কি না, তা বলতে পারছি না। ওটা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল রায়হান। বলল, 'মতলবটা কী আঁটছেন, বলুন তো, মাসুদ ভাই? আপনি নিশ্চয়ই এটা নিয়ে...'

'ঠিকই আন্দাজ করেছ,' রানা সায় দিল। 'জনবল বা ফায়ারপাওয়ার—কোনওটাতেই পেরে উঠব না আমরা। তারচেয়ে কেটে পড়বার চেষ্টা করাটাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়?'

'তাই বলে এই মান্ধাতার আমলের বিমানে? টেকঅফই হয়তো করবে না ওটা!'

'শুরুতেই হতাশ হও কেন? যন্ত্রপাতিকে এত অবহেলা করা উচিত নয়—ফোক্সভাগেন গাড়ি দেখোনি, সেই কোন্ আমলে তৈরি হয়েছিল, অথচ আজও চলে।'

'এটা কোনও ফোক্সভাগেন গাড়ি নয়, মাসুদ ভাই। কমপক্ষে তেষট্টি বছরের পুরনো যুদ্ধবিমান...'

'রিস্টোর করা,' যোগ করল রানা। 'ইঞ্জিনে সমস্যা নেই যখন, উড়তে পারবে না কেন?'

'উড়তে গেলে শুধু ইঞ্জিন নয়, ডানা-ফ্ল্যাপ-অ্যালেরন... অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। সেগুলো ঠিক আছে কি না, বুঝব কীভাবে?'

'নিশ্চিত হবার উপায় তো একটাই, তাই না?'

রায়হানকে নিয়ে বি-২৫-এর দিকে এগিয়ে গেল রানা, চারপাশ থেকে ফিউজলাজটা ঘুরে-ফিরে দেখল।

'স্ট্রাকচারাল কোনও সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না,' মন্তব্য করল ও, তাকাল সঙ্গীর দিকে। 'তোমার কী মনে হয়?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রায়হান। 'সব অক্ষতই মনে হচ্ছে। কিন্তু ফ্লাই করবার পর হাজারটা সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

'যখনকারটা তখন দেখা যাবে,' রানা বলল। 'তা ছাড়া এটা নিয়ে আমরা আটলান্টিক পাড়ি দিতে যাচ্ছি না, শুধু এস্টেট থেকে বেরুতে পারলে হয়, তারপর নিরাপদ একটা জায়গায় ল্যাণ্ড করে ফেলব।'

ওদের দিকে এগিয়ে এলেন এলিসা। 'আপনারা এই বিমানটা নিয়ে এভাবে মেতে উঠলেন কেন, জানতে পারি?'

ভদ্রমহিলার দিকে ফিরল রানা। 'এস্টেট থেকে পালাতে হবে আমাদের, ডক্টর। আর হেলিকপ্টারকে শুধু বিমানই পিছে ফেলতে পারে।'

'এমনভাবে বলছেন যেন হাওয়া খেতে বেরুবেন!' ইউনোর কণ্ঠে বিস্ময়। 'বাইরের ওরা টেকঅফ করতে দেবে আমাদের? গুলি করবে না?'

'করবে,' রানা মাথা ঝাঁকাল 'আর সেজন্যেই ছোট বিমানগুলোর দিকে না তাকিয়ে এটার উপর নজর দিচ্ছি। স্মল আর্মস্ দিয়ে গুলি করে অন্তত একটা বম্বারকে থামানো সম্ভব নয়। যতই গুলি লাগুক, আমরা টেকঅফ করতে পারব।'

অকাট্য যুক্তি শুনে কাঁধ ঝাঁকালেন এলিসা, পিছিয়ে গেলেন।

'চাকাগুলোয় খুব একটা বাতাস নেই, মাসুদ ভাই,' একটা টায়ার পরীক্ষা করে বলল রায়হান। 'যেরকম এবড়োথেবড়ো রানওয়ে, তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ব। বাতাস ভরতে হবে।'

'ওদিকে এয়ারহোস দেখেছি,' রানা আঙুল তুলল। 'চলো, নিয়ে আসি।'

'সময় কিন্তু নেই খুব একটা। ব্যাটারা যে-কোনও মুহূর্তে ঢুকে পড়বে।'

'আগে বাইরের দিককার চাকায় হাওয়া দেব,' ছুটতে শুরু করে বলল রানা। 'সময় পেলে ভিতরেরগুলোয়।'

boighar.com

হ্যাঙ্গারের একপাশের দেয়ালের ব্র্যাকেট থেকে এয়ারহোস খুলে আনল ওরা, পাম্প চালু করে বি-২৫-এর টায়ারগুলো ফোলাতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কম্প্রেসরের হিসহিসানি ছাপিয়ে ভেসে এল সার্ভিস ডোরের উপর গুলিবর্ষণের শব্দ। প্রায় একই সময়ে সামনের দিকেও গুমগুম ধ্বনি শোনা গেল—ডিনামাইট ফাটাতে শুরু করেছে হামলাকারীরা।

হাত থেকে এয়ারহোস ফেলে দিল রানা—পিছনের দুটো আউটার টায়ার আর নোজ হুইলের চাকায় যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস ভরা গেছে, আপাতত টেকঅফ করতে অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিমানে উঠে পড়ো সবাই। রায়হান, তুমিও।'

'আপনি?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রায়হান।

'দরজাটা খুলতে হবে কেউ একজনকে, ভুলে গেছ?'

'আপনি কেন? আমিই তো পারি।'

'না, তুমি আমাদের পাইলট। লড়াইয়ের দিকটা আমি সামলাব।'

ঢোঁক গিলল তরুণ হ্যাকার। 'এই মুড়ির টিনটা আমাকে ওড়াতে হবে?'

'কেন, বিমান চালানোর ট্রেইনিঙেও ফাঁকি দিয়েছ নাকি?'

'তা দিইনি, তবে সিলেবাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কোনও বম্বার চালানোর টপিক ছিল না।'

'বেসিক নিয়মকানুন সবই এক, খুব একটা সমস্যা হবে না,' রানা সাহস জোগাল। 'যাও, দেরি কোরো না। ইঞ্জিন স্টার্ট দাও, পাল্লা খুলে যাবার পর আমরা খুব একটা সময় পাবো না।'

'পাল্লা নাহয় খুললেন, আপনি চড়বেন কীভাবে?'

'বেলি-হ্যাচটা খোলা রেখো। যাও।' www.boighar.com

আদেশ পেয়ে আর দ্বিধা করল না রায়হান, ড. বুরেন আর ইভাকে নিয়ে উঠে পড়ল বম্বারে। রানা চলে গেল প্যানেলের সামনে, রায়হানের সঙ্কেত পেলে দরজা খুলে দেবে। হ্যাঙ্গারের পিছনে গুলিবর্ষণ বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে, সামনেও আরেকবার বিস্ফোরণের শব্দ হলো—শত্রুরা মরিয়া হয়ে উঠছে।

কাঁচ মোড়া ককপিটে পাইলটের উঁচু সিটে গিয়ে বসল রায়হান, প্রি-ফ্লাইট চেক করবে। প্যানেলের গজগুলোর কাঁচ ঘোলা হয়ে গেছে বয়সের ভারে, ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না কিছু। ঢোঁক গিলে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল ও—কাজটা সহজ হবে না মোটেই। দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মনকে প্রশান্ত করবার চেষ্টা করল, মাথাটা পরিষ্কার থাকলে ফ্লাইঙের কায়দাকানুন নিয়ে ভাবতে হবে না, সহজাতভাবেই আঙুলের ডগায় চলে আসবে সবকিছু। ঘোলা ডায়ালগুলো নিয়ে চিন্তা করল না আর, সবক'টার উপর সারাক্ষণ নজর রাখতে হয় না পাইলটকে। যেগুলো প্রয়োজনীয়, সেগুলো রুমাল দিয়ে মুছে নিল ও। তারপর দ্রুত সিস্টেমস্ চেক করতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সন্তুষ্টি বোধ করল—কোথাও কোনও ঝামেলা দেখতে পাচ্ছে না।

দুই পাইলটের সিটের মাঝখানের কনসোলে রয়েছে ফুয়েল আর এয়ারস্পিড গজ, সেই সঙ্গে রেডিও—সেখানে প্রজাপতির মত নেচে বেড়াল

রায়হানের আঙুল, পুরো কনসোলই এবার পিনবল মেশিনের মত আলোয় ভরে গেল। এবার আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে ইগনিশন সুইচ অন করল ও, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জন করে উঠল টারবাইন—ককপিটের কাঁচ ভেদ করে ডানাগুলোর দিকে তাকাতেই পাখাগুলোকে ধীরে ধীরে ঘুরতে দেখা গেল।

প্রপেলারের গগনবিদারী আওয়াজ বাড়ছে ক্রমেই, বাড়ছে পাখার ঘূর্ণন... রায়হান বুঝতে পারল, ঠিকমতই কাজ করছে ইঞ্জিনগুলো। বুড়ো আঙুল তুলে রানাকে সঙ্কেত দিল ও।

হ্যাঙ্গারের দরজার সুইচ টিপে দিল রানা, তারপর ছুটতে শুরু করল বি-২৫-এর দিকে। পলকের জন্য ব্লাস্ট ডোরের ফাঁক হওয়া জায়গাটায় একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ও—ওর দিকে একটা মেশিনগান তাক করছে। দৌড়ের গতি কমাল না রানা, ছুটন্ত অবস্থাতেই পিস্তল তুলে গুলি করল, বিশাল হ্যাঙ্গারের ভিতরে প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা। টলে উঠল ছায়ামূর্তি, হাত থেকে খসে পড়ল মেশিনগানটা, কাঁধ চেপে ধরে সরে গেল হ্যাঙ্গারের মুখ থেকে।

ঠিক তখুনি সার্ভিস ডোর ভেঙে ভিতরে ঢুকল হামলাকারীদের দ্বিতীয় দল। পিস্তল তুলে গুলি করতে গেল রানা, কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। প্রচণ্ড শব্দে প্রপেলারের পিছন দিয়ে বেরুতে থাকা বাতাসের ব্যাকড্রাফটের সামনে পড়ে গেল লোকগুলো, খড়কুটোর মত উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল হ্যাঙ্গারের দেয়ালে। দৃশ্যটা দেখে চওড়া হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। হ্যাচ গলে বিমানে উঠে পড়ল ও।

ইভা আর এলিসা রয়েছেন ক্রু-কম্পার্টমেন্টে, ওদেরকে সিটবেল্ট বাঁধতে বলে ককপিটে গিয়ে ঢুকল রানা। বলল, 'এবার তোমার শো, রায়হান। কেমন বুঝছ অবস্থা?'

ফুয়েল ফিড অ্যাডজাস্ট করছে তরুণ হ্যাকার, থ্রটলগুলো ঠেলে রেখেছে সামনের দিকে, ইঞ্জিনগুলোকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফুল পাওয়ারে: এখনও ব্রেক রিলিজ করেনি, ব্লাস্ট ডোর পুরোপুরি খুলে গেলে করবে। রানার প্রশ্নের জবাবে জানাল, 'বয়সটা বিবেচনায় রাখলে এই বুড়িটার পারফর্মেন্স চমৎকার বলতে হবে।'

'টেকঅফ করা যাবে তো?'

'মনে তো হয়।'

সামনের দিকে আঠার মত সেঁটে রয়েছে রায়হানের দৃষ্টি। বেরুবার মত ফাঁক পেলেই আগে বাড়বে। মানুষ ঢোকার মত জায়গা হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই, তারপরও হামলাকারীরা কেউ ভিতরে ঢুকছে না, সম্ভবত রানার গুলিতে একজন আহত হওয়ায় ভয় পেয়েছে তারা। ধীরে ধীরে দুপাশে সরে যাচ্ছে ব্লাস্ট ডোর, আধাআধি পৌঁছে থামল একবার—ডিনামাইটের বিস্ফোরণে আঁকাবাঁকা হয়ে যাওয়া একটা অংশ আটকে গেছে দেয়ালের কাছে গিয়ে। তবে বেশিক্ষণ থাকল না ওভাবে, শক্তিশালী মোটর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল পাল্লাটাকে।

'এবার, রায়হান! এবার!!' গ্যাপটাকে বড় হতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রেক রিলিজ করল রায়হান, একই সঙ্গে থ্রটল ঠেলে দিল

boighar.com

আরও সামনের দিকে। মেঝেতে ঘষা খেয়ে ঘুরতে শুরু করল বম্বারের চাকা, জ্যা-মুক্ত তীরের মত এগোল নাক বরাবর। গগনবিদারী আওয়াজ তুলে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এল বি-২৫।

আট

অতিকায় যুদ্ধবিমানটাকে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চমকে গেল বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গারফিল্ড আর তার সঙ্গীরা। তবে বিস্ময়টা দ্রুত কাটিয়ে উঠে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল তারা, বম্বারটাকে থামাতে চায়। ঠক ঠক করে বুলেট এসে বিঁধতে শুরু করল বি-২৫-এর গায়ে, একের পর এক ক্ষত সৃষ্টি হতে থাকল। তবে থামল না ওটা, ছুটতে থাকল আগের মত।

কী করবে, সেটা ঠিক করতে এক মুহূর্তও সময় নিল না অভিজ্ঞ খুনী। মুখের কাছে ওয়াকিটকি তুলে কপ্টারের পাইলটকে নির্দেশ দিতে শুরু করল গারফিল্ড।

ক্রু-কম্পার্টমেন্টে উঁকি দিল রানা, চেঁচিয়ে বলল, 'মাথা নামিয়ে রাখুন আপনারা, পোর্টহোল ভেঙে গুলি ঢুকতে পারে!'

ইভা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে নির্দেশটা, তবে প্রৌঢ়া ইউনো ওর কথাটা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না। পাগলের মত নিজের মোবাইল টেপাটিপি করছেন তিনি, কার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন...লাইন পাচ্ছেন না। রানা ধমকে উঠল, 'ড. বুরেন! করছেনটা কী আপনি? মাথা নামাতে বললাম না?'

'আমি... আমি বাইরের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করছি... থতমত খেয়ে জানালেন এলিসা।

'কেউ সাহায্য করতে পারবে না আমাদের এ-মুহূর্তে। ফোন রাখুন। সাহায্য যদি চাইতেই হয়, দু'হাঁটুতে মাথা গুঁজে ওপরঅলার কাছে চান।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে রানার দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন এলিসা, তারপর কুঁজো হয়ে পড়লেন সিটে।

'মাসুদ ভাই!' রায়হানের চিৎকার শোনা গেল সামনে থেকে।

ঝট করে ঘুরল রানা। 'কী হয়েছে?'

মুখে কিছু বলল না রায়হান, আঙুল তুলে দেখাল সামনের দিকটা। উইণ্ডশিল্ডের মধ্য দিয়ে শত্রুদের হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পেল রানা—কখন যেন টেকঅফ করেছিল ওটা, এখন ধীরে ধীরে নেমে আসছে রানওয়ের উপর, ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে ওদের রাস্তা জুড়ে। বি-২৫-কে না থামিয়ে উপায় নেই, নইলে সোজা কপ্টারটার গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে।

'কী করব?' পরামর্শের আশায় গুরুর দিকে তাকাল রায়হান।

কো-পাইলটের সিটে গিয়ে বসল রানা, সিটবেল্ট বাঁধল, চোয়াল শক্ত হয়ে

গেছে ওর। গম্ভীর গলায় বলল, 'স্পিড বাড়াও।'

'কী!'

'ঠিকই শুনছ... স্পিড বাড়াতে বলছি, টেকঅফের জন্য অন্তত একশো নটে পৌঁছুতে হবে তোমাকে।'

'কীসের টেকঅফ? আমরা... আমরা ক্র্যাশ করব হেলিকপ্টারটার গায়ে!'

'সত্যিই করব কি না, সেটাই দেখতে চাই,' বলল রানা। 'স্পিড বাড়াও এক্ষুণি, তাড়াতাড়ি ওটার কাছে চলে যেতে চাই, পাইলট ব্যাটা যেন নেমে যেতে না পারে। দেখিই না, সুইসাইড করে আমাদের ঠেকানোর মত সাহস আছে কি না ওর।'

এতক্ষণে গুরুর মতলবটা ধরতে পারল রায়হান, মুচকি হেসে থ্রটলটা একেবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে দিল ও।

রানওয়ে আটকে ল্যাণ্ড করতে পেরে আত্মতুষ্টির হাসি হাসছিল কপ্টারের পাইলট, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেটা মুছে গিয়ে আতঙ্ক ভর করল চেহারায়। অতিকায় বি-২৫ মূর্তিমান দানবের মত ধেয়ে আসছে ছোট্ট যান্ত্রিক ফড়িংটার দিকে, ওটাকে পিষে ফেলতে চাইছে... স্পিড কমাবার কোনও লক্ষণ নেই, আরও বাড়িয়েছে যেন। ওটার আরোহীরা নিঃসন্দেহে পাগল, নইলে এভাবে আত্মহত্যা করতে চায় কেউ? তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নেমে যেতে চাইল, কিন্তু নার্ভাসনেসের কারণে হাতলই খুঁজে পেল না বেচারা। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে তার, দিব্যচোখে নিজের মরণ দেখতে পাচ্ছে—বিশাল এক বম্বারের আকৃতি নিয়ে ছুটে আসছে সেটা।

বাঁচার উপায় একটাই, তাড়াতাড়ি পেডাল চেপে কণ্ট্রোল স্টিক আঁকড়ে ধরল আতঙ্কিত পাইলট। বনবন করে ঘোরার গতি বেড়ে গেল রোটরের, পাছা উঁচু করে সরে যেতে শুরু করল কপ্টারটা। লেজটা মাত্র রানওয়ের কিনারা পেরিয়েছে, এমন সময় পৌঁছে গেল বি-২৫, টেইল রোটরের মাত্র কয়েক ফুট দূর দিয়ে সবেগে এয়ারস্ট্রিপের অন্যপ্রান্তের দিকে ছুটে চলে গেল ওটা। বাতাসের ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল কপ্টার, ব্যালেন্স ফিরে পেতে জান-প্রাণ দিয়ে খাটল কয়েক মুহূর্ত।

এতকিছু অবশ্য দেখতে পাচ্ছে না রানা, ওর চোখ সেঁটে রয়েছে এয়ারস্পিড ডায়ালে।

ষাট...

সত্তর...

আশি...

এমনিতেই পুরনো ইঞ্জিন... তার ওপর যোগ হয়েছে এবড়োথেবড়ো রানওয়ের কারণে ক্রমাগত ঝাঁকুনি, সবগুলো চাকায় ঠিকমত বাতাসও দেয়া হয়নি—স্বভাবতই গতিবেগ বাড়ছে অত্যন্ত ধীরে, স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগছে।

রায়হান জানাল, 'রানওয়ে শেষ হয়ে আসছে, মাসুদ ভাই। টেকঅফ করব?'

'আরেকটু...'

boighar.com

'সরি, এখুনি যদি ডানা না মেলি, তা হলে পুরো পথ ড্রাইভ করে যেতে হবে।'

এয়ারস্পিড গজ নব্বুই নট গতিবেগ দেখাচ্ছে—প্রয়োজনের তুলনায় দশ নট কম। পিছন থেকে গুলি করা হচ্ছে এখনও, যতক্ষণ সারফেসে থাকছে, বিমানটার গায়ে আঘাতের সংখ্যা বাড়ছে ততই। বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো উড়াল দিতেই পারবে না বি-২৫। তাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'ও.কে, চেষ্টা করে দেখো।'

নির্দেশ পেয়েই ইয়োক ধরে টানতে শুরু করল রায়হান, ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়েছে আগেই... বাতাসের অবলম্বন নিয়ে বিমানটাকে ভাসিয়ে তুলতে চায়। ধীরে ধীরে নাক তুলল বি-২৫, মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেল নোজ হুইল, ওভাবেই ছুটল কয়েক মুহূর্ত। তবে গতি কম থাকায় পিছনটা তুলতে পারল না রায়হান, একটু পরেই মাটিতে আবার নেমে এল সামনের চাকা, ফুটবলের মত ড্রপ খেল কয়েকটা।

রানওয়ের শেষ প্রান্ত আর একশ' গজও নয়, ঢোঁক গিলল তরুণ হ্যাকার। সৃষ্টিকর্তার নাম জপে আবারও ইয়োক ধরে টানতে থাকল ও, উইণ্ডশিল্ডে উদয় হতে থাকা রুক্ষ-বন্ধুর জমি আর গাছপালার সারিগুলোকে ভুলে যেতে চাইল... পা-দুটো ফ্লোরবোর্ডের উপর এমনভাবে চেপে ধরেছে, যেন ওখানে গাড়ির মত অ্যাকসেলারেটর আছে। রানাও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ফলাফলটা দেখার জন্য।

এইবার সাড়া দিল প্রাচীন যুদ্ধবিমান, রানওয়ের একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে উঠে গেল বাতাসে, দশ গজও বাকি ছিল না তখন। ইঞ্জিন একজস্টের প্রবল ধাক্কায় নীচের গাছপালা বেঁকে গেল, যেন সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে—আরেকটু হলেই বম্বারের তলার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটত।

আটকে রাখা দমটা শব্দ করে ছাড়ল রায়হান, কপালের পাশ দিয়ে সরু ধারায় ঘাম ঝরছে ওর। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। তারপর বলল, 'বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি।'

রানা অবশ্য অতটা খুশি হতে পারছে না। গম্ভীর গলায় বলল, 'এখনও বেঁচেছি বলা যাবে না।' আঙুল তুলে একটা গজ দেখাল ও। 'দুই নম্বর ইঞ্জিনটা কাজ করছে না।'

'ইয়াল্লা! বলেন কী!'

ককপিটের দরজায় ইভা উদয় হলো এসময়। বলল, 'ডানদিকের ডানায় ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি আমরা পোর্টহোল দিয়ে।'

ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় আওয়াজই বলে দিচ্ছে কী ঘটেছে, তারপরও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। দেখা গেল, ওর আশঙ্কাটাই সত্যি। গুলি লেগেছে ইঞ্জিনটায়, কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে, ছন্দ হারিয়ে থেমে থেমে ঘুরছে পাখাগুলো। ব্যাপারটা রায়হানকে বলল ও।

'ফুয়েল লাইনও হিট হয়েছে,' গজের দিকে তাকিয়ে বলল তরুণ হ্যাকার। 'আমাদের তেল ফুরিয়ে আসছে।'

চুপচাপ নতুন দুঃসংবাদটা হজম করল রানা। সুইচ টিপে বন্ধ করে দিল দু'নম্বর ইঞ্জিন। গতিবেগ কমে গেল অনেকটা, অলটিচ্যুড মেইনটেন করতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এখন রায়হান। রানা বলল, 'যতক্ষণ পারো ভেসে থাকো। আমি দেখছি, ল্যাণ্ড করবার মত কোনও জায়গা পাওয়া যায় কি না।'

'দূরে কোথাও পৌঁছুতে না পারলে হেলিকপ্টারটা আমাদের খুঁজে বের করে ফেলবে, মাসুদ ভাই।'

'জানি,' রানা বলল। 'দেখো কতদূর যেতে পারো।' দুশ্চিন্তা বোধ করছে ও, প্ল্যানটা পুরোপুরি সফল হয়নি। শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র বেশ শক্তিশালী ছিল, একটা ইঞ্জিন বিকল করে দিতে পেরেছে তারা। এখন আর এই বিমান নিয়ে আলস্মির পৌঁছুনো সম্ভব নয়, বিডিংহুইযেনের আশপাশে কোথাও ল্যাণ্ড করতে হবে... খুনীদের নাগালের মধ্যে।

পরিস্থিতিটা যে আরও গুরুতর, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল মিনিট দশেকের মধ্যেই। নতুন করে গুলির শব্দে চমকে উঠল বি-২৫-এর আরোহীরা, ঠক ঠক করে বিমানের গায়ে আবারও বিঁধতে শুরু করেছে বুলেট।

'হোয়াট দ্য হেল!' বিস্মিত গলায় বলল রায়হান। 'আবার গুলি করছে কে?'

জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকল রানা, এক পলকের জন্য চোখে পড়ল রূপালি রঙের হেলিকপ্টারটা... বম্বারের একদম কাছে পৌঁছে গেছে ওটা, গুলি ছুঁড়ছে।

'হেলিকপ্টারটা, রায়হান... ওটা চলে এসেছে... সমস্ত লোকজনসহ,' তিক্ত গলায় বলল রানা।

'অ্যাঁ! কী বলছেন?'

'সত্যি!'

'হেলিকপ্টার নিয়ে বিমানকে ধরে ফেলল?'

'আমাদের স্পিড কী পরিমাণ কমে গেছে, সে-খেয়াল আছে? হেলিকপ্টার কেন, একটা পাখিও এখন ওভারটেক করে চলে যেতে পারবে।'

'শিট! কী করব এখন? স্পিড বাড়াব?'

'যে-অবস্থা বিমানের... প্রেশার দিলে একমাত্র ইঞ্জিনটাও খসে পড়বে,' রানার কণ্ঠে বিষাদ। কো-পাইলটের সিট ছেড়ে উঠে পড়ল ও। 'তোমার অ্যামিউনিশনগুলো দাও, দেখি ওদের তাড়ানো যায় কি না।'

'কী যে বলেন না, মাসুদ ভাই!' পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলল রায়হান। 'আমাদের অটোমেটিক পিস্তল দিয়ে একটা হেলিকপ্টারকে ঘায়েল করা অসম্ভব। পাখি তো নয় যে, ঢিল ছুঁড়লেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে—আহত হোক বা না-হোক।'

'দেখিই না চেষ্টা করে।' সঙ্গীর কাছ থেকে বাড়তি ক্লিপগুলো নিল রানা।

'আবার ইম্প্রোভাইজ করবেন কিছু?'

'যদি সুযোগ থাকে।' বলে ককপিট ছেড়ে ক্রু-কম্পার্টমেন্টে চলে এল রানা।

ইভা আগেই ফিরে এসেছিল নিজের সিটে, ওকে দেখে আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, মি. রানা?'

boighar.com

'তেমন কিছু না,' হালকা গলায় বলল রানা, সাহস দেবার চেষ্টা করছে। 'আমাদের এস্টেটের বন্ধুরা ফিরে এসেছে। বিদায় না নিয়ে ওভাবে চলে আসায় খুব রাগ করেছে ওরা।'

হাহাকারের মত করে উঠলেন এলিসা, মোবাইল ফোনটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আবার—সাহায্য চাইবেন বোধহয় কারও কাছে। ওঁকে এবার আর বাধা দিল না রানা, যদি ফোন করে শান্তি খুঁজে পান, তা হলে অসুবিধে কী? ওর হাতের পিস্তলটা লক্ষ করেছে ইভা। বলল, 'ওই জিনিস নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন নাকি?'

'না, না,' রানা হাসল। 'এ দিয়ে কি আর যুদ্ধ করা যায়? একটু ফায়ারিং প্র্যাকটিস করব আর কী। তোমরা দরজার সামনে থেকে সরে যাও, গায়ে যেন গুলি না লাগে।'

'আর আপনি?'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না। বুলেটকে কীভাবে ফাঁকি দিতে হয়, তা আমার জানা আছে।'

আবার মেশিনগানের ভারি আওয়াজ শোনা গেল, এবার আরও কাছ থেকে। ইভা আর এলিসাকে বিমানের পিছনদিকে পাঠিয়ে দিয়ে একজিট ডোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, গুলিবর্ষণে বিরতির জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর মোচড় দিল হাতলে, খুলে ফেলল পাল্লাটা।

প্রবল বেগে বাতাস হামলা চালাল খোলা জায়গাটায়, ভিতর-বাইরের বায়ুচাপ সমান করে আনছে। থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো বম্বার, ব্যালেন্স মেইনটেন করতে রীতিমত যুঝতে হচ্ছে এখন রায়হানকে। ককপিট থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'যা করার তাড়াতাড়ি করুন, মাসুদ ভাই! এভাবে বেশিক্ষণ ফ্লাই করা সম্ভব নয়।'

একজিট ডোরের পাশের বাল্কহেড ধরে কোনওমতে তাল সামলাল রানা, তারপর সোজা হয়ে বাইরে তাকাল। প্লেনটাকে ঝাঁকি খেতে দেখে একটু সরে গিয়েছিল হেলিকপ্টারটা, এখন আবার এগিয়ে আসছে—ওটার খোলা দরজায় ঝাঁটাগুঁফো এক লোককে দেখতে পেল ও, দাঁত বের করে হাসছে। লোকটার হাতে একটা হেভি মেশিনগান, বোঝা যাচ্ছে—ওটার কল্যাণেই এক নম্বর ইঞ্জিনটাকে এত সহজে ঘায়েল করতে পেরেছে। এবার দ্বিতীয়টার পালা। ইতোমধ্যেই গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বাম দিকের উইঙের একটা অংশ, দৃষ্টিসীমার মধ্যে দু-নম্বর ইঞ্জিনের যতটুকু দেখা যাচ্ছে, সেখানেও দুটো গর্ত চোখে পড়ল।

www.boighar.com

দাঁতে দাঁত পিষল রানা—প্ল্যানটা পুরোপুরি মাঠে মারা পড়ছে। বিমানটা নিয়ে কিছুতেই ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয় কপ্টারটাকে, ক্রমাগত গুলির আঘাতে দফারফা হয়ে গেছে বম্বারের, আহত পাখির মত ধীর হয়ে গেছে গতি, কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে খসে পড়বে। ক্র্যাশটা থেকে যদি কোনওভাবে বেঁচেও যায়, খুনীদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

ঝাঁটাগুঁফো আবারও ইঞ্জিনকে টার্গেট করছে দেখে হাতের পিস্তল তুলে গুলি

করতে শুরু করল রানা—যতক্ষণ সম্ভব ইঞ্জিনটাকে রক্ষা করতে হবে। হেলিকপ্টারটার দিকে তাক করে খালি করে ফেলল ক্লিপ্। নিশানা ঠিক করতে সময় ব্যয় না করায় তাতে অবশ্য তেমন লাভ হলো না, বেশিরভাগ গুলিই চলে গেল এদিক-সেদিক, একটা শুধু গিয়ে লাগল কপ্টারে... তাও লেজের দিকে। মেশিনগানধারী লোকটাকে আহত করা গেল না, পাইলটের গায়েও আঁচড় লাগেনি।

সামান্য সময়ের জন্য হেলিকপ্টারের ভিতরে শরীর টেনে নিয়েছিল ঝাঁটাগুঁফো গারফিল্ড, রানার পিস্তল থেমে যেতেই আবার উদয় হলো দরজায়, মুখটায় বিজয়ীর হাসি। ইঞ্জিন না, এবার রানাকে লক্ষ্য করে মেশিনগান তুলল সে, টিপে দিল ট্রিগার।

বৃষ্টির মত অঝোর ধারায় বি-২৫-এর দরজার দিকে ছুটে এল ভারি শেল, মোরব্বার মত কেচে ফেলতে থাকল প্রাচীন আকাশযানটার নাজুক দেহ।

মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখতে পেয়েই ফ্লোরে ডাইভ দিয়েছে রানা, প্রবল আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম হলো ওর, দৃষ্টিসীমায় থাকা ছোটখাট জিনিসপত্র আর সিটের ফোম গুলির আঘাতে ছিঁড়ে-খুঁড়ে উড়তে দেখল। মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া প্রাণঘাতী বুলেটগুলো, উপুড় হয়ে সেগুলোকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে ও, ক্রল করে সরে যেতে থাকল দরজা থেকে দূরে।

গুলির শব্দটা সামান্য সময়ের জন্য থামতেই হঠাৎ সামনে ড. বুরেনের পা দেখতে পেল রানা। সিট ছেড়ে উঠে পড়েছেন ভদ্রমহিলা। কী যেন হয়েছে ওঁর, মোবাইলে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি বোধহয়, বিপদের মুখে পড়ে এখন আর মাথাটা স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না। ঘোর লাগা একটা দৃষ্টি প্রৌঢ়া ইউনোর চোখে, ছুটে যেতে চাইছেন একজিটের দিকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে ধরে ফেলল রানা। কড়া গলায় বলল, 'করছেনটা কী আপনি?'

'ছাড়ুন আমাকে, মি. রানা!' বিকারগ্রস্তের মত বললেন এলিসা। 'এভাবে মরা চলবে না আমার... যে করেই হোক, বাঁচতে হবে।'

'সেজন্যেই বুঝি বিমান থেকে লাফ দিতে যাচ্ছেন? পাগল হয়ে গেছেন নাকি? যান বলছি, বসুন গিয়ে সিটে!'

প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুললেন এলিসা, ঠিক তক্ষুণি বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল বেশ ক'টা পোর্টহোল। আবার গুলি করছে কপ্টারের মেশিনগানার। ইভা চিৎকার করে উঠল আতঙ্কে, রানাও ধাক্কা দিয়ে ড. বুরেনকে সহ মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

'মাসুদ ভাই!' ককপিট থেকে রায়হানের ডাক ভেসে এল। 'দু'নম্বর ইঞ্জিনটাও গেছে! আমরা ক্র্যাশ করতে চলেছি!'

হতাশায় ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা—আর কোনও সুযোগ নেই বাঁচবার। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হচ্ছে ওদেরকে। আনমনে মাথা নাড়তে গিয়ে হঠাৎ দিব্যচোখে খুব পরিচিত একটা চেহারা দেখতে পেল ও। কাঁচাপাকা ভ্রূ-র নীচের অন্তর্ভেদী চোখজোড়া বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, যেন বলতে

boighar.com

চাইছে—এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে? বাকি পৃথিবীর কথা ভাবলে না? এজন্যেই কি এত বড় একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে? মনে মনে গাল দিল রানা, শালার মরার সময়ও বুড়োর জ্বালাতন থামবে না দেখছি!

পরমুহূর্তেই সচকিত হয়ে উঠল ও—বুকের গহীনে ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠল বাঁচার ইচ্ছা আর কর্তব্যবোধ। ঝট করে সোজা হলো রানা, চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে। বাল্কহেডের গায়ে ব্র্যাকেটে ঝোলানো একটা ফ্লেয়ার পিস্তলের উপর চোখ আটকে গেল ওর।

'মাসুদ ভাই!' আবার ডাক শোনা গেল রায়হানের। 'কী করব?'

'টিকে থাকো যতক্ষণ সম্ভব,' গলা উঁচু করে নির্দেশ দিল রানা। তারপর তাকাল ইভার দিকে। 'ড. বুরেনকে সামলাও।'

এলিসার হাত ধরে তাঁকে সিটে নিয়ে গেল তরুণী সেক্রেটারি। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে যাচ্ছেন?'

'এমন কিছু, যা ওরা কল্পনাও করতে পারবে না,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে ব্র্যাকেট থেকে ফ্লেয়ার পিস্তলটা সংগ্রহ করল ও; পাশে ঝোলানো বক্সে অ্যামিউনিশনও আছে, সেখান থেকে নিল স্মোক ফ্লেয়ার—পিস্তলে লোড করে ফেলল ওটা।

ভীষণভাবে দুলছে বি-২৫, তাল সামলে ধীরে ধীরে একজিটের পাশে চলে গেল রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'স্পিড কমাও, রায়হান। কাছে আসতে দাও হেলিকপ্টারটাকে।'

'কী!' রায়হান অবাক!

'হ্যাঁ। একটাই শট নেবার সুযোগ পাবো, ওটা দূরে থাকলে মিস হয়ে যেতে পারে। বিমানটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করো, নিশানা ঠিক করতে হবে আমাকে।'

গুরুর ওপর অগাধ আস্থা তরুণ হ্যাকারের, আর কোনও প্রশ্ন না করে হুকুম তামিল করল। ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, আর.পি.এম. কমিয়ে দিয়েছে ও। দরজা দিয়ে উঁকি দিল রানা—ওর প্ল্যান মোতাবেকই ঘটছে সব। কপ্টারটা বম্বারের পোর্ট উইঙের পাশে... একেবারে গায়ের উপর এসে পড়েছে—নিশ্চিত শটে বিমানটাকে অচল করে দিতে চায়। মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটল রানার, ফাঁদে পা দিয়েছে শত্রুরা।

পিস্তলটা আগেই রিলোড করে ফেলেছিল, দরজার ফ্রেমের আড়াল থেকে শুধু হাতটা বের করে এলোপাতাড়ি ফায়ার করল ও। আগের বারের মতই কপ্টারের ভিতর শরীর ঢুকিয়ে ফেলল মেশিনগানার, যাতে গুলি না খায়। হাতের ক্লিপটা খালি হতেই ঝট করে খোলা একজিটের সামনে উদয় হলো রানা, অটোমেটিকটা ফেলে দিয়েছে, এখন হাতে শুধু ফ্লেয়ার-গানটা। সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল ও, তারপর দম আটকে টিপে দিল ট্রিগার।

শটটা নিখুঁত হলো—উড়ে গিয়ে সোজা হেলিকপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে কেবিনের ভিতরে পড়ল স্মোক ফ্লেয়ার। কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বিস্ফোরিত হলো ওটা।

চোখের পলকে কপ্টারের ভিতরটা ভরে গেল কমলা রঙের রাশ রাশ ঘন

ধোঁয়ায়। বাতাসের শোঁ শোঁ আর ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল আরোহীদের চেঁচামেচি—খক্ খক্ করে কাশছে তারা, শাপ-শাপান্ত করছে প্রতিপক্ষকে। ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে উইণ্ডশিল্ডও, পাইলট সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, হেলিকপ্টারটা মাতালের মত টলমল করছে।

দৌড়ে ককপিটে এসে ঢুকল রানা, রায়হানকে বলল, 'ধাক্কা মারো ওটাকে।' আঙুল তুলে কপ্টারটা দেখাল ও।

মাথা ঝাঁকাল তরুণ হ্যাকার, ফুট পেডালে চাপ দিল, কন্ট্রোল কলামও ঘোরাচ্ছে একই সঙ্গে।

কাত হয়ে গেল বি-২৫, বাঁয়ে চাপছে—এক গাড়ি দিয়ে আরেক গাড়িকে যেভাবে পাশ থেকে ধাক্কা দেয়া হয়, ঠিক সেভাবে আঘাত করতে যাচ্ছে ছোট্ট হেলিকপ্টারটাকে। শেষ মুহূর্তে আগ্রাসী বিপদটা দেখতে পেল ঝাঁটাগুঁফো গারফিল্ড, ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে দরজায় মুখ বের করেছিল সে, কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই।

প্রথমে বম্বারের গায়ে ঘষা খেল কপ্টারের রোটরব্লেড, ইস্পাত ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হলো—চোখের পলকে আটফুট লম্বা একটা ক্ষত দেখা দিল বি-২৫-এর শরীরে, একই সঙ্গে দুমড়েমুচড়ে গেল ব্লেডগুলোও। ওখানেই শেষ নয়, রোটর ধ্বংস করে কপ্টারের প্রায় গায়ের উপর উঠে পড়ল যুদ্ধবিমানটা... যেন ছোট্ট ফড়িঙের উপর সওয়ার হলো দৈত্যাকার বাজপাখি! গারফিল্ডের বিস্ফারিত চোখদুটো বিস্ফারিতই রয়ে গেল, প্রবল বেগে এসে কপ্টারটার শরীরে যখন বম্বারটা ধাক্কা দিল, উল্টেপাল্টে পড়ে গেল সে।

ফিউজলাজের একটা পাশ পুরো থেঁতলে গেল হেলিকপ্টারটার, পরমুহূর্তেই ঘটল বিস্ফোরণ। কমলা রঙের আগুনের একটা পিণ্ডতে পরিণত হলো আকাশযানটা, খসে পড়ল আকাশ থেকে। দৃশ্যটা দেখে এক চিলতে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

রায়হান অবশ্য হাসতে পারছে না, সংঘর্ষে ওদের বিমানেরও ক্ষতি হয়েছে। দুমড়ে-মুচড়ে গেছে অনেকখানি জায়গা, বাল্কহেড ফেটে গেছে, আগুন ধরে গেছে ওখানটায়। ধীরে ধীরে করাল শিখা এগিয়ে যাচ্ছে ডানার দিকে, ফুয়েল লাইনের স্পর্শ পেলে বিস্ফোরণ ঘটবে। ব্যাপারটা রানাকে বলল ও।

'ল্যাণ্ড করো,' নির্দেশ দিল রানা।

নীচে যতদূর দেখা যায় সবটাই গাছপালায় ঢাকা, এক টুকরো পরিষ্কার জমিও চোখে পড়ছে না—সেদিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল রায়হান। বলল, 'ল্যাণ্ডিংটা খুব রাফ হবে, মাসুদ ভাই।'

'করার নেই কিছু,' রানা অবিচল। 'ওখানেই নামো।' তারপর ফিরল পিছন দিকে, চেঁচিয়ে বলল, 'রেডি থাকুন আপনারা, ড. বুরেন। আমরা ক্র্যাশ-ল্যাণ্ডিং করতে যাচ্ছি!'

কো-পাইলটের সিটে বসে সিটবেল্ট বেঁধে ফেলল রানা। 'দোয়া-টোয়া জানলে পড়তে শুরু করে দিন,' রায়হান বলল ওর দিকে তাকিয়ে।

'রিল্যাক্স,' রানা বলল। 'মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করো, আমি তোমাকে

boighar.com

সাপোর্ট দেব।'

কয়েক মিনিট পরেই ফ্লোভোল্যাণ্ডের জঙ্গলের মাথায় আছড়ে পড়ল বি-২৫। প্রথম আঘাতেই খসে পড়ল দুপাশের ডানা আর ইঞ্জিন, পুরো বিমানই কেঁপে উঠল তাতে। মড় মড় করে উঠল গোটা এয়ারফ্রেম, ডিমের খোসার মত ভেঙে পড়তে চাইছে। তারপরও থামল না পতন, লতাপাতার আচ্ছাদন তছনছ করে মাটির দিকে পড়তে থাকল বম্বারটা। পথে যত গাছপালা পাচ্ছে, সব ভেঙেচুরে ফেলছে। একেকটা আঘাতে ওটার শরীরেও ঘা তৈরি হচ্ছে কুষ্ঠ রোগীর মত।

ভিতরে ক্রমাগত ঝাঁকুনি খেয়ে চলেছে আরোহীরা, একটুও বিরতি নেই; ফলে দুই নারী-যাত্রী আতঙ্কে চেঁচাবারও ফুরসত পাচ্ছে না। সমস্ত পোর্টহোল, সেই সঙ্গে উইণ্ডশিল্ডের কাঁচ ভেঙে গেছে ইতোমধ্যে, ছিটকে আসা টুকরোগুলোর আঁচড়ে শরীরের উন্মুক্ত জায়গা কেটে গেছে কম-বেশি সবারই... রক্ত ঝরছে, কিন্তু অসহ্য ঝাঁকুনির কাছে এই ব্যথা কিছুই নয়। ওদের কাছে মনে হচ্ছে, দেহের প্রতিটা জয়েণ্ট খুলে পড়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

হঠাৎই ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে মাটি দেখতে পেল রানা। কথা বলার উপায় নেই, শুধু ইশারায় রায়হানকে সতর্ক করবার চেষ্টা করল। তরুণ হ্যাকার ওর ইঙ্গিত আদৌ দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না, বিমানটার ব্যালেন্স ফেরাবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না তার মধ্যে। কো-পাইলটের কণ্ট্রোল কলাম নিয়ে একাই একটু চেষ্টা করল রানা, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারল না। শেষ কয়েকটা গাছকে ধ্বংস করে দিয়ে সারফেসে পৌঁছে গেল বি-২৫, টর্পেডোর ভঙ্গিতে নাক দিয়ে সোজা আঘাত করল মাটিতে।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকিতে চোখে অন্ধকার দেখল রানা, সিটবেল্টের স্ট্র্যাপ ভয়াবহ শক্তি নিয়ে চেপে ধরেছে বুকটা, শ্বাস নেয়াই কষ্টকর হয়ে পড়ল। একটা ব্যাপারই শুধু চোখে পড়ল ওর—ক্র্যাশের ধাক্কায় নাক থেঁতলে গেছে বম্বারের, সেই চাপে ভেঙেচুরে সামনের কনসোলটা ছুটে আসছে ওর দিকে... কপালের একপাশে এসে খুব জোরে বাড়ি খেল একটা ভাঙা টুকরো।

এরপর আর কিছু মনে নেই ওর।

নয়

চমৎকারভাবে সাজানো একটা রুম—মেঝেতে দামি কার্পেট, দরজা-জানালায় ঝুলছে মখমলের পর্দা, দেয়ালে সুদৃশ্য পেইন্টিং, মাথার উপরে ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি, সেই সঙ্গে সুন্দর আসবাবপত্র। ঠিক মাঝখানটায় রয়েছে অ্যান্টিক খাটটা। চোখ মেলে দেখল রানা, ওটার তুলতুলে বিছানায় শুয়ে আছে। ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর, ভুল দেখছে না তো! এখানে এল কীভাবে ও?

কপালে চিন্তার রেখা ফুটল, চোখের দৃষ্টি সতর্ক। উঠে বসে কামরাটার উপর নজর বোলাল রানা। ব্যাপারটা দৃষ্টিবিভ্রম নয়, সত্যিই সুসজ্জিত একটা

রুমে রয়েছে ও। হঠাৎ খেয়াল করল, ভাঙা কাঁচের আঁচড়ে কেটে যাওয়া হাত আর মুখের ক্ষতগুলো ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, কপাল বরাবরও রয়েছে একটা। নিপুণভাবে ড্রেসিং করা হয়েছে প্রতিটি ক্ষত।

কে নিয়ে এল ওকে এখানে? চিকিৎসাই বা দিল কে? ভাবতে ভাবতে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল রানা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল রুম থেকে। সংকীর্ণ একটা করিডর চোখে পড়ল ওর, এটাও কার্পেটে মোড়া। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। প্যাসেজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুল ও, সিঁড়ি ধরে নেমে এল নীচের ফয়েই-য়ে।

সামনেই সদর দরজা, সেটা খুলে বাইরে পা রাখতেই সুন্দর একটা বাগান চোখে পড়ল—গাছগাছালিতে ছাওয়া। লনের চারপাশের কেয়ারিতে ফুটে রয়েছে রং-বেরঙের হাজারো ফুল। হঠাৎ একদিকের ঝোপ নড়ে উঠতে দেখল ও, দুজন লোক বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকেই এগিয়ে আসছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এরা সশস্ত্র—কোটের আড়ালে শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তল রয়েছে।

দ্বিধায় পড়ে গেল রানা—এরা শত্রু না মিত্র, জানা নেই; গা-ঢাকা দেবে কি না, চিন্তা করছে। পরমুহূর্তেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা, শত্রু হলে ওকে দেখামাত্র অস্ত্র উঁচিয়ে ছুটে আসত লোকদুটো, এভাবে হেলে-দুলে হাঁটত না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

কাছে এসে বেঁটেমত লোকটা বলল, 'নীচে নেমে এলেন কেন? বিশ্রাম নিন, স্যর।'

'কে তোমরা?' জানতে চাইল রানা।

'গাস ফর্ক,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা। সঙ্গীকে দেখাল, 'এ হচ্ছে উইন ফ্রেইবেল। আমরা আপনাদের পাহারা... না, না, নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি।'

'কাদের নিরাপত্তা?'

'এই তো... আপনার আর আপনার সঙ্গীদের।'

'কিন্তু তোমরা কে?'

'ক্রিয়েলটেকের সিকিউরিটি ডিভিশনের লোক আমরা, স্যর।'

'ক্রিয়েল-টেক... মানে ড. বুরেনের কোম্পানি?'

'জী, স্যর। ম্যাডাম আপনাদের দিকে নজর রাখার জন্য বলেছেন আমাদেরকে।'

'নজর রাখতে বলেছেন মানে?' রানা বিস্মিত হলো। 'ড. বুরেন কোথায়?'

'ঘণ্টাখানেক আগেই তো চলে গেছেন তিনি। আমাদের এখানেই থাকতে বলে গেছেন।'

'চলে গেছেন!' রানার বিস্ময় আরেকটু বাড়ল। 'কোথায়?'

'সেটা তো বলতে পারব না। তবে আপনাদের জন্য একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন।'

'কী মেসেজ?'

পকেট থেকে একটা মুখবন্ধ খাম বের করে দিল গাস। সেটা খুলে একটা

boighar.com

চিঠি পেল রানা। তাতে লেখা:

মি. মাসুদ রানা,

আপনার জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য নিজ মুখে ধন্যবাদ দেয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, আর দেরি করা ঠিক হবে না, তাই অ্যান্টি-ভাইরাসটার উপর কাজ করবার জন্য রওনা হয়ে গেলাম। মি. রশিদের পকেট থেকে সিডিটা নিয়ে নিয়েছি। আমার জন্য ভাববেন না, নিজের নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছি। কাজ শেষে যোগাযোগ করব।

-এলিসা ভ্যান বুরেন

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল রানা—ভদ্রমহিলা একা একা চলে গেলেন... আবার যদি কোনও বিপদ হয়! খুনীদের একটা দলকে ব্যর্থ করে দেয়া গেছে মানে তো এই নয় যে, শত্রুপক্ষ হাল ছেড়ে দেবে। অবশ্য প্রৌঢ়া ইউনোর যুক্তিটাও বুঝতে পারছে ও—অ্যান্টিভাইরাস তৈরির কাজটা দ্রুত শুরু করা প্রয়োজন ছিল।

চিঠিটা পকেটে গুঁজে গাসের দিকে তাকাল ও। জিজ্ঞেস করল, 'রায়হান আর ইভা কোথায়?'

'ওপরতলাতেই আছেন—আলাদা আলাদা কামরায়।'

'কী অবস্থা ওদের?'

'সামান্য কাটাছেঁড়া ছাড়া তেমন সিরিয়াস কোনও ইনজুরি নেই কারো, এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে আসবার কথা। চলুন, নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে ওঁদের কাছে।'

ফ্রেইবেলকে পাহারার দায়িত্ব দিয়ে রানাকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল গাস। হাঁটতে হাঁটতে খুলে বলল প্লেন-ক্র্যাশের পরের ঘটনাগুলো।

বম্বারটা জঙ্গলে আছড়ে পড়বার পর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল আরোহীদের সবাই, শুধু ড. বুরেন ছাড়া। কপাল খুব ভাল তাঁর, আঘাতও পেয়েছেন সবার চেয়ে কম। মোবাইলে নিজের সিকিউরিটি চিফকে খবর দেন তিনি, আধঘণ্টার মধ্যে একটা রেসকিউ টিম আর হেলিকপ্টার নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যায় ক্রিয়েল-টেকের লোকজন। সবাইকে নিয়ে আসে ড. বুরেনের এই বাগানবাড়িতে। অ্যামস্টারড্যাম থেকে দু'মাইল দূরে এই বাড়িটা, *ড্রুইভেনড্রেশ্‌টে*। এখানে পৌঁছুবার পর একজন বিশ্বস্ত ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় সবার। রানাদের অবস্থা স্টেবল করার জন্য ঘুমের ইঞ্জেকশন দেন তিনি, তবে এলিসার জন্য তেমন কিছু প্রয়োজন হয়নি, তিনিও রাজি ছিলেন না। ফার্স্ট এইড নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন কী এক জরুরি কাজ সারার জন্য, সঙ্গে নিয়েছেন সিকিউরিটি ডিভিশনের কিছু বাছাই করা লোক, গাস আর ফ্রেইবেলকে রেখে গেছেন রানাদেরকে পাহারা দেবার জন্য।

দোতলার একটা কামরার সামনে এসে নক করল গাস। দরজা খুলল রায়হান, রানাকে দেখেই হড়বড় করে বলল, 'ব্যাপার কী, মাসুদ ভাই? কোথায় আমরা? এটা আবার কে...'

হাত তুলে ওকে থামাল রানা। বলল, 'চিন্তা কোরো না, সব ঠিক আছে। ড.

বুরেনের বাগানবাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের।'

'আপনারা কথা বলুন, আমি মিস লরেন্সকে ডেকে নিয়ে আসছি।' বলে চলে গেল গাস।

রুমের ভিতরে ঢুকল রানা। এই কামরাটাও ওরটার মত চমৎকারভাবে সাজানো। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ও, কীভাবে ওরা এই বাড়িতে এসে পৌঁছেছে—সেটা খুলে বলল। একটু পরেই হাজির হলো ইভা, চোখে বিহ্বল একটা দৃষ্টি ওর—যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে বেচারির, সেটার শক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

'তুমি ঠিক আছ?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল রায়হান।

কোনওমতে মাথা নাড়ল ইভা। বলল, 'বুক ধড়ফড় করছে এখনও। বার বার ক্র্যাশ আর গোলাগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

হাত ধরে ওকে বিছানায় এনে বসাল রায়হান। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবেন, কিছু ঠিক করেছেন?'

'ড. বুরেনের সঙ্গে কথা বলে দেখি,' রানা বলল। 'ওঁর সঙ্গেই থাকা উচিত আমাদের। নতুন করে হামলা চালানো হতে পারে ওঁর ওপর, আমরা না থাকলে বিপদে পড়বেন।' ইভার দিকে তাকাল ও। 'ড. বুরেনের নাম্বারটা দাও তো।'

নিজের মোবাইলটা বের করে দিল ইভা। নাম্বারটা দেখে ডায়াল করল রানা, নিভৃতে কথা বলবার জন্য বেরিয়ে এল করিডরে।

'হ্যালো!' ওপাশ থেকে সাড়া দিলেন এলিসা।

'ড. বুরেন, মাসুদ রানা বলছি।'

'আপনার জ্ঞান ফিরেছে? থ্যাঙ্ক গড!'

'আপনার লোকেশন কোথায়?'

'কোথায় যাচ্ছি, সেটা তো জানেনেই,' ইচ্ছে করে গন্তব্যটা উহ্য রাখলেন ইউনো। 'এখনও পৌঁছুইনি, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পৌঁছুব বলে আশা করছি।'

'তা হলে ওখানেই অপেক্ষা করতে থাকুন, আমরা যত শীঘ্রি পারি চলে আসছি।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই, মি. রানা...'

'প্রয়োজন আছে কি নেই, সেটা এতক্ষণে বুঝে ফেলার কথা আপনার। আবারও হামলা হতে পারে...'

'হামলা ঠেকাবার মত প্রস্তুতি নিয়েছি আমি,' জানালেন এলিসা। 'সঙ্গে দশজন বডিগার্ড রেখেছি, তা ছাড়া ওখানে বেশিক্ষণ থাকবও না আমি, প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার আর অন্যান্য ইকুইপমেন্ট নিয়েই বেরিয়ে পড়ব। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টা আমি মুভমেন্টের ওপর থাকব, নির্দিষ্ট কোনও লোকেশনে স্থির থাকব না, কাজেই কোথায় আমাকে পাবেন আপনারা—সেটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না।'

'একটা রঁদেভু পয়েন্ট ঠিক করা যেতে পারে...'

'নেগেটিভ, মি. রানা। সেটা খুব রিস্কি হয়ে যাবে। আমার ধারণা—আমার

boighar.com

মোবাইল কলগুলো মনিটর করছে কেউ, সকালে আপনার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছে। নইলে ফ্যামিলি এস্টেটে যে আমি লুকিয়ে রয়েছি, তা জানতে পারত না। কাজেই কোথাও দেখা করার চিন্তা বাদ দিন। যেভাবে কাজ করতে চাইছি, ওভাবেই করতে দিন।'

'আমরা তা হলে কী করব?'

'বিশ্রাম নিতে থাকুন, আমি মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানাব আপনাকে। কোথাও চলে যাবেন না কিন্তু! কাজটা শেষ করে ওখানেই আপনাদের হাতে অ্যান্টিভাইরাসটা পৌঁছে দিতে চাই আমি।'

ব্যবস্থাটা রানার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, তারপরও ভদ্রমহিলার অকাট্য যুক্তির সঙ্গে পেরে না ওঠায় নিমরাজি হলো। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে এলিসা হেসে বললেন, 'হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বলছি না আপনাকে, মি. রানা। সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য কয়েকটা ঘণ্টা শুধু বিশ্রাম নিতে বলছি। আপনার কাজ তো শেষ হয়নি, অ্যান্টিভাইরাসটা তৈরি করবার পর সেটার ডিস্ট্রিবিউশন তো আপনাকেই করতে হবে।'

'ঠিক আছে, এখানেই অপেক্ষা করছি আমি। আপনি কিন্তু যোগাযোগ রাখবেন... কখন কী ঘটে, কিছু বলা যায় না। আমার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। রায়হানও খুব ব্রাইট ছেলে, প্রোগ্রামিঙের কাজে আপনাকে আইডিয়া দিতে পারবে।'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' আশ্বাস দিলেন এলিসা। 'দরকার হলে নিশ্চয়ই খবর দেব আপনাদের। এখন তা হলে রাখি, ঠিক আছে?' লাইন কেটে দিলেন প্রৌঢ়া বিজ্ঞানী।

আলসমিরে ড. বুরেনের বাড়ির সামনে এসে থামল ছোট্ট গাড়িবহরটা। মোট তিনটে গাড়ি—সামনে আর পিছনে রয়েছে সিকিউরিটি টিম, মাঝেরটায় এলিসা, তাঁর সঙ্গে দুজন বডিগার্ড রয়েছে। ড্রাইভওয়েতে এসে থামতেই দরজা খুলে নেমে পড়লেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী, সঙ্গের লোকজনকে বললেন বাইরে পাহারা দিতে।

ইলেকট্রনিক লকের কোড পাঞ্চ করে তালা খুললেন তিনি, ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভিতরে। পরনের ওভারকোটটা খোলার জন্য সময় নষ্ট করলেন না, হন হন করে হেঁটে চলে গেলেন স্টাডিতে। ডেস্কে বসে কম্পিউটারটা সবে অন্ করেছেন, এমন সময় হাতল ঘোরানোর শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকালেন।

স্টাডির দরজা খুলে গেছে, এক এক করে প্রবেশ করল তিন জন যুবক, চালচলনে শৃঙ্খলাবদ্ধ তারা—দলনেতার চেহারায় কাঠিন্য।

আলফা টিম!

স্থির হয়ে গেলেন এলিসা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিন খুনীর দিকে। ডেস্কের সামনে এসে এক সারিতে দাঁড়িয়েছে ওরা, কোনও কথা বলছে না। কয়েক মুহূর্ত ওভাবেই কাটল।

শেষ পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রৌঢ়া ইউনো, হেঁটে গিয়ে থামলেন

আলফা-ওয়ানের সামনে। রাগে চেহারাটা লাল হয়ে উঠেছে তাঁর, হঠাৎ চড় মেরে বসলেন যুবককে।

অপ্রত্যাশিত আঘাতে হকচকিয়ে গেল বাকি দুজন। সোজা হয়ে বিস্মিত কণ্ঠে আলফা-ওয়ান বলল, 'কী ব্যাপার, চড় মারলে কেন?'

'তোমার পরামর্শ শুনতে গিয়ে কত বড় বিপদে পড়েছিলাম, জানো?' ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন এলিসা। 'আহাম্মকের বাচ্চা গারফিল্ড আমাকে সুদ্ধ শেষ করে দিতে যাচ্ছিল! হারামজাদা নিজের ফোনটাও বন্ধ করে রেখেছিল... অপারেশনটা যে বাতিল করতে বলব, তার কোনও উপায় ছিল না। আর তোমাদেরই বা হয়েছিল কী? এতবার রিং দিলাম, ফোন ধরলে না কেন?'

ইতস্তত করল আলফা-ওয়ান। 'ইয়ে... ইচ্ছে করে করিনি কিছু। আমরা আসলে একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি...'

'ঝামেলা!'

স্টাডির দরজা সশব্দে খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে, সদর্পে ভিতরে ঢুকল বেঁটে-খাটো এক লোক। হঠাৎ দেখায় তাকে কেউকেটা বলে মনে হয় না; তবে মুখ যখন খুলল, বোঝা গেল—এ লোক যে-সে মাল নয়।

'গুড আফটারনুন, ড. এলিসা ভ্যান বুরেন!' উদাত্ত কণ্ঠে সম্ভাষণ জানাল ডগলাস বুলক ওরফে বুলডগ, মুখে মিটি মিটি হাসি লেগে রয়েছে তার। 'নাকি আপনাকে আলফা-যিরো বলে ডাকলে খুশি হবেন?'

www.boighar.com

দশ

ভীষণভাবে চমকে উঠলেন এলিসা, চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল তাঁর। এই অচেনা লোকটা তাঁর গোপন পরিচয় জানল কী করে? কোনওমতে তিনি বললেন, 'ম্... মানে! ক্... কী বলছেন এসব?'

মুখের হাসিটা একটুও হালকা হলো না ত্যাঁদোড় সিআইএ কর্মকর্তার। বাঁকা সুরে বলল, 'বলতে চাইছেন, এদের আপনি চেনেন না? আপনি এই তথাকথিত আলফা টিমের নিয়োগকর্তা নন?'

'কীসের আলফা টিম? এ হচ্ছে আমার ছোট ভাই থিও... ওই দুজন ওর বন্ধু—কার্টার আর মেলভিন।'

'তা তো বটেই... তা তো বটেই!' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বুলডগ। 'এসব কাজে নিজের ভাইয়ের চেয়ে বিশ্বস্ত লোক আর কোথায় পাবেন বলুন?'

'খুব আবোল-তাবোল বকছেন কিন্তু!' রেগে গেলেন এলিসা। 'কে আপনি?'

'অধমের নাম ডগলাস বুলক। আই অ্যাম ফ্রম সিআইএ।'

'সিআইএ!' হার্ট অ্যাটাক করবে যেন এলিসার, ধপ করে বসে পড়লেন পাশের একটা চেয়ারে।

boighar.com

'ইয়েস, ম্যা'ম।' হাসির বদলে এবার সিরিয়াস একটা ভাব ফুটে উঠল বুলডগের চেহারায়। আরেকটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল সে। 'কাজেই বুঝতে পারছেন, আবোল-তাবোল বকার জন্য আসিনি আমি এখানে। আপনার আর আপনার ভাইয়ের সমস্ত কীর্তি-কাহিনি জানা হয়ে গেছে আমার।'

'আমি... আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...'

'অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই, ডক্টর,' কঠিন গলায় বলল বুলডগ। 'সব জানি আমি—ন'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে খুন করিয়েছেন আপনি। আপনার গুণধর ভাই মন্টেগো আইস শেলফের একটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে ঢুকে আটজন স্টাফকে খুন করেছে। পালাবার কোনও পথ নেই আপনাদের। যথেষ্ট পরিমাণ লোক রয়েছে আমার সঙ্গে, বাড়ির চারপাশে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে তারা। আপনার এই আলফা টিম... সেইসঙ্গে বডিগার্ডদের অনায়াসে কচুকাটা করতে পারবে ওরা।'

'আ... আপনি কি আমাদের গ্রেফতার করতে এসেছেন?' ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করলেন এলিসা।

'আমি কী করব, সেটা নির্ভর করছে আপনার নেয়া সিদ্ধান্তের উপর। জেলে যেতে পারেন, আবার আমাকে সাহায্য করে আরাম-আয়েশেও থাকতে পারেন।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ইউনো-ভাইরাসের অ্যান্টিডোট, ড. বুরেন,' বলল বুলডগ। 'ওটা আমার চাই।'

'ইউনো-ভাইরাস!'

বিরক্তির একটা ভাব করল বুলডগ। 'আবার নাটক করছেন! বললাম না, সব জানি আমি?'

'কিন্তু... কীভাবে?'

'ভুলটা আপনার ভাইয়ের,' হাসল বুলডগ। 'রিসার্চ ফ্যাসিলিটির ক্যামেরাগুলোতে নিজেদের ছবি উঠতে দেয়নি ও, তবে ব্রাইটনের লোকেরা যে ড্রাইভারদের উপর নজর রাখার জন্য আইস-ট্র্যাক্টরগুলোতেও লুকানো ক্যামেরা বসিয়েছিল, সেটা সে জানত না। ওগুলো অপারেশন সেন্টারে লাইভ ফিড দিত না, ট্র্যাক্টরেই বসানো মেশিনে ভিডিও রেকর্ড করে রাখত—পরে চেক করে দেখার জন্য। তাই টেপগুলোর খোঁজ পেতে আমার দেরি হয়েছে। তবে পরে ওখান থেকেই ওর ছবি পাই আমি। ফ্যাসিলিটিতে হামলার আলামত দেখে বুঝতে পারছিলাম, কাজটা স্পেশাল ফোর্সের ট্রেইনিং পাওয়া সৈনিক ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আর্কটিকে আমাদের একটা লিসেনিং পোস্টও আপনাদের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করেছিল, কথাবার্তা শুনে আলফা-টিম যে সাধারণ কোনও খুনীর দল নয়, এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হই। খুনীদের ছবি নিয়ে স্পেশাল ফোর্সের ডাটাবেজে সার্চ করতে শুরু করি, ওখান থেকেই পেলাম প্রাক্তন ক্যাপ্টেন থিও ভ্যান বুরেনের নামটা।

'ড. স্ট্যানলি ডোনেন সম্পর্কেও খোঁজ নিচ্ছিলাম আমরা—দেখলাম, ছাত্রজীবনে খুব ঘনিষ্ঠ ন'জন বন্ধু ছিল তাঁর... একজন ছাড়া সবাই মারা গেছে,

রহস্যজনকভাবে। সেই একজন হচ্ছেন আপনি—থিও ভ্যান বুরেনের একমাত্র বোন! ব্যস, দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে আর কী অসুবিধে হয়? পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে—ভাইরাসটা আপনি ছেড়েছেন, বাকিদের নিজের ভাইয়ের মাধ্যমে সরিয়ে দিয়েছেন, যাতে প্রতিষেধকটা তৈরি করতে না পারে কেউ।'

কোনও কথা ফুটল না এলিসার মুখে—এই লোক সত্যিই তাঁর নীল নকশার নাড়িনক্ষত্র জেনে ফেলেছে।

'আপনাকেই প্রথমে খোঁজ করছিলাম আমরা,' বলে চলল বুলডগ। 'কিন্তু কোথায় যে ঘাপটি মেরেছেন, তা বের করতে পারলাম না। শেষে আপনার ভাইয়ের দিকে নজর দিলাম, দেখলাম তিনি ভালমানুষের মত মেক্সিকো থেকে অ্যামস্টারড্যামের দিকে রওনা দিয়েছেন... ওঁর কীর্তিকলাপ যে আমরা জেনে ফেলব, সেটা আন্দাজও করতে পারেননি বোধহয়। নিজ নামেই ট্র্যাভেল করছিলেন সেজন্যে। তিনজনকেই ধরার জন্য ফাঁদ পাতি আমরা, নেদারল্যাণ্ড সরকারকে জানাই—স্মাগলিং সংক্রান্ত একটা বিষয়ে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। অনুমতি পেতে অসুবিধে হয়নি, গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শিফল এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছে আমার লোকজন, আজ ওরা ল্যাণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গে আটক করেছে...'

'ওরা আমাদের ফোনগুলো নিয়ে নিয়েছে, সেজন্যেই তোমার কল রিসিভ করতে পারিনি,' বলল থিও।

বুলডগের দিকে মুখ তুলে তাকালেন এলিসা, নিজেকে সামলে নিয়েছেন। 'আমাদের নিয়ে কী করতে চান আপনি?'

'বললাম না, কী করব—সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে?' চেয়ারে হেলান দিল বুলডগ।

'অ্যান্টি-ভাইরাসটা পেলেই ছেড়ে দেবেন আমাদের?'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, ডক্টর,' হাসল বুলডগ। 'প্রথমে দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে।'

'কী প্রশ্ন?'

'আপনাকে দেখে মোটেও উন্মাদ বলে মনে হয় না। বরং এখন পর্যন্ত যা তথ্য-প্রমাণ পেয়েছি, তাতে তো মনে হচ্ছে অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে মাঠে নেমেছেন। তাই আমি জানতে চাই, আসলে আপনার উদ্দেশ্যটা কী? ভাইরাসটা কেন তৈরি করেছেন? পুরো দুনিয়ার সমস্ত কম্পিউটার ধ্বংস করে দিয়ে লাভটা কী আপনার?'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন এলিসা, সব বলবেন কি বলবেন না, সেটা ঠিক করতে পারছেন না।

'সময় কিন্তু বেশি নেই আপনার হাতে,' গম্ভীর গলায় বলল বুলডগ। 'লোকাল অথরিটি এখনও আসল ঘটনা জানে না, সবকিছু বলে দিয়ে ওদের হাতে যদি তুলে দিই আপনাদের, খুনের দায়ে নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝুলবেন। সারা পৃথিবীকে বিপদে ফেলবার কারণে আর কী কী শাস্তি হতে পারে, তা আর না-ই

boighar.com

বা বললাম। আমার সঙ্গে লুকোচুরি না করলেই ভাল করবেন।'

হার মানলেন প্রৌঢ়া ইউনো। নীচু কণ্ঠে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন তাঁর পরিকল্পনা। সবকিছু খুলে বললেন তিনি, কিছুই বাদ রাখলেন না। শুনতে শুনতে মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হয়ে গেল বুলডগের। এলিসার কথা শেষ হতেই উৎফুল্ল গলায় বলল, 'ওয়াণ্ডারফুল! আপনি তো দেখি আমার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছেন, ডক্টর! অপূর্ব... এক কথায় অপূর্ব আপনার প্ল্যান!'

'তাতে লাভ কী, কাজে তো আর লাগাতে পারলাম না,' গোমড়ামুখে বললেন বিজ্ঞানী।

'কে বলল কাজে লাগাচ্ছেন না?' ধুরন্ধর সিআইএ কর্মকর্তার চোখে শয়তানির ঝিলিক। 'বিশ্বাস করুন, আমার সাহায্য নিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে কয়েক গুণ বেশি সফল করে তুলবেন আপনি!'

অবাক হয়ে গেলেন এলিসা, আলফা-টিমের সদস্যদের চেহারায়ও বিস্ময়।

'তারমানে ভাইরাসটাকে ঠেকাতে চান না আপনি?'

'চাই তো বটেই, তবে শুধু অ্যামেরিকাতে,' বুলডগ বলল। 'অন্য জায়গায় যত খুশি আঘাত হানুক ওটা, তাতে আমাদেরই লাভ। আপনার ওই প্ল্যানের জোরে পুরো পৃথিবীর উপর রাজত্ব করতে পারব আমরা। হাত মেলান, ডক্টর! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বন্ধু হতে চলেছেন আপনি।'

এবার হাসি ফুটল এলিসার মুখে। প্রতিপক্ষের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে করমর্দন করলেন তিনি। থিও বলল, 'এই খুশিতে ড্রিঙ্ক করা যেতে পারে, কী বলেন, মি. বুলক?'

'শিওর!'

আলফা টিমের তিন সদস্য শ্যাম্পেন আর গ্লাস নিয়ে এল, মদ বিতরণ করা হলো সবার মাঝে।

'আমাদের সাফল্যের আশায়!' বলে গ্লাস ঠোকাঠুকি করা হলো।

'একটা ব্যাপার আপনাকে বলা হয়নি, মি. বুলক!' শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে বললেন এলিসা।

'কী?'

'প্ল্যানটা সফল করার পথে একটা ছোট বাধা রয়েছে—তার নাম মাসুদ রানা।'

'রানা?' ভুরু কোঁচকাল বুলডগ। 'আমি ওর ব্যাপারে জানি। মণ্টেগোতে ও-ই আপনার দলের সঙ্গে লড়াই করে ড. ডোনেনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল।'

'ওটা মাসুদ রানা ছিল?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল কার্টার ওরফে আলফা-টু। 'ব্যাটা তো আমাদের সামনে সাগরে পড়ে গিয়েছিল। মরেনি?'

'না, মরেনি,' বললেন এলিসা। 'বহাল তবিয়তে বেঁচে যে আছে, শুধু তাই নয়। আমার কাছে পর্যন্ত পৌঁছেও গেছে।'

'রানা কঠিন চিজ,' স্বীকার করতে বাধ্য হলো বুলডগ। 'অ্যামস্টারড্যামে ও যে পৌঁছুবেই, তা জানতাম আমি। ওর মত একগুঁয়ে লোককে ঠেকাবার কোনও উপায় নেই ভেবে ওদিকে আর শক্তি খরচ করিনি, কারণ আমি জানি—আপনি

যেহেতু পুরো ব্যাপারটার মূলে, সেহেতু আপনার তরফ থেকে কোনও সাহায্যই পাবে না সে। বরং আপনিই আমার হয়ে ওকে পথ থেকে সরিয়ে দেবেন বলে ভেবেছিলাম।'

'চেষ্টা তো করেছি,' তিক্ত গলায় বললেন এলিসা। 'ওকেই মারার জন্য গারফিল্ডকে খবর দিয়েছিলাম, গর্দভটা আমাকেও সাক্ষী ভেবে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল। রানার কারণে বেঁচে গেছি। গারফিল্ডকে উল্টো ও-ই খতম করে দিয়েছে।'

'আপনাকে সন্দেহ করেনি তো?'

'উঁহুঁ। কোথাকার কোন্ এগারো নম্বর ইউনোকে দায়ী ভাবছে ও। আমাকে চাপাচাপি করছে অ্যান্টিভাইরাসটা তৈরি করে দেবার জন্য। ভুলভাল বুঝিয়ে ওকে আমার বাগানবাড়িতে রেখে এসেছি, বলেছি জিনিসটা তৈরি করতে যাচ্ছি।'

'এগারো নম্বর ইউনো!' বুলডগের কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল, ব্যাপারটা তার কাছে নতুন।

'ওটা স্রেফ গল্পগাথা, মি. বুলক,' আশ্বস্ত করলেন এলিসা। 'আমাদের দশজনের বাইরে আর কোনও ইউনো নেই, কখনও ছিল না, থাকতে পারে না।'

'তা হলে তো ভালই। কিন্তু এই রানার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিতে হয়। ভীষণ নাছোড়বান্দা লোক... অ্যান্টিভাইরাসটার জন্য দোজখ পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াবে আপনাকে। যদি নিতান্তই না পারে, আর বিপর্যয়টা ঘটে যায়... তখন বেরুবে প্রতিশোধ নিতে।'

'ডেনজারাস লোক,' থিও একমত হলো। 'ওকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না।'

'তা বুঝতে পেরেছি আমি,' ভাইয়ের দিকে তাকালেন এলিসা। 'ভাবছিলাম তোমাকেই পাঠাব ওর ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু এখন যখন মি. বুলক আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই ফেলেছেন...'

'চাইছেন আমিই ওকে খতম করি?' বুলডগ জিজ্ঞেস করল।

'লোকটা যে ভয়ঙ্কর, তা তো আপনারা সবাই বলছেন। ছ'জন লোক আর অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও পেরে ওঠেনি গারফিল্ডের মত অভিজ্ঞ খুনী। রানাকে শেষ করতে চাইলে বড় একটা টিম দরকার, যাতে ও মেরে কুলিয়ে উঠতে না পারে। আমার মনে হয়, আপনিই এ-ধরনের আয়োজন সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারবেন। তা ছাড়া লোকাল অথরিটি পরবর্তীতে বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাইলেও আপনি সেটা ট্যাকেল করতে পারবেন।'

মাথা ঝাঁকাল বুলডগ। 'কথাটা মন্দ বলেননি আপনি। মাসুদ রানা আর রায়হান রশিদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াটা করতে চাই আমিও। আপনার ওই বাড়িতে দুজনেই আছে তো?'

'আছে। সঙ্গে দুজন গার্ড আর আমার সেক্রেটারিও আছে।'

'হুঁ, এই তিনজনের ব্যাপারে কী করতে চান?'

'ওরা কেউই আমার কলজের টুকরো নয়, গোটা প্ল্যানের সঙ্গে কোনও

boighar.com

সম্পর্ক নেই ওদের,' বাঁকা সুরে বললেন এলিসা। 'রানা বা রায়হানের কাছে গোটা ব্যাপারটা শুনে থাকতে পারে—এমন কারও বেঁচে না থাকাটাই বরং মঙ্গল আমাদের জন্য।'

'সেক্ষেত্রে এটা ছেলেখেলা হবে,' মন্তব্য করল থিও। 'বাড়িটা আমাদেরই হওয়ায় বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, কাউকে বাঁচানোর ঝামেলাও থাকছে না... মি. বুলকের দরকার কী, আমরা তিনজনেই গিয়ে সেরে আসতে পারি কাজটা।'

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন এলিসা। 'না, কম লোক পাঠাবার ঝুঁকি নেব না আমি। তা ছাড়া এটাও চাই না—তোমরা রানার সামনে এক্সপোজড্ হয়ে যাও। মি. বুলকই এ-কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। কী, মি. বুলক, আপনি রাজি তো?'

'উইথ প্লেযার,' হাসল বুলডগ। 'রানাকে একটা শিক্ষা দেবার জন্য আমি বহুদিন ধরে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছি।'

'তা হলে আসুন, মাসুদ রানা আর রায়হান রশিদের আশু-মৃত্যু উপলক্ষে পান করি।'

ক্রূর হাসি হেসে যার যার গ্লাস তুলে ধরল ষড়যন্ত্রকারীরা।

এগারো

ড্রুইভেনড্রেশ্‌টে সন্ধ্যা নেমেছে।

দোতলার সামনের দিকের একটা কামরায় জানালার পাশে চেয়ার নিয়ে বসে আছে রায়হান, পাহারা দিচ্ছে। যদিও বাইরে গাস আর ফ্রেইবেল রয়েছে, তারপরও রানা কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। তাই ড. বুরেনের সঙ্গে কথা হবার পর থেকে দোতলায় একটা ওয়াচ-পোস্ট বসিয়েছে ও। নিজেরা পালা করে পাহারা দিচ্ছে ওখানে বসে।

বসে থাকতে থাকতে চোখদুটো একটু লেগে এসেছিল তরুণ হ্যাকারের, হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল। রানা এসে ঢুকেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কী, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'না... ইয়ে... মানে...'

'রিল্যাক্স, সারাদিন যা ধকল গেছে, তাতে শরীর একটু বিশ্রাম চাইতেই পারে।' হাতে ধরা একটা প্লেট বাড়িয়ে দিল রানা—স্ন্যাকস্ নিয়ে এসেছে। 'কিছু মুখে দাও, শক্তি পাবে। সামনে আরও কাজ রয়েছে আমাদের।'

প্লেটটা হাতে নিয়ে ঘড়ি দেখল রায়হান—ছ'টা বিশ বাজে। বলল, 'গিয়েছিলেন কোথায়? আপনার তো আরও বিশ মিনিট আগে এসে আমাকে রেহাই দেয়ার কথা।'

আরেকটা চেয়ার টেনে বসল রানা। 'পুরো বাড়ি আর আশপাশটা রেকি করে দেখলাম—তাতেই সময় লেগে গেল। অবশ্য ফেরার তাড়া ছিল না,

তোমাকে ইভার সঙ্গে খুব গল্প জুড়তে দেখলাম তো, ভাবলাম একটু দেরি করলেও তোমরা সেটা খেয়াল করবে না।'

'হুঁহ, গল্প না ছাই! আপনি যাবার একটু পরেই কেটে পড়েছে ও।' স্যাণ্ডউইচে একটা কামড় দিয়েই মুখ বাঁকিয়ে ফেলল রায়হান। 'এহ্ হে, কে বানিয়েছে এটা?'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'আমি। কেন, ভাল হয়নি?'

অপ্রস্তুত একটা হাসি হাসল তরুণ হ্যাকার। 'না, না, অসাধারণ হয়েছে...'

'চাপা মেরো না,' রানা বলল। 'বানানোর পর আমিও একটা খেয়েছি—স্বাদটা এখনও মুখে লেগে আছে।'

হেসে ফেলল রায়হান। 'কষ্ট করে আপনি আবার স্যাণ্ডউইচ বানাতে গেলেন কেন?'

'রান্নার লোক পেলাম না, কী করব? ইভাকেও দেখলাম না কোথাও।'

'গেল কোথায় ও, চলুন তো দেখি। আমাকে তো বলেছিল দশ মিনিটের মধ্যে ফিরবে।' উঠে দাঁড়াল রায়হান।

দুজনে বেরিয়ে এল করিডরে, একেকটা রুমের দরজা খুলে ভিতরে উঁকি দিতে শুরু করল। রায়হানের কামরায় পাওয়া গেল সেক্রেটারিকে—তরুণ হ্যাকারের ল্যাপটপটা অন্ করে কাজ করছে।

ওদেরকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ইভা, চেহারায় ধরা পড়ে যাবার ভাব।

'কী করছ তুমি এখানে বসে?' জিজ্ঞেস করল রায়হান।

'ইয়ে...' অপরাধীর মত বলল ইভা। 'সময় কাটছিল না, তাই ভাবলাম একটু গেম খেলি...'

'বসে বসে কম্পিউটার গেম খেলছ! আর আমরা তোমাকে খুঁজে মরছি।'

'কেন?'

দাঁত বের করে হাসল রায়হান। 'মাসুদ ভাই অসাধারণ এক স্যাণ্ডউইচ বানিয়েছেন, সেটা তোমাকে না খাইয়ে শান্তি পাচ্ছি না।'

'রায়হান!...' চোখ রাঙিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ঠিক সেই সময়ে ওর কোমরের কাছে খড় খড় করে উঠল ওয়াকিটকি—বাইরের দুই প্রহরীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটা সেট চেয়ে নিয়েছে ও।

'মি. রানা! শুনতে পাচ্ছেন?'

সেটটা মুখের কাছে তুলল রানা। 'হ্যাঁ, গাস। কী ব্যাপার?'

'আশপাশ থেকে কিছু লোককে এগিয়ে আসতে দেখছি...' কথা শেষ হলো না বেচারার, দুপ্ করে একটা শব্দ হলো স্পিকারে, পরমুহূর্তে কেটে গেল যোগাযোগ।

থমকে গেল রানা—কীসের শব্দ ছিল ওটা, বুঝতে পেরেছে। সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্র দিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে গাস ফর্ককে। ফ্রেইবেল রক্ষা পেয়েছে, এমনটা ভাবারও কোনও কারণ নেই। রুমের বাতি নিভিয়ে দৌড়ে জানালার কাছে গেল ও। পর্দা সরিয়ে সাবধানে উঁকি দিল বাড়ির

boighar.com

পিছনদিকে।

অন্ধকারটা সয়ে আসতে একটু সময় লাগল, তারপরই অভিজ্ঞ চোখে ঝোপঝাড়ের আড়ালে নড়াচড়া টের পেল ও। মনে মনে ভাগ্যকে গাল পাড়ল রানা। করিডরে বেরিয়ে অন্যপাশের রুমটায় গেল ও, ওখান থেকে জানালা দিয়ে বাড়ির সামনেটা দেখল। এদিকেও একই অবস্থা।

ওর পিছু পিছু রায়হান আর ইভাও এসেছে। তরুণী সেক্রেটারি বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'হচ্ছেটা কী?' www.boighar.com

রানার চেহারা থমথম করছে। 'নতুন একটা দল এসেছে আমাদের ব্যবস্থা করবার জন্য। এটা আগেরগুলোর চেয়ে বড়... বিশ-পঁচিশজনের কম হবে না। কর্ডন করে পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলেছে ওরা।'

'কী বলছেন!' ইভা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'গাস আর ফ্রেইবেল...'

মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ল রানা।

'ওহ্ নো!' ফুঁপিয়ে উঠল ইভা।

বিমূঢ় দেখাল রায়হানকে। 'পঁচিশজন! শিট... কীভাবে ঠেকাব ওদের?'

ঝড়ের বেগে চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'সেলারে... কুইক!'

কর্ডনটা ধীরে ধীরে ছোট করে আনছে বুলডগের বাহিনী—এরা সবাই তার প্রতি বিশ্বস্ত সিআইএ এজেন্ট, ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই মিশনের জন্য ডেকে আনা হয়েছে, প্রত্যেকেই অত্যন্ত দক্ষ। দাঁড়ি-কমা মেনে রেইড অপারেশনটা চালাচ্ছে দলটা—শুরুতে আত্মগোপন করে থাকলেও বৃত্তের আকার ছোট করে আনায় এখন আর লুকোছাপা করছে না, গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। কর্ডন থেকে নিরাপদ দূরত্বে, একশো গজ পিছনে রয়েছে বুলডগ—হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হলে বেঘোরে প্রাণ হারাতে চায় না।

'বাড়ি থেকে ত্রিশ গজ দূরত্বে পৌঁছে গেছি আমরা,' রেডিওতে রিপোর্ট দিল অ্যাসল্ট টিমের নেতা। 'এখন পর্যন্ত কেউ গুলি করেনি আমাদের লক্ষ্য করে।'

'হুঁ, তাই বলে অসতর্ক হয়ে পোড়ো না,' বুলডগ বলল। 'আমাদের টার্গেট অত্যন্ত ঘাগু লোক, সে তক্কে তক্কে থাকবে তোমাদের বোকা বানানোর জন্যে।'

'ডোণ্ট ওয়ারি, স্যর,' বলল টিম লিডার। 'আমরা অ্যালার্ট রয়েছি। আপনি পারমিশন দিলে ভিতরে ঢুকতে পারি।'

'একটু অপেক্ষা করো, হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকলে নিজেই বিপদে পড়বে। চারপাশ থেকে রিপোর্ট নাও, পুরোপুরি শিয়োর হয়ে তারপর ঢোকো।'

'ইয়েস, স্যর।'

একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে বুলডগ। এলিমেণ্ট অভ সারপ্রাইজটা নষ্ট হয়ে গেছে—বাইরের ওই গার্ডের সঙ্গে যে রানার ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ থাকবে, সেটা কে ভাবতে পেরেছিল! লোকটাকে গুলি করতেও দেরি হয়ে গেছে, তার আগেই বাড়িতে রেইডের খবর জানিয়ে দিয়েছে ব্যাটা, রানাকে সতর্ক করে দিয়েছে। এখন কী ধরনের ডিফেন্সিভ অ্যাকশন নেয় বাঙালিটা, সেটা আন্দাজ

করা সম্ভব হচ্ছে না—মাথা দারুণ চালু ছোকরার, কী করবে, ঈশ্বরই জানেন।

ডগলাস বুলকের মানসচোখে ভেসে উঠছে আরকানসাসে এক বছর আগে সেই মিশনারি চার্চ অবরোধের ঘটনাটা। পুরনো গির্জাটায় মাসুদ রানাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল এফবিআই, সিক্রেট সার্ভিস আর পুলিশের সমন্বয়ে গড়া ফেডারেল টাস্ক ফোর্স, বিল্ডিংটায় আগুনও ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল ওকে পুড়িয়ে মারার জন্য। এক কথায় অসম্ভব ছিল রানার বেঁচে থাকা। অথচ সবাইকে অদ্ভুত কৌশলে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ও, কেউ কিচ্ছু টেরও পায়নি। এবারও তেমন কিছু ঘটে কি না—সেই শঙ্কা মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না বুলডগ।

এলিসা ভ্যান বুরেন আর তার ভাই অবশ্য গ্যারান্টি দিয়ে বলেছে, তাদের বাগানবাড়ি থেকে পালাবার জন্য গোপন সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ নেই—স্বস্তির ব্যাপার এটাই। ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই রানার, বাঁচার জন্য লড়তেই হবে তাকে। তবে ছোকরার কাছে যে অটোমেটিক পিস্তল ছাড়া আর কিছু নেই, সেটাও জানা গেছে এলিসার কাছ থেকে। বাড়িতে আর কোনও অস্ত্রও নেই, কাজেই লড়াইটা সংক্ষিপ্তই হওয়া উচিত। ভেবে-চিন্তে রানার কোর্স অভ অ্যাকশন একটাই দেখতে পাচ্ছে বুলডগ—বাড়ির আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থেকে ভিতরে ঢোকা টিমটার উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে পারে সে।

আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে রেডিও। টিম লিডার জানাল, 'সবার রিপোর্ট পেয়েছি আমি, স্যর। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে না। অনুমতি দিন, তা হলে ইনফিলট্রেট করি।'

'ঠিক আছে,' বলল বুলডগ। 'বাইরে অর্ধেক লোক রেখে বাকিরা ঢোকো। এক সঙ্গে... বাড়ির চারপাশ থেকে ঢোকা চাই। আর হ্যাঁ, টার্গেট সম্ভবত লুকিয়ে থাকবে; তোমাদের চমকে দিয়ে আড়াল থেকে আক্রমণ করতে পারে। সতর্ক থেকো।'

'কিচ্ছু ভাববেন না, ভিতরে গিয়েই চিরুনির মত তল্লাশি শুরু করব। ব্যাটা লুকিয়ে থেকে সুবিধে করতে পারবে না।'

'দ্যাটস্ গুড।'

'আর কিছু?'

'না। কমেন্স অ্যাটাক!'

দোতলা বাড়িটার নীচে, ভূগর্ভস্থ সেলারে এসে ঢুকেছে রানারা। আসবার পথে কিচেন থেকে নিয়ে এসেছে একটা গ্যাস সিলিণ্ডার, বার্নার, সেইসঙ্গে কিছু স্টিলের তৈজসপত্র আর কাঁচের ছোট বোতল। জিনিসগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে রায়হান বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মাসুদ ভাই। আপনার ওপর পুরো আস্থা আছে আমার, তারপরও বলব—এখানে ঢুকে কাজটা বোধহয় ভাল করেননি। এই ভাঁড়ার ঘর হচ্ছে একটা কানা গলির মত—কোথাও যাবার উপায় নেই। কোণঠাসা হয়ে পড়ব তো!'

জিনিসপত্রগুলো দেখাল রানা। 'এগুলো কি এমনি এমনি এনেছি ভাবছ?'

boighar.com

'মতলব যে কিছু একটা এঁটেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজটা উপরে কোথাও করা যেত না?'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'উপরে থাকলে দশ মিনিটও টিকতাম না, ধরা পড়ে যেতাম।'

'সে তো এখানেও পড়ব,' রায়হান মনে করিয়ে দিল।

'দেরিতে,' যোগ করল রানা। 'সেলারের ট্র্যাপডোরটা বয়সের ভারে কিচেনের মেঝের সঙ্গে মিশে গেছে, সহজে চোখে পড়ে না—খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই? উপরে তল্লাশি করতে করতে হয়রান হয়ে তারপর এটার দিকে নজর দেবে ওরা। বাড়িটার যা আকার, তাতে বিশ-পঁচিশ মিনিট সময় পাবো আমরা। প্ল্যানটা সফল করতে বাড়তি সময়টুকু দরকার।'

'প্ল্যানটা কী আপনার?' জিজ্ঞেস করল ইভা।

'এসো, দেখাচ্ছি।' দুই সঙ্গীকে সেলারের এক প্রান্তে নিয়ে গেল রানা—বাড়ির আশপাশের বাগানে ব্যবহারের জন্য ওখানে বেশ কিছু সারের বস্তা স্তূপ করে রাখা, রেকি করার সময় দেখে গেছে ও।

বেছে বেছে দুটো বস্তা বের করল রানা, ভুরু কুঁচকে সেগুলোর লেবেল পড়ল রায়হান। প্রথমটা পটাশিয়াম নাইট্রেট, দ্বিতীয়টা এক ধরনের মিশ্র সার। কিছু বুঝতে পারল না রায়হান, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'এটার মধ্যে সালফার আছে,' দ্বিতীয় বস্তাটা দেখিয়ে বলল রানা।

'তো?'

সেলারের আরেকটা কোণের দিকে আঙুল তুলল রানা, ওখানে ফায়ারপ্লেসে ব্যবহারের জন্য কয়লার বস্তা রাখা হয়েছে।

'কী যে দেখাচ্ছেন আপনি, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না,' বিরক্ত গলায় বলল ইভা।

রায়হান অবশ্য দ্রুত চিন্তা করছে। 'পটাশিয়াম নাইট্রেট, সালফার... আর কয়লা...' হঠাৎ দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'গানপাউডার!'

'একজ্যাক্টলি!' হাসল রানা। 'সংখ্যায় শত্রুরা বেশি বটে, তবে ছোটখাট দুয়েকটা বোমা বানিয়ে সমীকরণটা আমাদের অনুকূলে নিয়ে আসা যায়। কী বলো?'

'তা তো বটেই,' রায়হানও হাসছে।

'কী বলছেন এসব!' ইভা অবাক। 'এই সার আর কয়লা মিলিয়ে আপনারা গানপাউডার বানিয়ে ফেলবেন?'

'ঠিক ধরেছ,' রানা বলল। 'বিশুদ্ধ সালফার না থাকায় জিনিসটা হানড্রেড পারসেন্ট শক্তিশালী হবে না বটে, তবে আমাদের কাজ চলবে।'

'ফিউজ আর সিল দরকার আমাদের, মাসুদ ভাই,' রায়হান চাহিদা জানাল।

'শুকনো দড়ি দেখেছি ওখানে,' রানা আঙুল তুলে প্রবেশপথের পাশটা দেখাল। 'একটা মেইন্টেন্যান্স লকারও আছে। দেখো, সিল করার মত কিছু পাওয়া যায় কি না। মোম হলেই চলবে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই সবকিছু নিয়ে ফিরে এল রায়হান। একটা ডিশে মোমবাতি ভেঙে ছোট ছোট মোমের টুকরো ফেলল রানা, তারপর সেটা রাখল আগুনের উপরে—ইতোমধ্যেই বার্নারটায় গ্যাস সিলিণ্ডার থেকে লাইন দিয়েছে ইভা, জ্বেলেছে চুলোটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গলে তরল হয়ে গেল মোম। এবার আরেকটা পাত্রে পরিমাণমত সালফারের মিশ্রণ, পটাশিয়াম নাইট্রেট আর কয়লা ঢালা হলো। একটা খুন্তি দিয়ে ভাল করে সবকিছু মেশাল রানা। রায়হান এই ফাঁকে শুকনো দড়িতে পটাশিয়াম নাইট্রেট মাখিয়ে সেগুলোকে ফিউজে পরিণত করল।

তৈরি হয়ে গেছে গানপাউডার—কাঁচের ছোট বোতলগুলোয় ওগুলো ভরে ফেলল তিনজনে, মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এল ফিউজ, সবশেষে মোম ঢেলে আটকে দেয়া হলো মুখগুলো। সবমিলিয়ে আটটা বোমা বানানো গেল এভাবে।

শব্দ করে শ্বাস ফেলল রানা। ইভা জিজ্ঞেস করল, 'মাত্র এই ক'টা বোমা দিয়ে হারাতে পারবেন উপরের লোকগুলোকে?'

'হারজিত বলতে কী বোঝাচ্ছ, তার উপর নির্ভর করে,' রানা বলল। 'যত যা-ই করি, ওদের সবাইকে ঘায়েল করা কিছুতেই সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। আমি চাইছি গ্যারাজ পর্যন্ত পৌঁছুতে, ওখানে একটা ল্যাণ্ড রোভার আছে। বোমা ফাটিয়ে যদি ওদের চমকে দিতে পারি, তা হলে গাড়িটা নিয়ে পালিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না, হতভম্ব অবস্থায় থাকবে তো, বাধা দেয়ার সময় পাবে না। যে-ক'টা বানিয়েছি, তাতে কাজ হবার কথা।'

'কিচেন থেকে গ্যারাজ কিন্তু অনেক দূর,' শুকনো গলায় বলল ইভা।

'জানি। চেষ্টার পাশাপাশি ভাগ্যের সহায়তা প্রয়োজন হবে আমাদের।'

ঘড়ি দেখল রায়হান। 'সময় কিন্তু অনেকটা পেরিয়ে গেছে, মাসুদ ভাই। এখুনি বেরিয়ে না পড়লে আটকা পড়ব, ওরা এসে যাবে।'

'হ্যাঁ, চলো।' ওর হাতে চারটে বোমা ধরিয়ে দিল রানা। 'আগুন জ্বালানোর কিছু আছে তোমার কাছে?'

'কিচেন থেকে ম্যাচ নিয়ে নেব। আপনার লাগবে?'

চুলো জ্বালতে ইভাকে গ্যাস-লাইটারটা দিয়েছিল, ওটা ফেরত নিয়ে রানা বলল, 'আমার কাছে লাইটার আছে।'

'তা হলে চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

ট্র্যাপডোরের পাল্লা একটু উঁচু করে উঁকি দিল রানা। কিচেনটা খালি দেখা গেল, এক দফা তল্লাশি চালিয়ে চলে গেছে হামলাকারীরা। সমস্ত কেবিনেট আর মিটসেফের দরজা হাঁ করে খোলা, উন্মুক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে রিফ্রিযারেটর আর ডিপ ফ্রিযটাও। লোকগুলো মোটেই ঝুঁকি নিচ্ছে না, মানুষ লুকোবার মত সব জায়গায় হানা দিচ্ছে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও—ট্র্যাপডোরটার রঙ মেঝের সঙ্গে মিশে গেছে বলে। নইলে এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো।

নিশ্চিত হয়ে সঙ্গীদের ইশারা করল রানা, তিনজনে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল কিচেনে। মেঝের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে রেখেছে, যাতে জানালা দিয়ে বাইরে থেকে দেখা না যায় ওদের। কিচেনের বাইরে করিডরে হামলাকারীদের

boighar.com

আনাগোনার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, জানালা দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে বাড়ি ঘেরাও করে থাকা লোকগুলোকেও দেখতে পেল ওরা। ঠোঁট কামড়ে কোর্স অভ অ্যাকশন ঠিক করতে শুরু করল রানা, ব্যস্ত দৃষ্টি বোলাচ্ছে চারপাশে।

বামদিকের দেয়ালে ডাম্বওয়েইটারটা নজর কাড়ল ওর—ছোট্ট একটা লিফটের মত জিনিস ওটা, নীচতলার রান্নাঘর থেকে ওটায় করে খাবারদাবার দোতলার ডাইনিং রুমে ওঠানো-নামানো হয়। এগিয়ে গিয়ে শাফটটার আকার-আয়তন পরীক্ষা করল রানা—বেশ সরু। ইভা অবশ্য সহজেই উঠতে পারবে, কিন্তু ওর আর রায়হানের কষ্ট হবে।

তরুণী সেক্রেটারির দিকে তাকাল রানা। 'দড়ি বাইতে পারো?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ইভা।

'গুড! রায়হান, নীচের মেইন্টেন্যান্স লকার থেকে একটা বোল্ট কাটার বা স্প্যানার নিয়ে এসো।'

একটু পরেই ফিরে এল রায়হান, বোল্ট কাটার এনেছে। ডাম্বওয়েইটারের শেলফটাকে কেইবল্ থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল রানা, নামিয়ে রাখল শাফটের নীচদিকে। এরপর ইভাকে বলল ভিতরে ঢুকে পড়তে।

'কেইবল্টা বেয়ে ওপরতলায় চলে যাও। কিন্তু বেরিয়ো না, কিছুক্ষণ ঝুলে থেকো।' রায়হানের দিকে ফিরল রানা। 'ওর পিছনে তুমি থাকবে।'

'আর আপনি?'

'সবার শেষে। ভাল কথা, দেয়ালে পা ঠেকিয়ে রেখো, কেইবল্টার উপর বেশি প্রেশার পড়লে উপর থেকে খুলে পড়তে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে শাফটের ভিতর ঢুকে গেল ইভা আর রায়হান, কোনও প্রশ্ন করল না আর। পকেট থেকে ছোট্ট বোমাগুলো বের করল রানা। ফিউযে আগুন ধরিয়ে কিচেনের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করল। এরপর পিস্তল বের করে জানালা লক্ষ্য করে ধাঁই ধাঁই করে কয়েকটা গুলি করল ও।

হৈ-হৈ রব উঠল বাইরে থেকে, পরমুহূর্তেই নরক ভেঙে পড়ল যেন কিচেনের মধ্যে। বৃষ্টির মত ছুটে এল কর্ডন টিমের ছোঁড়া বুলেটগুলো। জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ল, দেয়াল ফুটো হতে থাকল মোরব্বার মত।

রানা অবশ্য এসবের জন্য অপেক্ষা করছে না, গুলি ছুঁড়েই ডাম্বওয়েইটারের শাফটে ঢুকে পড়েছে ও, টেনে বন্ধ করে দিয়েছে দরজাটা। উপরে ঝুলতে থাকা রায়হানের পা স্পর্শ করে বলল, 'তৈরি থাকো, বিস্ফোরণ ঘটবে এখুনি। পড়ে যেয়ো না আবার!'

কর্ডন টিমের গুলি থেমে গেল মিনিটখানেকের মধ্যে। লাথি মেরে কিচেনের দরজা ভাঙার শব্দ হলো, অ্যাটাক গ্রুপের সদস্যরা ভিতরে ঢুকছে। কামরাটার মাঝ পর্যন্ত পৌঁছুল তারা, এমন সময় ফাটল বোমাগুলো—প্রায় একই সঙ্গে। আগুনের একটা গোলা দখল করল কিচেনটাকে, হামলাকারীরা ঝলসে গেল সে আগুনে। শকওয়েভের ধাক্কায় শাফটের ভিতরে পলেস্তরা খসে পড়তে শুরু করল।

'বেরোও, ইভা!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'বেরোও!'

বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল বুলডগ। ওয়াকিটকি তুলে জিজ্ঞেস করল, 'হচ্ছেটা কী ওখানে?'

'বোমা, স্যর!' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল টিম লিডার। 'কিচেনে বোমা ফাটানো হয়েছে!'

'হোয়াট!' খেপাটে গলায় বলল বুলডগ। 'ওরা বোমা পায় কোত্থেকে?'

'জানি না। তবে পাঁচজনকে হারিয়েছি আমি।'

'আর রানা?'

'ভিতরে নেই সে। নিশ্চয়ই সরে পড়েছে।'

'কীভাবে? তোমরা নজর রাখছিলে না সবখানে?'

'রাখছিলাম, স্যর। কিন্তু ব্যাটা গেল কোথায়, বুঝতে পারছি না।'

একটু ভাবল বুলডগ, পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'মাটির নীচে... নিশ্চয়ই সেলারে গিয়ে ঢুকেছে হারামজাদা। সব লোক জড়ো করো, সেলারটা ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া চাই!'

'ইয়েস, স্যর!' www.boighar.com

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল দলটা, ট্র্যাপডোর খুলে সেলারের ভিতরে ছুঁড়ে দিল এক ঝাঁক গ্রেনেড। মুহুর্মুহু গর্জনে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি।

তারপরও সন্তুষ্ট নয় টিম লিডার। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আবার!'

আরও এক ঝাঁক গ্রেনেড ফেলা হলো ভিতরে। আরেক দফা বিস্ফোরণে কাঁপল বাড়িটা। এবার হাসি ফুটল টিম লিডারের মুখে। ওয়াকিটকিতে রিপোর্ট দিল সে, 'ইটস্ ডান, স্যর। টার্গেটকে কিমা বানিয়ে ফেলেছি আমরা।'

'লাশ দেখাও আমাকে!' বলল বুলডগ। 'তার আগে আমি স্বস্তি পাবো না।'

দলের লোকজনকে নিয়ে সেলারে ঢুকল টিম লিডার। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তল্লাশি শুরু করল। আর ঠিক তখুনি ওয়াকিটকিতে ভেসে এল আর্তনাদের মত একটা কণ্ঠ। দোতলায় ব্যাকআপ হিসেবে দুজনকে রেখে আসা হয়েছিল, তাদেরই একজন উন্মাদের মত চেঁচাচ্ছে।

'দিস ইজ ফক্সট্রট-ফাইভ! উই আর আণ্ডার অ্যাটাক... উই আর আণ্ডার অ্যাটাক!!'

দোতলার করিডর ধরে ছুটছে রানা, পিছু পিছু রায়হান আর ইভা। হঠাৎ সামনে অ্যাটাক টিমের দুজন উদয় হলো। তিন টার্গেটকে ওপরতলায় আশা করেনি তারা, চমকে গেল মুহূর্তের জন্য, দেরি করে ফেলল হাতের উজি সাবমেশিনগান তুলতে। সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা, ছুটন্ত অবস্থাতেই হাতের পিস্তল তুলে গুলি করল। লোকগুলো বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে, তাই বুকের বদলে নিশানা করল আরেকটু উপরে—উন্মুক্ত জায়গায়।

সামনের লোকটার গলায় ঢুকে গেল বুলেট, খাবি খেতে খেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে—শ্বাসনালী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, বিশ্রী ঘড় ঘড় শব্দে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত। দ্বিতীয় জনের রিফ্লেক্স চমৎকার, মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখেই ডাইভ

 boighar.com

দিয়েছে সে, গুলি ফাঁকি দিয়ে পাশের একটা রুমে ঢুকে পড়ল। ভিতরে তাকে চেঁচাতে শোনা গেল—ওয়াকিটকিতে সাহায্য চাইছে।

'দিস ইজ ফক্সট্রট-ফাইভ! উই আর আণ্ডার অ্যাটাক... উই আর আণ্ডার অ্যাটাক...'

গাসের কথা মনে পড়ল রানার, ঠিক এই রকম একটা পরিস্থিতিতেই বেচারাকে নির্মমভাবে খুন করেছে এরা। নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে নির্দেশ দিল ও, 'রায়হান, চুপ করাও ওকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে একটা বোমা বের করল তরুণ হ্যাকার, দাঁত দিয়ে কেটে ফিউজটা ছোট করে নিল, তারপর আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে দিল রুমের ভিতরে, দরজা ফাঁক করে।

মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডের বিরতি পড়ল কাজটুকুর জন্য। আবার ছুটতে শুরু করল ওরা। পিছনে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল, কাতর একটা ধ্বনি ভেসে এল রুম থেকে।

দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গেল তিনজন। সামনেই নীচে যাবার আরেকটা সিঁড়ি, সেটা ধরে নেমে এল গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। হইচই শোনা গেল, করিডর ধরে ছুটে আসছে সেলার থেকে উঠে আসা দলটা। রানার আদেশের জন্য অপেক্ষা করল না রায়হান, আরেকটা বোমায় আগুন ধরিয়ে সজোরে ছুঁড়ে দিল ধাওয়াকারীদের উদ্দেশে। প্রাণ বাঁচাতে লাফ দিয়ে সরে গেল লোকগুলো, করিডরের মাঝখানে প্রচণ্ড শব্দে ফাটল বোমাটা।

গ্যারাজে যাবার দরজার সামনে পৌঁছে গেছে রানা, লাথি মেরে খুলে ফেলল ওটা—দুই সঙ্গীসহ দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল ল্যাণ্ড রোভারে। সঙ্গে চাবি না থাকায় টান দিয়ে ড্যাশবোর্ডের তলা থেকে বের করে আনল এক গোছা তার, ইগনিশনের ওয়্যারিঙে স্পার্ক ঘটিয়ে স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে।

'সিটবেল্ট বাঁধো,' দুই সঙ্গীকে বলল ও।

গিয়ার দিল রানা, সজোরে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। কংক্রিটের মেঝেতে টায়ার ঘষা খাবার কর্কশ শব্দ হলো, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করতেই তীরের মত সামনে বাড়ল ল্যাণ্ড রোভার--গ্যারাজের দরজা চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বুলডগ তখন রেডিওতে চিৎকার জুড়েছে—'স্টপ দেম! স্টপ দেম!!'

তাতে লাভ হলো না। বাড়ি থেকে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে ছিল কর্ডন টিম, তাই প্রতিক্রিয়ার কোনও সময়ই পেল না তারা, চোখের পলকে গাড়িটা চড়ে বসল তাদের গায়ের উপর। সামনে দুজন মানুষ পড়ে গেছে দেখেও স্পিড কমাল না রানা, বাম্পারের ধাক্কায় উড়িয়ে দিল ব্যাটাদের। ফলে কর্ডনের মাঝখানে একটা ফাঁক পেয়ে গেল ল্যাণ্ড রোভার; সেখান দিয়ে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল বেষ্টনী ভেদ করে।

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল বাকিরা, পলায়নরত বাহনটার পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল, অস্ত্র তুলে ফায়ারও করছে একই সঙ্গে। ল্যাণ্ড রোভারের পিছনে ইস্পাতের ফুলকি উড়ল, ভেঙে পড়ল কাঁচ, গুলির আঘাতে রিয়ার-এণ্ড

ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে গাড়িটার।
'মাথা নামিয়ে রাখো!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল রানা।
আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে ল্যাণ্ড রোভার, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পিছে ফেলে দিল পদব্রজে ছুটতে থাকা ধাওয়াকারীদের। একটু পরেই পৌঁছে গেল বাগানবাড়ির মূল ফটকে—বন্ধ ওটা, এবারও স্পিড কমাল না রানা, গেট ভেঙে বেরিয়ে এল রাস্তায়।
শব্দ করে শ্বাস ফেলল ইভা। 'থ্যাঙ্ক গড যে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।'
'এখুনি খুশি হয়ো না,' বলল রায়হান। 'বিপদ এখনও কাটেনি।'
'মানে!'
'ওদের সঙ্গে কোনও গাড়ি ছিল না, খেয়াল করেছ? ওগুলো নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও আছে... ব্যাকআপ টিমসহ।'
'কী!'
'রায়হান ঠিকই বলেছে,' শান্তস্বরে বলল রানা, চোখ রিয়ারভিউ মিররে। 'পিছনে তাকিয়ে দেখো।'
মাথা ঘুরিয়েই আঁতকে উঠল ইভা। তীব্র বেগে ওদের ট্রেইল ধরে ছুটে আসছে দুটো ফোর্ড এস.ইউ.ভি—ড্রাইভারের বিপরীত পাশের জানালা দিয়ে শরীরের একাংশ বের করে রেখেছে দুজন গানার, তাদের হাতের উজি সাবমেশিনগানগুলো দূর থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।
'ওহ্ নো...'
কথা শেষ হলো না তরুণী সেক্রেটারির, গুলি শুরু করল খুনীরা।

বারো

রাস্তার অ্যাসফল্টে কর্কশ শব্দ তুলে চলেছে চাকাগুলো—ঘন ঘন স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে রানা, এঁকে বেঁকে বুলেটবৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে চায়। লাভ বলতে টায়ারগুলোকে এখনও বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে, কিন্তু ছাঁকনির মত ফুটো হয়ে যাচ্ছে ল্যাণ্ড রোভারের চেসিস; এখনও যে দেয়াল ভেদ করে গুলিগুলো যাত্রীদের গায়ে এসে লাগেনি, সেটা স্রেফ ভাগ্যের জোরে।
'চুপচাপ বসে থেকো না, রায়হান!' পাশে তাকিয়ে চেঁচাল রানা। 'ফায়ার করো!'
মাথা ঝাঁকাল তরুণ হ্যাকার, সিটবেল্ট খুলে ফেলে উল্টো ঘুরল সে, কোমর থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে। ইভা তার সিটে শুয়ে পড়েছিল আগেই, মেয়েটার উপর দিয়ে হাত প্রসারিত করল ও, পিছনের ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ফাঁক দিয়ে গুলি করতে শুরু করল।
একটা ফোর্ডের কাঁচে ফাটল ধরতে দেখা গেল, তবে আরোহীদের কেউ আহত হয়নি। পাল্টা গুলিতে তাদের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল যেন, আগের

boighar.com

চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণে গুলি করতে থাকল তারা।

রায়হানের ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে, সিটের আড়ালে শরীরে নামিয়ে গাল দিয়ে উঠল ও। 'শিট! আমার অ্যামিউনিশন শেষ, মাসুদ ভাই।'

নিজের জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে রানারও মুখ কালো হয়ে গেল। একটাই ক্লিপ আছে। ওটা রায়হানের হাতে দিয়ে বলল, 'এ-ই আমাদের শেষ সম্বল।'

'এ দিয়ে কিচ্ছু হবে না, মাসুদ ভাই। খামোকা গুলি খরচ করার কোনও মানে দেখতে পাচ্ছি না।'

'হায় হায়!' পিছনের সিট থেকে হাহাকার করে উঠল ইভা। 'তোমাদের গুলি শেষ?'

ফুয়েল গজের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা—সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে, কাঁটাটা দ্রুত বাঁয়ে ঘুরে যাচ্ছে। 'আমাদের ফুয়েল লাইনও হিট হয়েছে,' দুঃসংবাদটা অন্যদের জানিয়ে দিল ও।

'ইয়াল্লা!' রায়হানের চেহারা দেখে মনে হলো এক চামচ তেতো ওষুধ তাকে খাইয়ে দিয়েছে কেউ। 'তা হলে?'

দ্রুত চিন্তা করল রানা। অস্ত্র বলতে শুধু রায়হানের কাছে তিনটে বোতল-বোমা বাকি রয়েছে। ওগুলো বের করতে বলল ও।

'লাভ কী? ওগুলো ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। পাশ কাটিয়ে চলে আসতে পারবে।'

'প্ল্যানটা কাজে লাগলে পাশ কাটাতে পারবে না।'

'কী প্ল্যান?'

খুলে বলল রানা।

'ভাল বুদ্ধি বের করেছেন,' হাসি ফুটল রায়হানের ঠোঁটে।

'দুটো বোমা নাও,' রানা বলল। 'ফিউয একদম ছোট করে ফেলে ওখান থেকে একটা দাও আমাকে, অন্যটা তুমি রাখো।'

কথামত কাজ করল রায়হান। বোমাটা হাতে নিয়ে গাড়িটাকে সিধে করল রানা, এবার সরলরেখায় ছুটছে—শত্রুদেরকে ওর পছন্দমত পজিশনে আসতে দিচ্ছে আসলে।

অনুমানটা সঠিক বলে প্রমাণ হলো। ল্যাণ্ড রোভারটা আর ডান-বাম করছে না দেখে সমান্তরালভাবে পিছনের দু'কোণে চলে গেল ফোর্ডদুটো, গতি বাড়িয়ে পাশাপাশি আসবার চেষ্টা করছে, যাতে পাশ থেকে নিশ্চিত শটে টায়ার ফাটিয়ে দিতে পারে।

রায়হানের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাইটার দিয়ে দুটো ফিউয়েই আগুন ধরাল তরুণ হ্যাকার। বোমাটা কায়দা করে ধরে রানা বলল, 'হোল্ড অন!'

পরমুহূর্তেই সজোরে ব্রেক কষল ও। থমকে গেল ল্যাণ্ড রোভার, ঘোরা বন্ধ করে চাকাগুলো বিশ্রী শব্দে ঘষা খাচ্ছে রাস্তায়, থামিয়ে ফেলছে গাড়িটাকে। অকস্মাৎ এমনটা ঘটায় তাল মেলাতে পারল না ফোর্ডদুটো, সবেগে অতিক্রম

করে যেতে থাকল থেমে পড়া বাহনটাকে।

প্রতিপক্ষের খোলা জানালাগুলো পাশাপাশি পৌঁছুতেই নড়ে উঠল দুই বিসিআই এজেন্ট, আলতো করে ছুঁড়ে দিল বোমাদুটো—সোজা এস.ইউ.ভি-দুটোর ভিতরে গিয়ে পড়ল ওগুলো। ঘটনাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, সেটাকে প্রতিরোধ করার কোনও উপায় রইল না শত্রুদের—ফিউযের দৈর্ঘ্য ছোট হওয়ায় রিঅ্যাকশনের সময়ও পেল না তারা। গাড়ির মধ্যে বোমা নিয়ে সোজা চলে গেল সামনে।

ল্যাণ্ড রোভার থেকে বিশ গজ দূরে ঘটল বিস্ফোরণ। ছোটখাট দুটো আগুনের গোলা লাফ দিয়ে উঠল ফোর্ডগুলোর ভিতরে—আরোহীরা অক্কা পেল তৎক্ষণাৎ।

দৃশ্যটা দেখে হাততালি দিয়ে উঠল রায়হান। রানার মুখেও নিষ্ঠুর হাসি।

'তোমরা কারা—বলো তো?' বিস্মিত কণ্ঠে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল ইভা। 'রায়হান, তোমাকে তো এমন ভয়ঙ্কর মানুষ বলে কখনও কল্পনাও করিনি আমি।'

'ভয়ঙ্কর মানুষ আমরা নই, ইভা; ভয়ঙ্কর ওরা!' আঙুল তুলে সামনেটা দেখাল রায়হান। 'আমরা নির্দোষ-ভালমানুষ... স্রেফ আত্মরক্ষা করছি, আর কিছু নয়।'

'কিন্তু এতসব কীভাবে সম্ভব হচ্ছে তোমাদের পক্ষে? এভাবে লড়াই করতে কোথায় শিখেছ?'

'সেসব নাহয় পরেই আলোচনা করা যাবে,' রানা নাক গলাল। 'এখনও আমাদের ঝামেলা শেষ হয়নি। বাগানবাড়ির টিমটা যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসবে।'

'এই গাড়ি নিয়ে ওদের ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়, মাসুদ ভাই, একেবারে বারোটা বেজে গেছে,' বলল রায়হান, ফাঁকা রাস্তাটার উপর চোখ বোলাল ও। 'আর কোনও গাড়িও দেখছি না যে, দখল করে পিঠটান দেব।'

'তাতে লাভও হবে না। ব্যাটাদেরকে যে-রকম মরিয়া দেখছি, কিছুতেই পিছু ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তা হলে?'

'একটা পাবলিক-প্লেসে পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে। লোকজনের ভিড়ে মিশতে পারলে পালানো সহজ হবে, দেখে ফেললেও সবার সামনে খোলাখুলি হামলা চালাবার সাহস পাবে না ওরা।'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন।'

ইভার দিকে ফিরল রানা। 'যেভাবে ফুয়েল ঝরছে, তাতে টেনে-টুনে হয়তো মিনিট পনেরো চালাতে পারব গাড়িটা। এর মধ্যে কোনও পাবলিক-প্লেসে পৌঁছুনো যাবে?'

একটু ভাবল ইভা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, রেলওয়ে স্টেশন... *বিয়ল্মার অ্যারেনা* এখান থেকে খুব কাছে। সামনে একটা বাইপাস রোড আছে, ওটা ধরে গেলে দশ থেকে বারো মিনিটের মধ্যে পৌঁছুনো সম্ভব।'

boighar.com

‘গুড,’ বলে গিয়ার দিল রানা, জ্বলন্ত ফোর্ডগুলোকে পাশ কাটিয়ে সামনে ছোটাল ল্যাণ্ড-রোভারটাকে।

দূর থেকেই আগুনটা চোখে পড়ল বুলডগের। পাশে গিয়ে গাড়িটা যখন থামানো হলো, চোয়াল ঝুলে পড়ল তার।

‘এগুলো কি... এগুলো কি...’

‘হ্যাঁ, স্যর,’ পাশ থেকে বলল অ্যাসল্ট টিমের নেতা। ‘আমাদেরই গাড়ি। আরও চারজন হারালাম আমরা।’

মুখের ভাষা হারাল বুলডগ, কিছু বলতে পারছে না। সন্দেহ হলো তার—মাসুদ রানা লোকটা রক্তমাংসের মানুষ, নাকি অন্যকিছু? এত আয়োজন করে হামলা চালাবার পরও সে বেঁচে যায় কী করে? আক্রমণের পরিকল্পনা যখন করা হচ্ছিল, তখন একটাও খুঁত চোখে পড়েনি তার। মনে হচ্ছিল কোনও সুযোগই পাবে না ব্যাটা বাঙালি, অসহায়ভাবে মারা পড়বে। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা—ছোকরা তো মরেইনি, এ-পর্যন্ত উল্টো তেরোজনকে খতম করে দিয়েছে। কিচেনে পাঁচজন, দোতলায় দুই, কর্ডন টিমে আরও দুই, আর ব্যাকআপ টিমের চারজন... চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়ের মত স্কোর বাড়িয়ে চলেছে ব্যাটা। প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে বুলডগের জনবল। নিজের অজান্তেই ভয় ভয় করে উঠল সিআইএ কর্মকর্তার মনে—পিছু না হটলে কখন না জানি বাকিদের পাশাপাশি নিজেকেও পরপারে পাড়ি জমাতে হয়।

অ্যাসল্ট টিমের লিডারও বোধহয় একই কথা ভাবছে। নিচু গলায় সে বলল, ‘ইয়ে... স্যর। আরও কিছু লোক জোগাড় না করে বোধহয় এগোনোটা ঠিক হবে না...’

আঁতে ঘা লাগল বুলডগের, গরম চোখে তাকাল সঙ্গীর দিকে। খেঁকিয়ে উঠে বলল, ‘কী বললে! এতই যদি ভয় করে তো চুড়ি পরে বসে থাকো গে।’

‘রাগ করছেন কেন, স্যর? অবস্থাটা তো নিজ চোখেই দেখছেন। পুরো টিম নিয়েও কিছু করা যায়নি রানার, আর এখন তো লোক অর্ধেক কমে গেছে...’

‘শাট আপ!’ খেপে গেল বুলডগ। ‘গাধার বাচ্চা গাধা! পুরো অপারেশনটা লেজে-গোবরে করে এখন আবার যুক্তি দেখাচ্ছ আমাকে?’

‘আমরা আবার গোলমাল করলাম কোথায়? যেভাবে ব্রিফিং দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই তো কাজ করেছি।’

‘খবরদার, মুখে মুখে কথা বলবে না!’ হুমকি দিল বুলডগ। ‘আজ রাতের ভিতরই রানা আর ওর সাগরেদকে নিকেশ করা চাই। যদি না পারো, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়া করব আমি।’

কাঁচুমাচু হয়ে গেল টিম লিডারের মুখ। ‘জী, স্যর। এখন তা হলে কী করব?’

‘লোকাল ল-এনফোর্সমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো। খোঁজ নাও, ভাঙাচোরা ল্যাণ্ড-রোভারটা কোন্‌দিকে গেছে।’

বিয়ল্‌মার রেলস্টেশন।

মাইলখানেক দূরে রাস্তার পাশে গাড়িটা ফেলে রেখে এসেছে রানারা, টিকেট কেটে ঢুকেছে স্টেশনে। জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে ওদের—প্রচুর লোকজন রয়েছে ভিতরে, এদের মাঝে মিশে যেতে কষ্ট হবে না। তা ছাড়া সিকিউরিটিও খুব কড়া, স্টেশনের প্রবেশপথে মেটাল ডিটেক্টর রয়েছে, অস্ত্র নিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না; সেই সঙ্গে রয়েছে পুলিশি প্রহরা।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে চারপাশটা একটু দেখল রানা, পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবছে। এখানে বেশি সময় কাটানোর ইচ্ছে নেই ওর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে চায়। এই স্টেশনে মেট্রো সার্ভিসের ট্রেন থামে বলে ওগুলোরই একটায় চড়ার সিদ্ধান্ত নিল। রায়হানকে বলল টিকেট কেটে আনতে।

দশ মিনিট পরে ফিরে এসে তরুণ হ্যাকার জানাল, এ-মুহূর্তে লোকাল ট্রেন নেই কোনও। আসবে একটা, তবে আধঘণ্টা পরে। জিজ্ঞেস করল, 'ওটার টিকেট আনব?'

'নাহ্, আধঘণ্টা অপেক্ষা করাটা রিস্কি হয়ে যায়,' বলল রানা। 'এখুনি ছাড়বে, এমন কোনওটা নেই?'

'ওই যে, ওটা,' রায়হান আঙুল তুলে দেখাল।

ঝকঝকে একটা ট্রেন দেখা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের পাশে, আকৃতিটা অদ্ভুত, মাথাটা তীক্ষ্ণ বর্শার মত, যেন একটা রেসিং কার। বগিগুলো সাদা আর মেরুন রঙে নকশাকাটা। নামটা ফুটে আছে ঝকঝকে অক্ষরে: *থেলিস।*

'ওটা হাই-স্পিড ট্রেন, অভ্যন্তরীণ যাত্রী পরিবহন করে না,' জানাল ইভা। 'ওটায় যদি চড়ি, তা হলে হয় প্যারিস, নাহয় ব্রাসেলসে গিয়ে নামতে হবে।'

কিছু বলল না রানা, আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেল ট্রেনটার দিকে। হাই-স্পিড ট্রেনের কথা শুনেছে অনেক, ছবিতেও দেখেছে, কিন্তু এখনও চড়া হয়ে ওঠেনি। *ট্রেইন-আ-গ্রান্দ-ভিতে* বা সংক্ষেপে টি.জি.ভি বলে এগুলোকে।

স্থলপথে যত ধরনের যানবাহন আছে, তার মধ্যে এক বিস্ময় এই টিজিভি—আধুনিক ট্রান্সপোর্টেশনের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। মাটিতে চললেও এগুলো পাল্লা দিতে পারে যে-কোনও যাত্রীবাহী আকাশযানের সঙ্গে। হাই-স্পিড রেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর দ্রুত গতি। সবচেয়ে আস্তে যেটা চলে, সেটারও গতিবেগ ঘণ্টায় দুশ' কিলোমিটার। গিনেস বুকে সর্বোচ্চ ৫৭৪ কিলোমিটার বেগে চলার রেকর্ড রয়েছে একটা জাপানি টিজিভির। এই স্পিড সাধারণ রেললাইনে অর্জন করা সম্ভব নয়, তাই টিজিভির ট্র্যাক ভিন্ন ধরনের। চৌম্বকীয় পাত বসিয়ে তৈরি করা হয় হাই-স্পিড রেলওয়ে—ওগুলোর উপর দিয়ে বিপরীতমুখী চুম্বকের প্রভাবে ভেসে থাকে টিজিভির বগিগুলো, চাকা আর রেললাইনের মধ্যকার ঘর্ষণজনিত কোনও রকম বাধা না থাকায় ছুটতে পারে অনায়াসে। দিন দিন প্রযুক্তিটার আরও উন্নতি হচ্ছে। শুরুতে এই ট্রেনগুলোয় মেকানিক্যাল যা যা ছিল, তার সবই আজকাল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কম্পিউটার দিয়ে। টিজিভি এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা যোগাযোগ মাধ্যম, ইন্টারন্যাশনালি পরিচালিত হয় বলে প্রচুর ইয়োরোপিয়ান আজকাল বিমান বাদ

boighar.com

দিয়ে এতেই ভ্রমণ করে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি এখান থেকেই সোজা প্যারিসে চলে যাবে নাকি?'

'না,' রায়হান বলল। 'অ্যামস্টারড্যাম-সেন্ট্রালে একটা স্টপেজ আছে বোধহয়। কিন্তু ওখানে যাবার জন্য তো টিকেট দেবে না, নিলে দেশের বাইরে যাবার টিকেটই কাটতে হবে।'

'নো প্রবলেম,' ঘুরল রানা। 'চলো নিয়ে আসি।'

'মাত্র দশ-বারো ইউরো খরচ করে যেখানে যাওয়া যায়, সেখানে যেতে আপনি হাজার ইউরো খরচ করবেন?' ইভা চোখ কপালে তুলল।

হাসল রানা। 'ব্যাপারটা কেউ কল্পনাও করবে না, তাই না? সেটাই তো চাই!'

দুই সঙ্গীকে নিয়ে টিকেট কাউন্টারের দিকে এগোল ও। ইভার হাতে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পাঠাল টিকেট কিনতে, রায়হান আর ও দাঁড়িয়ে থাকল একটু পিছনে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল তরুণ হ্যাকার, রানার হাত ধরে চোখ দিয়ে ইশারা করল। রুক্ষ চেহারার কয়েকজন যুবক এসে ঢুকেছে স্টেশনে। ল্যাণ্ড রোভারটা নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছে ওরা, রেলস্টেশনটা কাছাকাছি একমাত্র পাবলিক-প্লেস হওয়ায় বুঝতে পেরেছে—শিকারেরা এখানেই আসবে। হাত খালি লোকগুলোর, তারপরও কোটের আড়ালে লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রের উপস্থিতি পরিষ্কার বোঝা গেল। একজনের চেহারা চিনতে পারল রানা—ড. বুরেনের বাগানবাড়িতে নীচতলার করিডরে দেখেছে একে।

'ইয়াল্লা,' বিস্মিত ভঙ্গিতে বলল রায়হান। 'এরা অস্ত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকল কীভাবে? মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে যাবার কথা তো!'

জবাবটা পরমুহূর্তেই পাওয়া গেল। দৃঢ় পদক্ষেপে আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো ডগলাস বুলক। গেটে নিশ্চয়ই সিআইএ-র ক্রিডেনশিয়াল দেখিয়েছে লোকটা, সেজন্যেই অস্ত্রসহ ঢুকতে দিয়েছে গার্ডেরা। ভিতরে ঢুকেই সঙ্গীদের নির্দেশ দিতে শুরু করল সিআইএ কর্মকর্তা, মাথা ঝাঁকিয়ে পুরো স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো।

দৃশ্যটা দেখে স্থবির হয়ে গেল তরুণ হ্যাকার। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'এ... এরা সব বুলডগের লোক, মাসুদ ভাই!'

রানারও ভুরু কুঁচকে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না—ড্রুইভেনডেশ্‌টে বুলডগ কেন ওদের খুন করবার চেষ্টা করবে? তা-ও এত ব্যাপক আয়োজন করে? ড. বুরেন তার ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবার কথা, আর নিরীহ একজন বিজ্ঞানীকে ধরার জন্য শুরুতেই বাইরে দাঁড়ানো প্রহরীদের খুন করে ফুল-স্কেল অ্যাসল্ট চালাতে হয় না। রানা ভদ্রমহিলার সঙ্গে আছে, এটা ভেবে সতর্কতা নিতে পারে সে, তাই বলে ওভাবে হামলা করার তো কথা নয়। কারণ ও-রকম আক্রমণে এলিসারও মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

একটা জিনিস ভাবলেই প্রশ্নগুলোর জবাব মেলে। তা হলো—রানা আর

মাইলখানেক দূরে রাস্তার পাশে গাড়িটা ফেলে রেখে এসেছে রানারা, টিকেট কেটে ঢুকেছে স্টেশনে। জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে ওদের—প্রচুর লোকজন রয়েছে ভিতরে, এদের মাঝে মিশে যেতে কষ্ট হবে না। তা ছাড়া সিকিউরিটিও খুব কড়া, স্টেশনের প্রবেশপথে মেটাল ডিটেক্টর রয়েছে, অস্ত্র নিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না; সেই সঙ্গে রয়েছে পুলিশি প্রহরা।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে চারপাশটা একটু দেখল রানা, পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবছে। এখানে বেশি সময় কাটানোর ইচ্ছে নেই ওর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে চায়। এই স্টেশনে মেট্রো সার্ভিসের ট্রেন থামে বলে ওগুলোরই একটায় চড়ার সিদ্ধান্ত নিল। রায়হানকে বলল টিকেট কেটে আনতে।

দশ মিনিট পরে ফিরে এসে তরুণ হ্যাকার জানাল, এ-মুহূর্তে লোকাল ট্রেন নেই কোনও। আসবে একটা, তবে আধঘণ্টা পরে। জিজ্ঞেস করল, 'ওটার টিকেট আনব?'

'নাহ্, আধঘণ্টা অপেক্ষা করাটা রিস্কি হয়ে যায়,' বলল রানা। 'এখুনি ছাড়বে, এমন কোনওটা নেই?'

'ওই যে, ওটা,' রায়হান আঙুল তুলে দেখাল।

ঝকঝকে একটা ট্রেন দেখা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের পাশে, আকৃতিটা অদ্ভুত, মাথাটা তীক্ষ্ণ বর্শার মত, যেন একটা রেসিং কার। বগিগুলো সাদা আর মেরুন রঙে নকশাকাটা। নামটা ফুটে আছে ঝকঝকে অক্ষরে: *থেলিস।*

'ওটা হাই-স্পিড ট্রেন, অভ্যন্তরীণ যাত্রী পরিবহন করে না,' জানাল ইভা। 'ওটায় যদি চড়ি, তা হলে হয় প্যারিস, নাহয় ব্রাসেলসে গিয়ে নামতে হবে।'

কিছু বলল না রানা, আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেল ট্রেনটার দিকে। হাই-স্পিড ট্রেনের কথা শুনেছে অনেক, ছবিতেও দেখেছে, কিন্তু এখনও চড়া হয়ে ওঠেনি। *ট্রেইন-আ-গ্রান্দ-ভিতে* বা সংক্ষেপে টি.জি.ভি বলে এগুলোকে।

স্থলপথে যত ধরনের যানবাহন আছে, তার মধ্যে এক বিস্ময় এই টিজিভি—আধুনিক ট্রান্সপোর্টেশনের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। মাটিতে চললেও এগুলো পাল্লা দিতে পারে যে-কোনও যাত্রীবাহী আকাশযানের সঙ্গে। হাই-স্পিড রেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর দ্রুত গতি। সবচেয়ে আস্তে যেটা চলে, সেটারও গতিবেগ ঘণ্টায় দুশ' কিলোমিটার। গিনেস বুকে সর্বোচ্চ ৫৭৪ কিলোমিটার বেগে চলার রেকর্ড রয়েছে একটা জাপানি টিজিভির। এই স্পিড সাধারণ রেললাইনে অর্জন করা সম্ভব নয়, তাই টিজিভির ট্র্যাক ভিন্ন ধরনের। চৌম্বকীয় পাত বসিয়ে তৈরি করা হয় হাই-স্পিড রেলওয়ে—ওগুলোর উপর দিয়ে বিপরীতমুখী চুম্বকের প্রভাবে ভেসে থাকে টিজিভির বগিগুলো, চাকা আর রেললাইনের মধ্যকার ঘর্ষণজনিত কোনও রকম বাধা না থাকায় ছুটতে পারে অনায়াসে। দিন দিন প্রযুক্তিটার আরও উন্নতি হচ্ছে। শুরুতে এই ট্রেনগুলোয় মেকানিক্যাল যা যা ছিল, তার সবই আজকাল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কম্পিউটার দিয়ে। টিজিভি এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা যোগাযোগ মাধ্যম, ইন্টারন্যাশনালি পরিচালিত হয় বলে প্রচুর ইয়োরোপিয়ান আজকাল বিমান বাদ

boighar.com

দিয়ে এতেই ভ্রমণ করে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি এখান থেকেই সোজা প্যারিসে চলে যাবে নাকি?'

'না,' রায়হান বলল। 'অ্যামস্টারড্যাম-সেন্ট্রালে একটা স্টপেজ আছে বোধহয়। কিন্তু ওখানে যাবার জন্য তো টিকেট দেবে না, নিলে দেশের বাইরে যাবার টিকেটই কাটতে হবে।'

'নো প্রবলেম,' ঘুরল রানা। 'চলো নিয়ে আসি।'

'মাত্র দশ-বারো ইউরো খরচ করে যেখানে যাওয়া যায়, সেখানে যেতে আপনি হাজার ইউরো খরচ করবেন?' ইভা চোখ কপালে তুলল।

হাসল রানা। 'ব্যাপারটা কেউ কল্পনাও করবে না, তাই না? সেটাই তো চাই!'

দুই সঙ্গীকে নিয়ে টিকেট কাউন্টারের দিকে এগোল ও। ইভার হাতে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পাঠাল টিকেট কিনতে, রায়হান আর ও দাঁড়িয়ে থাকল একটু পিছনে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল তরুণ হ্যাকার, রানার হাত ধরে চোখ দিয়ে ইশারা করল। রুক্ষ চেহারার কয়েকজন যুবক এসে ঢুকেছে স্টেশনে। ল্যাণ্ড রোভারটা নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছে ওরা, রেলস্টেশনটা কাছাকাছি একমাত্র পাবলিক-প্লেস হওয়ায় বুঝতে পেরেছে—শিকারেরা এখানেই আসবে। হাত খালি লোকগুলোর, তারপরও কোটের আড়ালে লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রের উপস্থিতি পরিষ্কার বোঝা গেল। একজনের চেহারা চিনতে পারল রানা—ড. বুরেনের বাগানবাড়িতে নীচতলার করিডরে দেখেছে একে।

'ইয়াল্লা,' বিস্মিত ভঙ্গিতে বলল রায়হান। 'এরা অস্ত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকল কীভাবে? মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে যাবার কথা তো!'

জবাবটা পরমুহূর্তেই পাওয়া গেল। দৃঢ় পদক্ষেপে আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো ডগলাস বুলক। গেটে নিশ্চয়ই সিআইএ-র ক্রিডেনশিয়াল দেখিয়েছে লোকটা, সেজন্যেই অস্ত্রসহ ঢুকতে দিয়েছে গার্ডেরা। ভিতরে ঢুকেই সঙ্গীদের নির্দেশ দিতে শুরু করল সিআইএ কর্মকর্তা, মাথা ঝাঁকিয়ে পুরো স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো।

দৃশ্যটা দেখে স্থবির হয়ে গেল তরুণ হ্যাকার। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'এ... এরা সব বুলডগের লোক, মাসুদ ভাই!'

রানারও ভুরু কুঁচকে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না—ড্রুইভেনডেশ্‌টে বুলডগ কেন ওদের খুন করবার চেষ্টা করবে? তা-ও এত ব্যাপক আয়োজন করে? ড. বুরেন তার ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবার কথা, আর নিরীহ একজন বিজ্ঞানীকে ধরার জন্য শুরুতেই বাইরে দাঁড়ানো প্রহরীদের খুন করে ফুল-স্কেল অ্যাসল্ট চালাতে হয় না। রানা ভদ্রমহিলার সঙ্গে আছে, এটা ভেবে সতর্কতা নিতে পারে সে, তাই বলে ওভাবে হামলা করার তো কথা নয়। কারণ ও-রকম আক্রমণে এলিসারও মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

একটা জিনিস ভাবলেই প্রশ্নগুলোর জবাব মেলে। তা হলো—রানা আর

রায়হান যে ওখানে একা আছে, জানত সে। ড. বুরেন নেই, সেটাও জানত। এজন্যেই নিশ্চিন্তে হামলা করতে পেরেছে। কিন্তু ওভাবে ভাবলেও নতুন প্রশ্ন উদয় হয় মনে। শেষ ইউনোকে বাগে পাবার চেষ্টা না করে দলবল নিয়ে ওদের খুন করতে উতলা হয়ে উঠবে কেন বুলডগ? নাহ্, বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

মাথা তুলে ডিসপ্লে বোর্ড আর ওটার পাশে ঝোলানো স্টেশনের মস্ত ঘড়িটার দিকে তাকাল রানা। এখনও পাঁচ মিনিট বাকি আছে থেলিস টিজিভি ছাড়তে। বুলডগের লোকজন যেভাবে গরুখোঁজা করছে ওদের, ট্রেনে চড়তে গেলে দেখে ফেলবে। ভাবনাচিন্তা করে একটাই পথ দেখতে পেল ও। রায়হানকে বলল, 'আমি ডাইভারশন তৈরি করতে যাচ্ছি, ইভাকে নিয়ে তুমি ট্রেনে উঠে পোড়ো।'

'আপনি?'

মৃদু হাসল রানা। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না, ঠিকই চলে আসব। কিন্তু আগে ওদের মনোযোগ ফেরাতে হবে, নইলে তোমরাও ট্রেনে উঠতে পারবে না।'

রায়হানকে পিছনে ফেলে হাঁটতে শুরু করল রানা, স্টেশনের যাত্রীদের আড়াল নিয়ে এগোচ্ছে। এঁকে-বেঁকে অনেকদূর ঘুরল ও, তবে দু'মিনিটের ভিতরই পৌঁছে গেল লক্ষ্যস্থলে। স্টেশনের প্রবেশপথের এক পাশে একা দাঁড়িয়ে আছে বুলডগ, তাকেই টার্গেট করেছে ও। ঘুরে তার পিছনদিকে চলে গেল ও, সন্তর্পণে এগিয়ে সোজা গিয়ে থামল একেবারে পিঠের সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে।

চমকে উঠে ঘোরার চেষ্টা করল বুলডগ, কিন্তু কিডনিতে একটা খোঁচা খাওয়ায় থেমে গেল। ওটা একটা কলম, কিন্তু সেটা বোঝার উপায় নেই কুত্তার বাচ্চার।

'নড়বেন না, গুলি করে দেব তা হলে!' হুমকির সুরে বলল রানা।

কথাটা বিশ্বাস করল বুলডগ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল যেভাবে ছিল সেভাবেই। পিছন থেকে হাতড়ে তার শোল্ডার হোলস্টার থেকে অটোমেটিকটা কেড়ে নিল রানা। কলমটা সরিয়ে ফেলে এবার ওটাই চেপে ধরল বন্দির পিঠে।

'পিস্তল ছিল না আপনার কাছে, না?' নিজেকে চাবুকপেটা করতে ইচ্ছে হলো বুলডগের, এত সহজে বোকা বনেছে বলে।

'থাকলে কি আর মালিকেরটা তার পিঠে ধরি?' হাসল রানা। 'আর কোনও কথা নয়, আসুন আমার সঙ্গে। খবরদার, চালাকি করবেন না। আপনার পিস্তলে আপনাকেই মারতে চাই না আমি।'

পিঠে খোঁচা খেয়ে হাঁটতে শুরু করল বুলডগ।

তেরো

প্ল্যাটফর্মের একপাশে অ্যাসিসটেন্ট স্টেশন ম্যানেজারের অফিসরুম, হাঁটিয়ে বন্দিকে ওখানে নিয়ে গেল রানা। ভেবেছিল বুলডগের নাম ভাঙিয়ে রুমটা খালি

boighar.com

করাবে, কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। অফিসটা এমনিতেই খালি—ম্যানেজার কোথায় যেন গেছে।

দেখে মুখে হাসি ফুটল রানার। একটা চেয়ার টেনে বসতে দিল বন্দিকে, তারপর দরজা বন্ধ করে আরেকটা চেয়ার টেনে নিজেও বসল মুখোমুখি।

'এবার... মি. বুলক,' বলল রানা। 'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনি।'

বিদ্রূপের হাসি হাসল বুলডগ। 'কীসের প্রশ্ন? আপনার খেল্ খতম, মি. রানা। অন্যকিছু ভেবে নিজেকে প্রবোধ দেবেন না। আমাকে বন্দি করে কোনও ফায়দাই হবে না আপনার। অনেক আগেই হেরে বসে আছেন আপনি।'

'কী বলতে চান, পরিষ্কার করে বলুন,' কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা।

'কিচ্ছু বলব না আমি। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, পুরো দুনিয়াকে উদ্ধারের যে দায় কাঁধে নিয়েছেন আপনি, তাতে সফল হবার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'মানে!'

'মানে হচ্ছে—ইউ আর ফাইটিং ফর আ লস্ট কয, মি. রানা। যতই কেরামতি দেখান, ফলাফলটা অনেক আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।'

'কী!'

'হ্যাঁ, মি. রানা। অ্যান্টিভাইরাসটা পেয়ে গেছি আমি, ইতোমধ্যে পেন্টাগনে পৌঁছে গেছে ওটা। সেই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করেছি—আপনি যেন কিছুতেই ওটার কোনও কপি না পান।'

'ড. বুরেন! কোথায় তিনি? কী করেছেন আপনি তাঁকে নিয়ে?'

'সেসব নিয়ে আপনাকে আর ভাবতে হবে না—ওই ভদ্রমহিলা আর কোনও কাজে আসবেন না আপনার।'

'মেরে ফেলেছেন ওঁকে?'

উত্তর না দিয়ে বুলডগ শুধু হাসল।

'জবাব দিন, মি. বুলক!'

'গলা চড়িয়ে লাভ হবে না। ইটস্ ওভার, মি. রানা।'

'সেজন্যেই আমাকে আর রায়হানকে খুন করতে গেছেন? যদি হেরে গিয়েই থাকি আমরা, তা হলে আর মারার দরকার কী? সামনে এসে আমাদের অপমান করলেই কি যথেষ্ট ছিল না?'

'ছেঁড়া সুতোকে কখনও ঝুলে থাকতে দিতে হয় না, মি. রানা। ওটাকে কেটে ফেলে দিতে হয়। আপনি ভবিষ্যতে সত্য প্রকাশ করে গোটা পৃথিবীর সামনে অ্যামেরিকার ইমেজ ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন, সেটা কীভাবে হতে দিই, বলুন?'

'দেশের ইমেজ, নাকি আপনার? ষড়যন্ত্রটা ফাঁস হয়ে গেলে আপনার সাধের অ্যামেরিকা কাকে কোরবানির ছাগল বানাবে, তা আমি জানি না ভেবেছেন?'

'যা খুশি ভাবতে পারেন,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল বুলডগ। 'আপনার ভাবাভাবিতে কিচ্ছু যাবে-আসবে না—কিছুই করতে পারবেন না কি না! দৌড়-ঝাঁপ বন্ধ করে বরং আত্মসমর্পণ করুন, বাঁচার একটা সুযোগ দিতে পারি

আপনাকে।'

'আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বলছেন!' রানা বলল। 'এ-মুহূর্তে বেকায়দায় তো আছেন আপনি।'

'এটা কোনও সমস্যাই না,' মনে হচ্ছে, একটুও চিন্তিত নয় বুলডগ। 'আমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবেন না আপনি, আমার লোকজন ঠিকই খোঁজ করতে শুরু করবে। বরং নিজেই ফাঁদের মধ্যে রয়েছেন আপনি, মি. রানা। এখানকার পুলিশকে আপনাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে—স্টেশন থেকে বেরুতে তো পারবেনই না, ট্রেনে চড়তে গেলেও অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন।'

'তাই নাকি?' বাঁকা সুরে বলল রানা। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু বাইরে স্টেশনের পাবলিক-অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাইক গম গম করে ওঠায় চুপ হয়ে গেল।

'অ্যাটেনশন প্লিজ। দিস ইজ দ্য লাস্ট বোর্ডিং কল ফর থেলিস এক্সপ্রেস টু প্যারিস। আই রিপিট...'

একটু ভাবল রানা। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল ইন্টারকমের রিসিভার। নির্দিষ্ট নাম্বারটা খুঁজে নিয়ে ডায়াল করে বলল, 'ইনফরমেশন ডেস্ক? আমি একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে চাই...'

ওর কথাগুলো শুনতে পেয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল বুলডগের। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'মানেটা কী এর?'

'এখুনি দেখবেন,' বলে পিস্তলটা উল্টো করে সজোরে বন্দির ঘাড়ের উপর আঘাত করল রানা।

চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল বুলডগ মেঝেতে—জ্ঞান হারায়নি, কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখছে, নড়তে পারছে না। আর তখনই শোনা গেল ঘোষণা।

'অ্যাটেনশন প্লিজ! ডগলাস বুলক নামে একটি ছোট্ট বাচ্চাকে প্ল্যাটফর্মে খুঁজে পাওয়া গেছে। বাবা-মা'র নাম-পরিচয় কিছু বলতে পারছে না সে, কাঁদছে। বাচ্চাটির অভিভাবকদের জরুরি ভিত্তিতে স্টেশনের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজারের অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে খড় খড় করে উঠল বুলডগের ওয়াকিটকি। উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করা হলো, 'স্যর, আপনি কোথায়? পাবলিক-অ্যাড্রেসে কী সব বলা হচ্ছে...'

পড়ে থাকা বুলডগের কোমর থেকে ওয়াকিটকিটা খুলে আনল রানা, মুখের কাছে এনে নাকি সুরে বলল, 'হেল্প! হেল্প!! আমাকে মেরে ফেলল...'

'হোয়াট দ্য... স্যর, আমরা এখুনি আসছি!'

হাত থেকে সেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা।

কাতরাতে কাতরাতে বুলডগ বলল, 'ইউ আর আ ডেড ম্যান, রানা! তোমাকে আমি ছাড়ব না!'

নিষ্ঠুরভাবে হাসল রানা। 'আপনি না ছাড়ুন, তবে এবারের মত আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। যাবার আগে একটা কথা বলি—স্বার্থের জন্য পুরো পৃথিবীকে বিপদে ফেলে কাজটা আপনি একদমই ভাল করেননি, মি. বুলক।

boighar.com

এ-ধরনের মানুষ নামের পিশাচকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি আমি। এবার ছাড়লাম ঠিকই, কিন্তু যদি এ-পথ থেকে সরে না দাঁড়ান, আগামীবার আমি কোনও দয়া দেখাব না। গুড বাই।'

অফিস থেকে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল রানা। ওর প্ল্যানটা কাজে লেগেছে—হাঁকডাক করতে করতে বসের খোঁজে ছুটে আসছে সিআইএ এজেন্টরা। সবকিছু ভুলে ছুটে আসছে পুলিশও—তিন পলাতককে ধরার জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, সব মাথায় উঠেছে। জুতোর ফিতে বাঁধার ভঙ্গিতে বসে পড়ল রানা, ওকে পেরিয়ে চলে যেতে দিল দলটাকে। লোকগুলো দূরে সরে যেতেই উঠে দাঁড়াল ও, ছুটতে শুরু করল টিজিভির দিকে—ওটার কম্পার্টমেন্টগুলোর দরজা বন্ধ হতে শুরু করেছে। একটা জানালায় রায়হান আর ইভার মুখ দেখতে পেল, হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ট্রেনে উঠতে পারল ও—দরজা প্রায় বন্ধ হয়েই গিয়েছিল, সামান্য ফাঁকটার মধ্য দিয়ে কোনওমতে লাফিয়ে কম্পার্টমেন্টে ঢুকল রানা। সোজা হতেই দেখল, যাত্রীরা বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'সরি,' একটু হেসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল ও, 'বাথরুমে দেরি করে ফেলেছি।'

কুঞ্চিত ভ্রূগুলো সোজা হয়ে গেল, যাত্রীরা সবাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। হেঁটে গিয়ে রায়হানের পাশে গিয়ে বসল রানা।

'কী করে এসেছেন, বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল তরুণ হ্যাকার। 'বুলডগের নামে অদ্ভুত একটা অ্যানাউন্সমেন্ট শুনলাম...'

জবাব না দিয়ে জানালার দিকে চোখ ফেরাল রানা—না, ট্রেনটাকে থামাতে ছুটে আসছে না কেউ।

নিরাপদেই বিয়ল্‌মার অ্যারেনা থেকে বেরিয়ে এল থেলিস টিজিভি।

www.boighar.com

অফিসরুম থেকে ধরাধরি করে বুলডগকে বের করে আনল তার এজেন্টরা। একটু সুস্থ বোধ করতেই গা-ঝাড়া দিয়ে সবাইকে সরিয়ে দিল সে। খেপাটে গলায় বলল, 'ছাড়ো আমাকে! এখন আর দরদ দেখাতে হবে না! কানার দল, চোখে ঠুলি পরে ঘুরছিলে নাকি? হারামজাদা রানার বাচ্চা আমাকে ধরে নিয়ে গেল, তোমরা কেউ দেখতেও পেলে না?'

গালি খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে গেছে অ্যাসল্ট টিমের লিডার। তিক্ত গলায় বলল, 'শুধু আমাদের দোষ দেন কেন? আপনিও তো দেখেননি ওকে।'

'আবার মুখে মুখে কথা! সবক'টা আবার আমাকে বাঁচাতে ছুটে এসেছে। এটা যে একটা ডাইভারশন ছিল, সেটা বোঝোনি?'

মুখ কালো করে ফেলল সবাই—আসলেই বোকার মত কাজ করেছে। টিম লিডার তাড়াতাড়ি বলল, 'চিন্তা করবেন না, স্যর। এখুনি চিরুনিখোঁজা করছি...'

'হ্যাঁ, মাসুদ রানা তোমার জন্য বসে আছে আর কী!' রাগে চোখদুটো জ্বলছে বুলডগের। 'পগার পার হয়ে গেছে ও, বুঝলে, পগার পার হয়ে গেছে!' পাশে দাঁড়ানো এক পুলিশ অফিসারের দিকে তাকাল সে। 'অ্যানাউন্সমেন্টটা

হবার পর কোনও ট্রেন ছেড়েছে?'

'হ্যাঁ,' বললেন অফিসার। 'একটা হাই-স্পিড ট্রেন, নন-স্টপ... প্যারিসে যাচ্ছে।'

'প্যারিস!' টিম লিডার বলল। 'তা হলে ওটায় চড়েনি...'

'সব শোনার আগেই কথা বলো কেন?' খেঁকিয়ে উঠল বুলডগ। 'অফিসার, আর কোনও স্টপেজ আছে ওটার?'

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক। 'অ্যামস্টারড্যাম সেন্ট্রাল থেকেও যাত্রী উঠবে ওটায়।'

'ওখানকার সিকিউরিটিকে সতর্ক করে দিন...'

কথা শেষ হলো না বুলডগের, কোটের পকেটে মোবাইল বেজে ওঠায় থেমে কানে তুলল ফোনটা। জটলা থেকে একটু দূরে সরে এসে বলল, 'হ্যালো?'

'হ্যালো, মি. বুলক!' ওপাশ থেকে এলিসার কণ্ঠ শোনা গেল। 'তর সইছিল না, তাই নিজেই ফোন করে ফেললাম। সব ঠিকঠাকমত শেষ হয়েছে তো?'

'কীসের শেষ... হারামজাদাটা আমার নাকে দম তুলে রেখেছে, এখনও ধাওয়া করে বেড়াচ্ছি ওকে।'

'কী বলছেন!' থমকে গেলেন এলিসা। 'এইমাত্র ড্রুইভেনড্রেশ্‌টের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফোন এসেছিল, আমার বাগানবাড়িতে নাকি গোলাগুলি হয়েছে, লাশ পাওয়া গেছে কয়েকটা। আমি তো ভাবলাম, কাজ শেষ করে ফেলেছেন আপনারা।'

'কিছুই শেষ হয়নি,' বুলডগ বলল। 'লাশ ওগুলো সব আমার লোকের। হারামজাদা রানা ওদেরকে মেরে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে!' কথাটা এলিসার বিশ্বাস হচ্ছে না। 'কীভাবে?'

'সেসব পরে শুনবেন, এখন সময় নেই। একটা হাই-স্পিড ট্রেনকে ইন্টারসেপ্ট করতে যাচ্ছি আমি।'

'আবোলতাবোল কী বকছেন এসব?' বিরক্ত হলেন এলিসা। 'ড্রুইভেনড্রেশ্‌টে হাই-স্পিড ট্রেন আসে কোত্থেকে?'

'ওখানে নেই আমরা। রানা পালিয়ে বিয়ল্‌মারে এসেছে, এখানকার রেলস্টেশন থেকে একটা টিজিভিতে চড়ে বসেছে ও—ট্রেনটা অ্যামস্টারড্যাম সেন্ট্রালে থামবে। ওখানে যাচ্ছি আমরা।'

'কী নিয়ে একটা টিজিভিকে ধাওয়া করবেন, শুনি?' বিদ্রূপ করলেন প্রৌঢ়া ইউনো। 'পকেটে বিমান-টিমান নিয়ে ঘুরছেন নাকি?'

অপমানটা নীরবে সহ্য করল বুলডগ—ভুল কিছু বলেননি এলিসা। ট্রেনের আগে কোনওমতেই পৌঁছুনো সম্ভব নয় তার পক্ষে। মিনমিন করে বলল, 'ওখানকার পুলিশ রেডি থাকবে...'

'হুঁহ্, মাসুদ রানা বনাম রেলওয়ে পুলিশ—ফলাফলটা কি বলে দিতে হবে আপনাকে?'

মুখ দিয়ে কথা বেরুল না বুলডগের—কৈফিয়তের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। এলিসা রাগী গলায় বললেন, 'আপনাকে কাজটা দেয়াই ভুল হয়েছে দেখছি।

boighar.com

এরচেয়ে থিওকে পাঠালেই ভাল করতাম।'

আর সহ্য হলো না বুলডগের। গলা চড়িয়ে বলল, 'হয়েছে, আর খোঁটা দেবেন না। চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি আমি—ওর যদি কপাল ভাল হয় তো আমার কী করার আছে, বলুন?'

'তা হলে আর ওখানে গেছেন কী করতে?' হুল ফোটালেন যেন এলিসা। 'ডিমে তা দিতে?'

এতদিন শুধু লোকজনকে গালাগাল করেছে, নিজে এমন গালি কখনও খায়নি বুলডগ। নিজের ওষুধ নিজের উপর পড়ায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সে। বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, ডক্টর। আর একটা কথাও বলবেন না! আমি কী করি, সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। যেখানে যত লোক আছে, সবাইকে মাঠে নামাচ্ছি এখুনি। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রানার নাম-নিশানাও থাকবে না আর দুনিয়ায়!'

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এত বাড়াবাড়ি করতে গেলে আমাদের উপরই তো নজর পড়ে যাবে সবার!'

'ভয় পাচ্ছেন?' বাঁকা হাসি হাসল বুলডগ। 'তা হলে নিজেই একটা বুদ্ধি দিন দেখি?'

'বুদ্ধি-টুদ্ধির কিছু নেই, যা করার আমিই করছি,' শান্ত গলায় বললেন এলিসা। 'আপনারা ফিরে আসুন।'

'কেন... কী করতে চাইছেন আপনি?'

'সেটা দেখতেই পাবেন। ফিরে আসুন এখুনি।'

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না বুলডগ, লাইন কেটে দিয়েছেন প্রৌঢ়া ইউনো।

বুলডগের কাছে কী কী শুনে এসেছে, সব রায়হানকে খুলে বলছে রানা—কথাবার্তা হচ্ছে বাংলায়, ইভাকে এখনও কিছু জানতে দিতে চায় না ওরা। অল্পবয়েসী নাজুক স্বভাবের মেয়ে ও, সবকিছু শুনে ভয় পেয়ে যেতে পারে।

রায়হানের কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে অ্যান্টিভাইরাসটা বুলডগের পেয়ে যাবার খবর শুনে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কী মনে হয়, মাসুদ ভাই? ব্যাটা সত্যি কথা বলেছে?'

'চাপা মারার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না,' রানার কণ্ঠেও দুশ্চিন্তার ছাপ। 'যেভাবে বুক ফুলিয়ে কৃতিত্ব জাহির করছিল, তাতে ব্যাপারটা সত্যি হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

'তার মানে কি ড. বুরেনকে মেরে ফেলেছে?'

'ও-কথা তো বলেনি। দুনিয়ার শেষ ইউনোকে খুন করে ফেলবে বুলডগ; ইউনোকোডের মত শক্তিশালী একটা জিনিসকে চিরতরে হারাবে? কক্ষনো না। হতে পারে, তিনি বন্দি; আমাদের কাজে আসবেন না বলতে সেটাই বুঝিয়েছে হয়তো।'

'ব্যাটাকে ছেড়ে দিলেন কেন? ভদ্রমহিলাকে কোথায় আটকে রেখেছে, সেটা প্যাঁদানি দিয়ে বের করতে পারলেন না?'

'তাতে লাভ হতো না—মুখ খুলত না ওর মত ঘাগু লোক। কথা আদায়ের জন্য দেরি করতে গিয়ে আমরা উল্টো ধরা পড়ে যেতাম।'

'ছেড়ে দিয়েই বা লাভ কী হয়েছে? ডক্টর বুরেনের খোঁজ কি আর পাবো আমরা?'

'জানি, সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ,' স্বীকার করল রানা। 'ধরা পড়ে গেলে তা-ও থাকত না। সেজন্যেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। দেখি, ট্রেন থেকে নেমে একটা কিছু করব। দরকার হলে বুলডগ বা তার সঙ্গীদের কাউকে তুলে নিয়ে আসব।'

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই আশপাশের যাত্রীদের গুঞ্জন কানে আসছিল ওদের, কিন্তু আলোচনায় মগ্ন থাকায় গুরুত্ব দেয়নি। হঠাৎ পুরো ট্রেনটা দুলে উঠতেই সংবিৎ ফিরে পেল দুই বিসিআই এজেন্ট, লক্ষ করল—সহযাত্রীদের চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। ইভাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'অ্যাই, কী হয়েছে?'

'ওরা বলছে, ট্রেনটা নাকি দিক বদলে ফেলেছে,' বলল ইভা। 'এখন আর অ্যামস্টারড্যাম সেন্ট্রালের দিকে যাচ্ছে না এটা, অন্যদিকে ছুটছে।'

'ধ্যাত্,' হাত নাড়ল রায়হান। 'কী যে বলো না! খামোকা রুট বদলাবে কেন?'

'না, না,' ইভা মানতে রাজি নয়। 'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ট্রেনের গতি কীভাবে বাড়ছে, খেয়াল করেছ?'

অসঙ্গতিটা রানাও ধরতে পারল এবার। সত্যিই স্পিড বাড়ছে টিজিভির—সেটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, যদি না একই সঙ্গে দুলুনি সৃষ্টি হতো। ম্যাগনেটিক ট্র্যাকের উপর ভাসতে থাকা এই রেলগাড়িতে দুলুনি তো দূরের কথা, সামান্যতম কম্পনও অনুভব হবার কথা নয়। কোথাও একটা ঘাপলা আছে।

আইল্ ধরে একজন অ্যাটেনডেন্টকে আসতে দেখা গেল, যাত্রীরা ছেঁকে ধরছে তাকে। কিন্তু কোনও জবাবই দিচ্ছে না লোকটা, মুখে হাসি ফুটিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। কাছে আসতেই খপ্ করে তার হাত চেপে ধরল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, 'থামো! আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও।'

'কী ব্যাপার, স্যর? কোনও সমস্যা?' মুখ দিয়ে মধু ঝরছে যেন অ্যাটেনডেন্টের।

'সত্যিই কি দিক পাল্টেছি আমরা?'

'না, ইয়ে... মানে...'

জবাবটা যে ইতিবাচক, সেটা বুঝতে আর অসুবিধে হলো না কারও। রানা জানতে চাইল, 'ট্রেনটা দুলছে কেন?'

'ইয়ে... সামান্য টেকনিক্যাল ফল্ট, এক্ষুণি সেরে যাবে।'

হৈ হৈ করে উঠল যাত্রীরা, হাত তুলে তাদের শান্ত করল রানা।

boighar.com

অ্যাটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের টেকনিক্যাল ফল্ট এটা, বলতে পারো?'

চেহারা থেকে হাসিখুশি মুখোশটা খসে পড়ল লোকটার। বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন, স্যর। আমি কিছু জানি না। কোনও প্রশ্ন থাকলে ড্রাইভারস্ ক্যাবে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।'

'ঠিক আছে, পথ দেখাও। ওখানে নিয়ে চলো আমাদের।'

অ্যাটেনডেন্টের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল রানা, রায়হান আর ইভা; বেশ ক'জন যাত্রীও পিছু নিল। একটার পর একটা কম্পার্টমেন্ট পেরিয়ে এগোচ্ছে ওরা, দলে যোগ দিচ্ছে নতুন নতুন উদ্বিগ্ন যাত্রী—সবাই জানতে চায়, আসলে হচ্ছেটা কী? শেষ পর্যন্ত ড্রাইভারস্ ক্যাবে যখন পৌঁছুল রানারা, তখন পিছে অন্তত চল্লিশজনের একটা মিছিল হয়ে গেছে।

ইতোমধ্যে আরও বেড়েছে টিজিভির গতি, ভীষণভাবে ডানে-বাঁয়ে কাত হয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। কোনওমতে তাল সামলে দরজায় নক করল অ্যাটেনডেন্ট। কয়েক মুহূর্ত পর পাল্লা খুলে উঁকি দিল মাঝবয়েসী ড্রাইভার—চেহারাটা দুশ্চিন্তায় ছাইবর্ণ ধারণ করেছে।

'কী ব্যাপার, এখানে এত ভিড় কীসের?'

একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সব যাত্রী, একের পর এক প্রশ্ন করছে। তাড়াতাড়ি তাদেরকে শান্ত করল রানা। বলল, 'আমাকে কথা বলতে দিন।' ফিরল ও ড্রাইভারের দিকে। বুকের ওপর ঝোলানো নেম-ট্যাগটা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ট্রেনে কি কোনও সমস্যা হয়েছে, মিস্টার থিয়েসেন?'

একটু ইতস্তত করল ড্রাইভার। তারপর বলল, 'হয়েছে যে, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। নইলে কি আর আপনারা এখানে আসতেন?'

'কী সমস্যা?'

কথা বলল না থিয়েসেন, কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

'জবাব দিন, মিস্টার,' রায়হান বলল। 'কোনও বিপদ হলে সেটা জানার অধিকার আছে সবার।'

সামনের দিকে মুখ বাড়াল থিয়েসেন। নিচু গলায় বলল, 'ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি আমি। কোনও রকম কমাণ্ডই নিচ্ছে না কণ্ট্রোল প্যানেল। স্পিডও বেড়ে যাচ্ছে, অপটিমাম লিমিট ছাড়িয়ে গেছে ইতোমধ্যে, সেজন্যই দুলছে। আরও যদি বাড়ে, তা হলে স্রেফ ছিটকে যাবো আমরা। অবস্থাদৃষ্টে ওটাই ঘটবে বলে মনে হচ্ছে।'

থমকে গেল সবাই—বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছে। ঘণ্টায় তিনশ' কিলোমিটারেরও বেশি বেগে ছুটতে থাকা এই ট্রেন যদি লাইনচ্যুত হয়ে ক্র্যাশ করে, দুমড়ে-মুচড়ে আস্ত থাকবে না আর; মারা যাবে সব যাত্রী। এক মুহূর্তের জন্য চুপ রইল জটলাটা, তারপরই শুরু হলো তারস্বরে চেঁচামেচি।

'থামুন আপনারা!' চিৎকার করে ধমক দিল রানা। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।' ড্রাইভারের দিকে তাকাল ও। 'সরুন, দেখতে দিন ব্যাপারটা।'

থিয়েসেনকে পাশ কাটিয়ে ক্যাবে ঢুকল রানা, রায়হান আর ইভা; বাকিদের

জায়গা হলো না, দরজা থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকল তারা।

ক্যাবের ভিতরটা ছোট্ট একটা ককপিটের মত, একজনই ড্রাইভার বসতে পারে। সামনে রয়েছে বিশাল উইণ্ডশিল্ড, সেখানকার দৃশ্যটা স্থির নয়—তীব্রবেগে ছুটে আসছে সবকিছু, যেন গায়ের উপর লাফিয়ে পড়বে। উইণ্ডশিল্ডের ঠিক নীচেই রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার কনসোল, তাতে নানা ধরনের বোতাম আর এলসিডি স্ক্রিন শোভা পাচ্ছে।

'এখানে সব কম্পিউটার-কন্ট্রোলড?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল থিয়েসেন। 'কিছু একটা হয়েছে অনবোর্ড কম্পিউটারে, কোনও কমাণ্ড নিচ্ছে না।'

রায়হানের দিকে তাকাল রানা। 'কিছু করতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বলল তরুণ হ্যাকার। 'তবে একটা কম্পিউটার দরকার।' ওরটা বাগানবাড়িতে রয়ে গেছে, আনতে পারেনি।

দরজায় উঁকি দিতে থাকা যাত্রীদের দিকে ঘুরল রানা। 'কারও কাছে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার পান কি না, দেখুন তো! পেলে নিয়ে আসুন।'

ছুটে চলে গেল কয়েকজন, ফিরে এল একটু পরেই—*তোশিবা*-র নতুন মডেলের একটা ল্যাপটপ নিয়ে এসেছে। দুলুনি বেড়ে গেছে আরও, কনসোলের সঙ্গে যন্ত্রটার সংযোগ দিতে গিয়ে রীতিমত কসরত করতে হলো রায়হানকে—ব্যালেন্স রাখতে পারছে না, ক্যাবের এপাশ থেকে ওপাশে গড়িয়ে পড়ে যেতে চাইছে শরীরটা। অবস্থা দেখে এগিয়ে এল ইভা, বন্ধুকে সাহায্য করল। দুজনের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেটা কেইবল্ দিয়ে টিজিভির কন্ট্রোলের সঙ্গে জুড়ে দেয়া গেল কম্পিউটারটাকে।

ল্যাপটপটা কোলের উপর রেখে ড্রাইভারের সিটে বসে পড়ল রায়হান। দ্রুত কয়েকটা বাটন চেপে ট্রেনের কন্ট্রোল ইন্টারফেসটা নিয়ে এল স্ক্রিনে। প্রথমে নরমাল কমাণ্ড দিয়ে চেষ্টা করল ট্রেনটাকে থামাতে, তাতে কাজ না হওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল পুরো সিস্টেমটার অ্যানালিসিসে। কী-বোর্ডে ঝড় তুলল ওর আঙুলগুলো, একটার পর একটা প্রোগ্রাম বের করে আনছে পরীক্ষা করবার জন্যে।

পিছনে ধুপধাপ শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা—ক্যাবের বাইরে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা দুলুনিতে তাল সামলাতে পারেনি, একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে মেঝেতে। কম্পার্টমেন্টগুলো থেকে মহিলাদের আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে এল, একই সঙ্গে তারস্বরে কান্না জুড়েছে কয়েকটা বাচ্চা।

'আপনারা যার যার সিটে ফিরে যান,' লোকগুলোকে বলল ও। 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই কোনও। জানাবার মত কিছু থাকলে আমি গিয়ে বলব আপনাদের।'

প্রতিবাদ করল না কেউ, আছাড় খেয়ে শিক্ষা হয়ে গেছে সবার। তাড়াতাড়ি বাল্কহেড ধরে নিজ নিজ কম্পার্টমেন্টে ফিরতে শুরু করল তারা।

'ইভা, তুমিও যাও। এখানে কিছু করার নেই তোমার।'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল মেয়েটা। 'যাবো না আমি কোথাও। মরলে

boighar.com

আপনাদের সঙ্গেই মরব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রায়হানের দিকে তাকাল রানা। 'রায়হান, তাড়াতাড়ি করো। আর বেশিক্ষণ টিকবে না ট্রেনটা, যে-কোনও মুহূর্তে লাইন থেকে ছিটকে যেতে পারে।'

ল্যাপটপের ডালাটা বন্ধ করে ধীরে ধীরে ওর দিকে চেয়ার ঘোরাল তরুণ হ্যাকার, চেহারায় মেঘ জমেছে। মন খারাপ করা গলায় বলল, 'সরি, মাসুদ ভাই। আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।'.

'কেন? বড় কোনও সমস্যা হয়েছে?'

'শুধু বড় না, সর্ববৃহৎ,' তিক্ত গলায় বলল রায়হান। 'কন্ট্রোলটায় গলদ নেই, কিন্তু ওটাকে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। বাইরে থেকে ট্রেনের গোটা সিস্টেমটাকে দখল করে নেয়া হয়েছে। ইচ্ছে করেই রুট বদলে স্পিড বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে অ্যাকসিডেন্ট ঘটে।'

রীতিমত একটা ধাক্কা খেল রানা। 'তুমি বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই। এটা ইউনোকোডের কীর্তি... ট্রেনটা ডাচ রেলওয়ের মেইনফ্রেমে সংযুক্ত, ওটার ভিতর দিয়ে এসে পুরো সিস্টেমটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে আমাদের প্রতিপক্ষ ওই ইউনো। ইউনোকোড দিয়ে একটার পর একটা কমাণ্ড পাঠাচ্ছে। আমাদের কিচ্ছু করার নেই... চুপচাপ মরা ছাড়া।'

থমকে গেল রানা—দুঃসংবাদটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এ কীভাবে সম্ভব? ওকে আর রায়হানকে পথ থেকে সরাবার জন্য ওই ইউনো পুরো এক-ট্রেনভর্তি মানুষ মেরে ফেলতে চাচ্ছে? এদের মধ্যে নিরীহ নারী আর শিশুও তো আছে। লোকটা কি মানুষ না পিশাচ?

অসহায় বোধ করল রানা। নির্দোষ মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করতে শুরু করেছে, কিন্তু এটাও জানে—আসলে কিছুই করার নেই ওর। রায়হানের কথাই ঠিক, চুপচাপ মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই ওদের। বিষণ্ন দৃষ্টিতে একবার রায়হান, আরেকবার ইভার দিকে তাকাল ও।

রায়হানেরও একই অবস্থা—পিছনের কম্পার্টমেণ্ট থেকে ভেসে আসা বাচ্চাদের কান্নার শব্দে বুকটা ভেঙে যেতে চাইছে ওরও। ফিসফিস করে বলল, 'মাসুদ ভাই, অন্তত বাচ্চাগুলোকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করতেই হবে...'

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত প্রকাশ করতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু ইভাকে দেখে থেমে গেল। চেহারায় আমূল পরিবর্তন এসেছে তরুণী সেক্রেটারির, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে—দৃঢ়প্রতিজ্ঞার একটা ছাপ ঠিকরে বেরুচ্ছে ওর মুখাবয়ব থেকে। ড্রাইভারস্ ক্যাবের বাল্কহেড ধরে ধরে দৃঢ় পায়ে সামনে এগোল মেয়েটা, রানার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পাশ কাটাল, সোজা গিয়ে থামল রায়হানের সামনে।

'চেয়ার ছাড়ো,' আদেশের সুরে বন্ধুকে বলল ইভা 'বসতে দাও আমাকে।'

'মানে?' রায়হানের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'কথা বোলো না তো!' ধমক দিল ইভা। 'সরো এখান থেকে।'

ব্যক্তিত্বে আমূল পরিবর্তন এসেছে তরুণীর; কেন যেন নিজেকে ওর সামনে

খুব ক্ষুদ্র মনে হলো রায়হানের। কারণটা ধরতে না পারায় কৌতূহলী হয়ে ছেড়ে দিল সিটটা, ইভাকে বসতে দিল।

হাবভাবে কোনও জড়তা লক্ষ করা গেল না, ল্যাপটপটার ডালা তুলে কয়েকটা বোতাম চাপল ইভা। টিজিভির কন্ট্রোল ইণ্টারফেসের প্রোগ্রাম ভেসে উঠল স্ক্রিনে, সেটা মাত্র দশ সেকেণ্ড দেখল ও, তারপরই আরও দুটো বোতাম চেপে পুরো পর্দাটা খালি করে দিল। এবার রায়হানের চেয়েও দ্রুতগতিতে কী-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করল মেয়েটা—চোখের পলকে নতুন একটা ইণ্টারফেস উদয় হলো স্ক্রিনে—তাতে বিচিত্র সব বর্ণ ফুটে উঠছে।

যতই লেখা বাড়ল, ততই একটা পরিবর্তন টের পেল রানা। টিজিভির ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল—ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। দুলুনিও কমে যাচ্ছে একই সঙ্গে। বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়বার অবস্থা হলো ওর—অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার আন্দাজ করতে পারছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সমস্ত বিপদ কাটিয়ে উঠল টিজিভি। দোলাদুলি নেই হয়ে গেল একেবারে, গতিটাও খুব মোলায়েম একটা পর্যায়ে এসে পড়ল। তারপরও থামল না ইভা, ল্যাপটপটায় কাজ করে চলল। শেষে আর দু'মিনিট পর একেবারেই থেমে গেল ট্রেনটা—বিশাল এক প্রান্তরের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত কম্পার্টমেণ্ট থেকে হুল্লোড় শোনা গেল, জীবনসংশয়ী বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ায় খুশি বাধ মানছে না কারও। ইভা তার কম্পিউটারের একটা বাটন চাপতেই খুলে গেল সব দরজা, উত্তেজিত যাত্রীরা বেরিয়ে পড়ল মাঠে—পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মুক্ত বাতাস ফুসফুসে টেনে নিচ্ছে।

হাততালি দিয়ে উঠল ড্রাইভার থিয়েসেন। 'দারুণ দেখিয়েছেন আপনি, ম্যা'ম। আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

রানাও হাসছে। 'গুড জব, ইভা। গুড জব ইনডিড!'

রায়হানের মুখে হাসি নেই—মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে ওর, পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না কিছু। হতভম্ব হয়ে বলল, 'ক... কিন্তু কীভাবে? কীভাবে সম্ভব হলো এটা?'

ল্যাপটপটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল ইভা, সরাসরি জবাব দিল না, রহস্যের হাসি হাসল শুধু। বলল, 'কেন, বুঝতে পারছ না?'

'ও একজন ইউনো, রায়হান,' রানা বলল। 'ইভা-ই সেই একাদশ ইউনো!'

'দুঃখিত, আমার নাম ইভা নয়।'

এবার রানার চমকাবার পালা। 'তা হলে কে তুমি?'

'আমি ক্রিস্টিনা ওয়ালডেন।'

'মাইকেল আর ডেবি ওয়ালডেনের মেয়ে?'

মাথা ঝাঁকাল রহস্যময়ী মেয়েটা। 'একাদশ ইউনোও নই আমি। নম্বর দিয়েই যদি পরিচিতি হয়, তা হলে আমি এক নম্বর ইউনো। কারণ...' শান্ত কণ্ঠে বজ্রপাতটা ঘটাল এবার ও, 'আমিই ইউনোকোডের স্রষ্টা!'

boighar.com

চোদ্দো

ট্রেনটা যেখানে থেমেছে, সেখান থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে হাসেলউইযেন নামে ছোট্ট একটা শহর—অ্যামস্টারড্যামের দক্ষিণে জায়গাটা, আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে। ড্রাইভার থিয়েসেনের মুখে শহরটার কথা শুনে পায়ে হেঁটে ওখানে চলে গেল রানারা, ট্রেনে আর বসে থাকল না। টিজিভি-টার খোঁজে, সেই সঙ্গে যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থার লোকজনের পাশাপাশি পুলিশও চলে আসবে খুব শীঘ্রি, তাদের হাতে ধরা পড়তে চায় না ওরা।

রানা আর রায়হানের মাথায় গিজ গিজ করছে একগাদা প্রশ্ন, কিন্তু দ্রুত এলাকাত্যাগের তাড়া থাকায় সেগুলো ক্রিস্টিনাকে জিজ্ঞেস করতে পারছে না। হাসেলউইযেন থেকে একটা ফোক্সভাগেন গাড়ি ভাড়া করে অ্যামস্টারড্যামের দিকে রওনা হবার পর প্রথম ফুরসত মিলল। শহরের সীমানা পেরিয়ে হাইওয়েতে পৌঁছুতেই নবীন ইউনোর দিকে ঘাড় ফেরাল রানা, ড্রাইভারের ঠিক পাশের সিটেই বসেছে মেয়েটা, রায়হান বসেছে পিছনে।

'দেখো ক্রিস্টিনা...'

'আমাকে টিনা বলে ডাকুন,' বাধা দিয়ে বলল মেয়েটা।

'ওকে, টিনা... এবার মনে হয় আমাদের সবকিছু খুলে বলা উচিত তোমার। নিজেকে এক নম্বর ইউনো... ইউনোকোডের স্রষ্টা বলে দাবি করলে, কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'মিথ্যে কিছু বলিনি আমি,' শান্তস্বরে জানাল টিনা, 'আপনাদের সবকিছু খুলে বলতেও আপত্তি নেই, কিন্তু আগে আপনারা আমাকে বলুন—এসব কী ঘটছে? ইউনোকোড নিয়ে কী ঘটাচ্ছে ওই ডাইনিটা?'

'ডাইনি!' রায়হান অবাক। 'কার কথা বলছ?'

'কার কথা আবার, এক ও অদ্বিতীয় ড. এলিসা ভ্যান বুরেনের কথা।'

'এ... এসবের পিছনে উনি জড়িত?' একের পর এক চমক আর সামলাতে পারছে না রায়হান, কথা আটকে যাচ্ছে মুখে

'কীসের সঙ্গে জড়িত—সেটাই তো জানতে চাইছি।'

রানাকে দেখে মনে হলো না, ড. বুরেনের খবরটা ওর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। আসলে যুক্তি দিয়ে বিচার করে পুরো ব্যাপারটা কিছুক্ষণ আগেই আঁচ করে ফেলেছে ও। ট্রেনের ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেছে, টিনা একাদশ ইউনো হলেও খারাপ কেউ নয়। তা হলে একমাত্র এলিসাই হতে পারেন সমস্ত অঘটনের মূল, ইউনো-ভাইরাসের পিছনের ব্যক্তিটি। বুলডগ কীভাবে এত সহজে অ্যান্টি-ভাইরাসটা পেল কিংবা কেনই বা ওদেরকে খুন করতে মরিয়া হয়ে উঠল—সেটাও বোঝা যাচ্ছে এ-থেকে। এলিসা নিশ্চয়ই হাত মিলিয়েছেন সিআইএ-র সঙ্গে, সে-কারণেই ভদ্রমহিলার পথের কাঁটা মাসুদ রানা আর

রায়হান রশিদকে খতম করাটা ফরজ হয়ে গিয়েছিল বুলডগের জন্যে। লোকটার কথাগুলোও এখন আর ধাঁধার মত মনে হচ্ছে না—সত্যিই খেলাটায় অনেক আগেই হার হবার কথা রানার... ড. ডোনেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। কারণ পুরো ষড়যন্ত্রটার উদ্যোক্তা, শেষ ইউনো ড. বুরেন কখনোই ওর হাতে ভাইরাসটার প্রতিষেধক তুলে দিতেন না।

রায়হান অবশ্য এত গভীরভাবে ভাবছে না ব্যাপারটা নিয়ে, টিনার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'ধ্যাত্, কী যে বলো না! ড. বুরেন মন্দ মানুষ হতে যাবেন কেন? ফ্লেভোল্যাণ্ডে ওঁর ওপর হামলা করল না খুনীরা?'

'হামলাটা আসলে ড. বুরেনের ওপর হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে,' রানা বলল। 'বরং ভদ্রমহিলা যেভাবে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে তো মনে হচ্ছে—ফাঁদটা আমাদের জন্য পেতে সরে পড়বার চেষ্টা করছিলেন তিনি। আমরা বিমান নিয়ে যাওয়াতেই প্ল্যানটার দফারফা হয়ে যায়—পাঁচ ঘণ্টার বদলে আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছে যাই, তখনও এলিসা ম্যানরে, আমাদের সামনে পড়লে আর কেটে পড়ার উপায় থাকবে না ভেবে তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যেতে চাইলেন... গুলিও ছুঁড়েছিলেন সেজন্যে। গাড়িটা অ্যাকসিডেন্ট করাতে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। জ্ঞান ফেরার পর সময় জানতে পেরে কেমন অস্থির হয়ে পড়লেন, খেয়াল করোনি? কারণ, বুঝতে পেরেছিলেন, খুনীদের আসবার সময় হয়ে গেছে। তাই কথা বলে সময় নষ্ট করেননি, আমাদের দু'চার কথা শুনেই অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করে দিতে রাজি হয়ে গেছেন; আসলে আমাদের প্লেনে চড়ে এস্টেট থেকে সরে পড়তে চাইছিলেন যত দ্রুত সম্ভব। নাহ্, রায়হান... একবিন্দু ভুল বলছে না টিনা—ড. বুরেনই সবকিছুর মূলে।'

'কিন্তু তিনি তো কেটে পড়তে পারেননি, বরং আমাদের সঙ্গে মরতে বসেছিলেন,' রায়হান যুক্তি দেখাল। 'খুনীরা যদি ওঁরই পাঠানো হয়ে থাকে, তা হলে ওরা নিজের এমপ্লয়ারকে মারার চেষ্টা করবে কেন?'

'আমার মনে হয়, এলিসাকে চিনত না খুনীরা। সেজন্যেই মেরে ফেলতে চেয়েছে। ভদ্রমহিলা পাগলের মত মোবাইল টেপাটেপি করছিলেন, নিশ্চয়ই ওদেরকে থামতে বলার জন্য... কিন্তু যোগাযোগ করতে না পারায় বিমানের দরজায় গিয়ে লোকগুলোকে সঙ্কেত দিতে চাইছিলেন—আমি ভেবেছিলাম মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওঁর, লাফ দিতে চাইছেন।'

এবার অসঙ্গতিগুলো রায়হানও ধরতে পারছে। 'তারমানে সত্যিই ড. বুরেন ভাইরাসটা ছেড়েছেন?'

'কীসের ভাইরাসের কথা বলছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল টিনা।

'যেটা নিয়ে এতকিছু ঘটছে,' রানা বলল।

'খুলে বলুন আমাকে!'

নাসার কম্পিউটারে পাওয়া সিগনালটা থেকে শুরু করে যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল রানা আর রায়হান। শুনতে শুনতে চোখ বড় হয়ে গেল টিনার, বিস্ময় চাপা দিতে পারছে না। রানাদের কথা শেষ হতেই বলল, 'কী বলছেন আপনারা! সমস্ত ইউনোকে মেরে ফেলেছে হারামজাদীটা? সারা দুনিয়ার সমস্ত কম্পিউটার

boighar.com

ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছে? এত বড় একটা ব্যাপার... আর আমি কিছুই জানি না? নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার—ডাইনিটা এত কিছু ঘটিয়ে চলেছে, অথচ আমি কিচ্ছু টের পেলাম না... কীসের গোয়েন্দাগিরি করছি আমি তা হলে গত চারটে মাস?'

'গোয়েন্দাগিরি!'

'ইউনোকোড নিয়ে শাকচুন্নিটার একটা বদ-মতলব আছে বলে জানতাম আমি, সেজন্যেই ক্রিয়েলটেকে চাকরি নিয়েছিলাম। ইচ্ছে করে প্রোগ্রামারের কাজকর্ম খারাপভাবে করেছি, কারণ ট্রেইনিঙে যারা খারাপ করবে, তাদের মধ্য থেকে একজনকে সেক্রেটারি বানানো হবে—এই খবর পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। আসলে এলিসার কাছাকাছি পৌঁছুতে চাইছিলাম।'

'জাস্ট আ মিনিট,' রানা বাধা দিল। 'উনি যে কুমতলব আঁটছেন, সেটা তুমি আগে থেকে জানলে কী করে?'

'ওসব পরে বলি? আগে ভাইরাসটার ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার। আপনাদের কাছে ওটার কপি আছে?'

চেহারায় তিক্ততা ফুটিয়ে মাথা দোলাল রায়হান। 'সিডিটা নিয়ে গেছে তোমার ওই *শাকচুন্নি*।'

'ধেত্তেরি!' সখেদে বলল টিনা। 'তা হলে আমি কাজ করব কেমন করে? বানাব কীভাবে অ্যান্টিভাইরাসটা?'

মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রায়হানের। পিছন থেকে বাড়িয়ে ধরল ট্রেন থেকে আনা ল্যাপটপটা—মালিক ভদ্রলোক খুশির ঠেলায় দান করে দিয়েছেন এটা ওদের।

'কী করব এটা নিয়ে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল টিনা।

'নাসার মেইনফ্রেমে হ্যাক্ করবে,' রায়হান বলল। 'অডিও সিগনালটার আরেকটা কপি ডাউনলোড করে আনবে। আমিই পারতাম, কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে। তবে তুমি যদি ইউনোকোড ব্যবহার করো, তা হলে কাজটা চোখের পলকে সারা যাবে।'

'নাসায় ঢুকতে হলে তো কানেকশন পেতে হবে। এটায় মডেম আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রায়হান। আঙুল বাড়িয়ে দেখাল, 'এই তো... ওয়্যারলেস মডেম, বিল্ট-ইন।'

খুশি হয়ে উঠল টিনা। 'চমৎকার! আমি এখুনি কাজ শুরু করে দিচ্ছি। কিন্তু নাসার মেইনফ্রেম তো অনেক বড়, সিগনালটা ঠিক কোথায় সেভ করে রাখা হয়েছে—জানব কী করে?'

'আগে হ্যাক্ তো করো, আমি বলে দেব—কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ওটা।'

ল্যাপটপটা অন করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তরুণী ইউনো। পাশে রানা উসখুস করছে—এই রহস্যময়ীর সব কথা না জানা পর্যন্ত মনে স্বস্তি পাচ্ছে না। তাই জিজ্ঞেস করল, 'টিনা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?'

'তা পারব। কী জানতে চান?'

'তোমার সম্পর্কে। ইউনোকোড শিখলে কীভাবে তুমি? তোমার বাবা-মা যখন মারা যান, তখন তো তোমার বয়স খুব অল্প হবার কথা। ছোট্ট একটা বাচ্চার পক্ষে কোডটা কীভাবে শেখা সম্ভব?'

'শিখব কেন? আমিই ওটার স্রষ্টা, বললাম না? পাঁচ বছর বয়সে কোডটা আবিষ্কার করি আমি।'

'কী যে বলছ তুমি, কিছুই বুঝতে পারছি না,' রায়হান বিরক্ত হলো। 'পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা বুঝি ইউনোকোড আবিষ্কার করতে পারে?'

'পারে, যদি বাচ্চাটা অস্বাভাবিক মেধার অধিকারী হয়,' কথা বলছে, কিন্তু কাজ থেমে নেই টিনার—যন্ত্রের মত কীবোর্ডে নেচে বেড়াচ্ছে ওর আঙুল। 'বিজ্ঞানের ভাষায় ওদের চাইল্ড-জিনিয়াস বা প্রডিজি বলে। কখনও শোনোনি, তিন-চার বছরের বাচ্চা কলেজ-ইউনিভার্সিটির লেখাপড়া শেষ করে ফেলেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রায়হান, এবার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে ওর। 'তুমি... তুমি চাইল্ড-জিনিয়াস ছিলে?'

'হ্যাঁ,' টিনা বলল। 'ঠিক ধরেছ।'

'কিন্তু... সেটা জানে না কেন কেউ? এমনকী অন্যান্য ইউনোরা... যাঁরা মাইকেল আর ডেবি ওয়ালডেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁরাও তো জানেন না কিছু।'

'বাবা-মা কাউকে বলেননি ব্যাপারটা। বলতেন ঠিকই, কিন্তু তার আগেই কম্পিউটারে কাজ করতে করতে নিজের অজান্তে কোডটা আবিষ্কার করে বসলাম আমি। আমার বাবা খুব সাবধানী মানুষ ছিলেন, তিনি মাকে বুঝিয়েছিলেন—ইউনোকোডের মত শক্তিশালী একটা জিনিস যে আমার আবিষ্কার, সেটা প্রকাশ পেলে আমার বিপদ হতে পারে। ইনটেলিজেন্স কমিউনিটি থেকে শুরু করে দুনিয়ার তাবৎ খারাপ মানুষ আমাকে বাগে পাবার চেষ্টা করবে। তাই সাধারণ বাচ্চার মত বড় করা হয় আমাকে, কোডটা বাবা-মা ওঁদের নিজেদেরই আবিষ্কার বলে বন্ধুদের কাছে প্রচার করেন...'

ড. ডোনেনের মুখে শোনা ঘটনাটা মনে পড়ল রানার, হঠাৎ করেই নাকি একদিন ইউনোকোড নিয়ে হাজির হয়েছিলেন মাইকেল আর ডেবি। '*... এমন একটা কোডের ধারণা কবে ওদের মাথায় এল, বা কবে থেকে কাজ করে জিনিসটাকে ডেমোনস্ট্রেশনের মত পর্যায়ে নিয়ে এল, তা আমাদের বলেইনি অবস্থা দেখে মনে হলো, ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোপন রাখছিল ওরা...*'

রহস্যটা পরিষ্কার হচ্ছে এবার। ইউনোকোডের ধারণা সত্যিই নিজেদের মাথায় আসেনি ওয়ালডেন দম্পতির—ওটা ওঁদের মেয়ের আবিষ্কার ছিল। বিষয়টা হয়তো গোপনই করতে চেয়েছিলেন তাঁরা, কিন্তু দুজনের ভিতরের বিজ্ঞানী সত্তা এমন উন্নত একটা কম্পিউটার-কোডকে চাপা দিয়ে রাখতে দেয়নি। সেজন্যেই বন্ধুদের কাছে ওটা নিজেদের আবিষ্কার বলে উপস্থাপন করেছিলেন তাঁরা, যাতে বিপদ-আপদ হলে নিজেদের হয়, তাঁদের সন্তান নিরাপদ থাকে। হয়েছেও তা-ই।

boighar.com

'টিনা,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমার বাবা-মা'কে খুন করা হয়েছে বলে সন্দেহ করেছিলেন ড. ডোনেন। সেটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, মি. রানা,' বলল টিনা। 'যদিও কোনও প্রমাণ নেই, তবে আমি জানি—ডাইনি এলিসাই কাজটার জন্য দায়ী।'

'কিন্তু কেন?'

'এই মহিলা যে ইউনোকোড নিয়ে কোনও একটা ষড়যন্ত্র আঁটছে, সেটা জেনে ফেলেছিল তারা। তখন খুব খেপে যান বাবা-মা, ওর মতলব সবার কাছে ফাঁস করে দেবেন বলে হুমকি দেন। সেজন্যেই মরতে হয়েছে ওঁদের।'

'তুমি ব্যাপারটা জানতে?'

'অল্প-স্বল্প। ছোট ছিলাম তো, বাবা-মা কেউই আমাকে কিছু বলেননি। আমি আড়ি পেতে শুনেছিলাম, দুজনে আলোচনা করছেন বিষয়টা নিয়ে। নাম-টাম কিচ্ছু শুনিনি, শুধু এটুকু শুনেছি—ইউনোদের কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। তাকে কীভাবে ঠেকানো যায়, এ-নিয়ে চিন্তা করছিলেন ওঁরা। পরে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম, কিন্তু পরদিনই খুন করা হলো ওঁদের। সবাই বলল দুর্ঘটনা, আমি প্রতিবাদ করতে চাইলাম, কিন্তু সাত বছর বয়েসী একটা বাচ্চার কথা কে বিশ্বাস করে, বলুন? নানা-নানীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো আমাকে, ওখানেও তাঁরা আমার কথা শুনলেন না। তাই শেষ পর্যন্ত চুপ হয়ে গেলাম আমি, ঠিক করলাম নিজেই এই রহস্য ভেদ করব।

'নিজেকে গুটিয়ে নিলাম আমি। আমার মেধার কথা কাউকে কোনওদিন জানতে দিলাম না। নানা-নানী পর্যন্ত কখনও বোঝেননি, তাঁদের নাতনি একজন জিনিয়াস। কলেজে ওঠার পর কিছুটা স্বাবলম্বী হলাম, আর তখনই শুরু করলাম কাজ। প্রথমেই এফিডেভিট করে নিজের নাম পাল্টে ফেললাম, হয়ে গেলাম ইভা লরেন্স, যাতে আমার পরিচয় কেউ জানতে না পারে। এরপর নামলাম গোয়েন্দাগিরিতে। ইউনোদের মধ্যে কে আমার বাবা-মা'র হত্যাকারী, সেটা জানাই ছিল আমার মূল লক্ষ্য।

'একে একে জীবিত আট ইউনোর সবার কাছে গেছি আমি, মিথ্যে পরিচয়ে। কলেজ আর ভার্সিটির ছুটিতে মেইডের কাজ করেছি আমি কুর্ট মাসডেন আর ভ্যাল মর্টিমারের বাড়িতে, ডুইট গার্ডনার আর হার্বার্ট গ্রান্টের বাচ্চাদের বেবিসিটারও হয়েছি, ট্রিসিয়া মিলনারের অফিসে ইন্টার্ন হিসেবে ছিলাম কিছুদিন, অ্যামেরিকায় এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট হিসেবে গিয়েছিলাম সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহে—স্ট্যানলি ডোনেন আর লুই পামারের ব্যাপারে তদন্ত করব বলে...'

'ড. ডোনেন তো তোমার শিক্ষক ছিলেন,' রানা বলল। 'কিন্তু লুই পামারের কাছে ভিড়েছ কীভাবে?'

'সেমেস্টার ফাইনালের ছুটিতে নিউ ইয়র্কে গিয়ে ওঁর স্ত্রীর পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট হয়েছিলাম আমি,' হেসে বলল টিনা। 'ভদ্রমহিলা সারাদিন ফুট-ফরমাশ খাটাতেন আমাকে।'

রানাও হাসল।

'ড. ডোনেনও সহজ পাত্র ছিলেন না, আমাকে একদমই কাছে ঘেঁষতে দিতেন না তিনি,' বলে চলল টিনা। 'ভদ্রলোক কী করেন না করেন, কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না। শেষে ওঁর কম্পিউটারে হ্যাক করতে শুরু করলাম, একদিন ইউনোদের মিটিঙেও হানা দিলাম...'

'কিন্তু ধরা পড়ে গেলে, তাই না?' বলে উঠল রায়হান। 'ডোনেন স্যর বলেছেন আমাদের—চার বছর আগে একাদশ ইউনোর সন্ধান পান তিনি... তুমি তখন আমাদের ভার্সিটিতে ছিলে!'

www.boighar.com

'ড. ডোনেন ভীষণ সতর্ক আর চালাক মানুষ ছিলেন,' টিনা স্বীকার করল। 'আমি তো প্রায় ধরাই পড়ে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস, ইউনোকোডটা খুব ভাল করে ব্যবহার করতে জানি, নিজেরই তৈরি তো, সেজন্যেই কোনওমতে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলাম।'

'হুঁ,' রানা বলল। 'তারপর কী ঘটল?'

'কী আর হবে? ড. ডোনেনের ধারেকাছেও ভিড়তে পারলাম না আমি, কম্পিউটারে হানা দেয়াও বন্ধ করতে হলো। তাই ওঁর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বিকল্প একটা কায়দা বের করলাম—ওঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রের গার্লফ্রেণ্ড হয়ে গেলাম আমি, যাতে ওর সাথে সাথে আমিও ভদ্রলোকের কাছে যখন-তখন চলে যেতে পারি। ডোনেনের ব্যাপারে অস্বাভাবিক কোনও তথ্য জানলে যেন ছাত্রটি নিজেই আমাকে সব জানায়...'

'ইয়াল্লা!' মাথায় হাত দিল রায়হান। 'সেজন্যে... সেজন্যেই তুমি গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলে? আজও নিশ্চয়ই একই কারণে আমার সঙ্গে জুটেছ। ড. বুরেনকে কেন খুঁজছি আমরা, কী ঘটছে তলে তলে—এসব জানাটাই তোমার মূল উদ্দেশ্য ছিল।'

অভিযোগটা একেবারে মিথ্যে নয়, টিনা কাঁধ ঝাঁকাল।

'তারমানে আমাকে তুমি কখনোই পছন্দ করতে না?' মন খারাপ করা সুরে বলল রায়হান, খুব যেন আঘাত পেয়েছে বেচারা। 'আমি স্রেফ তোমার স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার, তাই না?'

ওর কথাগুলো স্পর্শ করল তরুণী ইউনোকে। কাজ থামিয়ে ঘুরে বন্ধুর চোখে চোখ রাখল মেয়েটা, বলল, 'আমি তো সেটা বলিনি, রায়হান। কাজেকর্মে অমনটাই মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি বলতে কী...' একটু থামল ও, নারীসুলভ লজ্জাবোধ পেয়ে বসেছে ওকে। ইতস্তত করে বলল, 'ইয়ে... আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করি। বন্ধু হিসেবে নয়, আরও... আরও বড় কিছু হিসেবে। আমার জীবনটা যদি এমন না হত, তা হলে হয়তো তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারতাম...'

আর কিছু শুনল না রায়হান, সামনের দিকে ঝুঁকে এসে গভীর মমতায় চুমু খেল প্রেমিকাকে। দু'ফোঁটা চোখের জল নেমে এল টিনার গাল বেয়ে—এ-অশ্রু আনন্দের, ভালবাসার।

পাশ থেকে গলা খাঁকারি দিল রানা, তা শুনে সংবিৎ ফিরে পেল দুজনে। তাড়াতাড়ি পরস্পরকে ছেড়ে সোজা হয়ে বসল ওরা, অগ্রজপ্রতিমের দিকে

boighar.com

তাকাতে পারছে না—যেন লুকিয়ে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

'*কাবাব মে হাড্ডি* হতে হলো বলে দুঃখিত,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'সম্ভব হলে গাড়ি থামিয়ে নেমে যেতাম, তোমাদের একা হতে দিতাম। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তা পারছি না। তাই তোমাদের পর্বটা আপাতত মুলতবি রাখতে হবে। দায়িত্বের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি আবার ল্যাপটপে কাজ শুরু করল টিনা।

'আচ্ছা, সাতজনের কথা তো শুনলাম,' একটু অপেক্ষা করে বলল রানা। 'এদের কেউ যে তোমার বাবা-মাকে খুন করেনি, সেটা বুঝলে কী করে? এলিসা ভ্যান বুরেনকেই সন্দেহ করতে শুরু করলে কেন?'

'ওই সাতজনের ব্যাপারে সন্দেহ করবার মত কিছু পাইনি বলে,' টিনা জানাল। 'খুব ভালমত খোঁজখবর নিয়েছি আমি—তাতে ওঁদের নিরীহ-ভালমানুষ বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু এই ভ্যান বুরেন হলো ভিন্ন চিজ। আপাতদৃষ্টিতে একনিষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী, পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ... কিন্তু তার আসল রূপ কী, জানেন? জানেন, কীভাবে তার কোম্পানিটাকে এত উপরে তুলে এনেছে? কূটচাল চেলে আর পেশিশক্তি খাটিয়ে। প্রতিভাবান প্রোগ্রামারদেরকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভাগিয়ে আনে সে, হয় টাকার লোভ, নয়তো ভয় দেখিয়ে। অথচ তার কোম্পানি থেকে কেউ বেরুতে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোম্পানির লোকজনকেও হাতে রাখে সে, ওদের প্রোডাক্টে নানা রকম ভাইরাস আর বাগ ঢোকাবার জন্যে—যাতে তিতিবিরক্ত হয়ে কাস্টোমারেরা ক্রিয়েলটেকের প্রোডাক্টের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ভ্যান বুরেনের ওই অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার... *ক্রিয়েল-প্রটেক্ট*... কীভাবে পুরস্কার পেয়েছে, জানেন? নিজের তৈরি ভাইরাস ধ্বংস করে। এসব নিয়ে বাজারে অনেক গুজব প্রচলিত আছে, একটু খোঁজ নিলেই কানে আসবে আপনার, আমারও এসেছে। সবকিছু শুনে আমার মনে হয়েছে—একমাত্র এই মহিলাই ইউনোকোডকে মন্দ কাজে ব্যবহার করতে পারে। ছাত্রাবস্থায় হল্যাণ্ডে আসার কোনও সুযোগ ছিল না, তাই কিছু করতে পারিনি, কিন্তু ভার্সিটি থেকে বের হবার পর থেকেই তক্কে তক্কে ছিলাম, প্রথম সুযোগেই ক্রিয়েলটেকে চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়েছি। ওখানে ঢোকার পর সমস্ত সন্দেহের অবসান হলো আমার, বুঝতে পারলাম—এলিসা ভ্যান বুরেনই আমার বাবা-মাকে খুন করেছে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল রায়হান।

'বছরখানেক আগে এক ব্যবসায়ী রীতিমত ঘোষণা দিয়ে এলিসার কুকীর্তি ফাঁস করে দেবার জন্য মাঠে নেমেছিল, হঠাৎ করে হেলিকপ্টার-ক্র্যাশে মারা পড়ে বেচারা,' টিনা বলল। 'একদিন ব্যাপারটা নিয়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করছিল ডাইনিটা—পুলিশ নাকি কেসটা রি-ওপেন করতে চাইছে, তাতে গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। তাই কাকে কাকে টাকা খাওয়াতে হবে, সেটাই ঠিক করছিল ওরা। আড়াল থেকে সব শুনে ফেলি আমি। তখনই বুঝতে পারি, স্বার্থের জন্য মানুষ খুন করবার অভ্যেস আছে এই মহিলার। সে ছাড়া আর কে-ই বা আমার বাবা-মা'কে খুন করতে পারে?'

'ওঁর ভাইও জড়িত এসবের সঙ্গে?'

'সমস্ত নোংরা কাজ তো ও-ই করে। শেয়ালের মত চতুর, আর বাঘের মত ভয়ঙ্কর ওই থিও ভ্যান বুরেন। ছিল অ্যামেরিকান আর্মির ক্যাপ্টেন, স্পেশাল ফোর্সের মেম্বার... কিন্তু সবকিছু ছেড়েছুড়ে এখন চলে এসেছে বোনের কাছে—ক্ষমতা আর টাকার লোভে। স্পেশাল ফোর্সের দুই পেয়ারের বন্ধুকেও নিয়ে এসেছে সঙ্গে। ওরা তিনজন এখন এলিসার ব্যক্তিগত লাঠিয়াল—ভয় দেখানো, খুনোখুনি, ব্ল্যাকমেইল... সব এরাই সামলায়।'

'তিনজন?' ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'স্পেশাল ফোর্সের প্রাক্তন সদস্য?'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে রায়হানও। 'মাসুদ ভাই, এরাই গিয়েছিল মন্টেগো আইস শেলফে!'

'হ্যাঁ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' রানা বলল। 'খুব ভাল হলো ওদের পরিচয় জানতে পেরে। এবার বোঝাপড়া করা যাবে শয়তানগুলোর সঙ্গে।' দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটল ওর বলার ভঙ্গিতে।

এই সময় একটা সঙ্কেত শোনা গেল ল্যাপটপের স্পিকারে, নাসার মনোগ্রাম উদয় হয়েছে স্ক্রিনে। 'ঢুকে পড়েছি মেইনফ্রেমে,' জানাল টিনা। 'এখন কী করতে হবে?'

দেখিয়ে দিল রায়হান, আর ওর নির্দেশনা মেনে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ভাইরাস-আক্রান্ত অডিও-সিগনালটা ডাউনলোড করে ফেলল তরুণী ইউনো। ওটা স্টাডি করতে শুরু করল।

টানা পনেরো মিনিট জিনিসটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল ও, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেলান দিল সিটে। ব্যাপারটা লক্ষ করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, ওভাবে শ্বাস ফেলছ কেন?'

'এলিসা ভ্যান বুরেনের কীর্তি দেখে,' বলল টিনা। 'সত্যি, জিনিস বানিয়েছে একটা! ডাইনিটা যে কতখানি কুটিল, তা এই ভাইরাসটা দেখলেই বোঝা যায়। প্রোগ্রামিংটা মারাত্মক জটিল।'

'কুটিল মহিলার জটিল ভাইরাসটাকে এবার তুমি সুটিল... মানে সরল করে ফেলো,' হেসে সুর করে বলল রায়হান। 'তা হলেই তো হয়।'

'সরি,' মাথা নাড়ল টিনা। 'মিথ্যে আশা দেব না তোমাদের। কাজটা সহজ নয়, ঝামেলা আছে অনেক।'

'পারবে না তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পারব, তবে ঠিক সময়ে শেষ করতে পারব কি না—তার কোনও গ্যারান্টি নেই। কারণ শুধু প্রোগ্রামটা লিখলেই হবে না, ওটা ঠিকমত কাজ করে কি না, তা-ও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। নানা রকম ত্রুটি বেরুতে পারে, সেগুলো আবার সংশোধন করতে হবে—কাজ অনেক। অথচ রাত দুটো পর্যন্তই তো সময়সীমা, তাই না?'

'এ কী দুঃসংবাদ শোনাচ্ছ!' রায়হানের গলায় উদ্বেগ। 'ইউনোকোডের স্রষ্টা... দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ ইউনোই যদি এমন কথা বলে, তা হলে হবে কেমন করে? চেষ্টা তো অন্তত করো!'

boighar.com

'তা তো করবই। তবে খারাপ খবরটা আগেই জানিয়ে রাখলাম। দেখো, আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না। জীবনে কোনওদিন অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করেছি নাকি আমি? তারওপর ডাইনিটা নিশ্চয়ই অনেক সময় নিয়ে আর মাথা খাটিয়ে তৈরি করেছে এটা—চোখের পলকে সমাধান করে দেব, ভাবলে কী করে?'

'হুঁ, সময় নিয়েই বানিয়েছে ভাইরাসটা,' রানা একমত হলো। 'কমপক্ষে আঠারো বছর।'

'আঠারো বছর!' রায়হান অবাক হলো।

'হ্যাঁ,' রানা ব্যাখ্যা করল। 'এলিসার কুমতলব জেনে ফেলায় মরতে হয়েছিল মাইকেল আর ডেবিকে। আঠারো বছর আগে।'

'এই ভাইরাস বানাতে আঠারো বছর লেগেছে বলে মনে করো তুমি?' বিস্মিত কণ্ঠে টিনাকে জিজ্ঞেস করল রায়হান।

'সময় প্রচুর দেয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে,' উত্তর দিল টিনা। 'তবে আঠারো বছর একটু বেশি হয়ে যায়।'

'আক্ষরিক অর্থে বলিনি কথাটা,' রানা বলল। 'বলতে চেয়েছি যে, গত আঠারো বছর ধরে প্ল্যান আঁটছিলেন এলিসা। কাজে পরিণত করেছেন এই এতদিন পরে।'

'কিন্তু এতদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার মানেটা কী?' রায়হান বলল। 'কম্পিউটারই যাঁর ধ্যান-জ্ঞান, টাকা বানানোর উৎস... তিনিই বা হঠাৎ করে সারা দুনিয়ার সমস্ত কম্পিউটার ধ্বংস করে দিতে চাইছেন কেন?'

'পিছনে গূঢ় একটা রহস্য যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই,' টিনা স্বীকার করল। 'তবে এতদিন পর কেন ভাইরাসটা ছাড়া হয়েছে, সেটা বোধহয় আন্দাজ করতে পারি। তুমিই ভাবো, রায়হান, আঠারো বছর আগে এই ভাইরাস আক্রমণ করলে বিরাট কোনও ক্ষতি কি হত? তখন তো মানুষ কম্পিউটারের উপর খুব একটা নির্ভরশীল ছিল না। কিন্তু এখনকার কথা ধরো, বিশেষ করে গত দু'তিন বছরে কম্পিউটারের কী ধরনের প্রসার হয়েছে। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকার পরিচালনা, প্রতিরক্ষা... সবকিছু এখন কম্পিউটার-নির্ভর হয়ে গেছে। এলিসা এ-সময়টা বেছে নিয়েছে একটাই কারণে—এখনই ইউনো-ভাইরাস স্মরণকালের সবচেয়ে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারবে। ১৯৯০-এ তা সম্ভব ছিল না।'

'ঠিকই বলেছে ও,' রানা সায় দিল। 'দুনিয়াটাকে পুরোপুরি কম্পিউটার-নির্ভর হবার জন্যই এতকাল অপেক্ষা করেছেন এলিসা।'

'মহিলার ধৈর্য আছে বলতে হবে,' মন্তব্য করল রায়হান।

'শুধু ওর প্রশংসাই করলে?' টিনা বলল। 'আমাদের কোনও দোষ নেই বলতে চাইছ? যন্ত্রপাতির উপর মানুষের অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণেই তো এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দিন দিন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি—এটা কি কোনও শুভ লক্ষণ?'

'তাই বলে কোথাকার কোন্ ছিট-পাগল পুরো মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে

দেবে, বুলডগের মত স্বার্থান্বেষী সেটার ফায়দা লুটবে—এমন তো হতে দেয়া যায় না। এলিসা ভ্যান বুরেনকে ঠেকাতেই হবে, টিনা। অ্যান্টিভাইরাসটা তোমাকে তৈরি করতেই হবে।'

'রাত দুটোর মধ্যে কাজটা শেষ করা...'

'দুটো নয়, আরও আগে। ওটা ডিস্ট্রিবিউট করতে সময় দরকার আমাদের।'

'কী বলছ এসব! ছ'ঘণ্টাও নেই হাতে, আমি কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করব? এতই যদি তাড়া থাকে, তা হলে আগেই আমাকে বলোনি কেন? সারাটা দিন একসঙ্গে আছি, অথচ তুমি আর মি. রানা তো আমাকে একটুও বিশ্বাস করোনি। সারাক্ষণ গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফাসুর করেছ নিজেদের মধ্যে... আমাকে বুঝতে দিয়েছ কিছু?'

'ওমা! ডেকে বলতে হবে কেন? আমরা কি ছাই জানি নাকি যে, তুমি একজন ইউনো। এতকিছু ঘটতে দেখে তোমারই তো নিজ থেকে সব খুলে বলা উচিত ছিল।'

'কী-ই-ই! এখন সব দোষ আমার?'

ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকা, প্রমাদ গুনে তাড়াতাড়ি নাক গলাল রানা। 'থামো, থামো, ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ নেই এখন। যা হবার তো হয়েই গেছে।' টিনার দিকে তাকাল ও। 'সত্যিই অ্যান্টিভাইরাসটা বানাতে পারবে না তুমি?'

'সময় নেই হাতে, কী করব, বলুন?' টিনা কাঁধ ঝাঁকাল। 'তারপরও চেষ্টা করে দেখছি, যদি পারা যায়! তবে সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ, এটা আগেই বলে রাখছি।'

'সেক্ষেত্রে বিকল্প একটা ব্যবস্থা চিন্তা করে রাখাই ভাল,' রানা বলল।

'কীসের বিকল্প ব্যবস্থা?' রায়হান বুঝতে পারছে না। 'একমাত্র টিনার তৈরি অ্যান্টিভাইরাস ছাড়া আর কোনওভাবেই ঠেকানো সম্ভব নয় বিপর্যয়টা।'

'ওরটাই একমাত্র হতে যাবে কেন?' রানা ভুরু নাচাল। 'রেডিমেড আরেকটা অ্যান্টিভাইরাস আছে, বুলডগ ওটা পেয়ে গেছে... মনে নেই? জিনিসটা নিঃসন্দেহে এলিসা তৈরি করে রেখেছেন আগে থেকে, নইলে এত দ্রুত বুলডগকে দিতে পারতেন না। ওটাই চুরি করব আমরা—ওঁর কম্পিউটার থেকে!'

পনেরো

অ্যামস্টারড্যামে পৌঁছেই রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউসে উঠল ওরা। ওখান থেকে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে ফোন করল রানা, মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের কাছে অ্যাসাইনমেন্টের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিফ করল। সবকিছু শুনে গম্ভীর সুরে চিফ জানতে চাইলেন, 'কী মনে হয় তোমার, ডেডলাইনের

boighar.com

মধ্যে অ্যাণ্টিভাইরাসটা জোগাড় করতে পারবে?'

'আমি এখনও হাল ছাড়ছি না, স্যর,' রানা বলল। 'টিনা যদি ওটা বানাতে না-ও পারে, ড. বুরেনের কাছ থেকে চুরি করে আনব বলে ঠিক করেছি।'

'হুম, ওই ডগলাস বুলক কিন্তু তোমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে। সাবধানে থেকো।'

'থাকব, স্যর।'

'বেস্ট অভ লাক,' বলে লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

খাওয়া-দাওয়া শেষে দুই সঙ্গীকে নিয়ে আবার মিটিঙে বসল রানা। অ্যামস্টারড্যামে আসার পথে পরে আর বিশেষ কথা হয়নি ওদের মধ্যে; টিনা যাতে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারে, তাই নীরব হয়ে গিয়েছিল ও আর রায়হান। এবার মিটিঙে বসার পর নতুন করে আবার আলোচনা শুরু হলো। রানা জানতে চাইল, 'কাজ কদ্দূর, টিনা?'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল তরুণী ইউনো। 'একদমই এগোচ্ছে না। অডিও সিগনালটা অনেক বড়, ওটার আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে ভাইরাসটার বিভিন্ন অংশ। একটা অংশ ঠেকানোর ব্যবস্থা করি তো আরেকটা এসে উদয় হয়। খুব বিশ্রী অবস্থা।'

'তা হলে ধরে নিতে পারি যে, ডেডলাইনের ভিতরে অ্যাণ্টিভাইরাসটা তৈরি করতে পারছ না তুমি?'

'হুঁ। আপনার ওই বিকল্প প্ল্যানটাই কাজে লাগাতে হবে এখন। রেডিমেড অ্যাণ্টিভাইরাসটা জোগাড় করতে হবে।'

'কীভাবে?' রায়হান প্রশ্ন রাখল। 'ড. বুরেন একজন ইউনো, তাঁর কম্পিউটারে কোনও ধরনের হ্যাকিং করা সম্ভব নয়।'

'টিনা, তুমি পারবে না?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' টিনা বলল। 'অন্তত এই হতচ্ছাড়া ভাইরাসটা নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে অনেক সহজ হবে ওটা।'

'এলিসাকে এত বোকা ভাবা উচিত হচ্ছে না তোমার,' রায়হানকে গম্ভীর দেখাল। 'টিজিভি-র ঘটনাটার পর মহিলা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, এগারো নম্বর ইউনো সত্যিই আছে। ইউনোকোড দিয়ে ইউনোকোডের মোকাবেলা করেছ তুমি, তাঁকে হারিয়ে দিয়েছ... এই অবস্থায় আমি হলে তোমার হ্যাকিঙের শিকার হতে চাইতাম না কিছুতেই। কম্পিউটারের সব ধরনের কানেকশন খুলে রেখে দিতাম, যাতে বাইরে থেকে ওটায় কিছুতেই ঢোকা না যায়।'

'সেক্ষেত্রে ফিযিক্যালি অ্যাণ্টিভাইরাসটা সংগ্রহ করব আমরা,' রানা বলল। 'ওঁর বাড়িতে গিয়ে কম্পিউটার অন্ করে জিনিসটা বের করব।'

'ব্যাপারটা ওই মহিলা বা বুলডগ আন্দাজ করতে পারবে না ভাবছেন?'

'জানার উপায় একটাই,' বলে মোবাইল ফোন হাতে নিল রানা। সেফ হাউসে পৌঁছুবার পর পরই শাখাপ্রধান নাঈম আযমের সঙ্গে কথা বলে রানা এজেন্সির অপারেটর মারুফকে আলস্মিরে পাঠানো হয়েছে এলিসার ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার জন্য; ওর সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা, মিনিটদুয়েক কথা

বলল। শেষে ফোনটা নামিয়ে রেখে বলল, 'তোমার আশঙ্কাই ঠিক, রায়হান। বাড়িটাকে যখের ধনের মত পাহারা দিচ্ছে সিআইএ এজেন্টরা, ওটা এখন একটা দুর্গম দুর্গ।'

হতাশায় মাথা দোলাল রায়হান।

'একটা হামলা করে দেখা যেতে পারে...

'এক মিনিট, মি. রানা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল টিনা, কী যেন মনে পড়ে গেছে ওর। 'আরেক জায়গায় পাওয়া যেতে পারে অ্যান্টিভাইরাসটা।'

'কোথায়?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক্রিয়েলটেকের হেডকোয়ার্টারে... ড. বুরেনের অফিসে! ওখানে তার আরেকটা কম্পিউটার আছে, আর আমি যদ্দূর জানি—ওটায় সব ধরনের ফাইল আর সফটওয়্যারের একটা করে ব্যাকআপ রাখে ডাইনিটা।'

'অ্যান্টিভাইরাসটাও থাকবে?'

'থাকা তো উচিত। কম্পিউটারটাকে কোনও নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রাখে না এলিসা—হ্যাকিঙের ভয়ে। কাউকে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। সে না থাকলে ওই অফিসে কারও ঢোকাও বারণ। এত লুকোছাপার একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে: কম্পিউটারটায় ইউনোকোড সংক্রান্ত সব ধরনের জিনিস আছে। তারমানে ভাইরাস এবং অ্যান্টিভাইরাস—দুটোই।'

'তা হলে তো ওখানেও পাহারার ব্যবস্থা করবে মহিলা,' রায়হান বলল।

'মনে হয় না,' টিনা মাথা নাড়ল। 'বিল্ডিংটা এমনিতেই সুরক্ষিত। সিকিউরিটি ডিভিশনের কমপক্ষে দশজন গার্ড অফ-আওয়ারে পাহারা দেয় ওখানে। তা ছাড়া পুরো বিল্ডিঙে আলট্রা-হাইটেক সিকিউরিটি সিস্টেম বসানো আছে, চুরি করে কারও পক্ষেই ঢোকা সম্ভব নয়। দরজা-জানালা তো দূরের কথা, ভেন্টিলেশনের একটা ডাক্টের মুখও যদি আনশিডিউলডভাবে খোলা হয়, পুলিশ স্টেশনে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। আর খুলবেনই বা কীভাবে, বিল্ডিংটার সব ধরনের ওপেনিং ইলেকট্রিফায়েড করে রাখা হয়। ব্যবস্থাটার সঙ্গে কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিকসের কোনও সম্পর্ক নেই যে হ্যাকিং করে বন্ধ করবেন, শুধুমাত্র হেডকোয়ার্টারের কন্ট্রোল সেন্টার থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিখুঁত একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা—প্রায়ই এ-নিয়ে গর্ব করে ডাইনিটা—তার হেডকোয়ার্টারে নাকি একটা পিঁপড়েরও ঢোকার উপায় নেই।'

'তা হলে তো খুবই ভাল, সুযোগটা কাজে লাগাব আমরা,' রানা বলল। 'তবে আসলে ওখানে আজ বাড়তি কোনও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি হয়নি, সেটা আগে জেনে নিতে হবে।'

নাঈমকে ফোন করল ও, ক্রিয়েলটেকের হেডকোয়ার্টারে কাউকে পাঠাতে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শাখাপ্রধান বলল—ড. বুরেনের খোঁজ পাবার জন্য দু'দিন আগে থেকেই বিল্ডিঙটার পাশে একজন ওয়াচার বসিয়েছে সে। ওখানে সিআইএ বা কোম্পানির সিকিউরিটি ডিভিশনের লোকজনের কোনও অস্বাভাবিক তৎপরতা আছে কি না, সেটা জিজ্ঞেস করতেই কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে বলল। ওয়াচারের সঙ্গে আরেকটা ফোনে কথা বলে নিল নাঈম, তারপর জানাল—না,

boighar.com

সবকিছুই স্বাভাবিক রয়েছে বিল্ডিংটায়। সন্ধ্যা নামতেই নিয়মিত প্রহরীরা ডিউটিতে যোগ দিয়েছে, তারা ছাড়া আর কোনও লোক যায়নি ওখানে।

'থ্যাঙ্ক ইউ, নাঈম।' বলে লাইন কেটে দিল রানা। তারপর ফিরল রায়হান আর টিনার দিকে। 'ভাগ্য সুপ্রসন্ন মনে হচ্ছে। বিল্ডিংটায় হানা দেয়া যেতে পারে, ওখানে বুলডগ লোক পাঠায়নি।'

'এমনভাবে বলছেন যেন গেলেই দরজা খুলে ঢুকতে দেয়া হবে আমাদের,' টিনা ভুরু কোঁচকাল। 'বললাম না, যা সিকিউরিটি আছে, সেটা ভেদ করেই ঢোকা সম্ভব নয় কারও পক্ষে।'

'হাইটেক সিস্টেমটাকে তুমি যদি অচল করে দিতে পারো, তা হলে দশজন গার্ডকে সামলানো আমার আর রায়হানের জন্য কোনও ব্যাপারই না।'

'ব্যাপারটা এখনও ধরতে পারেননি আপনি, মি. রানা। ওটা একটা অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা—কেউ অনুপ্রবেশ করলেই শুধু অ্যালার্ম বাজায় না, সিস্টেমটা কোনও কারণে অচল হয়ে গেলেও পুলিশ স্টেশনে বিপদসঙ্কেত পাঠায়।'

'যদি সঙ্কেত পাঠানোর লাইনটাই কেটে দিই?'

'সিগনালটা ওয়্যারলেস পদ্ধতিতে যায়—তার-টারের কোনও ঝামেলাই নেই।'

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তা হলে ফ্রিকোয়েন্সি-জ্যামার ব্যবহার করব আমরা, নাঈম এনে দিতে পারবে।'

'তাতে তো শুধু সঙ্কেত পাঠানোটা থামবে। বিদ্যুতায়িত ওপেনিংগুলোর ব্যাপারে কী করবেন? ওটা তো বন্ধ করতে পারব না আমি।'

'বিল্ডিঙটার ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে দিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল রায়হান।

'দুঃখিত,' টিনা মুখ বাঁকাল। 'ওখানে ব্যাকআপ জেনারেটর আছে, দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই অন্ হয়ে যায় ওটা।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'যদি একটা হেলিকপ্টারে করে ছাদে নামি, তা হলে কাজ হবে? উপরে নিশ্চয়ই সিকিউরিটি এত কড়া না?'

'আরও বেশি,' টিনা বলল। 'ছাদের উপরে আলাদা একটা সিকিউরিটি পোস্টই আছে। তা ছাড়া ওখানকার সিঁড়িঘরের দরজা আর ভেন্টিলেশনের শাফটে সবচেয়ে বেশি ভোল্টের কারেন্ট দেয়া হয়েছে।'

'শিট! ওটা কি অফিস, না জেলখানা?' বিরক্ত গলায় বলল রায়হান।

রানাও চিন্তায় পড়ে গেছে। 'হুম, তা হলে ঢোকার পথগুলো ইলেকট্রিফায়েড হওয়াতেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ঠিক করে বলো তো, টিনা, ইলেকট্রিফায়েড নয়—এমন কোনও দরজা-জানালা কি একেবারেই নেই?'

'থাকবে না কেন?' টিনা বলল। 'বিল্ডিঙের ইনডোরে কোনও কিছু ইলেকট্রিফায়েড নয়। কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে আপনাকে আউটার-সাইডের বাধা পেরোতেই হবে—এমনভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে সিস্টেমটা।'

মাথা নিচু করে একটু ভাবল রানা, ক্রিয়েলটেক হেডকোয়ার্টারের

নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেয়ার উপায় নিয়ে চিন্তা করছে। কিন্তু আশার আলো দেখতে পেল না, সিস্টেমটা সত্যিই নিখুঁত। হঠাৎ কী যেন টোকা দিল মগজে, মাথা তুলে ও বলল, 'টিনা, বিল্ডিংটার ব্লু-প্রিন্ট দেখাতে পারবে আমাকে?'

'পারব,' বলে ল্যাপটপটা টেনে নিল তরুণী ইউনো। মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটারে রাজধানীর সমস্ত ইমারতের নকশা আছে, সেখানে হ্যাক করে কয়েক মিনিটের ভিতরই ব্লু-প্রিন্টটা বের করে আনল ও। স্ক্রিনে ফুটে উঠল ক্রিয়েলটেকের দশতলা হেডকোয়ার্টারের একটা ত্রিমাত্রিক মডেল।

'ড. বুরেনের অফিসটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

দশতলার একটা অংশে আঙুল রাখল টিনা। 'এখানে।'

রুমটার সঙ্গে লাগোয়া আরেকটা বড় কামরা দেখা যাচ্ছে। রানা ওটা দেখিয়ে বলল, 'এটা কী?'

'এলিসার অ্যাপার্টমেন্ট—মাঝে মাঝে অফিসেই রাত কাটায় সে।'

'আর এটা?' অ্যাপার্টমেন্টের দেয়াল ঘেঁষে বড় একটা শাফট নেমে গেছে নিচতলা পর্যন্ত, ওটা দেখাচ্ছে রানা।

'প্রাইভেট এলিভেটর। লবি থেকে সরাসরি অ্যাপার্টমেন্টে ওঠে ওটা।'

ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'অ্যামস্টারড্যামের স্যুয়ারেজ সিস্টেমের প্ল্যানটা দেখাও তো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মিউনিসিপ্যাল ডেটাবেজের আরেকটা অংশে অনুপ্রবেশ করল টিনা, এবার স্ক্রিনে ভেসে উঠল মাকড়সার জালের মত হিজিবিজি একটা ছবি।

'ক্রিয়েলটেকের বিল্ডিংটা যেখানে, ওই অংশটা জুম করো,' নির্দেশ দিল রানা।

'যুইডাস ডিস্ট্রিক্ট... হ্যাঁ, এই তো।' কয়েকটা বাটন চাপল টিনা, অ্যামস্টারড্যামের নির্দিষ্ট একটা অংশের স্যুয়ারেজ সিস্টেম কয়েক গুণ বড় হয়ে দেখা গেল পর্দায়।

'এটার উপরে বিল্ডিঙের ব্লু-প্রিন্টটা ওভারল্যাপ করতে পারো?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই।' স্যুয়ারেজ সিস্টেমের নকশার উপরে ক্রিয়েলটেক হেডকোয়ার্টারের টপ-ভিউ আউটলাইনটা নিয়ে এল টিনা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড

রায়হানও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'মাসুদ ভাই, এলিভেটর শাফটটার ঠিক নীচ দিয়ে স্যুয়ারেজের একটা টানেল আছে!'

টিনাও দেখল। বিস্মিত হয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানতেন, শাফটের তলায় টানেল পাওয়া যাবে?'

'তা জানতাম না,' রানা স্বীকার করল। 'একটা চান্স নিয়ে দেখলাম—মনে হচ্ছিল থাকতে পারে।'

'এই শাফট ধরে উপরে উঠবেন তা হলে?'

'যদি ওটার ভিতরে শক খাবার ব্যবস্থা না থাকে,' হাসল রানা।

'নেই,' টিনা জানাল। 'কিন্তু শাফটে ঢুকবেন কীভাবে?' প্ল্যানটা ভাল করে

boighar.com

দেখল ও। 'শাফটের তলা আর স্যুয়ারেজের ছাদের মাঝখানে চার ফুট পুরু কংক্রিট লেয়ার আছে। ম্যানহোল জাতীয় কিচ্ছু নেই জায়গাটায়।'

'ফোকর করে নেব,' রানা বলল, তারপর তাকাল রায়হানের দিকে। 'নাঈমের সঙ্গে যোগাযোগ করো—কয়েক পাউণ্ড সি-ফোর দরকার আমাদের, সেই সঙ্গে সিঁধ কাটার আরও কিছু সরঞ্জাম। যত দ্রুত সম্ভব ডেলিভারি দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রায়হান।

টিনা গম্ভীর হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? ওভাবে কী দেখছ?'

'আপনাদের,' বলল টিনা। 'অদ্ভুত মানুষ আপনারা—প্রথম দেখায় ভদ্রলোক মনে হয়, অথচ লড়াই করেন প্রশিক্ষিত সৈনিকের মত, মাথার বুদ্ধি মাস্টারমাইণ্ড ক্রিমিনালের মত... এইমাত্র যেভাবে ক্রিয়েলটেকে ঢোকার প্ল্যান বের করলেন, তা কেবল প্রফেশনাল চোরই করতে পারে। এদিকে আবার পৃথিবীকে বাঁচানোর মহান লক্ষ্য নিয়েও কাজ করছেন। কোনওটার সঙ্গেই কোনওটা মেলে না। আসলে... কে আপনারা?'

'সবকিছুর মিশেল...' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমরা এসপিওনাজ এজেন্ট!'

রাত বারোটা। যুইডাস ডিস্ট্রিক্ট, অ্যামস্টারড্যাম।

স্যুয়ারেজ টানেলের শ্যাওলা পড়া ভেজা দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে টর্চের আলো, পথ দেখে গোড়ালি সমান পানিতে ছপ ছপ করে পা ফেলে হেঁটে চলেছে তিনজন মানুষ—সবার সামনে মাসুদ রানা, পিছু পিছু ক্রিস্টিনা ওয়ালডেন আর রায়হান রশিদ। মাথার উপর রাজধানীর ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা, মাঝরাতেও নিশ্চুপ হয়ে যায়নি। ম্যানহোলের ছাকনি ভেদ করে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে যানবাহনের আওয়াজ, পথচলা মানুষের কথাবার্তা। সেসব দিকে কোনও মনোযোগ নেই নীচের তিনজনের, নিজেদের মধ্যেও কথা বলছে না, যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছুতে চাইছে গন্তব্যে। এমনকী স্যুয়ারেজ লাইনের উৎকট দুর্গন্ধটাও অগ্রাহ্য করে এগোচ্ছে ওরা।

টানেলের শাখা-প্রশাখা হয়ে টানা বিশ মিনিট হাঁটার পর থামল রানা, ডানদিকের সংকীর্ণ একটা অংশে এসে ঢুকেছে। হাতে একটা পোর্টেবল জিপিএস ট্র্যাকার রয়েছে ওর, সেটার রিডিং দেখল। পকেট থেকে নোটবুক বের করে কো-অর্ডিনেটস্ মেলাল, তারপর উপরদিকটা ইঙ্গিত করে ও বলল, 'এসে গেছি, এখানেই হবার কথা এলিভেটর শাফটটার তলা।'

কথাটা শুনে ঝটপট পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাকটা নামাল রায়হান, সেটা থেকে চারটে সি-ফোর এক্সপ্লোসিভের ব্লক বের করল—দুটো নিজে রাখল, বাকি দুটো রানাকে দিল। মোড়ক খুলে ব্লকগুলো পাকিয়ে আড়াই ফুট দৈর্ঘ্যের চারটে স্ট্রিপে পরিণত করল ওরা। এরপর সেগুলোকে বর্গাকারভাবে টানেলের ছাদে সেঁটে দিল।

'বিস্ফোরণের শব্দ শুনে গার্ডেরা সতর্ক হয়ে যাবে না?' জানতে চাইল টিনা।

'কিছু বুঝতেই পারবে না, সতর্ক হবে কেমন করে?' রানা উত্তর দিল, হাতদুটো ব্যস্ত ওর—রায়হানের কাছ থেকে ডিটোনেটর নিয়ে বিস্ফোরককে গুঁজে দিচ্ছে। 'দশতলা উঁচু এলিভেটর শাফট সাউণ্ডওয়েভটাকে ভাগাভাগি করে ছড়িয়ে দেবে পুরো বিল্ডিঙে—ফলে তীব্রতা অনেক কমে যাবে ওটার। মৃদু একটা শব্দ হয়তো শুনবে ওরা, কিন্তু কম্পন অনুভব করবে না কোনও। তাই শব্দটার উৎস খুঁজে বের করা কিছুতেই সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে।'

'তা হলে তো ভালই।'

মোবাইল ফোন তুলে নাঈম আযমের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা, ক্রিয়েলটেকের মুখোমুখি আরেকটা বিল্ডিঙের ছাদে রয়েছে শাখাপ্রধান। 'জ্যামারটা চালু করো, নাঈম। আমরা ভিতরে ঢুকব এখনই।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

ডিটোনেটরের সঙ্গে টাইমারের সংযোগ দিল রানা, দুই মিনিটে স্থির করল কাউণ্টডাউন। এরপর সঙ্গীদের নিয়ে টানেল ধরে পিছিয়ে গেল ও, একটা জাংশানে পৌঁছে আড়াল নিল।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দুই মিনিট পর বিস্ফোরণ ঘটল সি-ফোরে, গুমগুম শব্দে ভরে গেল গোটা জায়গাটা, পায়ের নীচে কেঁপে উঠল মেঝে। আড়াই ফুট বাই আড়াই ফুট আকারের একটা স্ল্যাব ধপাস করে খসে পড়ল টানেলের ছাদ থেকে। ধুলোটা মিলিয়ে যাবার জন্য একটু দেরি করল ওরা, তারপর এগিয়ে গেল সদ্য সৃষ্টি হওয়া ফোকরটার দিকে।

আলো ফেলে ছাদটা দেখল রানা, কাজটা চমৎকার হয়েছে—ফোকরটা ছাড়া আশপাশের কংক্রিটে একটুও ফাটল ধরেনি। গর্তটার মধ্য দিয়ে ছোট্ট টর্চের আলোকরশ্মি হারিয়ে যাচ্ছে এলিভেটর শাফটের নিকষ অন্ধকারে, কোনও প্রতিফলন নেই, তারমানে কেইবল-কারটা একদম উপরে রয়েছে এখন। ভালই হলো, ভাবল ও, কারটা থেকে অ্যাপার্টমেণ্টের দরজা খুলতে সুবিধে হবে।

'রায়হান, প্রথমে তুমি,' নির্দেশ দিল রানা, দু'হাতের খাঁজে খাঁজে আঙুল আটকে সামনে মেলে ধরেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল তরুণ হ্যাকার। প্রথমে ফোকর দিয়ে ছুঁড়ে দিল ব্যাকপ্যাকটা, তারপর রানার হাতে পা রেখে এক ঝটকায় উঠে গেল উপরদিকে, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ গর্তে ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরল ভিতরদিককার কিনারা, দুহাতে ভর দিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শাফটে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই একটা দড়ি ফেলল ও।

টিনার দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'এবার তুমি।'

দড়ি বেশ ভালই বাইতে পারে তরুণী ইউনো, তা ছাড়া ওদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে শুকনো ও-ই, তাই ফোকরটা ছোট্ট হলেও ঝটপট উঠে যেতে পারল। রানার অবশ্য একটু অসুবিধে হলো—কাঁধ বেশ চওড়া ওর, গর্তে আরেকটু হলে আটকে যেত। কোনাকুনিভাবে শরীরটা রেখে বানমাছের মত পিছলে এলিভেটর শাফটে উঠে এল ও সবার শেষে।

boighar.com

নিচতলার অ্যাকসেস ডোরের পাল্লায় কান পেতে রেখেছে টিনা। ফিসফিসিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা নাড়ল তরুণী। 'একটু আগে বুটের শব্দ পেয়েছিলাম, দরজার ওপাশ দিয়ে হেঁটে গেছে একজন গার্ড, তবে এখন সব চুপ।'

'হাঁটার ভঙ্গিতে কোনও অস্থিরতা ছিল?'

'মনে তো হলো না।'

'গুড। তা হলে চলো, উপরে রওনা দিই।'

'কীভাবে? আবার দড়ি-টড়ি বাইতে হবে না তো?'

টর্চের আলোটা শাফটের দেয়ালের উপর ঘুরিয়ে আনল রানা—দুপাশে দুই সারি ল্যাডার দেখা গেল, মেইন্টেন্যান্সের জন্য তৈরি করা হয়েছে। 'দড়ি বাইতে হবে না, এগুলো ব্যবহার করব,' আলো নেড়ে দেখাল ও। 'এসো।'

দশতলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে দেয়াল বেয়ে প্রায় একশো ফুট উঠতে হবে ওদের, কাজটা ছোটখাট একটা পাহাড় চড়ার মত। তাই ঠিক করা হলো, সবার সামনে রানা থাকবে। শারীরিকভাবে সবচেয়ে ফিট ও, তা ছাড়া ক্লাইম্বিঙে অভিজ্ঞ, কোমরে সেফটি লাইন বেঁধে টিনা আর রায়হানকে সাপোর্ট দেবে। ওর পিছনেই থাকবে কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ জুটি। দুজনের বেল্টেই মুখখোলা একটা করে ট্যালকম পাউডারের ছোট্ট থলে বেঁধে দিল ও। 'কিছুক্ষণ পর পর হাত ডোবাবে এতে,' বলে দিল রানা। 'তালু ঘেমে গেলে কিন্তু ল্যাডার থেকে মুঠি ফসকে যেতে পারে।'

সতর্কতামূলক আরও দু'একটা উপদেশ দিল ও, তারপর উঠতে শুরু করল দেয়াল বেয়ে।

তিনতলা পর্যন্তও পৌঁছুতে পারল না, তার আগেই কাতরে উঠল টিনা, হাতের পেশি টনটন করছে বেচারির। রায়হান অবশ্য বিসিআইয়ের ট্রেইনিঙের বদৌলতে অনেক ফিট, তারপরও পাঁচতলায় গিয়ে ওরও অবস্থা কাহিল হয়ে গেল।

'মাসুদ ভাই, থামুন একটু।'

'মি. রানা, আর পারছি না আমি!'

দুই সঙ্গীর আবেদনে একদমই কান দিল না রানা, নির্দয়ের মত উঠে চলল উপরদিকে—সেফটি লাইনে টান দিয়ে ওদেরকে চলতে বাধ্য করছে। থামা যাবে না এক মুহূর্তের জন্য, থামলে টিনা আর রায়হানের পেশি বিদ্রোহ করে বসবে, পরে আর চলতেই পারবে না ওরা।

পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে রানা, হাত ছুটে যেতে চাইছে বারে বারে। পাউডার মাখলেও তা টিকছে না বেশিক্ষণ। ক্লাইম্বিঙের হিসেবে একশো ফুট ওর জন্যে কোনও ব্যাপারই হবার কথা নয়, কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। পাহাড় চড়ার সময় মাঝে মাঝে চাতাল খুঁজে বিশ্রাম নেয়া যায়, এমনকী ঝুলন্ত অবস্থায় থেমে পড়লেও অসুবিধে হয় না ওর। কিন্তু এখন দুই সঙ্গীকে সচল রাখার স্বার্থে একটুও বিশ্রাম নিতে পারছে না, তার উপর টিনা নিজের শরীরের প্রায় পুরো ভর-ই চাপিয়ে দিয়েছে সেফটি লাইনে, চলতেই পারছে না বলতে গেলে বেচারি,

তাকে অনেকটা টেনেই তুলতে হচ্ছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত রয়েছে ভারি ব্যাকপ্যাকটা—রায়হানের কষ্ট হবে ভেবে ওটা নিজের পিঠে ঝুলিয়েছে রানা। বাড়তি বোঝার কারণে ল্যাডারের ধাতব সরু ধাপগুলো তালুর মাংস কেটে বসে যেতে চাইছে। টিনা এখন আর কথা বলার মত অবস্থায় নেই, রায়হানও ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে।

আটতলায় পৌঁছুতেই চোখে অন্ধকার দেখার মত অবস্থা হলো রানার। জ্যাকেটের কাঁধে আটকানো টর্চের আলোয় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে কেইবল্ কারের তলা—এখনও অনেক দূরে ওটা। কাঁধ আর বাইসেপের পেশি টন টন করছে ওর, মনে হচ্ছে চাপ আর সইতে পারবে না ওগুলো। দুনিয়া জাহান্নামে যাক, আগে থেমে একটু বিশ্রাম করে নিই—এমন একটা চিন্তা জেঁকে বসতে চাইছিল, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল কর্তব্যবোধ। তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবনাটা দূর করল ও। দাঁতে দাঁত পিষে একের পর এক ধাপ পেরোতে থাকল, মাথাটা একেবারে শূন্য করে দিয়েছে, কিছুই ভাবছে না আর, শুধু উপরে পৌঁছুতে চাইছে।

যেন অনন্তকাল পর কেইবল্ কারের কাছে পৌঁছুল ওরা, পাশের গ্যাপটা গলে উঠে গেল আরও উপরে, ওটার ছাদে। রায়হান আর টিনাকে টেনে তুলল রানা, তারপর ওদের পাশে নিজেও শুয়ে পড়ল। সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে ওর, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. রানা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল টিনা। 'আপনি না থাকলে আর উঠতে হতো না আমাকে, নীচে পড়ে হাড়গোড় ভাঙতাম।'

'ধন্যবাদ না জানিয়ে বরং মিস্টার বলা ছাড়ো,' কপট রাগের সুরে বলল রানা। 'ওটা শুনলে নিজেকে কেমন পর-পর মনে হয়।'

'কী ডাকব তা হলে?'

'কেন, রায়হানের মত মাসুদ ভাই বলতে পারো না? তোমার মত জিনিয়াস একটা ছোট বোন পেলে কত খুশি হবো আমি, জানো?'

হাঁপানোর মাঝেও হেসে ফেলল টিনা। 'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

ধাতস্থ হতে বেশ কিছুক্ষণ নিল ওরা। হাত-পায়ে সাড়া ফিরে আসতেই ঝট করে উঠে বসল রানা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে শাফটে ঢোকার পর।

'গেট আপ,' সঙ্গীদের বলল ও। 'ব্রেকটাইম শেষ হয়ে গেছে।'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল রায়হান আর টিনা। ছাদের অ্যাকসেস প্যানেল খুলে কেইবল্ কারের ভিতরে নেমে এল তিনজনে। ব্যাকপ্যাক থেকে দুটো লোহার পাত বের করল রানা আর রায়হান, সেগুলো দিয়ে চাড় দিতেই খুলে গেল এলিভেটর ডোর, অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল ওরা।

ওপাশটা অন্ধকার, আলো নেই কোনও। টর্চটা টিনার হাতে দিয়ে রানা বলল, 'পথ দেখাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল তরুণী ইউনো, অ্যাপার্টমেন্টের সিটিংরুম

boighar.com

পেরিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে নিয়ে গেল দুই সঙ্গীকে। নব ঘুরিয়ে খোলা গেল না দরজাটা।

'ওপাশেই এলিসার অফিস,' ফিসফিস করে জানাল টিনা। 'কিন্তু দরজাটা তালা দেয়া।'

'ইলেকট্রনিক লক?'

'না। চাবি দিয়ে খুলতে হয়।'

'সরো,' বলল রানা। 'এটা তা হলে আমার ডিপার্টমেন্ট।'

ব্যাকপ্যাক থেকে একটা কিট বের করল ও, হাঁটু গেড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল চাবির ছিদ্রটা নিয়ে, টিনাকে বলল আলোটা ধরে রাখতে। মিনিটখানেকের মধ্যেই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো—তালা খুলে গেছে। নবে মোচড় দিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল ও, টিনাকে সামনে পাঠিয়ে পিছু পিছু ঢুকল রায়হানকে নিয়ে।

www.boighar.com

টর্চের আলোটা খুব বেশি শক্তিশালী নয়, তারপরও রুমটার আকৃতি বুঝতে অসুবিধে হলো না। বিশাল ওটা, অন্তত চলিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুট। হঠাৎ দেখার হলঘর বলে মনে হয়। আসলে ডিজাইন করা হয়েছে পুরনো আমলের রাজা-বাদশাদের দরবারের মত করে। ওয়েইটিং রুম থেকে দরজা ঠেলে ঢোকার পর অনেকটা জায়গা হেঁটে আসতে হয় কামরাটার অন্যপ্রান্তে, ওখানে দেড় ফুট উঁচু একটা মঞ্চের মত করে তার উপর বসানো হয়েছে এলিসার বিশাল ডেস্ক-টেবিল। নিজেকে সম্ভবত সম্রাজ্ঞী ভাবে কুচক্রী ইউনো, ডেস্কের মুখোমুখি চেয়ারে যতক্ষণ না বসতে বলা হচ্ছে, ততক্ষণ নীচে প্রাচীন আমলের প্রজার মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে অতিথিকে।

ডেস্কটার উপরেই এক কোণে দেখা যাচ্ছে কম্পিউটারটা, সিপিইউ-টা নীচে। ঘুরে ওটার সামনে চলে গেল তিন অনুপ্রবেশকারী, কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়াল। এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না যে, গন্তব্যে পৌঁছে গেছে... কঠিন যে-দায়িত্বটা নিয়ে গত কয়েকদিন পাগলের মত ছোটাছুটি করছে, সেটা সম্পাদনের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে ওরা।

রুদ্ধশ্বাসে রায়হান বলল, 'এখানে আছে তো অ্যান্টিভাইরাসটা?'

'দোয়া করো যাতে থাকে,' রানা বলল। 'এটাই আমাদের শেষ ভরসা।'

'এখুনি জানা যাবে,' বলে পাওয়ার-সুইচ অন করল টিনা। ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠল মনিটর, বুট করে একটা স্ক্রিনে এসে স্থির হলো—পাসওয়ার্ড চাইছে।

চেয়ার টেনে বসে কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ল তরুণী ইউনো, হাত রাখল কীবোর্ডে। সিকিউরিটি সিস্টেমটা ইউনোকোডে তৈরি হলেও সেটা ওর জন্য কোনও সমস্যা নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এনক্রিপশন ভেঙে পাসওয়ার্ডটা দূর করে ফেলল ও, ঢুকে পড়ল হার্ড ডিস্কে। অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামটার খোঁজে একটা সার্চও শুরু করে দিল।

মিনিটখানেক চলল সার্চ, তারপরই স্ক্রিনের সার্চ উইণ্ডোতে একটা ফাইল উদয় হতে দেখা গেল। সেটা ওপেন করে কী যেন দেখল টিনা কয়েক মুহূর্ত,

তারপর উইণ্ডোটা ক্লোজ করে দিয়ে রায়হানের দিকে ফিরল। বলল, 'সিডি দাও।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর কাজ দেখছিল রানা আর রায়হান, কথাটা কানে গেলেও অর্থটা অনুধাবন করতে পারল না। তরুণ হ্যাকার শুধু শব্দ করল, 'অ্যাঁ?'

'সিডি দাও, প্রোগ্রামটা তুলে নিতে হবে ওটায়।'

'এখান থেকেই ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়া যায় না?'

'উঁহুঁ, একটা সমস্যা চোখে পড়েছে। ওটা দূর করে নিতে হবে। কথা বাড়িয়ো না, সিডি দাও।'

রানার হাত থেকে ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক সিডি বের করল রায়হান, তুলে দিল সঙ্গিনীর হাতে। ওটা সিপিইউ-র সিডি রাইটার ড্রাইভে ঢোকাল টিনা, কীবোর্ডের বাটন চেপে কমাণ্ড দিল অ্যান্টিভাইরাসটা ডিস্কে কপি করতে। মাত্র দু'মিনিট লাগল জিনিসটা সিডিতে তুলে নিতে, তারপরই ড্রাইভ থেকে ওটা বের করে বক্সে ভরল টিনা, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো, যাওয়া যাক।'

'কোথাও যাবে না তোমরা!'

গমগম করে উঠল কামরাটা বাজখাঁই গলার স্বরে, একই সঙ্গে জ্বলে উঠল সবগুলো বাতি। চমকে উঠে মুখ তুলতেই বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে গেল তিন অনুপ্রবেশকারী। ওয়েইটিং রুমের দরজা খুলে গেছে, সেখান দিয়ে উদ্যত সাবমেশিনগান হাতে ভিতরে ঢুকেছে আলফা টিমের প্রথম দুই সদস্য। অ্যাপার্টমেন্টে যাবার দরজাটাও খুলে গেল এই সময়, সেখান দিয়ে এসে ঢুকল আলফা-থ্রি—এরা সবাই আশপাশে ঘাপটি মেরে ছিল।

সবশেষে বিজয়ীর ভঙ্গিতে অফিসে ঢুকল ডগলাস বুলক। গটমট করে সামনে এগিয়ে এল। মুখে অনাবিল হাসি ফুটিয়ে বলল, 'পৃথিবীটা বড্ড ছোট জায়গা! আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের, মি. রানা। কী মজার ব্যাপার, তাই না?'

ষোলো

বিপদের প্রকৃতিটা বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না রানার—পৃথিবীকে বাঁচানো-টাঁচানো তো অনেক পরের কথা, ওদের নিজেদেরই সময় ফুরিয়ে এসেছে। ওদেরকে প্রলোভন দেখিয়েছে বুলডগ ক্রিয়েলটেকের হেডকোয়ার্টারে আসবার জন্য; আর ফাঁদটায় ঠিকই পা দিয়ে বসেছে ওরা। লোকটার হাসি দেখে বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই, অসহায়ভাবে খুন হতে হবে ওদেরকে। যা করার এক্ষুণি করতে হবে, নইলে বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই।

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে একটা প্ল্যান এসে গেল ওর মাথায়, ঠিক সচেতনভাবে নয়, ইন্সটিঙ্কট-ই বলে দিল কী করতে হবে। ঝট্ করে উবু হয়ে গেল ও, হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে ফ্লোরে রাখা ব্যাকপ্যাক-টার মধ্যে—ডেস্কের

boighar.com

আড়ালে রয়েছে ওটা, শত্রুপক্ষের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

'খবরদার, মাসুদ রানা!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল বুলডগ, কপট হাসিটা উধাও হয়ে গেছে মুখ থেকে। 'কোনও চালাকি করতে যাবেন না! সোজা হয়ে দাঁড়ান বলছি।'

এবার রানার মুখে হাসি ফুটল। ধীরে ধীরে সোজা হলো ও, এক হাতে ধরে রেখেছে ব্যাকপ্যাকটা। বলল, 'চালাকি করলাম কোথায়? আমি তো এটা তুলতে যাচ্ছিলাম।'

'বোকা পেয়েছেন আমাকে?' সরোষে বলল বুলডগ। 'ভেবেছেন আপনার ধোঁকাবাজি কিছুই বুঝি না আমি?'

'বোকা হতে যাবেন কেন?' রানা বলল। 'বোকা হলে কি আর আমাকে এভাবে ফাঁদ পেতে ধরতে পারতেন? মাঝে মাঝে শুধু ভাগ্যটা আপনার সঙ্গে বেঈমানী করে, এই যা!'

শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল বের করে ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে নাড়ল বুলডগ। 'ছেঁদো কথা বাদ দিয়ে ব্যাগটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখুন, তারপর সরে আসুন ওখান থেকে।'

'এত কাঠখোট্টাভাবে না বললেও হয়,' হাসিটা ধরে রাখল রানা। 'মিষ্টি কথার ভক্ত আমরা, ভদ্রভাবে অনুরোধ করলে জানটাও দিয়ে দিতে পারি।'

'তা হলে দয়া করে ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে বাধিত করুন,' বিদ্রূপ করল বুলডগ।

'যথাজ্ঞা!' বলে উঁচু জায়গাটা থেকে নেমে এল রানা, দাঁড়াল গিয়ে বুলডগের একেবারে কাছাকাছি, দেখাদেখি টিনা আর রায়হানও—ওদের দুজনের মুখই দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে গেছে। রানা হঠাৎ ঠাট্টা-মশকরায় মেতে উঠল কেন, সেটাও বুঝতে পারছে না কেউই।

'হাতদুটো উপরে তুলে ফেলুন, মি. রানা,' বলল বুলডগ। 'ও-দুটোকে বড্ড ভয় পাই আমি, কখন কী করে বসে!'

'শিয়োর,' বলে হ্যাণ্ডস্ আপ ভঙ্গিতে দাঁড়াল রানা।

টিনা আর রায়হানকেও একই ভাবে দাঁড়াতে ইশারা করল বুলডগ, তারপর তাকাল আলফা-থ্রি'র দিকে। 'ব্যাগটা চেক করে দেখো। রানা এমনি এমনি ওটা নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না। আমরা অস্ত্র তাক করে আছি, তারপরও ওটা তুলতে পাগল হয়ে গেল... ব্যাগটার প্রতি এত আকর্ষণের পিছনে নিশ্চয়ই গূঢ় কোনও কারণ আছে।'

'ঠিকই ধরেছেন,' বলল রানা, কৌতুক করছে এখনও। 'খুব শখ করে কিনেছিলাম ব্যাগটা, মরার সময় জড়িয়ে ধরে মরতে চাই।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ঝরল বুলডগের কণ্ঠে। 'তা হলে তো খুব চিন্তার কথা। মরার সময় মাসুদ রানা যে-জিনিস জড়িয়ে ধরে রাখবে, সেটা তো যে-সে বস্তু হবার কথা নয়।' টেবিলের দিকে এগোতে থাকা আলফা-থ্রি'কে ডাকল সে। 'মেলভিন, ব্যাগটা সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো। ওটায় সম্ভবত বুবি ট্র্যাপ আছে।'

'কী যে বলেন না!' রানা হাসল। 'প্রিয় জিনিসে বুবি ট্র্যাপ বসাতে যাব

কেন?'

'চুপ! আর একটা কথাও না!' দাঁত খিঁচাল বুলডগ। আলফা-ওয়ান আর টু'কে ইশারা করল বন্দিদের দেহ তল্লাশি করতে।

একপাশের দেয়াল ঘেঁষে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড় করানো হলো রানাদের, তারপর দক্ষ হাতে সার্চ শুরু করল কার্টার ওরফে আলফা-টু। ওদের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে বন্দিরা, তার পরেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, রানা ও রায়হানের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে বুলডগ আর থিও। প্রথমেই রানা ও রায়হানের শরীর তল্লাশি করল আলফা-টু। হোলস্টারের পিস্তল, আস্তিনের ভাঁজে লুকানো ছুরি, বেল্ট-বাকলের ভিতর থেকে স্টীলের ওয়্যায়্যার—সবকিছুই নিয়ে নিল সে; এমনকী হাতের ঘড়ি, পকেটে রাখা ওয়ালেট... কিচ্ছু বাদ দিল না। রায়হানকে অ্যান্টিভাইরাসের সিডিটা দিয়েছিল তরুণী ইউনো, ওটাও নিয়ে নেয়া হলো।

দুই বিসিআই এজেন্টের পর এবার টিনার পালা। বিশ্রী হাসি হেসে ওর দিকে এগোল আলফা-টু, পিছনে গিয়ে বলল, 'কী হে সুন্দরী, তোমার কোথায় কী লুকিয়ে রেখেছ?'

জবাব দিল না টিনা। বন্দিনীকে তল্লাশি করতে করতে মুখের কুৎসিত হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো আলফা-টু'র, নিরস্ত্র মেয়েটাকে বাগে পেয়ে হাত দিচ্ছে এখানে-সেখানে। পা থেকে সার্চ শুরু করল সে, টিনার নিতম্ব আর উরুসন্ধিতে সময় নষ্ট করে যখন বুকে এসে পৌঁছুল, তখন শরীরে রীতিমত শিহরণ বইছে বদমাশটার। পিছন থেকে স্তনদুটো আঁকড়ে ধরল সে, মুখ দিয়ে জান্তব আওয়াজ করছে।

'হাত সরাও!' শীতল গলায় বলে উঠল রায়হান, ব্যাপারটা লক্ষ করে ভয়ঙ্কর ক্রোধে শরীর কাঁপছে ওর। 'নইলে এই মুহূর্তে তোমাকে খুন করব আমি!'

যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছে, এমনভাবে টিনাকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল আলফা-টু। পরমুহূর্তেই হেসে উঠল গলা ছেড়ে। বুলডগের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনছেন, ব্যাটা কী বলে? ও নাকি আমাকে খুন করবে!'

দেয়ালের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল রায়হান। প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে বলল, 'সত্যিই তোমাকে খুন করব আমি, শুধু আরেকবার ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখো।'

'ওমা, তাই নাকি?' বিদ্রূপ করল আলফা-টু। 'তা হলে তো এখুনি মাগীটাকে ন্যাংটো করে সার্চ করা দরকার।'

'চেষ্টা করেই দেখো!' বলল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়েছে ও-ও, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। মরলে মরবে, কিন্তু চোখের সামনে ছোট বোনের সম্মানহানি হতে দেবে না।

'আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ?' খেপাটে গলায় বলল আলফা-টু। 'এখুনি টের পাবে ফলটা। আমার হাতেই মরবে তোমরা।' হাতের সাবমেশিনগানটা তুলল সে।

'থামো!' ধমক দিয়ে উঠল থিও। 'পাগলামি কোরো না, কার্টার!'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দলনেতার দিকে ফিরল আলফা-টু। 'কীসের থামাথামি? এই

boighar.com

দুই কুত্তার বাচ্চা কি কম ভুগিয়েছে আমাদের মন্টেগো আইস শেলফে? ওদেরকে খুন করার জন্য সেদিন থেকেই হাত নিশপিশ করছে আমার।'

'সেজন্য যথাসময়ে সুযোগ দেয়া হবে তোমাকে,' শান্ত গলায় বলল থিও। 'গুলি করে মেরে পুলিশি ঝামেলায় জড়ানো ঠিক হবে না। ওদের মৃত্যুটা হবে আর সব ইউনোদের মত—দুর্ঘটনার আদলে। শরীরে বুলেটের আঘাত থাকলে সব কেঁচে যাবে না?'

www.boighar.com

যুক্তিটা বুঝতে পেরে নিজেকে সামলাল অভিজ্ঞ খুনী। বন্দিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়ু একটু বাড়ল তোমাদের। তবে জেনে রাখো, মরণটা আমার হাতেই হবে—শুধু একটু দেরিতে, এ-ই আর কী।'

'তুমিও আমার হাতেই মরবে,' রাগী গলায় বলল রায়হান—টিনার সঙ্গে বদমাশটা যা করেছে, তার পর কিছুতেই নিজেকে শান্ত রাখতে পারছে না হাসিখুশি স্বভাবের তরুণ হ্যাকার।

'কীভাবে?' সকৌতুকে বলল আলফা-টু। 'আবারও তাক লাগানো কোনও খেলা দেখাবে ভাবছ নাকি? পারলে দেখাও না! আমি জানতে চাই, এই রকম একটা পরিস্থিতিতে কারও কিছু করার থাকে কি না। কে জানে, কোনও একদিন আমি নিজেও তো এমন অবস্থায় পড়তে পারি।'

দরজায় শব্দ হলো এ-সময়, সবার মনোযোগ টুটে গেল, এই সুযোগে ফিসফিস করে রায়হানকে রানা বলল, 'তৈরি থাকো, ব্যাটাদের খায়েশ পূর্ণ হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। একটাই সুযোগ পাব পালানোর, এদেরকে আমি সামলাব, তুমি টিনাকে সঙ্গে রেখো।' বাংলায় বলল কথাটা, শত্রুরা শুনলেও যাতে বুঝতে না পারে।

এলিসা ভ্যান বুরেনকে দেখা যাচ্ছে দরজায়, উঁকি দিচ্ছেন। বললেন, 'সবকিছু নিয়ন্ত্রণে তো? আমি আসতে পারি এবার?'

'আসুন, আসুন,' বলল বুলডগ। 'এখন আর কোনও ভয় নেই। বন্দিদের নিরস্ত্র করা হয়েছে।'

ব্যাকপ্যাকটা চেক করাও শেষ হয়েছে আলফা-থ্রি'র। বলল, 'কিচ্ছু নেই এখানে।' টেবিলের উপর স্তূপ করে রাখা দড়ি, নানা রকম কিট, আর অন্যান্য জিনিসপত্র দেখাচ্ছে সে, টিনার ল্যাপটপ কম্পিউটারটাও আছে ওর মধ্যে। 'খামোকাই ভয় পাচ্ছিলেন আপনি, মি. বুলক।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে রইল বুলডগ। 'আপনি দেখি আমাকে হতাশ করে দিচ্ছেন, মি. রানা। চমক দেখানোর জন্য কিছুই বুঝি নেই আর আপনার হাতে?'

'থাকলে তো দেখতেই পেতেন,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'তাই বলে কোনও রকম ব্যাকআপ প্ল্যান ছাড়া বাঘের গুহায় পা রেখেছেন, এটা তো বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'প্ল্যান-ট্ল্যান সব গোল্লায় গেছে। ভাল কথা, আপনারা এসেছেন কখন এখানে? আমার লোক দেখতে পায়নি কেন?'

হেসে উঠল বুলডগ। 'আপনার মাথা কীভাবে কাজ করে, তা এতদিনে বুঝে

গেছি আমি। বিল্ডিঙের বাইরে যে ওয়াচার রাখবেন, সেটা আন্দাজ করতে পেরেছি। সেজন্যে হেলিকপ্টারে এসেছি আমরা, ছাদের হেলিপ্যাডে এসে নেমেছি।'

'হুম, এবার তা হলে সত্যিই টেক্কা দিয়েছেন আমাকে,' প্রশংসার সুরে বলল রানা।

প্রশংসায় খুশি হলো বুলডগ। বলল, 'ঠিক এই কথাটাই আপনার মুখ থেকে শুনতে উন্মুখ হয়ে ছিলাম আমি।'

এলিসা এসে দাঁড়িয়েছেন বুলডগের পাশে, গা-জ্বালানো সুরে বললেন, 'অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ইভা? এসো, কাছে এসো—শেষবারের মত দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে নিই।'

দ্বিধা করল টিনা, কিন্তু অস্ত্র নেড়ে নির্দেশটা পালন করতে ইশারা করল আলফা-ওয়ান। মেয়েটা নড়ছে না দেখে হাত ধরে ওকে নিয়ে এগোতে শুরু করল রানা, রায়হান অনুসরণ করল ওদেরকে। শত্রুদের ডানে গিয়ে থামল রানা, ঘুরে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে ওদের মুখোমুখি হতে গেলে ডেস্কটার দিকে পিঠ থাকে মানুষগুলোর। নিজের সুবিধেমত একটা পজিশনে প্রতিপক্ষকে দাঁড় করাতে চাইছে ও, ঘটলও তা-ই।

ঘুরে বন্দিদের মুখোমুখি হলো এলিসা ভ্যান বুরেন, বুলডগ, থিও আর কার্টার। আলফা-থ্রি, মানে মেলভিনও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। সবার অস্ত্র তাক করা আছে সামনের দিকে। মুচকি হেসে ধুরন্ধর বিজ্ঞানী টিনাকে বললেন, 'ছোট্ট ক্রিস্টিনা ওয়ালডেন... কত্তো বড় হয়ে গেছ তুমি!'

চমকে উঠল টিনা। 'আ... আপনি আমাকে চেনেন?'

'আগে চিনতাম না, এখন চিনে ফেলেছি। ভেবে দেখলাম, টিজিভিটাকে যেভাবে বাঁচানো হয়েছে, তা রানা বা রায়হানের পক্ষে সম্ভব নয়। বাকি রইলে তুমি, তাই মি. বুলককে বলেছিলাম তোমার ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে। তোমার নাম বদলানোর রেকর্ডটা খুঁজে বের করতে একটুও সময় নেননি তিনি। ভালই খেল দেখিয়েছ, বাছা। মরার আগে মাত্র সাত বছর বয়েসী একটা বাচ্চাকে ইউনোকোড শিখিয়ে দিয়ে যাবে মাইকেল আর ডেবি—এটা কে-ই বা কল্পনা করতে পারবে?'

'কেউ শেখায়নি আমাকে,' রাগী গলায় বলল টিনা। 'আমিই ওটা আবিষ্কার করেছি।'

'তা-ই নাকি?' ভুরু কোঁচকালেন প্রতিভাবান ইউনো, টিনার কথার অর্থ ধরতে পারলেন পরমুহূর্তেই। 'ও মাই গড! তুমি চাইল্ড-প্রডিজি ছিলে! কী আশ্চর্য, মাইকেল আর ডেবি তো কোনওদিন বলেনি আমাদের।'

'বলবে কী করে? তার আগেই তো ওঁদের খুন করেছেন আপনি!'

'ছি ছি, এভাবে বলছ কেন? ওরা তো নিজেরাই নিজেদের মরণ ডেকে এনেছিল। আমার সঙ্গে হাত মেলাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম ওদের, ইউনোকোডের আবিষ্কর্তারা দলে থাকলে সুবিধে হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আদর্শের বুলি কপচাতে থাকল বোকাদুটো। আমার প্ল্যান সবার কাছে ফাঁস করে দেবে বলে

boighar.com

হুমকি দিল। তা কি হতে দেয়া যায়? কত কষ্ট করে ইউনোকোডের মত একটা অব্যর্থ অস্ত্রের সন্ধান পেয়েছি আমি, এমন একটা জিনিসের আশাতেই তো কুর্ট মাসডেনের প্রেমিকা হয়ে *নীরস পণ্ডিতের দলে* যোগ দিয়েছিলাম। দিনের পর দিন বোরিং মানুষলোকে সহ্য করেছি একটাই কথা ভেবে—কোনও একদিন বিশাল একটা কিছু আবিষ্কার করবে এই জিনিয়াসেরা, আর আমি সেটার ফায়দা লুটব। আদর্শের বুলি কপচে কেউ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে, তা আমি মেনে নেব কেন?'

'সেজন্যে নিরীহ দুজন মানুষকে খুন করবেন?'

'আমি খুন করতে যাব কেন? আমি কি খুনী? যদি তা-ই হতাম, তা হলে তো আজ তোমাদের তিনজনকেই শেষ করে দিতে পারতাম—প্লেন-ক্র্যাশের পর অজ্ঞান ছিলে, আমাকে বাধা দিতে কীভাবে? কিন্তু কপাল ভাল তোমাদের, রক্ত-টক্ত একেবারেই সহ্য করতে পারি না আমি। তাই খুন করে অন্যেরা, মাই ডিয়ার ক্রিস্টিনা, আমি স্রেফ হুকুম দিই।'

'কে খুন করেছে আমার বাবা-মা'কে?' ফুঁসে উঠে জিজ্ঞেস করল টিনা। 'আপনার ভাই?'

'না, না, তখনও খুনোখুনির বয়স হয়নি ওর। কাজটা আমি গারফিল্ড নামে আরেকজনকে দিয়েছিলাম—আজ দুপুরে ওর হাতে মরতে পারতে তুমিও, যদি মি. রানা ওকে বাঁচতে দিতেন আর কী! ওঁকে ধন্যবাদ দেয়া দরকার, কারণ গর্দভটা আরেকটু হলে আমাকেও শেষ করে দিতে যাচ্ছিল।'

'ধন্যবাদ-টা দেবেন না দয়া করে,' কপট সুরে অনুরোধ করল রানা। 'আপনার ওই *গর্দভটাকে* ব্যর্থ করে দিলাম কেন, এই দুঃখে মরে যাচ্ছি আমি।'

জোরে হেসে উঠলেন এলিসা। 'আপনি দারুণ রসিক লোক, মি. রানা। সত্যি, আপনাকে খুব মিস করব আমি।'

'একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, ড. বুরেন?' রায়হান বলে উঠল।

'নিশ্চয়ই,' হাসি থামালেন এলিসা। 'মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ অনুরোধ তো রক্ষা করতেই হয়।'

'কেন আপনি এ-কাজ করছেন?' জানতে চাইল রায়হান। 'আপনি একজন ইউনো—আপনাদের ঈশ্বর বলে ভাবি আমরা... কম্পিউটার জগতের সবাই। আর কেউ হলে মেনে নেয়া যেত, কিন্তু আপনি কেন দুনিয়ার সমস্ত কম্পিউটার ধ্বংস করে দিতে চাইছেন? এতে লাভ কী আপনার?'

'লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন আসছে কেন?' বাঁকা সুরে বললেন এলিসা। 'কারণ ছাড়া ঈশ্বর তো মাঝে মাঝে পৃথিবীতে গজব নাজেল করেনই—এটাও তেমন একটা কিছু ভেবে নিন না!'

'মিথ্যে বলছেন আপনি,' কাটা কাটা স্বরে বলল টিনা। 'ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখাতে নয়, আপনি ভাইরাস ছেড়েছেন দুনিয়াটাকে হাতের মুঠোয় নেবার জন্য।'

'মানে!' রায়হান ভুরু কোঁচকাল।

'অ্যান্টিভাইরাসটায় সমস্যা আছে, বলেছিলাম না? কী ওটা, জানো? ওটায়

একটা ব্যাকডোর রাখা হয়েছে। এই অ্যান্টিভাইরাস যে-ই ব্যবহার করবে, তার কম্পিউটারের সমস্ত তথ্য অটোমেটিক্যালি এসে জমা হতে থাকবে ক্রিয়েলটেকের সার্ভারে।'

'তো?'

'ইউনো-ভাইরাসের আতঙ্ক থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশ ব্যবহার করবে ওটা—ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর তাদের সমস্ত গোপন তথ্য স্রেফ ঘরে বসে পেয়ে যাবে এই মেয়েলোক।' রাগী গলায় বলল টিনা। 'একজনের কাছে আরেকজনের তথ্য বিক্রি করতে পারবে, চাইলে অর্থনীতিকে ধসিয়ে দিতে পারবে, এমনকী যে-কোনও দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও ধ্বংস করবার চাবিকাঠি এসে যাবে ওর হাতে। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ হয়ে যাবে ও।'

'কিন্তু... কিন্তু ভাইরাসটা তো আগেই কেয়ামত ঘটিয়ে ফেলবে, তথ্য চুরির জন্য কোনও কম্পিউটারই তো অবশিষ্ট থাকবে না!'

'থাকবে, মি. রশিদ, থাকবে।' হাসলেন এলিসা। 'আমার ভাইরাস কম্পিউটারের সমস্ত যন্ত্রাংশ ধ্বংস করে ঠিকই—কিন্তু হার্ড ডিস্কে রক্ষিত ডেটা নষ্ট করে না, শুধু ইউনোকোডে এনক্রিপ্ট করে ফেলে। পুরনো সমস্ত তথ্য ফেরত পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেজন্যে আমার অ্যান্টিভাইরাসটা ব্যবহার করতে হবে। বুঝতেই পারছেন, পৃথিবীর কম্পিউটার-ব্যবস্থাকে অচল করে দিচ্ছি না আমি, শুধু দু'একদিনের জন্য সামান্য একটা ক্রাইসিস তৈরি করে আমার অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারটা সবখানে ঢোকানোর ব্যবস্থা করছি। এক অর্থে এটাকে একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন বলতে পারেন।'

'সামান্য ক্রাইসিস!' রায়হান চোখ কপালে তুলল। 'দুনিয়ার সব কম্পিউটার রিপ্লেস করতে হবে আপনার এ-কাজের ফলে। সফটওয়্যার আর হার্ডওয়্যার কিনতে বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে যাবে—এটা সামান্য মনে হচ্ছে আপনার কাছে? ফর গডস্ সেক, ডক্টর, এখনও সময় আছে, থামান ভাইরাসটাকে।'

'এসব বলে লাভ নেই, রায়হান,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ন্যায়-অন্যায়বোধ সব হারিয়ে গেছে ওঁর মধ্য থেকে। থাকবেই বা কীভাবে, ওই বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের বেশিরভাগটাই ওঁর পকেটে আসবে কি না!'

'টাকাটা স্রেফ উপরি পাওনা,' প্রতিক্রিয়াহীনভাবে বললেন এলিসা। 'আমি চাই ক্ষমতা... অঢেল ক্ষমতা। সেজন্যেই দুনিয়ার সমস্ত গোপন তথ্য আমার হাতের মুঠোয় আনতে চাই। আফটার অল, নলেজ ইজ পাওয়ার—এটা জানেন নিশ্চয়ই?'

'সে-কারণেই ঈশ্বরের আসন ছেড়ে দিয়ে চোরের খাতায় নাম লিখিয়েছেন?' বিদ্রূপ করল রানা, রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খামোকাই এঁকে পুজো করেছ তুমি, রায়হান। ঈশ্বর-টিশ্বর কিছু নন এই মহিলা, স্রেফ আরেকজন হ্যাকার—তথ্য চুরি করা যার পেশা।'

'আপনার এই ষড়যন্ত্র কোনওদিন সফল হবে না, এলিসা,' টিনা বলল।

boighar.com

'কেউ কোনও সমাধান বের করতে পারবে না, কিন্তু আপনার অ্যান্টিভাইরাস জাদু দেখিয়ে বেড়াবে... তারপরও দুনিয়ার মানুষ কিছু বুঝতে পারবে না ভেবেছেন?'

'বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, ডিয়ার ক্রিস্টিনা। তখন কারও কিছু করার থাকবে না,' এলিসা বললেন। 'ততদিনে গোটা দুনিয়ার কম্পিউটার-ব্যবস্থা আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে, কেউ ঝামেলা করতে চাইলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে শুরু করে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধও বাধিয়ে দিতে পারব। তা ছাড়া...' বুলডগের দিকে তাকালেন তিনি, '... এখন যেহেতু অ্যামেরিকার সাপোর্ট পেয়ে গেছি, আমার গায়ে তো ফুলের টোকাও দিতে পারবে না কেউ।'

'ভালই চুক্তি করেছেন,' বুলডগকে বলল রানা। 'এলিসা আপনাদের কাছে সমস্ত চুরি করা তথ্য দেবেন, আর তার বদলে ওঁকে প্রোটেকশন দেবেন আপনারা—তাই না? আপনার তো দেখি দিন দিন অবনতিই হচ্ছে। ছিলেন সিআইএ-র স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, ডিমোশন পেয়ে হয়েছিলেন ব্যুরো চিফ, আর সেখান থেকে এক ধাক্কায় চোরের সাগরেদ?'

খেপল না চতুর সিআইএ কর্মকর্তা। মৃদু হেসে বলল, 'যা খুশি ভাবতে পারেন আপনি, মি. রানা। কিন্তু অ্যামেরিকা আমাকে তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বীরের খেতাব দিতে যাচ্ছে। আমার দেশকে আমি অপরাজেয় এক শক্তিতে পরিণত করতে যাচ্ছি—আপনার মত চুনোপুটির কথায় কিচ্ছু যাবে-আসবে না।'

'বড়াইটা একটু পরেই নাহয় করুন, এখনও তো শেষ হয়নি খেলা।'

'শেষ হয়নি মানে? অনেক আগেই তো হেরে বসে আছেন আপনি, বলিনি?'

'হেরেছি কি হারিনি, সেটাই তো দেখতে বলছি আপনাকে।'

'কী বলতে চান?' সতর্ক হয়ে উঠল বুলডগ।

জবাব দিতে পারল না রানা, ঠিক সেই মুহূর্তেই তীক্ষ্ণ একটা *বিপ বিপ* শব্দ ভেসে এল ডেস্কের দিক থেকে। টাইমারের যিরো কাউন্টডাউনে পৌঁছানোর সঙ্কেত ওটা—বুঝতে অসুবিধে হলো না পোড় খাওয়া সিআইএ কর্মকর্তার।

'শিট!' চেঁচিয়ে উঠল বুলডগ। 'বোমা!'

এলিভেটর শাফটে ফোকর করার পরও সি-ফোরের একটা বাড়তি ব্লক রয়ে গিয়েছিল রানার কাছে। বুলডগ আর আলফা টিমকে অস্ত্র বাগিয়ে অফিসে ঢুকতে দেখে ওটার জন্যই ব্যাকপ্যাকে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল ও, ব্যাগটা হাতে করে তোলার আগেই বিদ্যুৎবেগে ব্লকটায় একটা ডিটোনেটর আর টাইমার ফিট করেছে, তারপর ছুঁড়ে দিয়েছে ডেস্কের তলায়। যদিও বুলডগ ওকে সন্দেহ করেছিল, কিন্তু ডেস্কের তলায় কোনও কিছু খোঁজার কথা মাথাতেই আসেনি লোকটার। তাই নিরাপদেই রয়ে গেছে বোমাটা, টাইমার এখন এসে পৌঁছেছে শূন্যের ঘরে।

চিৎকারটা দিয়েই ফ্লোরে ডাইভ দিয়ে পড়ল বুলডগ, পিছনে কান-ফাটানো শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। ভেঙে পড়ল অফিসের সব কাঁচ, ভেঙে-চুরে উড়ে চলে গেল ডেস্কটা। এলিসা আর আলফা টিম ঠিকমত ডাইভ দিতে পারেনি, পিঠে

ধাক্কার মত খেল তারা, উড়ে গিয়ে দেয়ালে আছড়ে পড়ল। কায়দা করে বোমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে এজন্যেই ওদের দাঁড় করিয়েছিল রানা, যাতে শকওয়েভের ধাক্কাটা শত্রুদের উপর দিয়ে যায়।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে রানা নিজেও দুই সঙ্গীকে নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল মেঝেতে, গুম গুম শব্দের রেশটা কাটতেই ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। তারস্বরে সিকিউরিটি অ্যালার্ম বাজছে কোথায় যেন, শব্দটা অগ্রাহ্য করল ও, দৌড়ে গিয়ে আলফা টিমের অচেতনপ্রায় সদস্যদের কাছ থেকে দুটো মেশিনগান নিল। শয়তানগুলোকে গুলি করে মেরে ফেলাই উচিত, কিন্তু আহত-অসহায় মানুষকে খুন করবার শিক্ষা পায়নি ও। নিজের অজান্তেই ট্রিগার থেকে আঙুল সরিয়ে ফেলল রানা, কার্টারের পকেট থেকে অ্যাণ্টিভাইরাসের সিডিটা বের করতে করতে বিড়বিড় করল, 'তোমাদের সঙ্গে পরে বোঝাপড়া হবে আমার—যখন সজ্ঞান থাকবে।'

একটা মেশিনগান নিজে রেখে অন্যটা রায়হানের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, বেরিয়ে পড়তে ইশারা করল। টিনাকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল তরুণ হ্যাকার, বাধা দিল ও। 'শাফট ধরে নামার সময় নেই। ছাদে চলো।'

লাথি মেরে দরজা খুলে ওয়েইটিং রুমে বেরিয়ে এল ওরা, সেখান থেকে করিডরে। 'রাস্তা দেখাও।' টিনাকে নির্দেশ দিল রানা।

নীরবে করিডরের ডানদিকটা দেখিয়ে দিল তরুণী, সেদিকে ছুটতে শুরু করল তিনজনে। পিছনে হইচই শোনা গেল, বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে বিল্ডিঙের সিকিউরিটি গার্ডেরা ছুটে আসছে। অটোমেটিক রাইফেলের ক্যাট্ ক্যাট্ আওয়াজ হলো, পলায়নপর মানুষ তিনজনের পিছনে মেঝেতে খসে পড়ল দেয়ালের পলেস্তারা।

ঝট্ করে উল্টো ঘুরল রানা। মেশিনগানটা কোমরের কাছে তুলে অঝোর ধারায় ছুঁড়ল গুলি—নিশানা-টিশানা করার ঝামেলায় যাচ্ছে না, প্রতিপক্ষ ভয় পেয়ে না এগোলেই চলে। উদ্দেশ্যটা সফল হলো—করিডরের দূরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল আতঙ্কিত চিৎকার, লাফ দিয়ে আড়ালে চলে যাচ্ছে গার্ডেরা।

ম্যাগাজিনটা খালি হতেই হাতের অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা, উল্টো ঘুরে রায়হান আর টিনাকে অনুসরণ করল। ত্রিশ গজ পেরোতেই একটা ল্যাণ্ডিং পড়ল, সঙ্গে ছাদে যাবার সিঁড়ি। দ্রুত উপরে উঠতে শুরু করল ওরা।

সামনেই ইলেকট্রিফায়েড দরজা, তবে সেটা নিয়ে সময় নষ্ট করল না রানা। রায়হানের কাছ থেকে দ্বিতীয় মেশিনগানটা নিয়ে গুলি করে ওটার কবজা উড়িয়ে দিল ও—বোমা বিস্ফোরণের কারণে এমনিতেই অ্যালার্ম বাজছে, দরজাটা ভেঙে ফেললে তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

'গার্ড পোস্টটা কোথায়?' ছাদে বেরুনোর আগে টিনার কাছে জানতে চাইল রানা।

'বাঁয়ে, বিশ ফুট দূরে,' উত্তর দিল তরুণী ইউনো।

'আর হেলিপ্যাড?'

boighar.com

'ডানে। পঁচিশ গজের মত যেতে হবে।'

'গুড,' রায়হানের দিকে ফিরল রানা। 'বুলডগ একটা হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছে, ওটা নিশ্চয়ই আছে হেলিপ্যাডে। আমি কাভার দেব, তুমি আর টিনা সোজা ওটায় উঠে পোড়ো। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রাখবে, যাতে আমি চড়ামাত্র টেকঅফ করতে পারো।'

www.boighar.com

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

'ও.কে., তৈরি হও তা হলে। থ্রি, টু, ওয়ান... গো!'

লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেলল রানা, এক গড়ান দিয়ে বেরিয়ে এল ছাদে। হাঁটু গেড়ে পজিশন ঠিক করতেই পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসা দুই গার্ডকে দেখতে পেল—ওর দিকে রাইফেল তুলছে। মেশিনগান থেকে ব্রাশফায়ার করল ও, এক গার্ডের হাঁটুর নীচে বিঁধল গুলি, কংক্রিটের উপর লুটিয়ে পড়ল সে, অন্যজন ঝাঁপ দিয়ে একটা জাংশান বক্সের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

আরেকবার গুলি করে আহত লোকটাকে পরপারে পাঠিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকল রানা, গাস ফর্ক আর ফ্রেইবেলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, এরাও হয়তো ওই দুজনেরই মত—স্রেফ দায়িত্ব পালন করছে, এলিসা ভ্যান বুরেনের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই হয়তো নেই এদের।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো—রায়হান আর টিনা হেলিপ্যাডের দিকে ছুটে যাচ্ছে। দ্বিতীয় গার্ড একটু মাথা বের করল পরিস্থিতি বোঝার আশায়, কিন্তু তার ছ'ইঞ্চি দূর দিয়ে একটা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ভয় পাইয়ে দিল রানা। তাড়াতাড়ি আবার মাথাটা টেনে নিল গার্ড।

একটু পরেই চারপাশ কাঁপিয়ে চালু হলো হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন, রোটরব্লেডের ধাক্কায় ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে উঠল বাতাস। পিছাতে শুরু করল রানা, ছোট ছোট বিরতিতে গুলি করছে, আড়াল থেকে বেরুতে দিচ্ছে না গার্ডকে। হেলিপ্যাডের সিঁড়ির কাছে গিয়ে গুলিবর্ষণ থামাল ও, উল্টো ঘুরে ছুট লাগাল অপেক্ষারত আকাশযানটার দিকে। এবার বেরিয়ে এল গার্ড, রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল রানার দিকে। ছুটন্ত পায়ের পিছনে ছিটকে উঠল কংক্রিটের গুঁড়ো, লক্ষ্যবস্তুকে না পেয়ে ছাদে নিষ্ফল কামড় বসাচ্ছে বুলেটগুলো।

লাফ দিয়ে কপ্টারে চড়ে বসল রানা, তারপর ঘুরে টেনে দিল দরজাটা। চেঁচিয়ে উঠল, 'গো, রায়হান... গো!'

রোটরের আওয়াজ বদলে গেল, ছাদ ছেড়ে শূন্যে ভেসে পড়েছে হেলিকপ্টার। ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে বোঝা গেল, এবার আকাশযানটাকে লক্ষ্য করে গুলি করছে গার্ড—কপ্টারের শরীরে এসে বিঁধছে তার অব্যর্থ বুলেটগুলো।

'মাসুদ ভাই, থামান ব্যাটাকে!' পাইলটের সিট থেকে চেঁচিয়ে বলল রায়হান। 'ইঞ্জিনে গুলি লাগলে কিন্তু সর্বনাশ!'

জানালা গলে মেশিনগানটা বের করল রানা, ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ে গেল যতক্ষণ না ম্যাগাজিনটা শেষ হয়। ফাঁকা চেম্বারে হ্যামারটা যখন খটাস করে পড়ল, তখন ছাদের সীমানা পেরিয়ে গেছে হেলিকপ্টার, নাক ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে।

ফোঁস করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। সিটে হেলান দিয়ে শেষবারের মত তাকাল ক্রিয়েলটেক হেডকোয়ার্টারের ছাদের দিকে—খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেখানে উদয় হয়েছে পাঁচজন মানুষ।

বুলডগ, ড. বুরেন আর আলফা টিম। তীব্র আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে আছে তারা মিলিয়ে যেতে থাকা যান্ত্রিক ফড়িংটার দিকে।

সতেরো

'এবার কী, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল রায়হান। 'কী করতে চান?'

'সেটা টিনার উপর নির্ভর করছে,' বলল রানা, তাকাল তরুণী ইউনোর দিকে। 'কী করা যায়, টিনা? রেডিমেড অ্যান্টিভাইরাসটা নিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু ওটা তো ব্যবহার করা যাবে না। করলে ড. বুরেনের প্ল্যানটা সফল হয়ে যাবে, পৃথিবীর সব কম্পিউটার থেকে তথ্য চুরি করতে পারবে সে।'

টিনা বলল, 'ব্যাকডোরের অপশনটা মুছে দিয়ে প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলতে পারব আমি। এখনই কাজটা শুরু করে দিতে পারতাম, কিন্তু বোমা ফাটিয়ে আমার ল্যাপটপটা উড়িয়ে দিয়েছেন আপনি।'

'ভেবো না,' বলল রানা। 'নতুন একটা তোমাকে জোগাড় করে দেব এখুনি। কিন্তু কথা হলো— মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় হাতে, এর মধ্যে অ্যান্টিভাইরাসটা মেরামত করে নিতে পারবে তুমি?'

'পারব, তবে সবখানে ডিস্ট্রিবিউট করবার মত যথেষ্ট সময় পাবো কি না, তা বলতে পারি না। শিডিউলে এমনিতেই যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছি আমরা। আমার তো ইচ্ছে ছিল, এলিসার অফিস থেকেই ডিস্ট্রিবিউশনটা শুরু করব; ব্যাকডোরটা চোখে পড়ায় করিনি।'

'ভালই সমস্যা হলো দেখছি। সবখানে যদি বিলি করা না যায়, তা হলে জিনিসটা মেরামত করেই বা লাভ কী হবে?'

'কী করার আছে বলুন?' কাঁধ ঝাঁকাল টিনা। 'ব্যাকডোর সরাতে অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট দিতেই হবে আমাকে। আর পৃথিবীর সব ইণ্টারনেট সার্ভারে ওটা পাঠাবার জন্য আরও এক ঘণ্টা। সব মিলিয়ে দেড় থেকে দু'ঘণ্টার মামলা—যদি এই মুহূর্তে আমাকে একটা কম্পিউটার দিতে পারেন আর কী!'

'ল্যাণ্ড করব, মাসুদ ভাই?' অনুমতি চাইল রায়হান। 'নীচে নেমে দেখি, কোথাও একটা কম্পিউটার পাওয়া যায় কি না।'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'ক্রিয়েলটেক থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাদের। বুলডগ আর এলিসা এখুনি পাগলা কুকুরের মত ছুটে আসবে, কাছাকাছি ল্যাণ্ড করলে আমাদের সহজে খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা।'

'কিন্তু সময় যে ফুরিয়ে আসছে!' প্রতিবাদ করল রায়হান। 'এখুনি অ্যান্টিভাইরাসটা নিয়ে কাজ শুরু করা দরকার টিনার।'

boighar.com

'জানি, কিন্তু কাজ করার জন্য বেঁচে থাকতে হবে না প্রথমে?'

'এ দেখি উভয়সঙ্কটে পড়া গেল,' তিক্ত সুরে বলল রায়হান।

টিনার দিকে ফিরল রানা। 'মানলাম, তোমার কাজটার জন্য আধঘণ্টা লাগবেই লাগবে। কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টা কমিয়ে আনা যায় না? মানে... খুব দ্রুত অ্যান্টিভাইরাসটা বিলি করবার কায়দা নেই কোনও?'

'একভাবেই সেটা করা যেতে পারে—অত্যন্ত শক্তিশালী একটা কম্পিউটার দিয়ে,' বলল টিনা। 'পৃথিবীর যেখানে যত নেটওয়ার্ক আছে, সেগুলোর সবক'টায় একই সময়ে সংযুক্ত হতে হবে ওটাকে। শুধু সংযুক্ত হলেও হবে না; প্রত্যেক নেটওয়ার্কের নানা রকম সিকিউরিটি থাকে, সেসবকে ইনফিলট্রেট করে অ্যান্টিভাইরাসটা ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর এইসব কাজ করতে হবে একসঙ্গে... একই সময়ে। মিলিয়ন-মিলিয়ন গিগাবাইট তথ্য আদান-প্রদান হবে কাজটা করার সময়ে, কাজেই এত বড় প্রেশার সামলানোর মত ক্ষমতাও থাকতে হবে কম্পিউটারটার।'

'কী সব টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না,' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'এতকিছু না-বলে সোজাভাবে বলো না, কী চাই তোমার কাজটা সারতে?'

'সুপার-কম্পিউটার, মাসুদ ভাই,' হাসল টিনা। 'একটা সুপার কম্পিউটার দরকার আমার।'

'শুধু ডিস্ট্রিবিউশনের জন্যে তো? ব্যাকডোর সরাবার কাজটা তো যে-কোনও কম্পিউটারেই করতে পারবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। এখুনি ম্যানেজ করে দিচ্ছি সব।' রায়হানের দিকে তাকাল রানা। 'পাঁচ মিনিটের জন্য ল্যাণ্ড করো কোথাও। একটা ফোন করতে হবে আমাকে।'

'পাঁচ মিনিটে আপনি কীভাবে একটা সুপার-কম্পিউটার এনে দেবেন আমাকে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল টিনা।

'এনে দেব তো বলিনি! বলেছি ম্যানেজ করে দেব। তোমাকে শুধু ব্যাকডোর সরিয়ে অ্যান্টিভাইরাসটাকে ওই কম্পিউটার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে, বিলি-বণ্টন ওটা নিজেই করে ফেলতে পারবে।'

'কী বলছেন এসব! একটা যন্ত্র আবার নিজে নিজে কাজ করে কীভাবে?'

মুচকি হাসল রানা। 'করে... করে। ভিনাসকে তো তুমি দেখোনি!'

ওয়াশিংটনে এখনও ভোর হয়নি, হবে হবে করছে। এই সময়টাতেই সবচেয়ে গভীর ঘুম হয় সবার; ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি... সংক্ষেপে নুমা'র কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ, কালো মানিক ল্যারি কিং-ও তার ব্যতিক্রম নয়। আরাম করে কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছিল সে, স্বপ্নও দেখছিল। আচমকা বেরসিকের মত বেডসাইড টেবিলে রাখা ফোনটা বেজে উঠতেই নিদ্রাদেবীর আরাধনা শিকেয় উঠল। চোখ মেলে পিট পিট করে তাকাল ল্যারি, ঘড়ি দেখল। ভুরু কুঁচকে গেছে তার, এমন চমৎকার ঘুমটা ভেঙে গেলে কারই বা ভাল লাগে!

এখনও বেজে চলেছে ফোনটা, বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা তুলল ল্যারি, কানে ঠেকাল। অপরপক্ষের কোনও কথা শোনার আগেই তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'এটা যদি ইমার্জেন্সি কল না হয়, তা হলে তোমার খবর আছে—তুমি যে-ই হও না বাপু!'

'কী আশ্চর্য, ইমার্জেন্সি ছাড়া বন্ধুকে ফোন করা যায় না বুঝি?' ওপাশ থেকে রানার গলা ভেসে এল।

'ক্... কে? রানা নাকি?'

'ঠিক ধরেছ। তা, কী ধরনের খবর করবে আমার, জানতে পারি?'

হেসে উঠল ল্যারি। 'তোমার জন্য আমার ফোনের লাইন সবসময় খোলা, রানা। তাই বলে যখন-তখন ফোন করে আমার ঘুমের বারোটা না বাজালেও পারো।'

'ওটুকু দয়া দেখাতে রাজি আছি আমি, যদি ছোট্ট একটা কাজ করে দাও।'

'কী কাজ?'

'ইউনো-ভাইরাসের ব্যাপারে শুনেছ তো?'

'হ্যাঁ, তোমাদের বিসিআই থেকে একটা ওয়ার্নিং পাঠানো হয়েছে আমাদের কাছে। কেউ সেটা গুরুত্বের সঙ্গে না নিলেও আমি কোনও চান্স নিচ্ছি না। নুমার কম্পিউটার সেকশন বন্ধ করে দিয়েছি মি. রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলে।' জর্জ রেডক্লিফ নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের অনুপস্থিতিতে তিনিই এখন সবকিছু দেখাশোনা করছেন। 'যতক্ষণ না পুরো ব্যাপারটার সত্য-মিথ্যে যাচাই করতে পারছি, কোনও কম্পিউটারই আর অন্ করব না।'

'সিদ্ধান্তটা পাল্টাতে হবে তোমাকে,' রানা বলল। 'ভিনাসকে এখুনি চাই আমি।'

ভিনাস হচ্ছে ল্যারি কিঙের নিজ হাতে তৈরি এক অত্যাশ্চর্য সুপার-কম্পিউটার। অন্যান্য যে-কোনও সুপার-কম্পিউটারের চাইতে কয়েক গুণ উন্নত ওটা—ক্ষমতার দিক থেকে তো বটেই, সেই সঙ্গে নেক্সট জেনারেশন আর্টিফিশিয়াল-ইন্টেলিজেন্সের কারণে। অত্যন্ত স্মার্ট কম্পিউটার এই ভিনাস—নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, মানুষের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় করতে পারে, করতে পারে আরও অনেক কিছু। থ্রি-ডি ইন্টারফেসে কম্পিউটারটাকে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের চেহারা দিয়েছে ল্যারি, মানুষের সঙ্গে কথোপকথনটা উপভোগ্য হবার জন্য। ভিনাস নামেই ডাকে সে এই নারীমূর্তি এবং কম্পিউটারটাকে।

'ব্যাপারটা কী?' প্রশ্ন করল ল্যারি। 'হঠাৎ ভিনাসকে কী প্রয়োজন পড়ল তোমার?'

'ভাইরাসের ব্যাপারটা সত্যি,' রানা বলল। 'ওটার একটা অ্যান্টিভাইরাস জোগাড় করেছি আমি, সেটা ভিনাসের মাধ্যমে আধঘণ্টায় সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে হবে, নইলে কেয়ামত নেমে আসবে তোমাদের সাইবার-জগতে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল ল্যারি। 'কী বলছ এসব! ইউনোকোড তার মানে সত্যিই আছে?'

'হ্যাঁ, ল্যারি। তবে এসব নিয়ে আলোচনার সময় নেই এখন। তাড়াতাড়ি

boighar.com

ভিনাসকে অনলাইনে আনো, অ্যান্টিভাইরাসটা ঠিকঠাক করে যত দ্রুত সম্ভব আপলোড করে দিতে চাই আমি।'

'ওপেন লাইনে পাঠিয়ো না ওটা,' ল্যারি বলল। 'তা হলে যে-কেউ ইণ্টারসেপ্ট করতে পারবে।'

'কীভাবে পাঠাব?'

'নুমার সমস্ত শিপে ভিনাসের সিকিউরড্ নেটওয়ার্ক আছে, যে-কোনও একটাতে গিয়ে শিপের কম্পিউটারেই লোড করে দাও প্রোগ্রামটা। তা হলে হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত আর টানাহেঁচড়া করতে হবে না, শিপের কম্পিউটার থেকেই ওটা ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারবে ভিনাস।'

'আমি এখন অ্যামস্টারড্যামে, এখানে নুমার শিপ পাবো কোথায়? তা ছাড়া সময়ও নেই হাতে।'

'এমনি এমনি নিষেধ করছি না। আজকাল ভিনাসের সমস্ত আনসিকিউরড্ ডেটা-ট্রান্সফারে ইণ্টারসেপ্ট করছে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা—গোয়েন্দাগিরি করছে ওরা আমাদের উপর। ওপেন লাইনে প্রোগ্রামটা পাঠালে ওটা মাঝপথেই চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

'ভাল বিপদে পড়া গেল!' বিরক্ত স্বরে বলল রানা। 'বিকল্প কোনও উপায় আছে?'

'কেন, আমাদের কোনও জাহাজে যেতে পারবে না?'

'হেলিকপ্টার একটা অবশ্য আছে আমার সঙ্গে,' রানা বলল। 'কাছাকাছি কোনও শিপ থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'একটু ধরো তা হলে।' বলে টেবিল থেকে একটা ফাইল নিয়ে এল ল্যারি—ওটায় নুমার বিভিন্ন শিপের গতিবিধির রিপোর্ট রয়েছে। কয়েকটা পাতা উল্টাল সে, তারপর রানাকে বলল, 'আছে একটা শিপ। সি-স্কুইরেল, নর্থ সি-তে উপকূল জরিপ করছে। হল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূল থেকে দশ মাইল দূরে নোঙর করে আছে ওটা, তারমানে... অ্যামস্টারড্যাম থেকে চল্লিশ মাইল ডিসট্যান্সে।'

'তা হলে তো যাওয়া সম্ভব ওখানে,' বলল রানা। 'তুমি শিপে খবর পাঠিয়ে দাও, ল্যারি। আমরা পনেরো মিনিটের মধ্যে ওখানে পৌঁছুচ্ছি।'

'ঠিক আছে।' রানাকে জাহাজের কো-অর্ডিনেটস্ দিল ল্যারি। তারপর বলল, 'আমিও নুমা হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি। ভিনাসকে জাগিয়ে খবর দেব তোমাকে।'

ডেকলাইটের আলোয় সাগরের বুকে ঝলমল করতে থাকা *সি-স্কুইরেল*-কে আকাশ থেকে দেখাচ্ছে বিয়েবাড়ির মত—যেন উৎসব চলছে ওখানে, তাই এত সাজসজ্জা। আসলে হেলিকপ্টারটার ল্যাণ্ডিঙে সাহায্য করবার জন্য আলোগুলো জ্বেলেছে জাহাজের ক্রু-রা। কাছে গিয়ে জাহাজটাকে ঘিরে একবার চক্কর দিল রায়হান, তারপর ডেকের উপর ধীরে ধীরে নামাতে শুরু করল কপ্টারটাকে।

'এখানেই আসবার কথা আমাদের?' জিজ্ঞেস করল টিনা, চোখে সন্দেহ ওর। কাছ থেকে দেখার পর জলযানটাকে জাহাজ বলে মনে হচ্ছে না ওর কাছে।

হাসল রানা। 'কোনও সন্দেহ নেই, এটাই সি-স্কুইরেল।'

টিনার এই মনোভাবে অবাক হবার কিছু নেই, হঠাৎ দেখায় সি-স্কুইরেলকে একটা ড্রিলিং প্ল্যাটফর্ম বলেই ভ্রম হয়। সি-স্কুইরেল আসলে একটা সোয়াথ... মানে, স্মল ওয়াটারপ্লেন এরিয়া টুইন হাল শিপ—আণ্ডারওয়াটার সার্ভে এবং রিসার্চের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা জাহাজ। ক্যাটামারান কনসেপ্টে তৈরি হওয়া এই জাহাজ অন্যান্য যে-কোনও টুইন হাল শিপের চেয়ে উন্নত। পুরো কাঠামোটাকে ভাসানোর জন্য বয়া-র মত দুটো টিউব আছে এর—পানির নীচে থাকে। ওগুলোর উপর প্ল্যাটফর্মের মত করে বসানো হয়েছে পুরো সুপ্রারস্ট্রাকচার—দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে সেজন্যেই। অবশ্য চেহারাটা জাহাজের মত হোক বা না-হোক, অন্যান্য যে-কোনও জলযানের চেয়ে নিরাপদে ভাসতে পারে সোয়াথ শিপ। টুইন হালের মাঝে ফাঁকা থাকায় সবসময় দু'তিন রকম ওয়েভ প্যাটার্ন থাকে জাহাজটার নীচে, পরস্পরের প্রভাব নিষ্ক্রিয় করে ফেলে ওগুলো; ওয়াটারলাইন ভলিউম কম হবার কারণে ঢেউও ধাক্কা দেবার সময় খুব বেশি জায়গায় আছড়ে পড়তে পারে না—ফলে উত্তাল সাগরেও দুলুনি খুব একটা হয় না এসব জাহাজে।

ডেকে হেলিকপ্টারটা নেমে আসতেই দুজন মানুষ এগিয়ে এল অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে। ইঞ্জিন বন্ধ করে নামল রানারা, মুখোমুখি হলো তাদের।

দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভদ্রলোক জাহাজের ক্যাপ্টেন, তিনি হেসে বললেন, 'ওয়েলকাম টু সি-স্কুইরেল, মি. রানা। আমাকে চিনতে পারছেন?'

'ম্যাট ডিলান... আপনাকে কি ভোলা যায়?' রানাও হাসল—নুমার অনারারি এজেন্ট ডিরেক্টর ও, প্রতিষ্ঠানটার প্রায় সবাইকেই চেনে।

'যে-দিনকাল পড়েছে এখন, ভুলতে সময় লাগে না। গত বছরের অ্যানুয়াল মিটিঙের পর থেকে তো দেখাই হয়নি আর আপনার সঙ্গে।'

'আমি একটু পুরনো টাইপের মানুষ, বর্তমান দিনকালের প্রভাব সহজে পড়ে না আমার উপর,' ক্যাপ্টেন ডিলানের সঙ্গে হাত মেলাল রানা, তারপর পরিচয় করিয়ে দিল সঙ্গীদের।

www.boighar.com

ক্যাপ্টেনও তাঁর সঙ্গীকে পরিচয় করালেন, 'এ-হচ্ছে ডেভিড ওয়েবার—আমার ফার্স্ট অফিসার।'

'হাউ ডু ইউ ডু,' সবার সঙ্গে হাত মেলাল ওয়েবার।

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই কাজের কথায় এল রানা। 'ল্যারি কিং বলেছে আপনাদের, কী করতে হবে?'

'শুধু এটুকুই যে, শিপের কম্পিউটারে কিছু কাজ করবেন আপনারা। ব্যাপারটা কী, জরুরি কিছু না হলে তো রাতদুপুরে এভাবে ছুটে আসবার কথা নয় আপনার।'

'সবকিছু পরে খুলে বলব, এখন কম্পিউটার সেকশনে নিয়ে চলুন আমাদের। সময় খুব কম।'

'ঠিক আছে, আসুন।'

রানাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন ডিলান।

boighar.com

‘শিপে নামব কীভাবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার,’ হাঁটতে হাঁটতে বলল রানা। ‘ডেকে আপনাদের নিজেদের একটা চপার-ই তো থাকার কথা, তাই না? কোথায় ওটা?’

‘ক্রুদের নিয়ে মেইনল্যাণ্ডে গেছে,’ জানালেন ডিলান। ‘গত দু’মাস ধরে টানা সার্ভে করছি আমরা, বিশ্রাম-টিশ্রাম নিইনি একটুও। আজই প্রথম ডাঙায় যাবার সুযোগ দিয়েছি, তাই বেশিরভাগ লোকই চলে গেছে। জাহাজে এখন শুধু আটজন আছি আমরা।’

‘গেছে ভালই হয়েছে,’ রানা বলল। ‘নইলে চপারটাও যেত না, আমরাও ল্যাণ্ড করতে পারতাম না।’

ডেকের একপাশে বিশাল এক উইঞ্চে ঝোলানো রয়েছে, একটা ওয়ান-ম্যান ট্রাইটন মিনি-সাবমেরিন। পার হবার সময় ওটা লক্ষ করে রায়হান জিজ্ঞেস করল, ‘এটা কীসের জন্য?’

এবার জবাব দিল ওয়েবার। ‘আণ্ডারওয়াটার সার্ভে করছি আমরা, প্রায়ই নামতে হয় পানির নীচে, সেজন্যেই আনা হয়েছে ওটা।’

কৌতূহলী দৃষ্টিতে সাবমেরিনটা দেখল রায়হান আর টিনা। গ্রীক দেবতার নামে নাম ওটার, চেহারায়ও শক্তিমত্তার প্রতিফলন ঘটছে। ইস্পাতের তৈরি ছোটখাট একটা লৌহদানব এই ট্রাইটন—চুয়াল্লিশ ফুট লম্বা, সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু। ককপিটের জায়গাটা গোলাকৃতি ফাইবারগ্লাসের তৈরি, দেখলে মাছ রাখার পাত্রের কথা মনে পড়ে যায়। দুপাশ থেকে দুটো মেকানিক্যাল হাত বেরিয়ে এসেছে ওটার, সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে আছে—ও’দুটো দিয়ে সি-বেড থেকে নানা রকম নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

ওয়েদার-ডেক পেরিয়ে সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে পড়ল দলটা। সরু একটা করিডর ধরে একটু এগিয়েই বাঁয়ের একটা দরজা খুললেন ডিলান—ওপাশে শিপের কম্পিউটার সেকশন।

একটা অন্ করা কম্পিউটার দেখিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ‘এটা রেডি রাখা হয়েছে আপনাদের জন্য।’

চেয়ার টেনে ওটার সামনে বসে পড়ল টিনা, ড্রাইভে ঢোকাল অ্যান্টিভাইরাসের সিডিটা, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ব্যাকডোরটা সরানোর কাজে।

ডিলানকে অনুরোধ করে একটা স্যাটেলাইট ফোন আনাল রানা। সেটা থেকে ল্যারি কিঙের মোবাইলে রিং করল।

‘হ্যালো?’

‘ল্যারি, রানা বলছি। তুমি তৈরি আছ?’

‘হ্যাঁ, ভিনাস স্ট্যাণ্ডবাই রয়েছে। প্রোগ্রামটা আপলোড করেছ?’

‘একটু কাজ করতে হচ্ছে ওটার উপরে, আধঘণ্টা লাগবে হয়তো। তুমি রেডি থেকো, আমি জানাব কখন ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে।’

‘ঠিক আছে, অপেক্ষায় থাকছি আমি।’

ঠিক সেই মুহূর্তে কানে আরেকটা ফোন ঠেকিয়ে বসে আছে ডগলাস বুলক,

মনোযোগ দিয়ে শুনছে অপরপক্ষের কথা। আনমনে একটু মাথা নাড়ল সে, তারপর বলল, 'ধন্যবাদ।'

'কী খবর, খোঁজ পাওয়া গেল?' জিজ্ঞেস করল থিও ওরফে আলফা-ওয়ান, কার্টারের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে সে। ফার্স্ট এইডের ট্রেইনিং রয়েছে আলফা-টিমের সবার, নিজেরাই নিজেদের শুশ্রুষা করছে।

'এয়ার ট্রাফিক কণ্ট্রোলের সঙ্গে কথা বললাম,' বুলডগ বলল। 'হেলিকপ্টারটাকে উপকূল পেরুনো পর্যন্ত ট্র্যাক করতে পেরেছে ওরা।'

'উপকূল!' ভুরু কোঁচকালেন এলিসা। 'সাগরে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল বুলডগ।

'কিন্তু কেন?'

'নিশ্চয়ই কোনও শিপে গেছে,' অনুমান করল বুলডগ। 'অ্যাণ্টিভাইরাসটা ওখান থেকে সবখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।'

'শিপে কেন? ডাঙা থেকে চেষ্টা করতে পারত না?'

'বাড়তি কোনও সুবিধে পাচ্ছে নিশ্চয়ই,' বুলডগ বলল। 'আর বাড়তি সুবিধে বলতে একটা জিনিসই মাথায় আসছে—নুমা! ওদের একটা আলট্রা-সফিসটিকেটেড সুপার-কম্পিউটার আছে। আমার মনে হচ্ছে, নুমার শিপ থেকে ওই কম্পিউটারটার সাহায্যে কাজ উদ্ধার করতে চাইছে রানা।'

বিস্মিত কণ্ঠে এলিসা বললেন, 'নুমা তো অ্যামেরিকার... মানে আপনাদেরই সরকারি সংস্থা। ওরা কেন রানাকে সাহায্য করবে?'

'আর বলবেন না,' বিরক্তি ফুটল বুলডগের কণ্ঠে। 'নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আর তার সঙ্গের সব লোক হচ্ছে মানবদরদী। অ্যামেরিকার স্বার্থ নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই ওদের, ভাবে দুনিয়ার কথা। রানা আবার ওখানকার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর; কাজেই ওরা যে সুযোগ পেলে রানাকে সাহায্য করবে, তা আমি আগে থেকেই জানি। সে-কারণেই আপনার দেয়া ওই অ্যাণ্টিভাইরাসের কপি ওদেরকে দিতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম আমি, ব্যাটাদের একটু নাস্তানাবুদ করার ইচ্ছে ছিল—বিভিন্ন সময়ে সিআইএ-কে কম ভোগায়নি ওরা!'

'কিন্তু এখন তো ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে অ্যাণ্টিভাইরাসটা,' কার্টার বলল। 'শুধু তা-ই নয়, গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়েও দিতে যাচ্ছে।'

'পারবে না,' কঠিন গলায় বলল বুলডগ। 'রানা কোন্ জাহাজে গেছে, সেটা বের করতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না আমার। এখুনি একটা টিম রেডি করে...'

'হুঁহ্,' টিটকিরি মারল থিও, 'আপনার টিম যে কত কী করতে পারে, সেটা দেখা গেছে ড্রুইভেনড্রেশ্‌টে।'

'আর একটু আগে তোমরাই বা কী দেখিয়েছ?' তেতে উঠে জানতে চাইল।

'ওটা আপনার শো ছিল, আমাদের নয়। আপনার কথামত কাজ করতে গিয়েই যত ঝামেলা হয়েছে। এবার আমাদেরকে আমাদের মত চলতে দিন। দেখবেন, মাসুদ রানাকে কীভাবে শায়েস্তা করি!'

'এই আহত অবস্থায়?' মুখ বাঁকাল বুলডগ। 'দিব্যি সুস্থ থাকার পরও তো

boighar.com

মন্টেগো আইস শেলফে রানার চুলটাও ছিঁড়তে পারোনি।'

'রানার ব্যাপারে ওটা আমাদের লার্নিং পিরিয়ড ছিল। শিক্ষা যা পাবার, পেয়ে গেছি আমরা। এবার আর কোনও ভুলত্রুটি হবে না। আর সুস্থতার কথা?' চেহারায় হিংস্রতা ফুটল আলফা-ওয়ানের। 'আহত বাঘই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়—এটা জানেন তো?'

চুপ করে রইল বুলডগ।

আলফা-থ্রি'র দিকে তাকাল থিও। 'মেলভিন, তাড়াতাড়ি একটা চপার আনাও, সেই সঙ্গে প্রচুর আর্মস-অ্যামিউনিশন। এবার মাসুদ রানার রক্ষা নেই।'

আঠারো

ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে উঠছে রানা আর রায়হান। সি-স্কুইরেলে আসার পর বিশ মিনিট কেটে গেছে, এখনও কাজ শেষ হয়নি টিনার। রাত দুটোয় আঘাত হানার কথা ইউনো-ভাইরাসের, এখন বাজে একটা একুশ। আর মাত্র ঊনচল্লিশ মিনিট বাকি আছে প্রলয় ঘটতে। টিনা যদি আগামী ন'মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারে, তা হলে ভিনাসের পক্ষেও পৃথিবীর সব জায়গায় প্রোগ্রামটা পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না।

'আর কতক্ষণ, টিনা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

স্ক্রিনে ফুটে থাকা অদ্ভুত সঙ্কেতগুলো থেকে একটুও চোখ ফেরাল না তরুণী ইউনো। শুধু বলল, 'আর একটু, মাসুদ ভাই।'

'কিন্তু সময় তো ফুরিয়ে আসছে।'

'আমি তো চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে। একটু ধৈর্য ধরুন।'

'এত সময় নিচ্ছ কেন?' অস্থির গলায় বলল রায়হান। 'সোর্স-কোড থেকে ব্যাকডোরের অংশটা শুধু মুছে দিলেই হতো না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল টিনা। 'ইউনোকোড একটা কবিতার মত জিনিস—ছন্দ মেনে কাজ করে। মাঝখান থেকে হঠাৎ একটু অংশ মুছে দিলে ছন্দটা নষ্ট হয়ে যায়, ওটা আর কাজ করতে পারে না। তাই জিনিসটা আমাকে নতুন করে দাঁড় করাতে হচ্ছে। একটু সময় তো লাগবেই।'

আর কিছু বলার থাকে না এর পরে। অস্থিরতায় উসখুস করতে থাকল রায়হান। ওর অবস্থা দেখে রানা বলল, 'চলো, ডেকে গিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রস্তাবটায় রাজি হলো তরুণ হ্যাকার। 'ঠিক আছে, চলুন।'

কম্পিউটার সেকশন থেকে বেরিয়ে এল রানা আর রায়হান, করিডর ধরে বেরিয়ে এল শিপের পিছনদিকে। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় একটা শোঁ শোঁ শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। চোখ তুলতেই আকাশ থেকে তীক্ষ্ণ একটা আকৃতি ছুটে আসতে দেখা গেল, পিছন দিয়ে আগুন ঝরছে।

ওটা একটা রকেট!

দুই বিসিআই এজেন্টের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ল্যাণ্ড করা হেলিকপ্টারটায় আঘাত করল ওটা। পরমুহূর্তেই বিস্ফোরিত হলো।

দপ করে জ্বলে উঠল শিখা, কমলা রঙের একটা আগুনের গোলা গ্রাস করল আকাশযানটাকে, প্রচণ্ড শব্দে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল চোখের পলকে। শকওয়েভের ধাক্কায় উল্টে ডেকের উপর পড়ে গেল রানা ও রায়হান।

কানের ভিতর বোঁ বোঁ শব্দ হচ্ছে, তারপরেও হামলাকারী চপারটার আওয়াজ ঠিকই শুনতে পেল রানা। মাথা তুলতেই শিপের একপাশ থেকে উদয় হতে দেখল ওটাকে—আকাশের পটভূমিতে কেন যেন ভৌতিক একটা ছায়া মনে হচ্ছে ওটাকে। একেবারে শিপের উপরে এসে থামল চপারটা, তিনটে দড়ি ফেলা হলো নীচে—র‍্যাপলিং করে নেমে আসতে চাইছে আলফা টিম।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, রায়হানকেও টেনে তুলল। 'জাহাজের ভিতরে... জলদি!' আদেশের সুরে বলল ও।

দুদ্দাড় করে সুপারস্ট্রাকচারে এসে ঢুকল দুজনে, টেনে বন্ধ করে দিল ভিতরে ঢোকার দরজাটা। পিছনে হৈচৈ শোনা গেল, দুজন ক্রু নিয়ে ছুটে আসছেন ক্যাপ্টেন ডিলান। কাছে এসে বললেন, 'হা যিশু, হয়েছেটা কী?'

'একটা অ্যাসল্ট টিম হামলা করেছে আমাদের উপর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'হেলিকপ্টারটা উড়িয়ে দিয়েছে ওরা।'

'হোয়াট!'

'দুঃখিত, ব্যাপারটা আমাদের জন্য ঘটছে।'

'ক...কী! কেন?'

'কী-কেন-কীভাবে... সব পরে শোনাব আপনাকে,' রানা বলল। 'আগে আত্মরক্ষা করা দরকার। কী ধরনের আর্মস আছে আপনার কাছে?'

'এটা রিসার্চ শিপ, মি. রানা। আমাদের কাছে অস্ত্র থাকবে কোত্থেকে?'

হতাশায় ঠোঁট কামড়াল রানা। হাত একেবারে খালি, সময়ও নেই যে কিছু বানিয়ে নেবে। রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'টিনাকে সরিয়ে ফেলতে হবে কম্পিউটার সেকশন থেকে।'

'কিন্তু ওর তো কাজ শেষ হয়নি!'

'যতটুকু করেছে, সেটা একটা পোর্টেবল কম্পিউটারে শিফট করে নিক। তা হলে গা ঢাকা দিয়েও কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল রানা। 'ল্যাপটপ আছে শিপে?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ডিলান।

'নিয়ে আসুন একটা। কুইক!'

ছুটে চলে গেলেন ডিলান। রায়হানসহ কম্পিউটার সেকশনে গিয়ে ঢুকল রানা—ওখানে কাজ থামিয়ে বসে আছে টিনা, চোখে আতঙ্কিত দৃষ্টি। ওদেরকে দেখে বলল, 'ওরা এসে গেছে, তাই না?' www.boighar.com

'হ্যাঁ, তবে চিন্তা কোরো না,' রানা আশ্বাস দিল। 'আমি আর রায়হান ওদের সামলাবো। তোমাকে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার এনে দেয়া হচ্ছে—ওটায় সব

boighar.com

তুলে নাও। ক্যাপ্টেন লুকানোর জায়গা দেখিয়ে দেবেন, ওখানে বসে কাজটা শেষ করে ফেলো।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টিনা। 'কাজ করে কোনও লাভ নেই, মাসুদ ভাই। আমরা হেরে গেছি।'

'কী বলছ এসব!'

আঙুল তুলে স্যাটেলাইট ফোনটা দেখাল টিনা, ওটার রিসিভার তোলা। 'ল্যারি কিং লাইনে আছেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে দেখুন।'

ভুরু কুঁচকে রিসিভারটা কানে ঠেকাল রানা। 'কী হয়েছে, ল্যারি?'

'ভিনাস ইজ গন, রানা,' হাহাকারের মত শোনাল ল্যারির গলা। 'ওকে হারিয়েছি আমি!'

'মানে?'

'অদ্ভুত একটা কোড এসে ভিনাসের পুরো সিস্টেম দখল করে নিয়েছে, রানা। আমার সমস্ত সিকিউরিটি ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছে ওটা, ভিনাস আর আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এখন।'

'শিট! ওটা ইউনোকোড!' বলল রানা। 'দাঁড়াও, দেখি কী করা যায়।' টিনার দিকে তাকাল ও। 'টিজিভি-র মত ভিনাসকে দখল করে নিয়েছে এলিসা। তুমি কিছু করতে পারো?'

'পারি, কিন্তু ওদিকে সময় দিলে অ্যান্টিভাইরাসটা ঠিক করব কখন?' হতাশা ঝরল তরুণী ইউনোর কণ্ঠে। 'আর অ্যান্টিভাইরাসটাই যদি ঠিক না হয়, তা হলে ভিনাসের কন্ট্রোলই বা ফিরিয়ে এনে লাভ কী?'

পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা। একূল-ওকূল-সব কূল হারিয়েছে ওরা। ভিনাস নেই, অ্যান্টিভাইরাসটাও রেডি হয়নি, হলেও ডিস্ট্রিবিউট করা যাবে না—কাজেই ইউনো-ভাইরাসটাকে ঠেকানো আর কোনও উপায় বা সময়, কোনওটাই নেই। শুধু তা-ই নয়, শিপে নেমে এসেছে আলফা টিমের ভয়ঙ্কর খুনীরা, আত্মরক্ষার জন্য কোনও অস্ত্র নেই ওদের কাছে—কাজেই জীবনও বাঁচানো যাচ্ছে না সম্ভবত।

এমন দিশেহারা অবস্থায় আগে কখনও পড়েনি রানা। রায়হান আর টিনা তাকিয়ে আছে ওর দিকে—ভাবছে মাসুদ ভাই নিশ্চয়ই একটা কিছু বাঁচার পথ বের করবেন। কিন্তু করবেটা কী ও? কিছুই বুঝতে পারছে না।

ল্যাপটপ নিয়ে ক্যাপ্টেন ডিলানকে কম্পিউটার সেকশনে ঢুকতে দেখে সংবিৎ ফিরল ওর। তাড়াতাড়ি মাথা ঠাণ্ডা করে সিস্টেম্যাটিক্যালি এগোবার সিদ্ধান্ত নিল। এতে সফল হবে, না বিফল হবে—তা পরে দেখা যাবে।

টিনার দিকে তাকাল রানা। বলল, 'ল্যাপটপটা নাও। তোমার কাজটুকু তুলে ফেলো ওটায়।' গলার স্বর আশ্চর্য রকম শান্ত ওর, সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেলেছে। যা হবার হোক, কিন্তু নিজের কায়দায় কাজ করে যাবে ও। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'টিনা... সেই সঙ্গে আপনার সমস্ত ক্রু নিয়ে একদম নীচের ডেকে চলে যান—লুকিয়ে থাকুন, যাতে অ্যাসল্ট টিমটা সহজে খুঁজে না পায় আপনাদের।'

'আপনারা?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানা আর রায়হানের দিকে তাকাচ্ছেন ডিলান।

'লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করার মত ট্রেইনিং শুধু আমাদের দুজনেরই আছে। তাই আমরা ওদের ঠেকাবার চেষ্টা করব।'

'কিন্তু আপনাদের কাছে তো কোনও অস্ত্র নেই!'

'কে বলেছে নেই?' একটু হাসল রানা। 'ধৈর্য-সাহস-বুদ্ধি... এগুলো কি অস্ত্র নয়?'

'যাবেন না, মাসুদ ভাই,' অনুনয় করল টিনা। 'এবার আর ওদের সঙ্গে পারবেন না আপনি। এবার আপনার কাছে গানপাউডার বা বোমা কিছুই নেই।'

'তবু আমাকে যেতে হবে, টিনা,' শান্তভাবে বলল রানা। 'নিজে মরি তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের খুন হতে দেখতে পারব না আমি। অবশ্য রায়হান যদি থেকে যেতে চায়...'

'কী বলছেন, মাসুদ ভাই!' আহত কণ্ঠে বলে উঠল রায়হান। 'আপনি একা একা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, আর আমি সেটা চুপচাপ বসে দেখব? কক্ষনো না! আমি আছি আপনার সঙ্গে।'

'প্লিজ, রায়হান,' ফিসফিস করল টিনা। 'তোমাকে... তোমাকে আমি হারাতে চাই না।'

এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল তরুণ হ্যাকার। ঠোঁটে চুমো দিয়ে বলল, 'আমাকে তুমি কখনও হারাবে না, টিনা। কাছে থাকি বা দূরে, আমি সবসময় তোমারই থাকব।'

'প্লিজ, আমার কথা শোনো...'

'আমাকে আর বাধা দিয়ো না, টিনা। আমি কাপুরুষের মত মরতে চাই না, মরতে হলে লড়াই করেই মরব।'

চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে এল টিনার। বলল, 'ঠিক আছে, যাও, কিন্তু মরবার অনুমতি দিচ্ছি না। আমার কাছে ফিরে আসতে হবে তোমাকে।'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।' বলে হাসল রায়হান। তারপর তাকাল রানার দিকে। 'চলুন, মাসুদ ভাই, থিও আর ওর দোস্তদের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আসি।'

ছড়িয়ে পড়েছে আলফা টিম। একসঙ্গেই টার্গেটদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছিল তারা, কিন্তু প্রথম ডেকে কাউকে না পেয়ে বুঝতে পেরেছিল—শিকারেরা সবাই লুকিয়ে পড়েছে। জাহাজটা বেশ বড়, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে পারে মাসুদ রানা আর তার সঙ্গীরা, খুনীরা তিনজনেই একসঙ্গে থাকলে হয়তো আর খুঁজেই পাবে না ওদের। তাই ঠিক করা হয়েছে, সুপারস্ট্রাকচারের তিনটে অংশ থেকে তল্লাশি শুরু করবে ওরা—মিলবে এসে জাহাজের কেন্দ্রে। এ পদ্ধতিতে এগোলে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের দশা হবে শিকারদের, ধরা পড়তে বাধ্য হবে।

এ-মুহূর্তে আলফা-টু রয়েছে জাহাজের তিনতলায়—একে একে সমস্ত

boighar.com

কেবিন চেক করতে করতে এগোচ্ছে। এই ডেকের বেশিরভাগ কামরাই বিভিন্ন ধরনের অফিস আর ল্যাব, অ্যাকোমোডেশন নেই কোনও। অফিসগুলোয় লুকানোর কোনও জায়গাই নেই, ল্যাবগুলোরও কমবেশি একই অবস্থা—তাই একটু হলেও ঢিল পড়েছে তার পেশিতে। দায়সারা ভঙ্গিতে তল্লাশি করছে সে।

সিঁড়ির আগে শেষ কামরাটা কেমিক্যাল ল্যাব, ওটারও দরজা খুলে যেন-তেনভাবে উঁকি দিল সে, কিন্তু ভিতরে চোখ পড়তেই থেমে গেল। লাইট জ্বলছে না, কিন্তু পোর্টহোল দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় আবছাভাবে ধরা পড়ছে একটা ছায়ামূর্তি—টেবিলের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা।

সাবধানে ভিতরে ঢুকল আলফা-টু। পা টিপে এগোল কয়েক কদম, তারপর বিনা নোটিশে মেশিনগান তুলে ব্রাশফায়ার করতে শুরু করল। ঠং ঠং করে শব্দ হতে থাকল ইস্পাতের বাল্কহেডে বুলেট আঘাত করায়, একই সঙ্গে মূর্তিটাও একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল।

এবার সুইচ টিপে লাইট জ্বালল আলফা-টু, এগিয়ে গেল গুলিবিদ্ধ শিকারকে দেখতে। টেবিলের পাশে পৌঁছুতেই মুখ দিয়ে একটা খেদোক্তি বেরিয়ে এল তার—মানুষ নয় ওটা, কোট-হ্যাঙ্গার। দণ্ডের মত লম্বা জিনিসটায় ঝোলানো ছিল একটা ল্যাব-ওভারকোট, উপরে আবার একটা টুপিও আছে—অন্ধকারে এটাকেই মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

আলফা-টু যখন ঝুঁকে কোট হ্যাঙ্গারটা দেখছে, ঠিক তখুনি পিছনে বাল্কহেডের গায়ে তৈরি ক্লজিটের দরজা খুলে গেল ধীরে ধীরে, সাবধানে ওখান থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ আলফা-টু-এর, বিপদটা টের পেয়ে গেল সে কীভাবে যেন। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ব্যাপার কী দেখার জন্য।

দৃশ্যটা দেখে খুশি হওয়া উচিত তার, একজন শিকারকে পেয়ে গেছে সে, দাঁড়িয়ে আছে কয়েক গজ দূরেই, কিন্তু কেন যেন মন কুডাক ডেকে উঠল। সামনে দাঁড়ানো রায়হান রশিদের হাতদুটোই এর কারণ। পাতলা কাঁচের তৈরি একটা প্রমাণ সাইজের বিকার ধরে আছে ও, সেটার বেশিরভাগটাই স্বচ্ছ তরলে ভরা। সন্দেহ নেই, এটা একটা ফাঁদ—কোট-হ্যাঙ্গারটাকে মানুষের আদলে সাজিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছে তাকে। কিন্তু হাতে ধরা জিনিসটা কী?

কৌতূহলটা নিবৃত্ত করতে চাইল না অভিজ্ঞ খুনী, মেশিনগানটা সোজা করে গুলি করার চেষ্টা করল, কিন্তু রায়হান তার চেয়ে এগিয়ে আছে। বিদ্যুৎবেগে বিকারটা ছুঁড়ে দিল ও, সেটা এসে সজোরে আছড়ে পড়ল কার্টারের মুখে। শব্দ করে ভেঙে গেল পাত্রটা, ভিতরের তরলটা ভিজিয়ে ফেলল তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করল আলফা-টু। হিস হিস শব্দ হচ্ছে, মুখমণ্ডল পুড়িয়ে ফেলছে তরলটা—ওটা আসলে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড! অস্ত্র ফেলে দিয়ে মুখ চেপে ধরল সে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। পানি... পানি দরকার তার, অ্যাসিডটা ধুয়ে ফেলতে হবে, কিন্তু চোখে যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না! ঘন অ্যাসিড চোখের মণি গলিয়ে ফেলেছে, থিকথিকে ধারায় বের করে দিচ্ছে অক্ষিকোটর থেকে—কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে

অপটিক্যাল নার্ভের চ্যানেল ধরে পৌঁছে যাবে মগজের ভিতরেও।

কাত হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল আলফা-টু, সারা শরীর এমনভাবে কাঁপছে যেন হাই ভোল্টেজ কারেন্ট বয়ে যাচ্ছে ভিতর দিয়ে। একটু পরেই থেমে গেল তার নড়াচড়া, কিন্তু অ্যাসিডটা তখনও কাজ করে যাচ্ছে—মাংস পুড়িয়ে, হাড় ভেদ করে ধ্বংস করে দিচ্ছে পুরো করোটিকে। দৃশ্যটা বীভৎস, উৎকট দুর্গন্ধও ছড়িয়ে পড়েছে ল্যাবের ভিতরে, কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল রায়হান। মনের মধ্যে করুণা অনুভব করছে না কোনও, বিষাক্ত একটা কীটকে পায়ের তলায় ফেলে মারলে যেমনটা লাগে—ঠিক তেমনই একটা অনুভূতি কাজ করছে ওর ভিতরে। বিষাক্ত কীট-ই ছিল লোকটা—অসহায় মানুষকে খুন করে বেড়াত। টিনাকে নিয়েও বাড়াবাড়ি করেছে। www.boighar.com

'আগেই বলেছিলাম,' বিড়বিড় করল রায়হান, 'তুমি আমার হাতে মরবে!'

উনিশ

রানার ভাগ্য অবশ্য রায়হানের মত ভাল নয়—ফাঁদ পাতার সময় পায়নি ও, তার আগেই পড়ে গেছে আলফা-থ্রি'র সামনে। খুনীরা যে ওদের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ে তল্লাশি শুরু করবে, সেটা জানত ও। চতুর এবং দক্ষ তিন সৈনিক একসঙ্গে থাকলে কোনও ধরনের অস্ত্র ছাড়া তাদের ঘায়েল করা এক কথায় অসম্ভব। তাই বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থাতেই একে একে লোকগুলোকে খতম করার প্ল্যান এঁটেছিল ও—রায়হানকে পাঠিয়ে দিয়েছিল কেমিক্যাল ল্যাবে ফাঁদ পাতার জন্য, নিজে রয়ে গেছে নীচে।

সেটাই হয়েছে কাল, এই ডেকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের মত কিছুই পায়নি ও, ফাঁদ পাতার মতও ভাল জায়গা নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে এক কেবিন থেকে আরেক কেবিনে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সোনার রুম থেকে করিডরে বেরুতেই বুটের শব্দ পেল রানা। লুকিয়ে পড়ার সময় পেল না, চোখের পলকে বামদিকে, বিশ গজ দূরের মোড় ঘুরে উদয় হলো আলফা-থ্রি।

চমৎকার রিফ্লেক্স লোকটার, টার্গেটকে দেখতে পেয়েই কোমরের কাছে ধরা মেশিনগান থেকে ফায়ার করল, তবে রানাও কম যায় না। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে মেঝেতে ডাইভ দিয়ে গুলিবৃষ্টি এড়াল ও, ডিগবাজি খেয়ে চলে এল ডানদিকের দ্বিতীয় মোড়টার আড়ালে। পিছনে ফুলকি উড়ল, ব্যর্থ বুলেটগুলো বাল্কহেডে ঘষা খেয়ে আগুন ঝরাচ্ছে।

কাঁধের পেশিতে ব্যথা অনুভব করল রানা, হাত দিতেই আঙুলে রক্ত মেখে গেল—একটা গুলি মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা সহ্য করল ও, উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল—লুকানোর একটা জায়গা খুঁজছে। সামনেই একটা হ্যাচ পড়ল—পাশের বাল্কহেডে তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা: *ডাইভিং পুল।*

boighar.com

হ্যাচটা গলে নীচের কম্পার্টমেণ্টে নেমে এল ও। ভিতরে ব্যস্ত দৃষ্টি বোলাতেই বৃত্তাকার পুলটা দেখতে পেল—সাগরের নীল পানি ঝলমল করছে, এখান দিয়ে নীচে নামে ডুবুরিরা। কী যেন ভাবল রানা, তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করল ডাইভিং স্টোরটা—একপাশের বাল্কহেডে ওটার দরজা পাওয়া গেল। স্টোররুমটায় ঢুকে ক্লজিটের দরজা খুলল রানা, ভিতরে রাখা ডাইভিং ইকুইপমেণ্টের মধ্যে ঝড়ের বেগে হাত চালাল।

অক্সিজেন সিলিণ্ডার আর মাস্ক সরিয়ে দুটো হারপুন গান পেল ও, কিন্তু এতে কাজ হবে না। অটোমেটিক মেশিনগানের বিরুদ্ধে হারপুন গান কিছুই নয়, তা ছাড়া খুনীরা কেভলারের তৈরি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে, বর্শাগুলো সেটা ভেদ করতে পারবে না। আরেকটু খুঁজল ও, হঠাৎ টিউবলাইট আকৃতির পাঁচফুট লম্বা একটা সাদা দণ্ড দেখতে পেয়ে মুখে হাসি ফুটল—এটাই চাইছিল।

মিনিটখানেক পরেই উপরে হ্যাচের কাছে এসে পৌঁছুল আলফা-থ্রি। সাবধানে, সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়েছে সে, রানার তৈরি কোনও ফাঁদে পড়তে চায় না, তাই একটু দেরি হয়েছে। তীক্ষ্ণ চোখে মেঝেতে নজর বোলাল সে, রানার ক্ষত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরা রক্ত একটা ট্রেইল তৈরি করেছে, হ্যাচ ধরে নীচে নেমে গেছে সেটা। দুর্ধর্ষ খুনীর মুখে হাসি ফুটল—যাক, শিকারকে আহত করা গেছে। চারপাশ বন্ধ একটা কম্পার্টমেণ্টে নেমেছে ব্যাটা, ওখানে সহজে শিকার করা যাবে ওকে—ব্যাপারটা স্রেফ হাঁড়ির মধ্যে মাছ মারার মত হতে যাচ্ছে। মেশিনগানটা ভাল করে বাগিয়ে ধরল সে, তারপর পা টিপে নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে।

অর্ধেকের মত নেমে এসেছে, এমন সময় সিঁড়ির দু'ধাপের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সাদা রঙের লাঠির মত জিনিস। সোজা নীচে তাকাতেই গ্রেটিঙের ফাঁক দিয়ে রানাকে দেখতে পেল আলফা-থ্রি, অ্যালুমিনিয়ামের একটা পোল ঢুকিয়ে ওর পায়ে বাধাতে চাইছে গর্দভটা—ভাবছে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দেবে তাকে। হেসে উঠল দুর্ধর্ষ খুনী—কী ছেলেমানুষি করছে লোকটা! থেমে দাঁড়িয়ে নীচদিকে রানার উপর অস্ত্র তাক করল আলফা-থ্রি, লাথি দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল পোলটা।

ঠিক তক্ষুণি শোনা গেল বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ।

অসহ্য যন্ত্রণার একটা ঢেউ বয়ে গেল আলফা-থ্রি'র শরীরে, চোখের সামনে দপ করে জ্বলে উঠল কী যেন—গুলি আর করা হলো না তার। চেষ্টা করেও ব্যালেন্স ধরে রাখতে পারল না সে, একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল সিঁড়িতে, গড়াতে শুরু করেছে। ধাতব ল্যাডারে নির্মমভাবে ঠোকর খেতে খেতে কম্পার্টমেণ্টের মেঝেতে এসে আছড়ে পড়ল, হাত থেকে মেশিনগানটা ছুটে চলে গেছে আগেই।

কোনওমতে মাথা তুলল আলফা-থ্রি, চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো রক্ত দেখে অবাক হলো—বুঝতে পারছে না, এত রক্ত এল কোত্থেকে! দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়েই দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল তার, এবার ধরতে পারছে রহস্যটা—হাঁটুর ছ'ইঞ্চি নীচ থেকে তার ডান পা-টা উধাও হয়ে গেছে, অঝোর ধারায়

সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত... তার নিজের রক্ত!

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে মাথা ঘোরাল আলফা-থ্রি—রানাকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসতে দেখল, এখনও লোকটার হাতে সাদা রঙের পোলটা রয়েছে, ডগা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওটার। জিনিসটা আসলে ব্যাং-স্টিক, বা পাওয়ারহেড শার্ক-কন্ট্রোল ডিভাইস—অ্যালুমিনিয়ামের পোলটার ভিতরে একটা প্রেশার-সেন্সিটিভ ফায়ারিং মেকানিজম আছে, ওটার সাহায্যে এক্সপ্লোসিভ শেল ছোঁড়া হয়। লাঠির মত নিরীহদর্শন হলেও ব্যাং-স্টিক আসলে শক্তিশালী একটা অস্ত্র—হাঙরের হাত থেকে বাঁচার জন্য ডুবুরিরা ব্যবহার করে এটা। এসব জানা ছিল না আলফা-থ্রি'র, বোকার মত লাথি মেরে নিজের পা উড়িয়ে দিয়েছে বেচারা।

নির্দয় ভঙ্গিতে এগোচ্ছে রানা, ব্যাং-স্টিক থেকে খালি শেলটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ভরল—ডাইভিং স্টোরের ক্লজিটে বাড়তি অ্যামিউনিশনও পেয়েছে ও। নিজের পরিণতি কী হতে যাচ্ছে, তা নিয়ে আর সন্দেহ রইল না আলফা-থ্রি'র, কাঁপা কাঁপা হাতে কোমরে হাত দিল সে, হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে আনতে চাইছে।

কোনও তাড়া লক্ষ করা গেল না রানার মধ্যে, পড়ে থাকা খুনীর পাশে এসে শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াল ও, তাকে পিস্তলটা বের করে আনতেও বাধা দিল না। অস্ত্রটা ওর দিকে তাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপরই নড়ে উঠল।

'গুডবাই!' বলে ব্যাং-স্টিকটা তলোয়ার বেঁধানোর ভঙ্গিতে সজোরে নামিয়ে আনল ও খুনীটার গলায়।

সি-স্কুইরেলের লোয়ার ডেকে তল্লাশি চালাচ্ছে আলফা-ওয়ান। হঠাৎ খড় খড় করে উঠল ওয়াকিটকিটা। গুরুগম্ভীর স্বরে তার নাম ধরে ডাকা হলো, 'থিও, জবাব দাও।'

ভুরু কুঁচকে গেল আলফা-ওয়ানের। মুখের কাছে সেট তুলে সে বলল, 'কে... আলফা-থ্রি, তুমি?'

'না, থিও। আমি মাসুদ রানা।'

বিস্মিত হলো থিও। 'তুমি আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি পেয়েছ কীভাবে?'

'ফ্রিকোয়েন্সি পাইনি, ওয়াকিটকিটাই পেয়ে গেছি। মেলভিনের সেটটা এখন আমার কাছে।'

থমকে গেল আলফা-ওয়ান। 'আর ও?'

'বলে দেয়ার প্রয়োজন আছে কি?'

'তুমি ওকে মেরে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। এবার তোমার পালা, আমি আসছি তোমার জন্য।'

মাথার ভিতর যেন অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে আলফা-ওয়ানের। তাড়াতাড়ি ওয়াকিটকিতে ডাকল কার্টারকে। 'আলফা-টু, অ্যাবোর্ট! অ্যাবোর্ট অপারেশন!! ফিরে এসো এক্ষুণি। রানা...'

কথা শেষ হলো না তার, ওয়াকিটকিতে ভেসে এল নতুন একটা কণ্ঠ,

boighar.com

কার্টারের সেটে কথা বলছে মানুষটা। 'দুঃখিত, আলফা-টু জবাব দিতে পারছেন না। পরপারের উদ্দেশে ওয়ান-ওয়ে টিকেট নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন তিনি।'

গলাটা রায়হানের।

চমকে গেল থিও—দুই সঙ্গীকে হারিয়েছে সে। তারমানে মাসুদ রানা আর রায়হান রশিদ এখন ওদের অস্ত্রশস্ত্রের কল্যাণে সশস্ত্র! দেয়ালের লিখন পড়তে একটুও অসুবিধে হলো না অভিজ্ঞ খুনীর—যুদ্ধটায় হার হয়েছে তার। দুর্ধর্ষ ওই দুই বাঙালির সঙ্গে একা কিছুতেই পেরে উঠবে না সে।

ওয়াকিটকিতে এবার বোনকে ডাকল থিও, 'এলিসা, তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

'সব শুনেছি আমি,' হন্তদন্ত ভঙ্গিতে জবাব দিলেন প্রৌঢ়া বিজ্ঞানী, হামলাকারী হেলিকপ্টারটায় বুলডগের সঙ্গে রয়েছেন তিনি। 'তুমি জলদি আফট ডেকে চলে এসো, আমরা তোমাকে পিকআপ করে নিচ্ছি।'

উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল আলফা-ওয়ান। ল্যাডার বেয়ে উপরে উঠল, তারপর দুদ্দাড় করে বেরিয়ে এল আফট ডেকে।

মাথার উপরে রোটরের গর্জন শোনা গেল, হেলিকপ্টারটা চলে এসেছে। কিন্তু ওখান থেকে দড়ি ফেলার সুযোগ পেলেন না এলিসা, ব্রিজের ছাদে উদয় হলো একটা ছায়া—এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ঠ্যাক্ ঠ্যাক্ করে বিশ্রী শব্দে কপ্টারের গায়ে বিঁধতে শুরু করল বুলেট, উইণ্ডশিল্ডেও ফাটল ধরাল।

গাল দিয়ে উঠল বুলডগ, পাইলটকে বলল, 'সরে যাও! সরে যাও এখান থেকে!!'

'না-আ!' চেঁচিয়ে উঠলেন এলিসা। 'আমার ভাই রয়েছে নীচে। ওকে ফেলে যেতে পারব না আমি।'

'না সরলে আমাদেরও ওর সঙ্গে যোগ দিতে হবে,' কঠিন গলায় বলল বুলডগ। 'অ্যাই ব্যাটা পাইলটের বাচ্চা! সরতে বললাম না তোকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল কলাম ঘোরাল পাইলট, সাঁই করে সি-স্কুইরেলের উপর থেকে সরে গেল কপ্টার, দূরে চলে যাচ্ছে। জানালার কাঁচে হাত রেখে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এলিসা।

ডেকের উপর আলফা-ওয়ানেরও একই দশা, মুখের ভাষা হারিয়েছে সে। আপন বোন... যার জন্য এতকিছু করেছে, মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছে, নির্দ্বিধায় মানুষ খুন করেছে... সে-ই কি না তাকে ফেলে চলে গেল! আচমকা প্রচণ্ড ক্রোধ ভর করল থিও-র মধ্যে। উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল সে, সবকিছু ভুলে গিয়ে টিপে ধরল মেশিনগানের ট্রিগার, সুপারস্ট্রাকচারের দিকে ফিরে বৃষ্টির মত গুলি করছে, সবকিছু ঝাঁঝরা করে ফেলতে চায়।

রাগে অন্ধ হয়ে গেছে সে, নইলে বিপদটা টের পেত সময় থাকতেই। যখন পেল তখন আর করার কিছু নেই। শরীরের খুব কাছে বিশাল একটা অবয়বের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে উঠে মাথা ঘোরাল সে, উইঞ্চে ঝোলানো ট্রাইটন মিনি-সাবমেরিনটাকে বিকট এক পেণ্ডুলামের মত ছুটে আসতে দেখল। সরবার সময় পেল না আলফা-ওয়ান, সজোরে তাকে এসে আঘাত করল সেটা, ঠিক

একটা গলফ বলের মত উড়িয়ে দিল।

বাতাস কেটে ডেকের আরেক প্রান্তে গিয়ে আছড়ে পড়ল থিও, চেঁচিয়ে উঠল ব্যথায়, শরীরের একপাশের সমস্ত হাড় ভেঙে গেছে তার। সুস্থ পাশটায় ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো সে—তাকাল উইঞ্চ অপারেটরের বক্সটার দিকে। চাঁদের আলোয় প্লেক্সিগ্লাসের উল্টোপাশে বসা মাসুদ রানাকে চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না তার—গুলিবৃষ্টি ভেদ করে এগোতে না পারায় ওখানে গিয়ে ঢুকেছে ও, উইঞ্চে ঝোলানো সাবমেরিনটাকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে।

তিক্ত একটা হাসি হাসল আলফা-ওয়ান। লোকটার উপস্থিতবুদ্ধির সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না, তার জীবনে শনি হয়ে উদয় হয়েছে এই বাঙালিটা। তীব্র ঘৃণায় ভাল হাতটা দিয়ে সাবমেশিনগানটা তুলে ধরল কঠিন চেহারার যুবক, কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে ঝোলানো থাকায় অস্ত্রটা এখনও রয়ে গেছে তার কাছে। সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল সে, কিন্তু ট্রিগার চাপতে গিয়েই থমকে গেল—চাঁদের আলো আর পড়ছে না তার গায়ে, উপর থেকে নেমে এসেছে একটা কালো ছায়া। মুখ তুলে তাকাতেই মিনি-সাবটাকে আবার দেখতে পেল, উইঞ্চ ঘুরিয়ে ওটাকে ঠিক তার মাথার উপরে নিয়ে এসেছে রানা।

কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে একটা কথাই শুধু বলল আলফা-ওয়ান। 'হা, ঈশ্বর!'

পরমুহূর্তেই ট্রাইটন থেকে উইঞ্চের হোল্ডিং ক্ল্যাম্প আলগা করে দিল রানা, প্রবল বেগে পঞ্চাশ টন ওজনের ডুবোজাহাজটা নেমে এল হতভাগ্য খুনীর উপর। যেন তেলাপোকাকে মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে—এমন একটা *থ্যাচ্* শব্দ হলো। ট্রাইটনের নীচে ভর্তা হয়ে গেল থিও ভ্যান বুরেন ওরফে আলফা-ওয়ান।

চলে যায়নি হেলিকপ্টারটা, সি-স্কুইরেল থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হোভার করছে। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে ডেকের দিকে তাকিয়ে আছেন এলিসা ভ্যান বুরেন, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন তাঁর একমাত্র ভাইয়ের শেষ পরিণতি। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল প্রৌঢ়া ইউনোর, চেঁচালেন না, শুধু বিনকিউলার নামিয়ে ফিসফিস করলেন, 'ওরা... ওরা থিওকে খুন করেছে!'

বুলডগের হাতেও আরেকটা দূরবীন রয়েছে, সে-ও প্রত্যক্ষ করেছে ব্যাপারটা। বিরক্ত গলায় বলল, 'উচিত হয়েছে! গাধা কোথাকার, আমাকে টিম আনতে দেয়নি, মাত্র তিনজনে গেছে রানাকে খতম করতে... মরবেই তো!'

'খবরদার, মি. বুলক!' চেঁচিয়ে উঠলেন এলিসা। 'আমার ভাইকে একটা গালিও দেবেন না!'

'চুমো দিলেই বা কী লাভ হবে?' সরোষে বলল বুলডগ। 'আপনার পুরো প্ল্যান চৌপাট হয়ে গেছে। আলফা টিম শেষ, কাজেই আর কোনও চিন্তা নেই রানার। এখন শান্তিতে অ্যান্টিভাইরাসটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে ও।'

'অসম্ভব! নুমার কম্পিউটারটাকে অচল করে দিয়েছি আমি।' সিটে রাখা ল্যাপটপটা দেখালেন এলিসা—ওটার মাধ্যমেই ভিনাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন তিনি।

boighar.com

'তাতে কী? দুনিয়ায় সুপার-কম্পিউটার কি ওই একটা? ক্রিস্টিনা মেয়েটা আছে রানার সঙ্গে, সে ইউনোকোড ব্যবহার করে আরেকটা কম্পিউটারে ঢুকে পড়তে পারে, সেটার সাহায্য নিতে পারে।'

'তা হলে?'

'ওদেরকে এখুনি খতম করে দিতে হবে ইউনোকোড ব্যবহারের কোনও সুযোগই দেয়া যাবে না ওদের।' www.boighar.com

'আমিও তো সেটাই চাই,' বললেন এলিসা। 'আমার ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে। কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব? আমরা দুজনে তো ওদের সঙ্গে পেরে উঠব না।'

একটু ভাবল বুলডগ। হঠাৎ হাসি ফুটল তার মুখে, এলিসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পারবেন, ডক্টর। আমাকে প্রয়োজন নেই, আপনি একাই ওদের পুরো জাহাজটাকে ধ্বংস করে দিতে পারবেন।'

'কীভাবে?'

'ডাচ নেভির একটা জাহাজের সিস্টেমে হ্যাক করে। আসুন, বুঝিয়ে দিই কী করতে হবে আপনাকে...'

উপকূল থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে উত্তর সাগরে টহল দিচ্ছে রয়্যাল নেদারল্যাণ্ডস্ নেভির মিসাইল-ফ্রিগেট *ভ্যান অ্যামস্টেল।* রাতের ওয়াচ বলে ডিউটিতে একটু ঢিলেঢালা ভাব, পোস্টে বসে অনেকেই ঝিমুচ্ছে—ওয়েপনস্ সিস্টেমে বসা লিডিং সি-ম্যান জর্গেনসেনও তাদের দলে। প্রায় ঘুমিয়েই পড়ছিল সে, হঠাৎ টুটে গেল তন্দ্রাটা। কনসোলে হঠাৎ একটা বাতি জ্বলে উঠেছে অস্বাভাবিকভাবে। সন্দেহ হলো জর্গেনসেনের, তন্দ্রার ঘোরে ভুল করে কোনও কিছুতে চাপ দিয়ে ফেলেছে কি না। তাড়াতাড়ি সবকিছু চেক করে দেখল সে—না, এমন কোনও প্রমাণ তো দেখা যাচ্ছে না। কনসোলের ডিসপ্লেয় বাতিটা জ্বলছেই। [illegible] করে সোজা হলো অভিজ্ঞ নাবিক, গোলমালটা ধরতে পেরেছে। প্রথমবার তার ভুলে একটা বাতি জ্বলতে পারে, কিন্তু এবার তো কিছুই করেনি সে।

সামনের এলসিডি মনিটরটা আলোকিত হয়ে উঠতেই চমকে গেল জর্গেনসেন—হচ্ছেটা কী এসব? কে অন করছে সবকিছু? মনিটরে ভেসে ওঠা প্রটোকলটা চোখে পড়ল এবার, সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাক করবার মত অবস্থা হলো তার, তাড়াতাড়ি কীবোর্ড নিয়ে টিপতে শুরু করল, কমান্ডটাকে ক্যানসেল করে দিতে চায়। এবার আরেক দফা অবাক হতে হলো তাকে—কোনও কাজই হচ্ছে না কীবোর্ডে, নিজের মত চলছে সিস্টেমটা, যেন ওটার জীবন আছে, নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি আছে!

চেয়ার ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে পড়ল জর্গেনসেন, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল দু'পা। নিজ চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না—এ অসম্ভব, এ হয় কী করে? তাড়াতাড়ি ইন্টারকম তুলে অফিসার অভ দ্য ওয়াচের সঙ্গে যোগাযোগ করল। 'জর্গেনসেন, স্যর। একটা ইমার্জেন্সি দেখা দিয়েছে, আপনি এক্ষুণি ওয়েপনস কন্ট্রোলে আসুন।'

মিনিটখানেক পরেই চলে এল অফিসার অভ দ্য ওয়াচ। সমস্যাটা শুনে এক মুহূর্তও দেরি করল না, খবর দিল অধিনায়ককে। রাতের পোশাক পরেই ছুটে এলেন ক্যাপ্টেন জেনাস ক্রমবার্গ, ইউনিফর্ম পরার জন্য সময় নষ্ট করেননি।

'হচ্ছেটা কী এখানে?' গরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মিসাইল-কন্ট্রোল জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, স্যর,' বলল জর্গেনসেন। 'ওটা প্রি-লঞ্চ চেক করতে শুরু করেছে।'

'জ্যান্ত হয়ে উঠেছে মানে? কে অন্ করেছে ওটা?'

'আমি না, স্যর। আমার কাছে তো সিকিউরিটি কোড-ই নেই।'

'ড্রিল-চেকের জন্য কোড দরকার হয় নাকি?'

'এটা ড্রিল নয়, স্যর। সত্যি সত্যি লঞ্চিং সিকোয়েন্স চালু হয়েছে। প্রটোকলটা নিজ চোখে দেখুন।'

চোখ রগড়ে মনিটরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন ক্রমবার্গ, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। এ অসম্ভব, সত্যি সত্যি একটা মিসাইল লঞ্চ হতে যাচ্ছে! সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ করা ছাড়া সম্ভব নয় কাজটা, আর কোডটা একমাত্র তিনিই জানেন।

'কীভাবে ঘটল এটা?' জর্গেনসেনকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'জানি না, স্যর। নিজে নিজেই হচ্ছে সব।'

'থামাও ওটাকে, কুইক!'

'আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও ইনপুটই নিচ্ছে না সিস্টেমটা।'

'মাস্টার কন্ট্রোলে যাও। ওখানকার কোড দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দাও কনসোলটাকে।'

ছুটে চলে গেল জর্গেনসেন। ফিরে এল একটু পরেই, চেহারা ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। 'কাজ হচ্ছে না, স্যর। ওয়েপনস্ সিস্টেমটা মাস্টার কন্ট্রোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ওখানকার কোনও কমাণ্ড পৌঁছুচ্ছে না এখানে।'

মনিটর দেখে অফিসার অভ দ্য ওয়াচ বলল, 'টার্গেট সিলেকশন হচ্ছে, ক্যাপ্টেন।'

'কো-অর্ডিনেটসটা কীসের, তা বের করো এক্ষুণি।'

ব্রিজে ছুটে গেল অফিসার। রেকর্ড দেখে ইন্টারকমে জানাল, 'ওটা একটা অ্যামেরিকান সার্ভে শিপ, ক্যাপ্টেন। নাম, সি-স্কুইরেল—নুমার জাহাজ।'

'গুড গড!' আঁতকে উঠলেন ক্রমবার্গ। এগিয়ে গিয়ে কনসোলের অ্যাবোর্ট বাটন পাগলের মত টিপতে শুরু করলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, অমোঘ নিয়তির মত লঞ্চার থেকে বেরিয়ে গেল মিসাইলটা—ছুটতে শুরু করল টার্গেটের দিকে।

বিশ

টিনাকে নিয়ে সি-স্কুইরেলের কম্পিউটার-সেকশনে ফিরে এসেছে রানা আর

boighar.com

রায়হান। তরুণী ইউনো জানাল, অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামটা থেকে ব্যাকডোরটা সরিয়ে ফেলেছে ও।

'গুড, এখুনি শিপের কম্পিউটারে ঢোকাও ওটা,' রানা বলল। 'তারপর ভিনাস থেকে তাড়াও এলিসাকে।'

ঘড়ি দেখল টিনা—একটা চল্লিশ বেজে গেছে। বলল, 'কিন্তু সময় তো আর নেই, মাসুদ ভাই। অ্যান্টিভাইরাসটা তো সবখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়।'

'যতটুকু পারা যায়, তা-ই করো। যদি অর্ধেক দুনিয়াকেও বাঁচাতে পারি, সেটাই বা মন্দ কী?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ল টিনা। নুমা হেডকোয়ার্টারে ভিনাসকে দখল করা কোডের লিঙ্ক ধরে খুঁজে বের করল সেটার উৎস। মিনিটখানেকের মধ্যেই এলিসার ল্যাপটপে ঢুকে পড়ল ও, কোডটাকে নিশ্চল করে দিতে গেল। কিন্তু একটা জিনিস চোখে পড়তেই থমকে গেল তরুণী ইউনো। নতুন একটা কমাণ্ড পাঠানো হচ্ছে ল্যাপটপ থেকে... সেটা যাচ্ছে একটা নেভি শিপের কম্পিউটারাইজড় ফায়ার কণ্ট্রোল সিস্টেমে।

'ওহ্ গড! করছে কী ডাইনিটা!'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'একটা মিসাইল লঞ্চ করেছে ও—আমাদের টার্গেট করে!'

'হোয়াট! এলিসার কাছে মিসাইল এল কোত্থেকে?'

'মিসাইলটা ডাচ নেভির। ওদের একটা শিপের কম্পিউটার দখল করে নিয়ে কাজটা করছে ও।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার—রেগে গেছে ভীষণ। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে শয়তান মহিলাটা। রায়হান আর টিনাসহ ওকে মারতে চাইছে, সেটা নাহয় মেনে নেওয়া যায়; কিন্তু সি-স্কুইরেলে তো নিরীহ আরও মানুষ আছে! তাদের এভাবে খুন করার মানেটা কী! মেয়েমানুষ বলে একটু দয়া দেখাবে ভেবেছিল, কিন্তু সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না।

রায়হানের দিকে তাকাল রানা। 'ওদের হেলিকপ্টারটা কোথায়?'

'কাছাকাছিই আছে, যায়নি এখনও... ছাদ থেকে নামার সময় আমাদের স্টারবোর্ড সাইডে দেখে এসেছি ওটাকে।'

'ব্রিজে যাও, রেইডার থেকে ওদের একজ্যাক্ট পজিশনটা এনে দাও আমাকে।'

কোনও প্রশ্ন না করে বেরিয়ে গেল রায়হান।

'কী করতে চান?' খসখসে স্বরে জানতে চাইল টিনা, নতুন করে আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে ওর ভিতরে। একটা মিসাইলের হাত থেকে কীভাবে বাঁচা সম্ভব, সেটা বুঝতে পারছে না।

'আমি কিছু করব না, করবে তুমি,' বলল রানা। 'ডাচ নেভির সমস্ত মিসাইল কম্পিউটার-গাইডেড, তারমানে যেটা ছুটে আসছে, সেটাও। ওটাকে ইণ্টারসেপ্ট করবে তুমি।'

'কীভাবে ইণ্টারসেপ্ট করব?'

'মিসাইলটার সঙ্গে একটা ডেটা-লিঙ্ক আছে, মিড-ফ্লাইটে টার্গেট-বদল এবং সেলফ্-ডেস্ট্রাক্ট কমাণ্ড রিসিভ করার জন্য। লিঙ্কটায় ঢুকতে হবে তোমাকে।'

'আমি... আমি পারব না, মাসুদ ভাই,' ভয়ার্ত গলায় বলল টিনা। 'আমি কোনওদিন এ-ধরনের কাজ করিনি!'

'তুমি পারবে, টিনা,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'তুমি হচ্ছ ইউনোকোডের স্রষ্টা—সাইবার জগতের সত্যিকার ঈশ্বর। আর ঈশ্বর পারেন না, এমন কোনও কাজ নেই।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল টিনা, কথাটা ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে ওকে। মুহূর্তের মধ্যে চেহারায় আমূল পরিবর্তন এল ওর, আতঙ্ক আর দ্বিধা সরে গিয়ে সেখানে বাসা বাঁধল দৃঢ়সংকল্প। আর কিছু না বলে সোজা হলো ও, হাত রাখল কীবোর্ডে।

হেলিকপ্টারের ভিতরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে বুলডগ আর এলিসা। চেহারায় উত্তেজনা থাকলেও ভিতরে ভিতরে উল্লাস অনুভব করছে তারা। মিসাইল ছোঁড়া হয়ে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা এসে আঘাত করবে সি-স্কুইরেলকে। দলবল-সহ মাসুদ রানা ডুবে মরবে, একই সঙ্গে দূর হয়ে যাবে সমস্ত ঝামেলা। ইউনো-ভাইরাস আর পনেরো মিনিট পর নির্বিঘ্নে আঘাত হানতে পারবে বিশ্বজুড়ে, বিজয় হবে তাদের।

আশু-সাফল্যের কথা ভেবে হেসে উঠতে যাচ্ছিল দুজনে, এমন সময় পাশে রাখা ওয়াকিটকিটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'এলিসা ভ্যান বুরেন... ডক্টর, আপনি শুনতে পাচ্ছেন?'

রানার গলা চিনতে অসুবিধে হলো না বুলডগের, আলফা-থ্রি'র সেটে যোগাযোগ করছে। হাত বাড়িয়ে ওয়াকিটকিটা তুলে নিল সে, খুশি খুশি গলায় বলল, 'মি. মাসুদ রানা! হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ!'

'মি. বুলক নাকি? আপনিও আছেন ওখানে?'

'থাকব না কেন? নিজ চোখে আপনার মরণ না দেখে কি শান্তি পাব ভেবেছেন?'

'তারমানে আপনি জানেন, ড. বুরেন আমাদের লক্ষ্য করে একটা মিসাইল লঞ্চ করেছেন?'

'জানব না কেন, আইডিয়াটা তো আমিই দিয়েছি।'

'আপনি?' একটু থামল রানা। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আপনি পাগল হয়ে যাননি তো, মি. বুলক? কার উপরে মিসাইল মেরেছেন, জানেন? আপনার নিজেরই দেশের উপরে... সি-স্কুইরেল একটা অ্যামেরিকান সরকারি শিপ, এখানে আপনার দেশের বেশ কয়েকজন নিরীহ নাগরিক আছেন।'

'গোল্লায় যাক দেশ!' গরম গলায় বলল বুলডগ। 'আপনাকে খতম করার জন্য জনা কয়েক অ্যামেরিকান মরলে আমার কিছু যায়-আসে না।'

'আমাকে খতম করার জন্য, নাকি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য?'

'যেভাবে খুশি ভাবতে পারেন,' অবহেলার সুরে বলল বুলডগ। 'আপনি

boighar.com

মরলেই তো আমার স্বার্থসিদ্ধি হয়, তা-ই না?'

'তারমানে নিরীহ মানুষগুলোর জীবনের কোনও মূল্যই নেই আপনার কাছে?'

'কান খুলে শুনুন, মি. রানা, একটা জিনিসকেই মূল্য দিই আমি—নিজেকে, নিজের উচ্চাশাকে। আমার পথে আমি কোনও কাঁটা সহ্য করি না—হোক সে অ্যামেরিকান, বা আপনার মত একটা ভেতো বাঙালি!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'সীমাটা আপনি তা হলে ছাড়িয়েই গেলেন, মি. বুলক—স্বার্থের সামনে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিলেন। কাজটা ভাল করলেন না; আমি আগেই আপনাকে সাবধান করেছিলাম—নিজেকে শুধরে না নিলে আগামীতে আমি আপনাকে আর দয়া দেখাব না।'

'চেয়েছি নাকি যে দেখাবেন?' বিদ্রূপ করল বুলডগ। 'আপনার সময় তো ফুরিয়ে এসেছে, এখুনি রওনা দেবেন ঈশ্বরের কাছে। মরার আগে সর্বশক্তিমানের কাছে আপনারই দয়া ভিক্ষা করা উচিত।'

'আমারটা আমাকেই ভাবতে দিন,' হাসল রানা। 'তবে আপনার দিকটা না ভেবে পারছি না আমি। তাই শেষবারের মত একটা সুযোগ দিতে চাই—মিসাইলটা কোনও কিছুতে হিট করবার আগেই ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব, করবেন কি না বলুন।'

'না, মি. রানা,' চেঁচিয়ে উঠলেন এলিসা। 'নেভার!'

'দুঃখিত, আমাকেও ওঁর সঙ্গে একমত হতে হচ্ছে,' বুলডগ বলল।

'সেক্ষেত্রে আমিও দুঃখ প্রকাশ করছি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনাদের দয়া দেখাতে পারছি না বলে।'

'কী বলতে চান?' সতর্ক হয়ে উঠল বুলডগ।

'বলতে চাই যে, আপনারা দুজনই মানবজাতির কলঙ্ক। স্বার্থ আর ক্ষমতার লোভে পিশাচ হয়ে গেছেন আপনারা—খুন করছেন নিরীহ মানুষ... এমনকী প্রিয়জনদেরও। এলিসা তাঁর সবচেয়ে কাছের ন'জন বন্ধুকে খুন করেছেন, আপনিও ক্রিয়েলটেকের দুজন গার্ডকে ড্রুইভেনড্রেশটে নির্মমভাবে মেরে ফেলেছেন। টিজিভি-র কয়েকশো যাত্রীকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন আপনারা, এখন আবার মিসাইল দিয়ে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছেন নিজেরই দেশের একটা জাহাজকে—নিরীহ বিজ্ঞানী আর ক্রু-সহ! কী আর বলব, মানুষ নামের যোগ্য নন আপনারা।'

'গাল দিচ্ছেন আমাদের?' খেপে উঠল বুলডগ। 'পাছার মধ্য দিয়ে মিসাইলটা যখন ঢুকবে...'

'দুঃখিত, ওটা আমার নয়, আপনাদের পাছায় ঢুকবে,' বলল রানা। 'ভেবেছেন কী, সঙ্গে একজন ইউনো আছে বলে যা-খুশি তাই করে বেড়াতে পারবেন? জেনে রাখুন, মি. বুলক, এলিসা ভ্যান বুরেন সাইবার জগতের ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের বেশধারী একটা ভণ্ড-শয়তান। আসল ঈশ্বর আছে আমাদের সঙ্গে, ইউনোকোড সৃষ্টি করেছে ও, তাই যা-খুশি-তা করবার ক্ষমতা একমাত্র ওর-ই আছে।'

'ধাপ্পা দিচ্ছে, রানা ধাপ্পা দিচ্ছে!' চেঁচিয়ে বললেন এলিসা। 'মিসাইলটা

এখনও আমার নিয়ন্ত্রণে আছে, ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই হিট করবে ওটা—এত অল্প সময়ে ঈশ্বরও পারবে না ওটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে।'

'তা-ই?' হাসল রানা। 'আরেকবার তাকান তো নিজের কম্পিউটারের দিকে!'

এক সঙ্গে ল্যাপটপের মনিটরের দিকে তাকাল বুলডগ আর এলিসা—সবকিছু সরে গিয়ে ওখানে জ্বলজ্বল করে ভাসছে একটা বাক্য... নিষ্ঠুর পরিহাস বলতে হবে, ইউনো-ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট হবার সময় এই বাক্যটা দিয়েই সারা পৃথিবীকে একটা মেসেজ দিতে চেয়েছিলেন কুচক্রী ইউনো:

"ইউ আর ডুমড্!"

পাগলের মত কীবোর্ড টিপলেন এলিসা, কিন্তু কম্পিউটারটা সাড়া দিল না একটুও। হঠাৎ থমকে গেলেন তিনি, রোটরের গর্জন ছাপিয়ে কানে ভেসে আসছে অন্য একটা শব্দ। জানালা দিয়ে তাকাতেই তীব্র বেগে ছুটে আসতে থাকা মিসাইলটাকে দেখতে পেলেন তাঁরা। জাহাজ নয়, ওটা আসছে হেলিকপ্টারটার দিকে!

কণ্ট্রোল কলাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ড. বুরেনের একান্ত অনুগত পাইলট, সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল যান্ত্রিক ফড়িংটাকে। কিন্তু বেচারার সে-চেষ্টায় কোনও লাভ হলো না, মিসাইলটা ইতোমধ্যে টার্গেট লক করে ফেলেছে।

প্রচণ্ড বেগে গিয়ে কপ্টারের গায়ে আঘাত করল ক্ষেপণাস্ত্রটা, ফিউজলাজ ভেঙে ঢুকে গেল শরীরে... তারপরই বিস্ফোরিত হলো। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে গেল আকাশযানটার বেশিরভাগ অংশ, যে-টুকু অবশিষ্ট রইল, সে-টুকু পরিণত হলো জ্বলন্ত একটা অগ্নিপিণ্ডে, খসে পড়ল সুনীল সাগরে। পানিতে কয়েক সেকেণ্ড ভেসে রইল ধ্বংসস্তূপটা, এরপর ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল অতলে।

আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টিনা। হালকা গলায় বলল, 'বসে থাকতে থাকতে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। মাসুদ ভাই, চলুন না, ওয়েদার ডেক থেকে একটু ঘুরে আসি? রায়হান, তুমি আসবে?'

'ঘুরতে যাবে মানে?' চোখ কপালে তুলল রায়হান। 'অ্যান্টিভাইরাসটা ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে না? ভিনাস...'

'এলিসার ল্যাপটপটা অচল হবার সঙ্গে সঙ্গে ভিনাসের নিয়ন্ত্রণ ফিরে গেছে মি. ল্যারি কিঙের কাছে,' বাধা দিয়ে বলল টিনা। 'ওটা এখন নিজ থেকেই কাজ করতে পারবে। অবশ্য... না করতে পারলেও অসুবিধে নেই।'

'কী বলছ এসব! পনেরো মিনিটও নেই, ভিনাস ঠিক থাকলেও তো সবখানে পৌঁছুনো সম্ভব নয় অ্যান্টিভাইরাসটা। আর তুমি কি না বলছ...'

আবার বাধা দিল টিনা। বলল, 'খামোকা দুশ্চিন্তা করছ। ভিনাস-টিনাস নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না কাউকে, অ্যান্টিভাইরাসটা নির্ধারিত সময়ের ভিতরেই পৌঁছে যাবে সব জায়গায়। সত্যি বলতে কী, পৌঁছুনোর পরও চার-পাঁচ মিনিট সময় বেঁচে যাবার কথা।'

'ক্... কিন্তু কীভাবে?' রায়হানকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

'সহজ,' ব্যাখ্যা করল টিনা। 'প্রোগ্রামটায় নতুন কয়েকটা লাইন ঢুকিয়ে

boighar.com

দিয়েছি আমি। ফলে অ্যান্টিভাইরাসটা এখন একটা সেলফ-রেপ্লিকেটিং ভাইরাসের মত কাজ করবে। একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটা, চারটা থেকে ষোলোটা... এভাবে প্রত্যেক কম্পিউটারই অন্যান্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে দিতে থাকবে ওটা—প্রায় আলোর গতিতে, যতক্ষণ না পৃথিবীর সমস্ত কম্পিউটারে পৌঁছে যায় ওটা। আমার হিসেব বলছে, মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত মিনিটেই ডিস্ট্রিবিউশনটা শেষ হয়ে যাবে। কাজটার জন্য সুপার কম্পিউটারের প্রয়োজন নেই, বুঝেছ?'

'কখন... কীভাবে তুমি এতকিছু করলে?' হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করল রায়হান, বিস্ময়ে মুখের কথা আটকে যাচ্ছে ওর।

মুচকি হাসল টিনা। 'কখন-কীভাবে... এসব প্রশ্ন করতে হয় না ঈশ্বরকে।' রানার দিকে তাকাল ও। 'ঈশ্বর যা চায়, তা-ই করতে পারে, ঠিক না?'

রানাও হাসল। 'একদম ঠিক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাসুদ ভাই,' কৃতজ্ঞতা জানাল টিনা। 'আমার মধ্যে কী ক্ষমতা আছে, সেটা আপনি না বললে কোনওদিন উপলব্ধিই করতে পারতাম না।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না,' রানা বলল। 'ডেকে চলো, খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছে আজ। চাঁদের আলোয় বড় ভাইটাকে একটু সঙ্গ দিলেই খুশি হব আমি।'

কম্পিউটার সেকশন থেকে বেরিয়ে ওয়েদার ডেকে গেল ওরা। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে, মনে প্রশান্তি নিয়ে। নীরবতা ভেঙে একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলল টিনা, বলল, 'আমার ভবিষ্যৎ কী, মাসুদ ভাই? ইউনোকোডের কথা জেনে ফেলেছে অনেকে, আমার ব্যাপারেও নিশ্চয়ই তথ্য পেয়ে যাবে। বাকি জীবন কি পালিয়ে বেড়াতে হবে আমাকে?'

'ভবিষ্যৎটা কেমন হবে, সেটা তুমিই ঠিক করবে,' রানা বলল। 'আমি শুধু পরামর্শ দিতে পারি।'

'দিন না!'

'লোকের ভয়ে ইউনোকোডকে চাপা দিয়ে ফেলো না তুমি। জিনিসটা অত্যন্ত শক্তিশালী, মানুষের ক্ষতি করা যায় ঠিক, কিন্তু উপকারেও তো আসতে পারে। তোমার বাবা-মা জানতেন সেটা, সেজন্যেই গোপনে হলেও গবেষণা করে গেছেন, কোডটাকে পৃথিবীর উপকারে ব্যবহারের জন্য একটা পর্যায়ে আনতে চেয়েছেন। তাঁদের পথেই তোমাকে চলতে অনুরোধ করব আমি।'

'কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? আমার পিছনে যদি মন্দ লোকেরা শেয়ালের মত ধাওয়া করতে থাকে, তা হলে গবেষণা আমি করব কী করে?'

'আমি যদি তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিই, তা হলে করবে?'

'আপনি আমাকে আশ্রয় দিতে পারবেন? সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন?'

'আমি একা পারব না, তবে বিসিআই পারবে। বাংলাদেশেই গবেষণার একটা জায়গা করে দেয়া হবে তোমাকে... যদি তোমার আপত্তি না থাকে আর কী!'

একটু দ্বিধা করল টিনা—বিদেশি একটা এসপিয়োনাজ সংস্থার হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া ঠিক হবে কি না, তা বুঝতে পারছে না।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল রানা। বলল, 'দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই তোমার। বিসিআই একটা এসপিয়োনাজ সংস্থা ঠিকই, কিন্তু কিছু নীতি মেনে চলে। কখনও মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিই না আমরা, জোর-জুলুম করে কাউকে কিছু করতে বাধ্যও করি না। আমি কথা দিতে পারি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনোই কিছু করতে বলা হবে না তোমাকে।'

'আমি যদি বলি, গবেষণা সফল না হওয়া পর্যন্ত আমার কাছ থেকে কিছুই পাবেন না আপনারা?'

'বলো। কোনও অসুবিধে নেই।'

'গবেষণাটা শেষ হতে যদি অনেক বছর লেগে যায়?'

'আমরা অপেক্ষা করব।'

হাসি ফুটল টিনার ঠোঁটে। 'তা হলে প্রস্তাবটা বিবেচনা করতে রাজি আছি আমি।'

'কিন্তু এত বড় একটা কাজ কি একা শেষ করতে পারবে তুমি?' সন্দেহ প্রকাশ করল রায়হান। 'কোডটা আবিষ্কার করেছ ঠিকই, কিন্তু তোমার বাবা-মা আর তাঁর বন্ধুরাও তো কম প্রতিভাবান ছিলেন না। বিশ বছর খেটে তাঁরাও তো পারেননি কিছু করতে!'

'কী বলতে চাও?' প্রশ্ন করল টিনা।

'বলছি যে, তোমার সহকারী প্রয়োজন—সৎ, বিশ্বস্ত, দক্ষ... এমন কেউ, যে ইউনোকোড নিয়ে নতুন কোনও ষড়যন্ত্র আঁটবে না, আবার তোমাকে জানপ্রাণ দিয়ে সাহায্যও করতে পারবে। সোজা কথায়... নতুন ইউনো।'

'ব্যাপারটা কী, নিজের কথাই বলছ নাকি?' ভুরু নাচাল টিনা। 'ইউনো হতে চাও?'

'ধ্যাত্, ইউনো হতে চাইব কেন?' অবজ্ঞার সুরে বলল রায়হান। 'আমি তো চাই আরও বড় কিছু হতে।'

'কী?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল টিনা।

এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল তরুণ হ্যাকার। 'আমি চাই তোমার জীবনসঙ্গী হতে।'

www.boighar.com

ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল টিনার, আবেগের উচ্ছ্বাসে কথা বলতে পারছে না। গভীরভাবে ওকে চুমো খেল রায়হান, টিনাও সাড়া দিচ্ছে। এভাবে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেল তরুণী ইউনো।

'অ্যাই ছাড়ো, ছাড়ো। করছটা কী... মাসুদ ভাইয়ের সামনে...' বলতে বলতে থেমে গেল টিনা।

রানা নেই। ওদের দুজনকে একা হবার সুযোগ দিয়ে কখন যেন চলে গেছে ও।

***

www.boighar.com